স্নাতক স্তরের "এডুকেশন" বিষয়ে তৃতীয় পত্রের সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমানুসারে
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত।

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নাতকোত্তর 'শিক্ষা' বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রকাশনী
৩৪৫, গাঙ্গুলীবাগান গভঃ কলোনী
নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

প্রথম প্রকাশ : ২৩শে জুলাই ১৯৬৯
তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্য : ১২.৫০ টাকা মাত্র ॥

প্রকাশিকা : তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিক্ষা প্রকাশনী,
৩৪৫, গাঙ্গুলী বাগান গভঃ কলোনী,
নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

মুদ্রাকর : শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস,
৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলিকাতা-৭

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

ষ্টুডেণ্টস্ হোম,
৯এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স,
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ,
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইণ্ডিয়ান বুক ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

স্বরাজ ভাণ্ডার
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

আমার মা
শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবী'র
পায়ে।

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের বক্তব্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবর্ষ স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্য 'এডুকেশন' এর তৃতীয় পত্রের সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুসারে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য বই হিসেবে বইখানি লিখেছি। বিভিন্ন কলেজে এডুকেশনে অধ্যাপনারত পরিচিত বন্ধু এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপনা করছেন, তাঁদের উৎসাহেই আমি উদ্যোগী হয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে খুবই আনন্দিত হব।

বইখানিতে কোন কোন জায়গায় কিছুটা পুনরাবৃত্তি দোষ থাকতে বাধ্য। এর জন্য সিলেবাসই দায়ী। সিলেবাসটি আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক—দুইভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক অংশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার কথা রয়েছে; আবার ঐচ্ছিক অংশেও বিশেষ পাঠের জন্য রয়েছে ঐ বিষয়ে দুটি বিভাগ। গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন থেকেই দেখা যায় যে আবশ্যিক অংশের জন্য প্রস্তুতি কতটা গভীর এবং ব্যাপক হওয়া দরকার, একথা ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বোঝাই দুষ্কর। তাই কতগুলি বিষয় দুই জায়গাতেই আলোচনা করতে হয়েছে—ছাত্রছাত্রীরই স্বার্থে।

একটু পটভূমি তৈরী করে নিলে বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাগুলি বুঝতে সুবিধা হবে মনে করে কয়েকটি পৃষ্ঠায় সামান্য পটপরিক্রমা করেছি, যদিও লিখিতভাবে এটি সিলেবাসের মধ্যে উল্লেখ করা নেই।

সিলেবাসে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখেছি। তা ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় অংশে আলাদাভাবে তুলনামূলক আলোচনা করতে হয়েছে। এজন্য বইয়ের পৃষ্ঠা বেড়েছে, হয়তো কোন কোন জায়গায় একটু ভারীও লাগতে পারে। কিন্তু আমার উপায় ছিলনা—কারণ সিলেবাসের নির্দেশ।

ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই বিভিন্ন 'গ্রুপ' অনুসারে আলাদাভাবে তৈরী করতে ভুল করে। এজন্য প্রতিটি 'গ্রুপের' পাঠ্যবিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। সব গ্রুপ মিলিয়ে বইখানি যদিও বেশ বড়, তবুও কোন গ্রুপের ছাত্রছাত্রীকেই আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক পাঠ মিলিয়ে ২৫০ পৃষ্ঠার বেশী পড়তে হবেনা, কারণ গ্রুপ

গুলির ওজন সাধ্যমত সমভাবে বণ্টন করতে চেষ্টা করেছি। (তবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক গ্রুপের জন্য পাঠ্যবিষয় একটু বেশী, কারণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে)। আমি অবশ্য আশা করি অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ দুটি অবসর সময়ে পড়ে নেবে, কারণ এর ফলে আবশ্যিক সাধারণ বিভাগের ক্ষেত্রে তারা উপকৃত হবে।

প্রতি অধ্যায়ের শেষে নিজের রচিত প্রশ্ন ছাড়াও বইয়ের শেষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী সংযোজন করেছি এবং ঐগুলির সঙ্গে আমার দেওয়া প্রশ্নের সাদৃশ্য উল্লেখ করেছি। সর্বশেষ তথ্যাদি (যতটা পাওয়া গেছে) বইয়ে উল্লেখ করেছি।

বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার ডায়গ্রাম কয়টি এঁকে দিয়েছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আমার মেয়ে গোপা এবং তাকে সাহায্য করেছে ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রী ছোট মেয়ে মহুয়া। তাদেরকে আমার আশীর্বাদ এবং বইখানি প্রকাশ করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রকাশিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবারও বলছি বইখানি অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ভাল লাগলে এবং ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

২৩শে জুলাই ১৯৬৯

স্নাতকোত্তর 'শিক্ষা' বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : সাধারণ পাঠ

প্রথম অধ্যায় : পটপরিক্রমা :—আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষা —আধুনিক যুগ—পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন—ক্রমিক পরিবর্তন— ৩-২২

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সংস্কার :—১৯৪৭ সনের অবস্থা—পুরাতন শিক্ষা কাঠামো—স্বাধীন ভারতে শিক্ষা কর্মধারা— ২২-২৮

তৃতীয় অধ্যায় : আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা :— ২৯-৪২

চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা :—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী— ৪২-৭৫

পঞ্চম অধ্যায় : স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনা ও অগ্রগতি : প্রাক-প্রাথমিক--প্রাথমিক—গান্ধিজী ও বুনিয়াদি—বাধ্যতামূলক শিক্ষার চেষ্টা—প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার অগ্রগতি—সমস্যা—বাংলাদেশেরকথা—সমাধানের পথ ; মাধ্যমিক শিক্ষা—মুদালিয়ার কমিশন—শিক্ষার প্রসার—সমস্যা ; উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি—গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা—সমস্যা—বাংলাদেশের কথা ; উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য—আমাদের ব্যর্থতা—ত্রুটি ও সমাধান—ভাষার প্রশ্ন—ছাত্রবিক্ষোভ—প্রশাসন ; অর্থ সংস্থান—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ; কোঠারি কমিশন বক্তব্য—৭৬-১৩২

ষষ্ঠ অধ্যায় : শিক্ষা প্রশাসন ও অর্থসংস্থান :—শিক্ষা প্রশাসনের সার্বিক রূপ—শিক্ষায় অর্থসংস্থান—সরকারের সীমিত দায়িত্ব— ১৩৩-১৩৮

সপ্তম অধ্যায় : ভবিষ্যতের কথা (কোঠারি কমিশন রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষানীতি, চতুর্থ পরিকল্পনা) :—রিপোর্ট—শিক্ষা কাঠামো—উল্লেখযোগ্য সুপারিশ—প্রশাসন—শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য ও অর্থসংস্থান—সমালোচনা—জাতীয় শিক্ষানীতি—চতুর্থ পরিকল্পনা— ১৩৮-,৬০

দ্বিতীয় পর্ব : বিশেষ পাঠ

'খ' বিভাগ : প্রথম অধ্যায় : প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা :—শৈশবের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব—শিশু শিক্ষা চেতনা—শিশুর প্রক্ষোভজীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, পরিচালনা ও শিক্ষার মূল্য—শিক্ষা গুরুদের অবদান—শিশু শিক্ষা আন্দোলন—শিশু শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রম (নার্সারী ও কে, জি)—শিক্ষালয়ের রকমভেদ—শিক্ষা পদ্ধতি (মন্তেসরি, ফ্রোয়েবল, ডিউইর কথা), খেলা, প্রকৃতি বীক্ষণ—পরীক্ষা ও প্রমোশন—অপসঙ্গতি—শিক্ষিকা—বিদেশে ও

এদেশে বর্তমান অবস্থা—প্রয়োজনীয়তা পশ্চাৎপদতার কারণ—পরিকল্পনা—সমস্যা ও সমাধান ৩-১০০

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাথমিক শিক্ষা :— বাল্যজীবনের বৈশিষ্ট—প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশুকেন্দ্রিকতা—বিদ্যালয়, পাঠ্যক্রম—ইংরেজীর প্রশ্ন—শিক্ষাপদ্ধতি—পরীক্ষা—বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক—সহপাঠ্যক্রম—শিক্ষক—অন্যান্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা—এদেশে স্কুল ব্যবস্থা—শিক্ষার প্রসার—অর্থ, প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতের কথা—স্কুলের প্রকারভেদ—গ্রাম সহরের অবস্থা—সামগ্রিক পরিস্থিতি, সমস্যা ও পরিকল্পনা ; শিক্ষক, জমি বাড়ী, সরঞ্জাম, প্রশাসন, অর্থ সমস্যা—আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি ১০—১৭৪

"গ" বিভাগ : তৃতীয় অধ্যায় : মাধ্যমিক শিক্ষা :—

মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞা—কৈশোরের গুরুত্ব ও প্রয়োজন, চেতনার বিবর্তন—মাধ্যমিক শিক্ষার বিশিষ্টতা—বিভিন্নমুখীনতা আভ্যন্তরীন স্তরবিন্যাস ও বৈচিত্র্য—স্কুলের প্রকারভেদ ; শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, ভাষাসমস্যা, পদ্ধতি, সহপাঠ্যক্রম—পরীক্ষা—নির্দেশনা—অপসঙ্গতি, যৌনশিক্ষা, ছাত্রবিশৃঙ্খলা—শিক্ষক—মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—শিক্ষক সমস্যা শিক্ষামান—পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গের কথা, প্রশাসন, অর্থসংস্থান ১৭৫—২৬১

'ঘ' বিভাগ : চতুর্থ অধ্যায় : বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা :

কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার সংজ্ঞা—সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি, উদ্দেশ্য—প্রয়োজন ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক—সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা—শিক্ষালয়ের প্রকারভেদ—পাঠ্যক্রম, সহপাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, পরীক্ষা, নির্দেশনা—চেতনার বিকাশ, বর্তমান অবস্থা—শিক্ষার প্রসার—প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ—প্রশাসন, অর্থ—ভবিষ্যতের চিন্তা, শিক্ষার সংকট—কৃষি, মেডিক্যাল, চারুকলা, শিক্ষক শিক্ষণ ইত্যাদি ২৬২—৩৩৬

"ঙ" বিভাগ : পঞ্চম অধ্যায় : ব্যাহতদের শিক্ষা :—

নবচেতনা—ব্যাহতদের প্রকারভেদ—মানসিক খর্বতার প্রকৃতি ও প্রকারভেদ—মানসিক ব্যাহত—স্তরভেদ—প্রতিষেধক—ব্যাধি নির্ণয়, প্রতিবিধান—পাঠ্যক্রম—পদ্ধতি—বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা—দৈহিক বিকলাঙ্গের শিক্ষা—মূক বধিরদের শিক্ষা—অন্ধদের শিক্ষা ৩৩৭-৩৮৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ৩৮৬-৩৯২

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

প্রথম পর্ব

সাধারণ পাঠ

সকল পরীক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক

বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পাঠ্যক্রম :—

Education—Pass

Paper III ... ... 100 marks

CURRENT PROBLEMS IN INDIAN EDUCATION

Group A :

An outline system of education in India :

Primary, Secondary, and University.

Problems of free and compulsory primary education.

Basic education, English in Primary curriculum.

Problems of finance, accommodation and equipment Control and management. Curriculum and Co-curricular activities.

Teaching personnel ; tests and examinations in Primary and Secondary education.

* 'ক' বিভাগের অন্তর্গত অংশটি সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য অবশ্য-পাঠ্য বিষয়

সাধারণ পাঠ

প্রথম অধ্যায়

পটপরিক্রমা

যে কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তার শিক্ষা ব্যবস্থা। আবার শিক্ষা ব্যবস্থাই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়। সমাজ পরিবর্তিত হয়, সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে জাতীয় ঐতিহ্য। শিক্ষাব্যবস্থার প্রগতিশীলতাই জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এখনও আমাদের প্রভাবিত করে; কিন্তু আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে যেতেও চাই। **অতীত আর ভবিষ্যতের এই টানাপোড়েন, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে অনেক সমস্যা।**

দীর্ঘদিন আমরা ইংরেজ শাসনে ছিলাম। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন ইংরেজ শাসকরা। তাঁরা নিজেদের স্বার্থই বড় করে দেখেছিলেন। স্বাধীনতার পরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়বার সমস্যা এলো। এজন্য আমরা কোন পন্থা গ্রহণ করবো? ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বদলে সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবো না সেই ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করবো? দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করলে **সংস্কারের রূপ কি হবে, উপযুক্ত সামঞ্জস্য থাকবে কিনা, অথবা প্রয়োজনীয় উপকরণ ও রসদ আমাদের আছে কিনা,—এই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সমস্যা।**

বর্তমানের যুগটিই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগ। আমরা জাতীয় উন্নতি চাই, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। কিন্তু সারা বিশ্বের আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারাও আমরা গ্রহণ করতে চাই। অন্য দেশ থেকে আদর্শ ও কর্মপন্থা কতটা এবং কিভাবে আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে পারবো, সামঞ্জস্য থাকবে কিনা, আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি

হবে কিনা—এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। **অন্ধভাবে গ্রহণ না করে সচেতন বিচারের সাহায্যেই গ্রহণ-বর্জন করতে হবে! এই পথেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক সমস্যা।**

কেন আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর: কেন স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার এখনও হয়নি; কেন শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য; কেন আমাদের কারিগরি শিক্ষা দেরীতে সুরু হয়েছে; কেন হয়েছে শিক্ষিত-বেকারত্বের সমস্যা? আমাদের এমনি অসংখ্য 'কেন'র উত্তর আমরা শুধুমাত্র বর্তমানের দিকে তাকিয়েই দিতে পারব না। অনেক সমস্যার শিকড় রয়েছে অতীতের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার লতাগুলো বেড়ে উঠেছে, জট পাকিয়েছে। সুতরাং আমাদের বর্তমান **শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতিটি বুঝতে হলে, সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে পিছনে তাকিয়ে একটু পটপরিক্রমা করতেই হবে।**

আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে বৈদিকধর্ম এবং বেদ উপনিষদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের ঋষিরা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক পরম স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এই পরমের অনুভূতি জাগ্রত করাই পরম জ্ঞানের লক্ষ্য। জীবনব্যাপী সংযম, মনন, জ্ঞানার্জন এবং আত্মোন্নতির পথেই এই পরম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

কিন্তু আধ্যাত্মিক আদর্শই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার একমাত্র আদর্শ ছিল না। ঋষিরা পার্থিব দায়িত্বও স্বীকার করেছেন। তাই সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্যের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণের শিক্ষাকেও তাঁরা বড় করে দেখেছেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে নাম দিয়েছিলেন পরাবিদ্যা এবং জাগতিক শিক্ষাকে বলেছিলেন অপরাবিদ্যা। **পরা ও অপরার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা।**

(বিঃ দ্রঃ—এই আলোচনাটি সংক্ষিপ্তাকারে আমরা উপস্থিত করলাম এই জন্য যে আজও আমাদের শিক্ষাবিদরা শিক্ষার আদর্শ ও নীতি নির্ধারণের

সময় অনবরত বলে থাকেন যে ভারতের প্রাণশক্তি নিহিত আছে অধ্যাত্মবাদে, অথচ আমাদের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিদ্যাও প্রয়োজন। তাই অধ্যাত্মবাদ এবং বাস্তববাদের সমন্বয়ের কথা তাঁরা বলেন। কিন্তু স্বার্থক সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থতার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানের অনেক শিক্ষা সমস্যা। **বর্তমানের পরিস্থিতিতে পরা ও অপরার সামঞ্জস্য করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।**)

প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ছিল বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, ষড়বেদান্ত প্রভৃতি। অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, ছন্দ, ব্যাকরণ, ব্যুৎপাত্তিতত্ত্ব জ্যোতিষ এবং বিধিতত্ত্ব)। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক শিক্ষনীয় বিষয় এই সঙ্গে সংযোজিত হয়।

সে যুগের মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল **গুরুকুল**, অর্থাৎ গুরুর গৃহে আবাসিক গৃহবিদ্যালয়। শিক্ষা ছিল **অবৈতনিক**। প্রতিটি শিষ্যের শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু বিদ্যালয়ের চেতনা ছিল সামগ্রিক। শিক্ষক ছিলেন পিতৃতুল্য। গুরুকুলে শিষ্যরা লাভ করতো কর্তব্য ও সমষ্টি-জীবনের শিক্ষা।

ঋষিরা মানুষের জীবনকে চারিটি পর্যায় অর্থাৎ আশ্রমে ভাগ করেছিলেন। প্রথম পর্যায়—**ব্রহ্মচর্যাশ্রমই ছিল শিক্ষার সময়**। বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শুরু হতো। ছাত্রদের হতে হতো মনে ও দেহে নিয়মানুবর্তী। তারা পালন করতো ব্রহ্মচর্য। আচার্য ও উপাচার্যের তত্ত্বাবধান ও দয়িত্বে ছাত্রদের স্ব-অধ্যায়ই ছিল শিক্ষারীতি। গুরু শিষ্যের কর্তব্য ও অধিকার ছিল সুনির্দিষ্ট।

আমরা বলেছি যে অধ্যাত্ম শিক্ষাই ছিল মূল নীতি, কিন্তু জাগতিক শিক্ষাও ক্রমে মূল্য অর্জন করে। তাই ইতিহাস-পুরাণ, আখ্যান, গাঁথা, ক্ষাত্র-বিদ্যা, এবং নানাধরনের ব্যবহারিক বিদ্যা পাঠ্যক্রমে স্থান পায়। একথাও আমরা বলেছি যে সামাজিক দায়িত্ব পালনের শিক্ষাও তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সমাজটি ছিল বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। তাই ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। শূদ্রদের সমাজিক অধিকার ছিল না, তাই তাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল না।

গুরুর কাছ থেকে পাঠগ্রহণ, অনুশীলন, প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সন্দেহমোচন এবং মননের সাহায্যে সত্যজ্ঞান লাভই ছিল **শিক্ষণ-পদ্ধতি**। বিদ্যালয়

জীবনেও ছিল সময় নির্ঘণ্ট এবং বিধিবিধান। গুরুগৃহে বার বৎসর জ্ঞানসাধনার পরে উপযুক্ত শিষ্যরা **সমাবর্তন** উৎসবের মধ্য দিয়ে **স্নাতকরূপে** গৃহ ও কর্ম-জীবনে ফিরে আসতেন।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্য থেকে যেমন বৌদ্ধধর্মের উত্থান হয়েছিল, তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল **বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা**। বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ছিল পরিনির্বাণ। বৌদ্ধশিক্ষার আদর্শও হলো পৃথিবীর বন্ধন ও বাসনা থেকে মুক্তি। তাই ত্যাগধর্ম এবং নৈতিক জীবনই ছিল বৌদ্ধ-শিক্ষার মূলমন্ত্র। সংসারত্যাগী শিক্ষার্থীরা স্থান পেলো বিহারে। তাদের ভিক্ষুরূপে তৈরী করাই হলো শিক্ষার মূল রীতি ও পদ্ধতি। সুতরাং এ শিক্ষায় গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ট, নিয়মানুবর্তিতাই ছিল মূলমন্ত্র।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অতি সত্বর গণধর্মে পরিনত হয। তাই বৌদ্ধ শিক্ষায় বর্ণ বৈষম্যের বদলে **সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়**। লোকায়ত্ত নানাধরনের পাঠ্য-বিষয় পাঠ্যক্রমে স্থান পায়। সাধারণ গৃহী নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষাও প্রসারিত হয়। শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী গণতান্ত্রিকতা ছিল বৌদ্ধযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন ভারতে **নারী শিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল**। ঋষি নারীকে ঋষিকা কিম্বা ব্রহ্মবাদিনী বলে আখ্যা দেওয়া হতো। অনেক বিদুষী নারীর নামও তোমরা জান। বিয়ের পরেও মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থাকতো। অনেক ঋষিপত্নী ছিলেন পরম প্রজ্ঞার অধিকারিণী। কিন্তু সামাজিক ভাঙ্গাগড়া এবং রাজনৈতিক উত্থানপতনের ফলে নারীশিক্ষার ধারাটি ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও স্ত্রীশিক্ষার ঐতিহ্য কখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি।

সংসার বন্ধন ত্যাগ করাই ছিল বৌদ্ধ জীবনের আদর্শ। ভিক্ষুরা নারী সংসর্গ পরিহার করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ শিক্ষার প্রথমাবস্থায় নারী শিক্ষার মূল্য ছিলনা। কিন্তু ক্রমে যখন বৌদ্ধধর্ম নারী হৃদয়েও আলোড়ন সৃষ্টি করলো, তখন তাদের দাবীও স্বীকৃত হলো। মেয়েদের পৃথক বিহারও প্রতিষ্ঠিত হলো।

তাই বৌদ্ধযুগও বহু গুণী নারীর প্রভাবধন্য হয়েছে!

সামাজিক জীবনে উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য। তাই **বৃত্তি-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, কারিগরি-শিক্ষা এবং পেশাগত শিক্ষারও** বহুল প্রচলন হয়।

প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুকুল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে তপোবন আশ্রম, পরিষদ, সুত্র বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ বিহারগুলিই পরিনত হলো নালন্দা, বিক্রমশীলার মত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে। হিন্দু শিক্ষাও ছড়িয়ে পড়লো মঠমন্দির ও তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে। কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, নদীয়া, প্রভৃতি এইভাবেই বিখ্যাত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিনত হয়। **এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিলনা**। তবে রাজপুরুষ ও বিত্তশালী সমাজ অর্থ ও ভূমি দান করে **শিক্ষা ব্যবস্থাকে পোষণ করতেন**। প্রাচীন ভারতে বিদ্যোৎসাহী নৃপতির অভাব ছিল না। সাধারণ মানুষরাও শিক্ষা ব্যবস্থাটি বাঁচিয়ে রাখাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করেছে। কিন্তু কালক্রমে যেমন বৌদ্ধধর্মও ভারতে হীনপ্রভ হয়ে গেল, তেমনি বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়লো। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকলো। হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বাপর অস্তিত্ব রক্ষা করে চললো। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে হিন্দু শিক্ষার মধ্যেও পরিবর্তন এলো অসংখ্যভাবে। এই পরিবেশেই ভারত প্রবেশ করলো প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল, রক্ষণশীলতা ছিল, বর্ণ বৈষম্য ছিল। কিন্তু তবু এই ব্যবস্থা সে যুগের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল বলেই এই ব্যবস্থাটি দীর্ঘজীবি হয়েছিল। কালক্রমে রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বলিষ্ঠ চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে কোনরকমে এই শিক্ষা ব্যবস্থা অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু বর্তমানের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার মুখে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা কোনরকমেই যেন আর সম্ভব নয়। শিক্ষার উপর শিক্ষকের সর্বাধিকার, প্রাচীন ধরনের গুরুকুল, গুরুশিষ্যের সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, নিয়মানুবর্তিতা, সংযম ও ব্রহ্মচর্যের সেই ধারনা, আশ্রম জীবন এবং অধ্যাত্মচেতনার মধ্য দিয়ে **শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভারতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল, কালের যাত্রাপথে তার বহুলাংশই নিশ্চিহ্ন হয়েছে**।

(বিঃ দ্রঃ—কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের বহু রেশ আমাদের জীবনে নানাভাবে

মিশে রয়েছে। প্রাচীন মূল্যবোধের সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়নি। অধ্যাত্ম অন্বেষণের চেতনা এখনও বহু ভারতবাসীর অন্তরে সাড়া জাগায়। পরাধীনতার যুগে প্রাচীন গৌরবের কথা সচেতন ভাবেই স্মরণ করিয়ে লোকের মনে আলোড়ন সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। এখনও গুরুকুল ও আশ্রমিক শিক্ষার অনুকরণে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার চেষ্টা হয়। তাই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার টানাপোড়েন, রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার টানাপোড়েন বর্তমান ভারতের শিক্ষা চেতনায় খুবই সত্য এবং এই দ্বন্দ্বের পথেই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অনেক শিক্ষা সমস্যা। তাই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।)

মধ্যযুগের কথা

তুর্কো-আফঘান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রবেশ করেছে। ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করেছে মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থা। এইভাবে মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষায় সংযোজিত হলো আর একটি নূতন উপাদান।

অতীতেও ভারতবর্ষে শক, পহ্লব, কুষাণ, হুণ প্রভৃতির বৈদেশিক আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ হয়েছে। কিন্তু এদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তদুপরি এদের কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্কৃতি ছিল না। তাই ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যেই এরা বিলীন হয়ে গেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ নানাভাবে এদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করে নিয়েছে।

কিন্তু ইসলাম এলো সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা রূপে। মুসলীম বিজয়ীদের সঙ্গে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম ; আরব, পারস্য, তুর্কি সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ ঐতিহ্য। ইসলামী রাজশক্তি এখানে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। রাজশক্তির আনুকুল্যে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সযত্নে লালিত হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে এই নূতন শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে নানা সময়ে নানাভাবে। প্রাচীন শিক্ষা তখন আর নূতন রাজশক্তির সহায়তা পায় নি। কিন্তু মাটিতে শিকড় ছিল বলেই সে ব্যবস্থা আত্মরক্ষা করেছে ; বেঁচে রয়েছে জনগণের মধ্যে। **তাই হিন্দু ও মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র মধ্যযুগ ধরে পাশাপাশি চলেছে।**

ভারতীয় সুলতানরা ইসলামী শিক্ষাকে আনুকূল্য দিয়েছেন। তাঁরা মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। **মাদ্রাসাই হয়েছে ইসলামী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান**। লোকশিক্ষা এ ক্ষেত্রেও ছিল প্রায় রাজানুকূল্য বর্জিত। জনসাধারণ নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। **হিন্দু পাঠশালার মত মক্তবে হয়েছে সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা, যেমন হিন্দু টোলের মত মাদ্রাসায় হয়েছে ইসলামী উচ্চশিক্ষা।**

কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি অবস্থানের ফলে দুইটি সংস্কৃতির মধ্যে পরিশেষে আদান প্রদান হয়েছে, হয়েছে সমন্বয়। দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থাও পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। পারস্পরিক আদানপ্রদান বাদশাহী যুগে, বিশেষত আকবরের আমলে বিস্তৃত হয়। আকবর সকল পণ্ডিতকেই প্রসন্নতা দেখিয়েছেন, শিক্ষাপ্রয়াসে বৈষম্য দেখাননি। তাই সে যুগে এসেছিল শিক্ষার ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে প্রাণচাঞ্চল্য। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আবার আসে দুর্দৈব।

বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসাগুলিও ছিল মূলতঃ অবৈতনিক। মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষাও ছিল প্রায় অবৈতনিক। ইসলামী শিক্ষায়ও নৈতিক মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ধর্মগুরুই করতেন শিক্ষাগুরুর কাজ। **ইসলামীঅনুশাসনে নারী শিক্ষাও অবৈধ ছিলনা।** ভারতেও অভিজাত সমাজে অন্দরমহলে নারী শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু ধর্মসংঘাতের ফলে সাধারণভাবে সমাজে যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে সাধারণ নারী শিক্ষাও সংকুচিত হয়। হিন্দু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংকোচন আরও বেশী প্রকট।

অবক্ষয়ের যুগ

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যে দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। সমগ্র রাজ্যে আসে অরাজকতা। রাজনৈতিক অব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। রাজনৈতিক অরাজকতা অর্থনৈতিক জীবনেও সৃষ্টি করলো বিপর্যয়। আইনের মূল্য রইল না; নূতন ভূস্বামীর উদয় হলো, কৃষকের শস্যভরা জমি লুণ্ঠিত হলো, কারিগর হারালো তাঁত। ধর্মীয় উগ্রতা, অন্ধতা এবং সংকীর্ণতা তীব্রতর হলো।

নারী সমাজের উপর আঘাত হলো সর্বাপেক্ষা বেশী। সমাজের নৈতিকজীবন হলো অধঃপতিত। ক্ষয়িষ্ণু জীবনে হলো আদর্শেরও ক্ষয়।

সামাজিক ও নৈতিক জীবনের এই ভগ্নদশা শিক্ষাজীবনেও সৃষ্টি করলো ভাঙ্গণ। উচ্চশিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠানের দ্বার বন্ধ হলো। সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতি এবং জীবনে অস্থিরতার ফলে পাঠশালা মক্তবও এলো ভগ্নদশার প্রান্তে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা জীবনে এই হতাশা ও নৈরাজ্যের সুযোগেই **বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করলো ইউরোপের খৃষ্টান পাদ্রীর দল। শিক্ষা ইতিহাসে আরম্ভ হলো আর এক অধ্যায়।**

(**বিঃ দ্রঃ**—মধ্যযুগের প্রভাব আজও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত। মক্তব মাদ্রাসা আজও রয়েছে। আরবি এবং ফারসী ভাষা রয়েছে পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে। ঐ যুগের সৃষ্টি উর্দু ভাষা আজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ধারন করে রয়েছে ওসমানিয়া, জামিয়া মিলিয়া, নাহদাতুল উলেমা।

যুগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি যুগ আসে। যুগ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু রেশ থাকে ঐতিহ্যের তন্ত্রীতে। মধ্যযুগ বহন করেছে প্রাচীন যুগের রেশ, আধুনিক যুগ বহন করছে সমগ্র অতীতের প্রভাব। **অতীতের অশুভ প্রভাব বর্জন করা এবং সুস্থ প্রভাব গ্রহণ করাই আজকের সমস্যা।** তাই এখানে মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।)

আধুনিক যুগের কথা

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে ইউরোপীয় বণিকরা যেমন এদেশে ব্যবসা সুরু করে, তেমনি খ্রীষ্টান মিশনারীরাও ধর্ম প্রচার সুরু করে। ইউরোপে ধর্মসংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ফলে এই উদ্যম অনেক বেড়ে যায়। প্রোটেষ্টান্ট এবং ক্যাথলিক—উভয় ধরনের দেশ থেকেই পাদ্রীরা আসেন। কোম্পানীগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এদের ভাগ্যও ওঠানামা করেছে। মধ্যযুগ থেকেই ইউরোপে মিশনারীরাই ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য তাঁরা এই দেশেও বহন করে আনেন।

কখনও তারা ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, কখনও শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্মান্তর করেছেন।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত **পর্তুগীজ পাদ্রীরাই** প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি যায়গায় ছিল তাঁদের কর্মকেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে **ওলন্দাজরাও** চুচুড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। **ফরাসীদের** কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে। **দিনেমার পাদ্রীরাও** খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁরা বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলেন এবং ক্রমে বাংলাদেশেও তাঁদের প্রভাব অনুভব করা যায়। **ইংরেজ মিশনারীরাও** কর্মব্যস্ত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ ব্যাপারে তাঁরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর উৎসাহ লাভ করেন।

ইংরেজ কোম্পানী কখনোই প্রত্যক্ষভাবে মিশনারীদের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, তবে পরোক্ষ সহায়তা দিয়েছে নানাভাবে। তাদের লক্ষ্য ছিল মিশনারীদের নিয়ে কোন বিপদ সৃষ্টি হলে তা যেন কোম্পানীর বাণিজ্যকে স্পর্শ না করে, অথচ এদেশে মিশনারীদের কার্যকলাপের সুযোগ যেন কোম্পানী গ্রহণ করতে পারে।

মিশনারীরা অনাথাশ্রম, দাতব্য বিদ্যালয়, দু'একটি উচ্চ বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় এবং ধর্মীয় মহাবিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশনারীদের আবেদন ছিল দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের সাধারণ সমাজের কাছে। তাই তাঁরা **প্রধানতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাই দিয়েছেন।** কিন্তু এক্ষেত্রেও আগের চেয়ে অনেক উন্নতি সাধন করেছেন। ছাপাখানা, মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয়ের সময়-নির্ঘণ্ট ও শ্রেণীবিভাগ, বৃত্তিশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রভৃতি এই যুগের মিশনারী উদ্যমের বৈশিষ্ট্য। এগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার নিদর্শন নয়। **বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীরা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেন নি।**

তবুও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁদের কর্মধারায় ভাটা পড়েছে। পলাশীর যুদ্ধ জয় এবং ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে স্বভাবতঃই

মিশনারীরা খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী প্রমাদ গোণে। এদেশের লোকেরা বিদ্রোহ করলে নবস্থাপিত রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। এই ভয়েই মিশনারীদের উপর ইংরেজ কোম্পানী এবং সরকার নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এই মনোমালিন্য শতাব্দীর শেষভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু কোম্পানী যতোই এদেশীয় ঐতিহ্য এবং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপোষণ করে লোকের অন্তর জয় করবার চেষ্টা করুক, **ইতিমধ্যে দেশী ও বিদেশী মহলে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে।** কোম্পানীর কর্ম-কর্তারা কলকাতা মাদ্রাসা এবং কাশীর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও কোম্পানীর কর্মচারী গ্রান্ট **সরাসরি ইংরেজী শিক্ষা এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রস্তাব করেন।** মিশনারীরাও এদেশে এবং বিলেতে এই ব্যাপারে আন্দোলন করেন। বিলেতের প্রভাবশালীদের মধ্যে চার্লস গ্র্যাণ্ট প্রমুখ কেউ কেউ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উইলবারফোর্স সাহেব এই বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তাব পেশ করেন। ১৭৯৩ সনে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। **কিন্তু ১৮১৩ সনে মিশনারীরা এদেশে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাদানের অধিকার লাভ করেন। তা ছাড়া পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানীকে নির্দেশ দেয় বছরে ১ লক্ষ টাকা এদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে।**

পার্লিয়ামেণ্ট কিন্তু এমন কথা বলে দেয়নি যে ইংরেজী শিক্ষা কিম্বা ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরম্ভ হলো **প্রাচ্যবাদী এবং পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে বিরাট বিতণ্ডা।** টাকাটা ব্যয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা কমিটি গঠন করেছিল, তার মধ্যেই বিবাদ উঠলো চরমে। প্রথমে প্রাচ্যবাদীরাই জিতলো, কিন্তু ক্রমে পাশ্চাত্য-শিক্ষার শিবিরই বেশী শক্তিশালী হলো।

বস্তুতঃ, **আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ভারতীয় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন তৈরী হয়েছে।** নবজাগরণ আন্দোলন, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র তখন তৈরী হয়েছে। পাদ্রীরা অনেক ইংরেজী স্কুল গড়ে তুলেছেন। অনেক বেসরকারী ইংরেজও শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভারতীয়

নব্যবাদীরাও এগিয়ে গেছেন। পাশ্চাত্যধর্মী **হিন্দু স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে** ১৮১৭ সনে: শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ত্রয়ী—কেরী, ওয়ার্ড, মার্সম্যান প্রেস প্রতিষ্ঠা করে, বই ছাপিয়ে, সংবাদপত্র ছাপিয়ে, প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ এবং নবসংকলন করে শিক্ষাজগতে অভাবনীয় আলোড়ন এনেছেন। দেশী ও বিদেশী যৌথ প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুলও হয়েছে অনেক।

এইভাবে ইংরেজী শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত, তখন লাট পরিষদের আইন সচিব এবং বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড মেকলে শিক্ষাকমিটির সভাপতিরূপে রায় দিলেন যে **ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্যই সরকারী সাহায্য ব্যয়িত হওয়া উচিত; এবং এই শিক্ষা মূলতঃ দেওয়া হবে সমাজের উচ্চ শ্রেণীকে।** এই নীতিই গ্রহণ করে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনে ঘোষণা করলেন যে প্রাচীন প্রাচ্য-বিদ্যার জন্য সরকারের কোন দায়িত্ব থাকবে না, এবং **ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারই হবে সরকারী নীতি।**

লর্ড মেকলে এবং লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রমুখ কর্তাব্যক্তিরা এ দেশের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা, অসংখ্য দেশজ বিদ্যালয়ের কথা, মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা, সাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কথা আমলই দিলেন না। অথচ ঐ সময়েই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সমীক্ষা হয়েছিল। বাংলাদেশে রেভাঃ উইলিয়াম এ্যাডাম বিস্তৃত সমীক্ষার রিপোর্টে বহু দেশজ বিদ্যালয় এবং কার্যকরী গণ-শিক্ষার অস্তিত্বের কথা জানালেন। দেশীয় ঐতিহ্যপূর্ণ এবং দেশের লোকের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করে এই ভিত্তিতে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা গড়বার সুপারিশও তিনি করলেন। কিন্তু কোন ফলই হলো না।

১৮৩৫ সনে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি গৃহীত হলো। দেশীয় শিক্ষা, দেশীয় ভাষা, এবং গণশিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হলো। বিদেশের একটি শিক্ষাব্যবস্থা শাসকের স্বার্থে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। **এ থেকেই সৃষ্টি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংঘাত ও সমস্যা।** এই সমস্যার কথাই তোমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে। একথা অতি সহজেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে গণশিক্ষার প্রশ্নটিকে ঐ যে অবহেলা করা হলো, তা থেকেই সৃষ্টি হলো আমাদের নিরক্ষরতা এবং প্রাথমিক শিক্ষার

অনগ্রসরতার সমস্যা। একথাও তোমাদের বিশেষ ভাবে জানতে হবে যে দেশীয় ভাষা, বিশেষতঃ মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করে ঐ যে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হলো, তা থেকেই সুরু হলো শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার সমস্যা। এই সমস্যা তোমাদের জীবনেরই সমস্যা। এই সম্বন্ধেও তোমাদের ভালভাবে জানতে হবে। পটপরিক্রমার মূল্য এখানেই।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ১৮১৩ সনে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অংশ গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। ১৮৩৫ সনে গৃহীত হয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সমাজের উচ্চশ্রেণীর জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি। অল্পদিনের মধ্যেই আরও দু'একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৮২৭ সনেই কোম্পানীর পরিচালকসভা ঘোষণা করেছিল যে **কোম্পানীর কাজের জন্য সুদক্ষ কর্মচারী তৈরী করাই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য**। ১৮২৯ সনে লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করেছিলেন যে **ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে** স্বীকৃতি দেওয়াই সরকারী নীতি। এই দুইটি ঘোষণার ফলে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেলো। কার্যক্ষেত্রেও বিচার বিভাগীয় পদ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। **১৮৩৭ সনে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকেই সরকারী ভাষা করা হয়**। ১৮৪৪ সনে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সরকারী **চাকুরীতে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি** এবং যোগ্যতা বিচারের জন্য **প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার নীতি** ঘোষণা করেন। এসবের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

সরকারী মিশনারী এবং ভারতীয় প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারিত হওয়ায় আবার নূতন সমস্যা দেখা দিল। ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থ সাহায্য পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিই হলো নূতন সমস্যা। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য **১৮৫৪ সনে পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হলো**। বিলেত থেকে যে দলিলে এই নীতি ঘোষণা করা হলো, তারই নাম **উড'এর দলিল** (Wood's Despatch)।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন

এই ঘোষণায় বলা হলো যে বিশ্বাসযোগ্য এবং সুদক্ষ কর্মচারী তৈরী করাই হবে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষা ও চাকুরীকে একসূত্রে গাঁথা হলো। এই শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য—অর্থাৎ এক কথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম থাকবে ইংরেজী, এবং গণশিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষ'কে উৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশজ পাঠশালাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। শিক্ষা হবে ধর্ম নিরপেক্ষ।

শিক্ষা প্রশাসনের জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশে থাকবে সরকারী শিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগ থেকেই বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সর্তসাপেক্ষ অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে: আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের কথাও বলা হলো। সর্বোপরি ঘোষণা করা হলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চস্তরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। তার নীচে থাকবে বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল। **বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব থাকবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষামান নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট প্রদান।**

এতদিন পর্যন্ত এলোমেলো ভাবে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল, এবার সেগুলিকে একসূত্রে গেঁথে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করা হলো। এই শিক্ষা ব্যবস্থাই সামান্য হেরফেরের মধ্য দিয়ে পুরো একশত বৎসর বেঁচে ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে ব্যবস্থাটি টিকেছিল, তার প্রভাব তো মাত্র ২০ বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা নয়। ঐ ব্যবস্থাকেই মূল কাঠামো হিসেবে রেখে বর্তমানে আমরা শিক্ষা সংস্কার এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। এই কাজ জটিল এবং কষ্টসাধ্য বলেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা এইমাত্র বললাম যে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হেরফেরের মধ্য দিয়ে ১৮৫৪ সনের শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। ঐ পরিবর্তনের কথা সামান্য আলোচনা করলেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছিলাম, তার সম্যক পরিচয় মিলবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক পরিবর্তন

পরিবর্তনের প্রথম পর্যায় হলো ১৮৮২ সন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আমাদের জাতীয় চেতনা দ্রুত বিকাশ লাভ করে। তার ফলে শিক্ষার প্রসার দাবী করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের উপরও কর্তৃত্ব দাবী করা হয়। তাই সরকারী সাহায্যের কথাটি নূতন ভাবে ভাবতে হলো। শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান এবং পাঠ্যক্রম সংস্কারের কথাও চিন্তা করতে হলো। মিশনারীরা এতদিন পর্যন্ত বিশেষ সুবিধার যে দাবী করে এসেছিলেন, সে সম্পর্কেও একটা পাকা সিদ্ধান্ত দরকার হলো। এইসব কাজ করার জন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই কমিশনে কয়েকজন স্বনামধন্য ভারতবাসীকেও গ্রহণ করা হয়। উইলিয়াম হাণ্টার ছিলেন সভাপতি। **তাই নাম হয়েছে 'হাণ্টার কমিশন'।**

কমিশন সুপারিশ করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবং এজন্য আরও ব্যাপক এবং উদার ভাবে সরকারী অর্থ সাহায্য (গ্রাণ্ট-ইন-এড) দেওয়া হবে। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য দুই অথবা তিনটি কোর্স চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা উচিত।

ঐ কমিশন **প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেবার সুপারিশ করেন।** স্থানীয় শিক্ষাকর এবং বর্ধিত সরকারী সাহায্য দিয়ে এই শিক্ষার ব্যয় সংকুলান হবে। গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা প্রভৃতিকে পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। **প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা।** (কমিশন অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীকে মাধ্যম রূপে রাখাই উচিত মনে করেন)। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বেশী সংখ্যায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়।

এই কমিশনের সুপারিশের মধ্য দিয়ে অনেক নূতন দিক উন্মেষিত হলো। ভারতীয় উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল প্রসারতার চিন্তা এলো। শিক্ষায় বহুমুখীনতার ধারনা সৃষ্টি হলো। প্রাথমিক শিক্ষায় আধুনিকতা এবং

মাতৃভাষার অগ্রগণ্যতা স্বীকৃত হলো। শিক্ষা প্রশাসনে ভারতীয়দের অধিকার এবং দায়িত্বও স্বীকার করা হলো।

কমিশনের সুপারিশের ফলে **শিক্ষার দ্রুত বিস্তার হলো**. এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে ভারতীয় বেসরকারী কলেজ হলো ৪২টি, চিকিৎসা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও বিস্তার ঘটলো। শুধু মহিলাদের কলেজ হলো ১২টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮২২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৩০৫টি, এবং শিক্ষণ বিদ্যালয় ৪৫টি। (কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলিও ছিল নিতান্তই অল্প, কারণ এই সংখ্যাগুলি সমগ্র ভারতের হিসেবে)। যাই হোক, মুসলীম ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাও আধুনিক ধারায় অগ্রসর হতে লাগলো।

মাধ্যমিক শিক্ষায় 'এ' এবং 'বি' কোর্স প্রচলিত হলো। কিন্তু নানাকারণে 'বি কোর্স (অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষা) তেমন সাফল্য অর্জন করলো না। **কিন্তু সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হলো**। এই শতাব্দীর সুরুতে স্কুলের সংখ্যা হলো ৫১২৪ টি। ঠিক তেমনি আশানুরূপ না হলেও, প্রাথমিক শিক্ষাও প্রসারিত হলো।

বিংশ শতাব্দীর কথা

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিল নূতন সমস্যা। স্বাধীনতার চেতনা তখন টগবগ করে উত্তাল হয়ে উঠেছে, বিদেশী সরকারের প্রয়োজনে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা যে প্রকৃত মানুষ তৈরী করছেনা, একথাও প্রমানিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সেই শিক্ষার কোন যোগই ছিলনা। তা ছাড়া একমুখী সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধেও সচেতনতা এসেছে। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে। **শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন নূতন আদর্শ, পরিবেশ এবং কর্মধারার প্রয়োজন অনুভব করা হলো**।

অথচ এই সময়ে এদেশে বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন, যিনি উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকরূপেই পরিচিত। তিনিও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির কথা বললেন, তবে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং ভারতের নেতৃবৃন্দকে কোন আমল না দিয়ে।

কার্জন একথা ঠিকই বলেছিলেন যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে অসমভাবে, শিক্ষার লক্ষ্য হয়েছে চাকুরী, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষার সংস্থায় পরিনত হয়েছে এবং স্কুল ও কলেজগুলি হয়েছে পরীক্ষা পাশের যন্ত্র। এর ফলে শিক্ষার মান অবনত হয়েছে। এই কথাগুলির অনেকটাই ছিল সত্য। কিন্তু কার্জন ভুলে গেলেন যে এইসব ক্রটির জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই ছিল দায়ী। কারণ শিক্ষানীতি নির্ধারণের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে এবং এই ব্যবস্থাটা তাদেরই তৈরী।

কার্জনের এই নীতির সঙ্গে মিশে গেলো তার বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা। জাগ্রত জনমানস তাঁকে ক্ষমা করতে পারলোনা। তিনি চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা সংকোচন করতে। তাও সম্ভব হলো না। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গ স্থষ্টি করলো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ) এবং পরবর্তী আর এক পর্যায়ে ১৯২০ থেকে ১৯২২ সনে (অসহযোগ আন্দোলনের যুগে) চললো আন্দোলন। অনেক সাধারণ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। আইন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশার জন্য কয়েকটি পেশাগত কলেজ হলো। আর জাতীয় শিল্প প্রয়াস সুচনার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তৈরী হলো—যেমন যাদবপুরের কারিগরি কলেজ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আন্দোলনের ফলশ্রুতি হয়েছে অনেক। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে, বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার এবং বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে আমাদেরও চেতনা বেড়েছে, গভর্ণমেণ্টের টনক নড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার বদলে শিক্ষাদান এবং গবেষণার উদ্যোগ স্থষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার সঞ্চার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চেতনা দানা বেঁধেছে। সর্বোপরি অকেজো শিক্ষার বদলে কার্যকরী শিক্ষার জন্য শিক্ষা সংস্কারের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা।

শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯১৭ সনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্যাডলার কমিশন যে সুপারিশ করেন, তা সমগ্র ভারতের পক্ষেই প্রয়োগযোগ্য হয়। কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান এবং গবেষণা। কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় মনোন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চ-শিক্ষায় বিশেষীকরণের সহায়করূপে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প-বিষয়ে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। কলেজের শিক্ষাতেও ভারতীয় ভাষার উপর গুরুত্ব এবং অনার্স পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করে শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলা হয়।

তোমরা আজ মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখীনতার সঙ্গে পরিচিত। ১২ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষার কথাও আজ সুবিদিত। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স-এ তোমরাই পড়ছো। এইসব ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রস্তাবনা এবং প্রারম্ভিক সূচনা হয়—স্যাডলার রিপোর্টের ফলে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যে রূপটি আজ প্রচলিত, তারও শিকড় রয়েছে ঐ রিপোর্টের মধ্যেই।

সংস্কার প্রচেষ্টার দ্বিতীয় ধাপ হলো বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন। আইনগুলির ফলশ্রুতি হলো সামান্যই, কিন্তু আমাদের চিন্তার জগত আরও প্রসারিত হলো। ১৯১৯ সনের শাসন সংস্কারের ফলে শাসনতন্ত্রে শিক্ষাকে প্রাদেশিক বিষয় বলে দেশীয় মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তরিত রূপে গণ্য করা হলো। হার্টগ কমিটিও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সুপারিশ পেশ করলেন ১৯২৯ সনে।

১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নির্বাচিত মন্ত্রীদের দায়িত্ব এবং অধিকার অনেক বেড়ে গেলো। দেশের জন্য, বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে রূপ দেওয়ার জন্য গান্ধীজি উপস্থিত করলেন বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা, ১৯৩৭ সনে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হার্টগ কমিটিই প্রস্তাব করেছিলেন নিম্নমাধ্যমিক স্তরেই বৈচিত্র্যমূলক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন এবং ঐ স্তরের ছাত্রদের একাংশকে শিল্প

ও বাণিজ্যিক শিক্ষার দিকে পরিচালনার কথা। ১৯৩৪ সনে উত্তর প্রদেশে সপ্রু কমিটি প্রস্তাব করেছিলেন বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম ব্যবস্থায় ১১ বৎসরের মাধ্যমিক এবং ৩ বছরের ডিগ্রী শিক্ষার কথা। ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা, বিভিন্ন দৈর্ঘ ও প্রকৃতির উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং এই স্তরের শেষে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষার পথ খোলা রাখবার প্রস্তাব করলেন।

১৮৮২ সনেই হাণ্টার কমিশন প্রস্তাব করেছিলেন মাধ্যমিক স্তরে তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহারিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন। কিন্তু আমাদের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য তখনও প্রসারিত হয়নি। তাই সেই প্রস্তাবও সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। 'বি' কোর্স অবলম্বন করে যে কয়টি স্কুল গড়ে উঠেছিল, তাও ক্রমে ক্রমে উঠে যায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে আমাদের শিল্পায়ন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। **সুতরাং বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়।**

এই সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সুপারিশ করেন ১৯৩৭ সনে গঠিত **এ্যাবট-উড কমিটি**। তাত্ত্বিক শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষাকে সমমর্যাদা দানের কথা বলা হয়। অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ পাঠের পরে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সমান্তরালরূপে তিন বছরের জুনিয়র কোর্স, এবং একাদশ শ্রেণীর পরে উচ্চ শিক্ষার সমান্তরাল রূপে দুই বছরের কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হয়। তা ছাড়া কর্মরত শ্রমিকদের জন্য আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশও করা হয়।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে ১৯১৭ সন থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা কিম্বা বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার **সংস্কারের কথা বলা হয়**; কিন্তু কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয় না। এই কাজটি হাতে নেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি। **১৯৪৪ সনে সার্জেণ্ট পরিকল্পনা রূপে** একটি সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনাটি প্রস্তাবিত হয় ৪০ বছরের মেয়াদে।

৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি শিক্ষা, ৬ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কিম্বা বুনিয়াদি শিক্ষা, ১১

থেকে ১৪ বছরের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক কিম্বা উচ্চবুনিয়াদি, বাছাই করা ছেলেমেয়ের জন্য ১১ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, এবং তদূর্ধ ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক স্তরে উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে দুই ধরনের। কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অব্যবহারিক তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য থাকবে এক শ্রেণীর বিদ্যালয়, আর প্রয়োগ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, করিগরি এবং মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য থাকবে আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয়।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হলো উচ্চ বুনিয়াদি স্তরের পরে তিন বছরের জুনিয়ার টেকনিক্যাল, শিল্প ও ট্রেড স্কুল। এর মর্যাদা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য। একাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে থাকবে দুই বছরের উচ্চতর টেকনিক্যাল বিদ্যালয়। শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে স্নাতকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষণ কলেজ এবং অস্নাতকদের জন্য নানা ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও করা হয়।

সার্জেণ্ট কমিটির পরিকল্পনা নিতান্তই সুপারিশ হিসেবে রইলো কাগজ কলমে, কারণ ঐ অনুসারে কাজ হওয়ার আগেই ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু এই পরিকল্পনাতেই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী কর্তব্যের কথা, সর্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী দায়িত্বের কথা, বুনিয়াদি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণের কথা, বয়স্ক শিক্ষায় সরকারী দায়িত্ব, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ের কথা এবং সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে সকল স্তরের শিক্ষাকে একটিমাত্র ব্যবস্থাপনায় সুসংহত করবার কথা সর্বপ্রথম সরকারীভাবে বলা হয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা বহুলাংশে এই রিপোর্টের কাছে ঋণী।

আমাদের পটপরিক্রমার কাজ এবার শেষ হলো। উপরের বিবরণ এবং আলোচনা থেকে একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে **শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলি হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি।** অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনমত ধাপে ধাপে পরিবর্তন করতে না পারার ফলেই একদিকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতির ফলেই ধীরে ধীরে জমে উঠেছে সমস্যাগুলি। স্বাধীনতা-

লাভের পরে আরও নূতন সমস্যা ঐ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। **দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে শিক্ষাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারিনি। তাই আমাদের সমস্যা এখন পাহাড় প্রমান।**

অপরদিকে এ কথাও বুঝেছ যে শিক্ষা সংস্কারের চেতনা এসেছে অনেকদিন আগেই, চেষ্টাও চলেছে অনেকদিন থেকে। কিন্তু সব চেষ্টাই হয়েছে বিতর্কমূলক। প্রকৃত ফলশ্রুতি বিশেষ ঘটেনি। সব কিছুই রয়ে গেছে স্বাধীনতার উত্তর পর্বের জন্য। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সনে আমরা প্রবেশ করলাম স্বাধীনতার যুগে।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত, বিগত ২০ বছর সময়কেই আমরা সাম্প্রতিক যুগ বলে ধরি। এই সময়ে আমরা কি ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা করেছি, কতটা সাফল্য লাভ করেছি, আমাদের সমস্যাগুলি কি এবং কোন পথে এই সমস্যার সমাধান করে আমাদের ব্যর্থতা দূর করা যায়—এই হলো তোমাদের প্রকৃত পাঠ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সংস্কার

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার যুগে প্রবেশ করবার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পুঁজি কি ছিল?

(ক) **ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল।** ঐ ব্যবস্থাটির বয়স তখন প্রায় ৯৫ বছর। এই সময়ের মধ্যে জাতির জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি নগণ্য সংস্কার এবং সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়া মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ১৮৫৪ সনেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে **বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী তৈরীই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য।** দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কাচামাল রপ্তানী এবং ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্য আমদানীর পথে বাণিজ্যের সুফল সম্বন্ধে ভারতীয়দের সচেতন করা। (অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আর্থিক ব্যবস্থায় বেঁধে রাখা)। এই উদ্দেশ্যের

কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। গণতান্ত্রিক যুগের সুশিক্ষিত, জাতীয় চেতনা সম্পন্ন, সুদক্ষ নাগরিক সৃষ্টির আদর্শ ছিলনা। সুতরাং স্বাধীন ভারতের পক্ষে শিক্ষার মূল আদর্শই পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো।

(খ) কেরানী তৈরীর শিক্ষা ছিল বলেই পাঠ্যক্রম ছিল মানবিক বিদ্যার বোঝায় ভারাক্রান্ত। আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম অবদান—প্রকৃতি বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উপযুক্ত প্রতিফলন ছিলনা পাঠ্যক্রমে। সুতরাং জীবনের সঙ্গে পাঠ্যবস্তুর ছিল অসঙ্গতি।

(গ) ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রয়োগ বিদ্যার স্বল্পতা ছিল বলেই পাঠ্যক্রম ছিল তত্ত্বভারাক্রান্ত এবং পুঁথিগত। পুঁথিগত ছিল বলেই পাঠ ও পঠন পদ্ধতি ছিল চিরাচরিত।

(ঘ) শিক্ষা ও চাকুরী এক সূত্রে গ্রথিত হওয়ায় সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাধান্য। পরীক্ষার প্রয়োজন দিয়েই পাঠ্যক্রম, পঠন-পদ্ধতি এবং বিদ্যালয় প্রশাসন নির্ধারিত হতো।

(ঙ) বৃত্তি ও কারিগরি কিম্বা অন্যধরনের সমমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষাধারার অভাব ছিল বলে মানবিক উচ্চশিক্ষার জন্য একমুখো মিছিল ক্রমেই জনাকীর্ণ হয়েছিল। নিম্ন ও মধ্যস্তরে বৃত্তি শিক্ষার যে সামান্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ছিল, তাও উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সুসংহত ছিল না।

(চ) দেশের আর্থিক জীবনযাত্রার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ সঙ্গতি ছিল না। তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্যের স্বীকৃতি তথা বহুমুখীনতার স্বীকৃতি ছিল না। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ ছিল নিতান্তই সীমিত।

(ছ) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক ছিল না। সুতরাং শিক্ষায় গণতান্ত্রিক সমসুযোগের প্রশ্ন ছিল বাতুলতা।

(জ) দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার কোন সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত ছিল না। প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব এবং সাহায্য কমে গিয়েছিল। প্রধানতঃ বেসরকারী

উদ্যমের উপরই শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন অভিভাবকরা।

(ঝ) **বর্ণ বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য** প্রতি নানা উপসর্গ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবাধে বিরাজ করছিল।

(ঞ) মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার দাবি স্বীকৃত হলেও **সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি ছিল ইংরেজীর অনুগত**। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃত্ব এবং জনসংযোগ ছিল নগণ্য। অর্থাৎ একটি সর্বাঙ্গীন **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্বই ছিল না**।

শিক্ষায় প্রসারতার দিকটিও ছিল সংকীর্ণ। ১৯৪৭ সনে সমগ্র ভারতে—

—প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৩৪৯৬৬টি; মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩০৩৬৬৬৫। সারা ভারতে মাত্র ১২৯টি সহরে এবং ১০৯০টি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছিল। ৬—১১ বছরের শিশুদের মাত্র ৩০ ভাগ স্কুলে পড়াশুনা করতো। এর মধ্যেও আবার ৬০ ভাগ শিশু চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ করবার আগেই পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো।

—সারা ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ১২৬৯৩টি; ছাত্রসংখ্যা ২৯৫৩৯৪।

—সকল ধরনের কলেজের সংখ্যা মোট ছিল ৫০০'-এর মত। এর মধ্যে সাধরণ কলা ও বিজ্ঞান কলেজই ছিল ২৮৫টি।

—বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১৮টি; এই স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২৩০০০।

—সকল রকমের বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষালয়ের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০০। কিন্তু এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র শ'খানেক। বিভিন্ন ধরনের পেশাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মোট ২০৮টি।

—পৃথকভাবে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সবরকমের মোট ১৬৯৫১টি; ছাত্রীসংখ্যা ৩৫৫০৫০৩।

—বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ শিল্প-শিক্ষা, সমাজ-শিক্ষা, ললিত-কলা শিক্ষা এবং বিকলাঙ্গদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে সর্বমোট ছিল পাঁচ হাজারের কম।

—১৯৫১'-এর লোকগণনার সময় সাক্ষরতা ছিল মাত্র ১৭%।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

উপরের চিত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের কথাও অনুমান করা যায়। এখানে তখন পর্যন্ত বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

—প্রাথমিক স্কুল ছিল ১৩৯৫০টি।

—উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৮৫৮; ছাত্র সংখ্যা ৩৮৬৯৭২ এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১১৬৪৪।

—জুনিয়র হাইস্কুল ছিল ১০৪৫টি; ছাত্রসংখ্যা ১৩৫৫২৮ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৫৯৮৭।

—কলেজ ছিল ৫৫টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১টি।

পুরাতন শিক্ষা-কাঠামো

সেই পুরানো ব্যবস্থায় শিক্ষার কাঠামোটি কিরকম ছিল?

(১) এ বিষয়ে প্রথমেই বলা দরকার যে সার্জেণ্ট কমিটির সুপারিশে সর্বপ্রথম সরকারীভাবে পাক-প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ দানের কথা বলা হলেও এ বিষয়ে কোন সরকারী দায়িত্ব কিম্বা উদ্যোগ ছিল না। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধরা হয়নি।

(২) স্কুলের শিক্ষা ছিল সর্বমোট ১০ বছরের। সাধারণতঃ ১৫ বছরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যেতো। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হতো ৫ বছরে। প্রাথমিক স্তর ছিল ৪ বছরের। পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ হতো।

(৩) মাধ্যমিক স্তরের নীচের দিকে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীকে সাধারণতঃ বলা হতো U.P. (Upper-Primary), কিম্বা পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণীর সমন্বয়ে M.E. (Middle English), কিম্বা আরও এক ক্লাস যোগ করে V—VIII জুনিয়র হাই স্কুল। এই স্তর পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে কোন ঐচ্ছিক বিষয় ছিলনা। এই স্তর পর্যন্ত ইংরেজী, মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি ছিল আবশ্যিক।

(৪) নবম ও দশম শ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত (অথবা আরবী কিম্বা ফারসী), গণিত

ছিল আবশ্যিক। এ ছাড়া ছিল ২টি ঐচ্ছিক বিষয়। কিন্তু এখনকার মত কোন প্রবাহ ব্যবস্থা ছিলনা। দশম শ্রেণীর শেষে হতো প্রথম বহিঃপরীক্ষা—প্রবেশিকা। (বাংলাদেশের চিত্রটিই এখানে দেওয়া হচ্ছে।)

(৫) এর পরে সুরু হতো কলেজীয় তথা উচ্চ-শিক্ষার স্তর। (বিভিন্ন প্রদেশে এ সম্বন্ধে সামান্য তারতম্য ছিল। তবে আমরা মূলতঃ বাংলাদেশের কথা মনে রেখেই বলছি।) কলেজের প্রথম দুইটি বছর নিয়ে গঠিত ছিল Intermediate Arts অথবা Science (I.A এবং I.Sc) এবং ক্রমে কমার্স'ও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্তরের পরে ছিল আবার বহিঃপরীক্ষা।

কলেজের শেষ দুইটি বছর ছিল B.A. অথবা B.Sc. স্তর। এই স্তরের শেষে আবার ছিল বহিঃপরীক্ষা। উত্তীর্ণ ছাত্ররাই স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশ করার অধিকার পেতো।

(৬) I.Sc. পরীক্ষার শেষে সাধরণ পাঠ ছাড়া ৫ বছরের ডাক্তারী, চার বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং; এবং স্নাতক স্তরের পরে তিন বছরের ওকালতি প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষায় প্রবেশ করা যেতো।

ম্যাট্রিক পাশ করে মেডিক্যাল স্কুলে যাওয়া যেত। ম্যাট্রিক পাশ, কিম্বা পাশ না করেও মোক্তারী পড়বার সুযোগ ছিল।

সাধারণ কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর স্তর ছিল দু'বছরের।

(৭) সাধারণ উচ্চশিক্ষা ছাড়া Trade School, Technical School'ও ছিল কয়েকটি। শিক্ষনীয় বৃত্তির তারতম্য অনুসারে এগুলিতে প্রবেশ করা যেত সাধারণত M-E কিম্বা Junior High School স্তর, কিম্বা বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রবেশিকা স্তরের পরে।

আলোচিত ছকটিকে ডায়গ্রামে রূপান্তরিত করলে অনেকটা ২৭নং পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত ছবির মত দেখাবে।

যাই হোক, এই রকম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে স্বাধীনতার উত্তরকালে আমাদের যাত্রা সুরু হলো।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-কর্মধারা

স্বাধীনতা লাভের পরে জাতীয় পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংস্কার

এবং কাঠামোটির পুনর্গঠনও দরকার হলো। এই যুগে আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার কয়েটি দিক বিশেষ উল্লেখ্য :—

১। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তথা জাতীয় সরকারের দায়িত্ব স্বীকৃতি। সংবিধানেই লিখিতভাবে এই স্বীকৃতির উল্লেখ করা হয়।

২। সাধারণ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রধানত রাজ্যগুলিকে, এবং উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করা হয়।

৩। অবৈতনিক সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। বুনিয়াদি শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মৌল প্যাটার্ণ রূপে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন কমিশন নিয়োগ না করা হলেও নানাধরনের কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়া হয়।

(৪) স্ত্রী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অনুন্নতদের শিক্ষা, বিকলাঙ্গদের শিক্ষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

(৫) বিশেষ কমিটি গঠন করে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা প্রসারের নীতি গৃহীত হয়।

(৬) উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়।

(৭) মাধ্যমিক-শিক্ষা সংস্কারের জন্য কমিশন গঠিত হয়।

(৮) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশরূপে শিক্ষা প্রচেষ্টাও পরিকল্পিত হয়।

(৯) সর্বোপরি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি সমন্বয় করে নূতন কাঠামোতে একটি পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

নূতন শিক্ষা কাঠামো এবং তদনুসারী কর্মপ্রয়াস, সফলতা, ব্যর্থতা, বর্তমানের সমস্যা এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতই আমাদের পরবর্তী বিস্তারিত আলোচ্য। আমরা আলোচনা করবো কয়েকটি বিশেষ বিষয়—

(১) আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি। (তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে)।

(২) বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থার নানা পর্যায়ে তুলনার কথাও পাঠ্যক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে। (চতুর্থ অধ্যায়েই এই কাজ করে নেব)।

(৩) বিগত ২০ বছরে আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন দিকে কি কি সংস্কার হয়েছে, কি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কতটা অগ্রগতি হয়েছে, এবং সাধারণ সমস্যাগুলি কি কি, এ কথাই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। (এই আলোচনাটি উপস্থিত করা হবে পঞ্চম অধ্যায়ে)।

(৪) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাগুলির আলোচনা করা হবে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

(৫) ভবিষ্যতের প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনার কথা থাকবে (সপ্তম অধ্যায়ে)।

তৃতীয় অধ্যায়

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলির প্রায় পূর্ণ কর্তৃত্বই স্বীকার করা হয়েছে (অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করা, সহায়তা করা, এবং দিকনির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা রেখেছেন)। রাজ্য সরকারগুলি বহু ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করেন। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োজন মত অদল বদল করবার অধিকার তাদের আছে। তাই সমস্ত ভারতের জন্য হুবহু একই রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। তবে সামান্য হেরফের সমেত একটি সাধারণ ছক আমরা ধরতে পারি।

১৯১৭ সন থেকে বহু সমীক্ষা ও সুপারিশ এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের অভিমত সমন্বয় করে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটি তৈরী হয়েছে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অবশ্য সর্বাংশে রক্ষিত হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক সংশোধিত মুদালিয়র ছকটিই আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। তা ছাড়া এই ব্যবস্থার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে। তবুও সাধারণ ব্যবস্থাটিই

আমরা আলোচনা করবো। আগের পৃষ্ঠার ডায়গ্রামে বর্তমান ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে। ছবি থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে—

(১) পূর্ণ ২ **বছর থেকে পূর্ণ ৬ বছর বয়সকে ধরা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর**। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় বরং ঐচ্ছিক। তবে এই স্তরের প্রতিষ্ঠান—নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেনকে সরকারী উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(২) ছয় বছর পূর্ণ হলে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পূর্ণ এগার বছর পর্যন্ত চলবে প্রাথমিক শিক্ষা। অর্থাৎ **প্রাথমিক শিক্ষা হবে পাঁচ বছর ব্যাপী**। (বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য কোথাও কোথাও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেই বহু চার ক্লাসের প্রাথমিক স্কুল আছে। নতুন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি অবশ্য পাঁচ ক্লাশেরই হচ্ছে)। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত আছে, যদিও বাস্তব-ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি।

(বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করছি।)

আধুনিক পৃথিবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের জন্য সম-সুযোগের নীতি গৃহীত হচ্ছে। নীতি হিসেবে আমরাও একথা বলছি। কিন্তু পাঠ্যক্রম, সুযোগ এবং মালিকানার ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরেই আমাদের দেশে রয়েছে অনেক ধরনের স্কুল। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

(ক) পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে রয়েছে **সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়**। (অবশ্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তর, কিম্বা বুনিয়াদি ধাঁচে পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে)। তা ছাড়া রয়েছে নানা ধরনের "ইংলিশ মিডিয়াম" স্কুল।

(খ) পাঠকালের দৈর্ঘ হিসেবে রয়েছে ৪ **ক্লাস, ৫ ক্লাস কিম্বা আরও বেশী** সময়ের জন্য প্রাথমিক স্কুল।

(গ) শিক্ষার সুযোগের ভিত্তিতে রয়েছে অনেক বৈষম্য। এখনও পর্যন্ত **এক শিক্ষকের স্কুলও** (Single Teacher School) **আছে**। একদিকে রয়েছে অবৈতনিক প্রাথমিক অথবা বুনিয়াদি বিদ্যালয়, অপরদিকে রয়েছে **বৈতনিক প্রাথমিক অথবা বুনিয়াদি বিদ্যালয়**। সহরাঞ্চলে এমন বিদ্যালয়

তো তোমরাই দেখতে পাচ্ছ যেখানে একটি শিশুর জন্য মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ আমাদের দেশের গড় পরিবারের (average family) মাসিক গড় আয়ের চেয়ে বেশী।

(ঘ) মালিকানার ভিত্তিতে রয়েছে **সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের** কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, এবং **ব্যক্তিগত মালিকানায়** লাভের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনি আরও শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার **দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব রাজ্য-সরকারের উপর ন্যস্ত**। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেন, পরামর্শ দান করেন, বিশেষজ্ঞ দিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সাহায্য করেন এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। রাজ্যস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয় রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে (ডি, পি, আই এবং স্কুল পরিদর্শন বিভাগ)। বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎও আছে; অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরামর্শ দানের জন্য। (পশ্চিমবঙ্গে আছে একটি মৃত পর্ষৎ। সম্প্রতি তাকে আবার সঞ্জীবিত করবার কথা বলা হয়েছে)।

দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শুধু সরকারী বিভাগের দ্বারা এই বিরাট কর্ম প্রয়াস সম্ভব নয়। তাই **প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় সব রাজ্যেই বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে**। কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, কিম্বা সম্প্রতিকালে পঞ্চায়েৎ সংগঠনের হাতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে পৃথক ভাবে সংগঠিত জিলা স্কুল বোর্ড। এইসব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাকর আদায় করা, শিক্ষক নিয়োগ করার ক্ষমতা ভোগ করে। শিক্ষাকর থেকে আদায়ী অর্থের সঙ্গে সরকারী অনুদান (গ্র্যাণ্ট) মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয়।

স্বাধীনতার বিশ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে **প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য** সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইংরেজ আমলে প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট এবং

প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ছিলনা বললেই চলে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ করতে হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা জীবনের মৌলিক ভিত্তি রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার জন্য মৌলিক জ্ঞান, সুস্থ নাগরিকতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ, জ্ঞান ও আচরণ, উৎপাদনী যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হওয়ার ভিত্তি রচনা, সামাজিক চেতনা ও সহযোগিতার শিক্ষা, শিশুর সম্ভাবনা ও আবেগের সুস্থ বিকাশই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই আদর্শ কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র; রূপায়িত যে হয়নি সে কথা বেদনাদায়ক হলেও স্বীকার করতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় পাঠ্যক্রমে। মূলতঃ মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রকৃতি পাঠ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্কণ কিম্বা অন্যধরনের হাতের কাজ, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে পাঠ্যক্রম গঠিত। রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজীর সমস্যা এক্ষেত্রেও আছে। উদাহরণরূপে বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের কথা। এখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজীর পাঠ আরম্ভ হয়, যদিও ইংরেজীর বাধ্যতামূলক পাঠ সুরু পঞ্চম শ্রেণী থেকে। (চতুর্থ শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষাতেও ইংরেজীর পরীক্ষা লওয়া হয়)। তা ছাড়া পঞ্চম শ্রেণী থেকে হিন্দি বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গে এর উপরও রয়েছে বাংলায় দ্রুত পঠনের আলাদা বই। চতুর্থ শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ছয়টি পৃথক পাঠ্য বিষয় এবং দু'খানি ব্যাকরণ বই সহ মোট দশখানার উপর পাঠ্য পুস্তক।

এই তালিকা থেকেই পাঠ্যক্রমের বোঝা অনুমান করা যায়। **এর উপর রয়েছে পরীক্ষার সমস্যা।** অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে হেরফের আছে। প্রাথমিক স্তরে কোন কড়া পরীক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বসম্মত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বহু ক্ষেত্রেই ক্লাশ প্রমোশন পরীক্ষা এবং বহিঃপরীক্ষাও প্রচলিত। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। (অবশ্য এই পরীক্ষা সব স্কুল এবং সকল ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়)।

শিক্ষার আদর্শ কেবল পাঠ্যক্রমেই নয়, পঠণ পদ্ধতিতেও প্রতিফলিত হয়। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে খেলার ভিত্তিতে পড়া

এবং ছাত্রদের সক্রিয়তাধর্মীতাই স্বীকৃত। কিন্তু **আমাদের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন-পদ্ধতি এখনও মূলতঃ চিরাচরিত।** বুনিয়াদি পদ্ধতি গ্রহণের যে কথা বলা হয়েছিল, তাও কার্যকরী হয়নি, বরং বুনিয়াদি স্কুলগুলিই চিরাচরিত ঢংয়ের হয়ে উঠেছে। প্রকৃত বুনিয়াদি বিদ্যালয় আছে খুবই কম। অন্যান্য তথাকথিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সাধারণ প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একটি হাতের কাজ যোগ করা হয়েছে মাত্র। পঠণ পদ্ধতি এখনও চিরাচরিত ধরনের।

এই সূত্রেই **প্রশ্ন হতে পারে যে পুরাতন ধরনের প্রাথমিক স্কুলগুলিকে এখনই বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যুক্তিযুক্ত কিনা** বিগত বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে অর্থসমস্যা, স্থান সমস্যা, উপকরণ ও সরঞ্জামের সমস্যা, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সমস্যা, ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার সমস্যা, প্রকৃত বুনিয়াদি বিদ্যালয় গঠনের ব্যর্থতা প্রভৃতির ফলে এই রূপান্তর সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ রাতারাতি রূপান্তর সম্ভবও নয়। সুতরাং উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করে একটি সঠিক ব্যবস্থার ক্রম প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে উভয় ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নানা ধরনের সমীক্ষাও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি এই জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও উপরের আলোচনা মূলতঃ প্রযোজ্য। এখানে কি করা হয়েছে, কি সাফল্য হয়েছে এবং কি সমস্যা রয়েছে সে কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে ("বাংলা দেশের কথা" শিরোনামায়)। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলিও ঐ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথা আলোচনা করা হবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

৩। **প্রাথমিক শিক্ষার ঊর্ধে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় রয়েছে মাধ্যমিক স্তর।** এই স্তরটি দুইভাগে বিভক্ত—নিম্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরকে কোন কোন রাজ্যে মিড্‌ল্ স্কুলও বলে। এই স্তরের শিক্ষাকাল ১২-১৩-১৪ বৎসর; অর্থাৎ তিনবৎসর ব্যাপী। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সংবিধানে ১৪+পর্যন্তই বাধ্যতামূলক সর্বজনীন

শিক্ষাকাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় রয়েছে অনেক ধরনের। তবে সাধারণভাবে নিম্নমাধ্যমিক/মিডল স্কুল এবং উচ্চ বুনিয়াদি (সিনিয়র বেসিক) স্কুলের সংখ্যাই বেশী। তিন ক্লাসের আলাদা স্কুল, কিম্বা পূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচের অংশ, অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরতলা হিসেবে এই সব স্কুল অস্তিত্ব রক্ষা করে। অন্যান্য রাজ্যে এই স্তরে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কিছু ভূমিকা আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভূমিকা নেই বললেই চলে। সুতরাং নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল সাধারণতঃ সরকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী এবং সাহায্যহীন বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাই নিম্নমাধ্যমিক স্কুলগুলি রাজ্য শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ আয়ত্বে এবং পরিদর্শকমণ্ডলীর অধীন। অবশ্য প্রতিটি বিদ্যালয়েরই স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটি থাকে। এই কমিটির মাধ্যমেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যও ম্যানেজিং কমিটি স্থাপন করা নিয়মসিদ্ধ।) রাজ্য সরকারের শিক্ষা বাজেট থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন বিদ্যালয় পরিদর্শন বিভাগ।

১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা। ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর বয়স নয়। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষায় কোন বিশেষীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাছাড়া জাতীয় সংহতির স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাই প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর পরে অধিকাংশ লোকেরই আর পড়া হবেনা বিবেচনা করে সুস্থ নাগরিকতা এবং ভবিষ্যত বৃত্তি ও বিশেষ শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি রচনা করাই এই স্তরের উদ্দেশ্য। পাঠ্যক্রমও সেই অনুযায়ী গঠন করা হয়। তাই ভাষা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যপাঠ (মেয়েদের জন্য গৃহ বিজ্ঞান), ইতিহাস, ভূগোল, শারীর শিক্ষা ও হাতের কাজ নিয়ে গঠিত হয় পাঠ্যক্রম। ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দির পাঠ এই স্তরেও চলে, সংস্কৃতের পাঠ আরম্ভ হয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম, তবে ইংরেজীর চর্চা বৃদ্ধি পায়। হিন্দির পাঠ সব রাজ্যে আবশ্যিক নয়, যেমন উত্তর ভারতে অনেক স্থানে ইংরেজীর পাঠও আবশ্যিক নয়।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি চলে পঞ্চম থেকে সপ্তমশ্রেণী পর্যন্ত, সংস্কৃত আসে অষ্টম শ্রেণীতে, ইংরেজী চলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বরাবর, বাংলা তো মাতৃভাষা এবং স্কুল স্তরে শিক্ষার বাহন। শিশুদের উপর ভাষার চাপ স্বভাবতঃই অত্যধিক। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় হিন্দি শিক্ষাও সার্থক হয়না। নবম শ্রেণী থেকে যারা বিজ্ঞান পড়বে, তাদের জন্য সংস্কৃতের পাঠ কেবল অষ্টম শ্রেণীতে একবছর। এ ব্যবস্থা নিতান্তই অর্থহীন। তাছাড়া রয়েছে ইংরেজীর প্রবল চাপ; তাই কোন ভাষাতেই প্রকৃত দখল হয়না। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার এটি অন্যতম কারণ। গণিতের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণীতে জ্যামিতি এবং সপ্তম শ্রেণীতে বীজগণিতের সূচনা, এও কম কথা নয়।

পড়ার এত চাপের ফলে শারীর শিক্ষা ব্যর্থ হয়, হাতের কাজ নামে মাত্র পাঠ্যক্রমে স্থান পায়। উচ্চ-বুনিয়াদি স্কুলগুলি বুনিয়াদি পদ্ধতিতেই পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করবার জন্য উচ্চ-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মত করে নিতে হয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে নাম মাত্র একটি হাতের কাজের ঠাঁট বজায় রাখা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের এই প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা এবং পঠণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথাই এখনও বর্তমান আছে।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা দরকার। ছবিতে দেখবে **সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এই স্তরে ট্রেড স্কুল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের প্রস্তাবও আছে।** অর্থাৎ এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং এই শিক্ষাকেও নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের সমান শিক্ষা বলে গণ্য করা হবে। কোন ছাত্র সাধারণ শিক্ষার বদলে ঐচ্ছিকভাবে এই বৃত্তি শিক্ষার দিকেও যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক! কিছু কিছু ট্রেড স্কুল এখনও আছে, হস্তশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রও আছে। কিন্তু ১১ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাই যে ক্ষেত্রে আজও বাধ্যতামূলক নয়, সে ক্ষেত্রে ট্রেড স্কুলে বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ওঠে না।

(৪) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ **অষ্টম শ্রেণীর পরে আরম্ভ হয় উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা।** এই স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে নানা রকমের—

যেমন (ক) ১৪+থেকে ১৭+পর্যন্ত তিন বৎসরের উচ্চতর মাধ্যমিক, (খ) ১৬+পর্যন্ত ২ বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক। এ পথে যারা অগ্রসর হবে তাদের জন্য ১৬+থেকে ১৭+পর্যন্ত ১ বৎসরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়। (সুতরাং ১৭+এ উভয় পথের ছাত্ররাই সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুরু করবে)। (গ) ১৬+পর্যন্ত দুই বছরের টেকনিকাল স্কুল। (ঘ) তিন বছরের **উত্তর বুনিয়াদি স্কুল** (Post Basic)। এদের প্রতিটি সম্বন্ধেই সামান্য পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ভবিষ্যতের একমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। একদিকে ব্যক্তি-বৈষম্যের স্বীকৃতি অনুযায়ী বিশেষ পাঠ, অন্যদিকে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক পাঠের সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। সকল ছাত্রের জন্য আবশ্যিক পাঠ্য হলো আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষা, ইংরেজী, মূল গণিত, সমাজ-বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং হাতের কাজ। এ ছাড়া ব্যক্তিবৈষম্য, সম্ভাবনা ও যোগ্যতা অনুসারে ৭টি বিশেষ প্রবাহের মধ্য থেকে একটি বাছাই করে বিশেষ পাঠ। প্রতিটি প্রবাহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ৩টিকে পাঠ্যরূপে নির্বাচন করতে হয়। প্রবাহ নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা ও অভীক্ষা, Guidance and Counselling প্রভৃতি অতি আবশ্যিক যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা প্রায় কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকের ইচ্ছাই ছাত্র ও শিক্ষকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর বিষময় ফলও দেখা যায় অনেক।

একটানা তিনবছর পড়ার পরে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীই ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির আবেদন করতে পারে। মূল গণিত, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, হস্তশিল্প প্রভৃতি ফাইনাল পরীক্ষার বিষয় নয়; অবশ্য বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল সার্টিফিকেটে উল্লেখিত হওয়ার বিষয়। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার বিষয় নয় বলেই এগুলি যে অবহেলিত একথা সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে আরও একটু বলা প্রয়োজন। এখানে মানবিক প্রবাহে সংস্কৃতকে আবশ্যিক করে ভাষার চাপ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রয়েছে দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলগুলিকে একসময়ে পরিবর্তনের যুগে ক্ষণস্থায়ী-রূপেই কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এগুলি স্থায়ীত্বের পর্য্যায়ে এসে গিয়েছে। তাই এগুলিতে রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পাঠের বিকল্প ব্যবস্থা। অনেক দিন পর্যন্ত দুই ধরনের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পচুর গরমিল ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের চেষ্টায় এই পার্থক্য বহুলাংশে দূর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বছরের (১৯৬৮) পাঠ্যক্রমের প্রায় সবটাই ১১ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সমতুল্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ নিয়েই **পাঠ্যক্রমের প্রকৃতি** আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে ইংরেজী, বাংলা, গণিত, সংস্কৃত, সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল , সমাজবিদ্যা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয়েছে আবশ্যিক পাঠ্য। তাছাড়া উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ কয়েকটি বিশেষ পাঠের প্রবাহ এখানেও গৃহীত হয়েছে। প্রতি ছাত্রকে নির্দিষ্ট একটি প্রবাহ থেকে দুটি বিষয় বাছাই করতে হয়। তবে মানবিক প্রবাহে সংস্কৃত হবে আবশ্যিক, ইতিহাস ও ভূগোলের বিকল্পরূপে সমাজবিদ্যা নেওয়া চলবে, বিজ্ঞান প্রবাহে 'সাধারণ বিজ্ঞান' আবশ্যিক হবেনা, মানবিক প্রবাহে 'সমাজবিদ্যা' আবশ্যিক হবেনা। বিজ্ঞান প্রবাহে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষাও নেই। একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণের সুবিধেও রয়েছে। (এ ব্যবস্থা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরেও স্বীকৃত)। দশম শ্রেণীর শেষে বহিঃপরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে **এক বৎসরের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স** পড়তে হবে।

কলেজে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে আছে মানবিক, বিজ্ঞান ও বানিজ্য প্রবাহ। ইংরেজী, বাংলা ও ঐচ্ছিক বিষয়ের সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম গঠিত। এ ক্ষেত্রেও রয়েছে বহিঃপরীক্ষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দশ শ্রেণীর বিদ্যালয় দিয়ে যারা অগ্রসর হয়, তাদের প্রায় ১ বছরের মধ্যেই দুইটি বহিঃপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের উপর চাপ পড়ে বেশী।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে আছে টেকনিক্যাল স্কুল। বিভিন্ন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে মেকানিক, ফিটার, ওয়েল্ডার, কার্পেণ্টার, ইলেকট্রিসিয়ানরূপে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বিত শিক্ষাই এই

সব বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আংশিক কিম্বা পূর্ণ সময়ের পাঠ গ্রহণ করা চলে। কর্মরত ব্যক্তির দক্ষতা অর্জনের পক্ষেও এই শিক্ষা বিশেষ উপযোগী। এ ক্ষেত্রেও পাঠকালের শেষে পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে উত্তর বুনিয়াদি কার্যক্রম এক সমস্যা বিশেষ। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধিজীর প্রথম প্রস্তাবে একটানা সাত বছরের সর্বজনীন শিক্ষার কথাই ছিল। জাকির হোসেন কমিটি এই প্রস্তাবের বৈজ্ঞানিক দিক বিশ্লেষণ ও সমর্থন করেন। খের কমিটির প্রস্তাবে ৬-১৪ বছরের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষাকে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে ভাগ করার কথা বলা হয়। পরিশেষে ১৯৪৫ সনে ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা ও গণশিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এই পরিকল্পনায় নিম্ন, উচ্চ ও উত্তর বুনিয়াদি স্তরবিভাগ ছিল।

রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন এই সূত্র ধরেই আর একধাপ অগ্রসর হন। কমিশনের প্রস্তাবে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনায় উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয়কেই গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। এই স্তরের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণই পরিবেশ-কেন্দ্রিক, কর্ম-কেন্দ্রিক এবং স্থানীয় জীবন-কেন্দ্রিক। ৭ কিম্বা ৮ বছর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষার শেষে তিন কিম্বা চার বছরের উত্তর বুনিয়াদি এবং তদূর্ধে ৩ বছরের স্নাতক ও ২ বছরের স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থায় গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব করা হয়।

কিন্তু গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ফেঁসে যাওয়ায় যে কয়টি উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদেরও হয়েছে নাভিশ্বাস। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য যে ধরনের উত্তর বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব। তা ছাড়া এই ধরনের বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত নয়। সুতরাং একদিকে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা এবং অপরদিকে সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানই এদের পক্ষে মৌলিক সমস্যা। তাই বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মূল্য নির্ণয়, গণিত ও বিজ্ঞানের স্থান নির্ণয়, ইংরেজী ও হিন্দির মূল্য নির্ণয়,

এবং কর্মকেন্দ্রীকতার প্রকৃতি নূতন করে নির্ণয় করতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে বিশেষজ্ঞ প্রচেষ্টাও চলেছে। সুখের বিষয় সমগ্র ভারতেই উত্তর বুনিয়াদি বিত্থালয়ের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটি কোন প্রকৃত সমস্যা নয়, কারণ এখানে উত্তর বুনিয়াদি বিত্থালয় আদৌ কোন আসন লাভ করতে পারেনি।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের **মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো** (ক) প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা, (খ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি, (গ) যুব সমাজের চরিত্র গঠন, (ঘ) উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন সামাজিক মানুষ তৈরী করা এবং (ঙ) মধ্যম স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ। সমগ্র প্রাক-যৌবন কালকেই এই শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত করা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাটি হওয়া উচিত ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কথা। যারা উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাঙ্খী এবং যোগ্য, তাদের জন্য হবে বিশ্ববিত্থালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি, আর যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু, তাদের জন্যে হবে কর্মজীবনের প্রস্তুতি। তাই শেষ দুই বছরে ঐচ্ছিক এবং বিশেষ পাঠের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এছাড়া **কমিশন ভাষা-সূত্রও প্রস্তাব করেছিলেন।** (এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব)। পুঁথিগত বিত্থার সঙ্গে ব্যবহারিক দক্ষতার সমন্বয়, গতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, guidance এবং Counselling প্রবর্তন, ছাত্র কল্যাণ ব্যবস্থা, সহপাঠ্যমূলক কর্মোত্থম এবং শিক্ষা প্রশাসনে উন্নতির কথাও বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার ঊর্দ্ধেই উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিত্থালয়ের স্তর। এই স্তরকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় (ক) স্নাতক স্তর এবং (খ) স্নাতকোত্তর স্তর।

উচ্চতর মাধ্যমিক এবং প্রাকবিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশের পরে অনেকগুলি পথ খোলা আছে। (ক) সরাসরি **পলিটেকনিকে ভর্তি** হওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি বিত্থায় সাধারণতঃ তিন বছরের পাঠ্যক্রম প্রচলিত। তিন বছরের শেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের

ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। সম্প্রতি পলিটেক-উত্তীর্ণ ছাত্রদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সান্ধ্য ক্লাসে ভর্তির সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

(খ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হওয়া চলে। এখানে এক বছরের প্রস্তুতি পাঠের পরে ৪ বছরের কোর্স।

(গ) **ডাক্তারি** পড়াও চলে, এক্ষেত্রেও এক বছরের প্রি-মেডিক্যাল কোর্সের পরে ৫ বছরের ডাক্তারি কোর্স।

(ঘ) **বৃত্তিমূলক অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান** রয়েছে যেগুলিতে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে অস্নাতক কিম্বা স্নাতকরা ভর্তি হতে পারে। সম্প্রতি **কৃষি-স্নাতক কোর্সটি** জনপ্রিয় এবং প্রসারিত হয়েছে।

(ঙ) **সাধারণ স্নাতক পাঠে** রয়েছে বি. এ., বি. এস. সি., বি কমের তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স। এই তিনটি বছর আবার ২টি পার্টে (২+১) বিভক্ত।

(চ) স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করবার পর এম. এ., এম. এস. সি., এম. টেক., এম. কম প্রভৃতির ২ বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ এবং তিন বছরের আইনের পাঠ নেওয়া চলে।

স্বাধীনতার যুগে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন **উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন**। এখানে থাকবে ত্রিমুখী উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষা, উদার মতাদর্শের শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গুরুত্ব আরোপিত হবে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একই সময়ে প্রসার ও মানোন্নয়নের কথাই কমিশনে বলেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কথাও কমিশন বিশেষ করে বলেছিলেন। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে কয়েক শ্রেণীর—(ক) Affiliating, (খ) Affiliating and Teaching (গ) Residential, (ঘ) Unitary, (ঙ) Federal. আমাদের দেশে বিগত বিশ বছরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু কিছু আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়েছে। কমিশন

সবরকম প্রতিষ্ঠানের কথাই বলেছিলেন, তবে Affiliating and Teaching ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনও সংখ্যায় বেশী, এবং এর প্রয়োজনও আছে।

সমগ্র ভারতে মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি সবই রাজ্যস্তরে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ্য আইনসভায় আইন পাশ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পরে বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপেই স্বীকৃত হয়। অবশ্য সরকারী অর্থ সাহায্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই পথে সরকারী নিয়ন্ত্রণও প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধানের প্রকৃতির উপর এর স্বাধীনতা নির্ভরশীল। তাই স্বাধীনতারও হেরফের আছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ·টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের প্রশাসনেই রয়েছে নানা পার্থক্য। তবে সাধায়ণতঃ রাজ্য-পালই হয়ে থাকেন চ্যান্সেলার। এ ছাড়া কর্মকর্তা রয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলার, (প্রস্তাবিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার), রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষার কণ্ট্রোলার প্রভৃতি। পরিচালক সংস্থারূপে থাকে সিণ্ডিকেট (অথবা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ,, সিনেট (অথবা কোর্ট), এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টি, কলেজ কাউন্সিল, বোর্ড অব স্টাডিজ প্রভৃতি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নীতি ও অর্থ সাহায্য প্রয়োগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে। (বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

প্রসঙ্গতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের কথাও একটু বলা দরকার। আগে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব কয়টি রাজ্যেই আলাদা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ তৈরী হয়েছে। রাজ্য আইনের সাহায্যেই বোর্ড তৈরী হয়। সুতরাং বোর্ডের গঠনতন্ত্র, দায়িত্ব এবং ক্ষমতার প্রসার সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য আছে।

তবে সাধারণতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম, পরিকল্পনা, বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট দানই পর্ষদের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। এর পাশাপাশি থাকে রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর। স্কুল পরিদর্শন, শিক্ষার অর্থ সংস্থান প্রভৃতি যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব এর উপরই ন্যস্ত থাকে। যে ক্ষেত্রে এই দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে সদ্ভাব থাকে, সেখানে প্রশাসন অপেক্ষাকৃত সরল। দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলেই জটিলতার সৃষ্টি

হয়। (পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ উদাহরণ সহ এইসব সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

আশা করি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের একটি মোটামুটি ধারনা হয়েছে। এবার এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত ডায়গ্রামটির সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে উপস্থাপিত ডায়গ্রামটি তুলনা করে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে শিক্ষা ব্যবস্থা কি ছিল আর কি হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের সিলেবাসে কেবল নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচারের কথাও বলা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ পাঠের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে "Comparison with other countries"; মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নাম ধরে বলা হয়েছে ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানীর কথা; অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে অন্যদেশের সঙ্গে তুলনার কথা। বিশেষ পাঠের ক্ষেত্রে যদি টুকরো টুকরোভাবে তুলনার অবতারনা করতেই হয়, তবে তার আগে সাধারণ-ভাবে ঐসব শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারনা লাভ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান অধ্যায়ে অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করবো।

ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটি তৈরী হয়েছে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন দ্বারা। ব্যবস্থাটি বুঝবার জন্য নীচের ডায়গ্রামটি দেখ।

(১) **দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত বয়সকে নার্সারী শিক্ষার সময় বলে ধরা হয়েছে।** নার্সারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে স্থানীয় শিক্ষা

কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ দেখাতে বলা হয়েছে। নার্সারী স্কুলগুলি প্রয়োজন হলে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গেও থাকতে পারে, আবার সম্পূর্ণ আলাদাও থাকতে পারে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী এবং সম্পূর্ণ বেসরকারী নার্সারী স্কুলও আছে।

(২) নার্সারী শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা না থাকলেও **বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুরু হয় ৫+বছরে।** পাঁচ থেকে এগার বছর পর্যন্ত বয়সকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। ৫—৭ **বছরের শিক্ষাকে বলা হয় ইনফ্যাণ্ট স্কুল।** এই দুই বছরের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শারীরিক, মানসিক, আত্মিক এবং বৌদ্ধিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বাকশিক্ষা, চলাফেরা আচার আচরণ শিক্ষা, সৃজনাত্মক কাজ এবং সৌন্দর্যবোধের শিক্ষা। এই স্তরেই বিভিন্ন শিশুর নিজস্ব সম্ভাবনা এবং প্রেরণা অনুযায়ী লেখা, পড়া ও প্রাথমিক গণিতের পাঠ শুরু হয়। এই স্তরে বিশেষ পরিবেশে আত্মশিক্ষার নীতি গৃহীত।
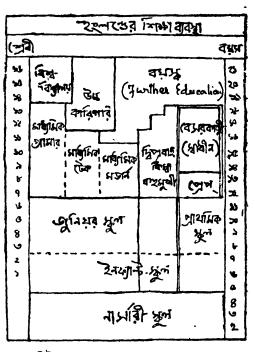
ছবিটি থেকে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে যে-

(৩) **সাত বছর থেকে এগার বছর পর্যন্ত সময়টি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট।** প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে রয়েছে লিখন, পঠন, গণিত, প্রকৃতিপাঠ, সমাজবিদ্যা, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি। স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি,

অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রকেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। পঠণ পদ্ধতিতে ক্রীড়ানীতি, আগ্রহ এবং জ্ঞানের দৃঢ়তা (Sound foundation) নীতির সমন্বয় করা হয়েছে। রাষ্ট্রপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার বিদ্যালয়ও আছে। প্রাথমিক পাঠের শেষে ১১ বছরে হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশের ব্যবস্থা হয়।

প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয়গুলিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান হয়। এর **পাশাপাশি রয়েছে শিশুদের জন্য (৭—১১) প্রাইভেট স্কুল এবং ১১—১৩ বছরের জন্য প্রেপ স্কুল** (Preparatory)। এগুলি পাবলিক স্কুলের সোপান বিশেষ এবং পাঠ্যক্রমও সেইভাবে তৈরী। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষারও দরকার হয় না। অবশ্য এগুলি বৈতনিক বিদ্যালয় এবং বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত বলা চলে।

(৪) **প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের তিনভাগে ভাগ করে তিন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়—** (ক) অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ১১ থেকে ১৫ বছরের মডার্ণ স্কুল। এই স্কুলের সংখ্যাই সর্বাধিক। (খ) ১১ থেকে ১৬ কিংবা ১৭ বছর পর্যন্ত টেকনিক্যাল হাইস্কুল। সাধারণ ও কারিগরি বিদ্যার সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়। (গ) অপেক্ষাকৃত মেধাবী (অথবা যাদের মেধাবী মনে করা হয়) শিশুদের জন্য ১১—১৮ বছর পর্যন্ত তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে গ্রামার স্কুল।

এই তিন শ্রেণীর পৃথক চরিত্রের বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে **কিছু কম্প্রিহেনসিভ স্কুল, বাইলেটারাল স্কুল অথবা বিশেষ স্কুল**। বর্তমানে ৫—১৫ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক। কিন্তু ছবিতেই দেখছো রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে স্বশাসিত বিদ্যালয় সমূহ। এগুলির নানা ধরনের নাম আছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এসব স্কুলে যোগ দেওয়া ঐচ্ছিক। স্কুলগুলি বৈতনিক। এই ব্যবস্থাটি অসাম্যের পরিচায়ক। তা ছাড়া ১১ বছরের শেষে তিনটি ধারায় ছাত্র বাছাইয়ের নীতিটিও আজ সমালোচিত।

ইংলণ্ডে পরীক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল করা হয় নি। অভিনবত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পাঠান্তে পরীক্ষার নাম **জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষা** (জি.সি.ই.)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক সংগঠন এই পরীক্ষা পরিচালনা করে। কয়টি বিষয়ে এবং কোন কোন মানে পরীক্ষায় বসবে এই সম্পর্কে ছাত্রদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত করার অধিকার আছে। সাধারণ মানের (ordinary level) পরীক্ষাগুলি দিতে হয় সাধারণত ১৬ বছরে এবং উন্নতমানের (advanced level) পরীক্ষা দিতে হয় ১৮ বছরে। **বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিম্নতম যোগ্যতা হলো দুটি বিষয়ে উন্নত মানের পাশ।**

মাধ্যমিক স্তরের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু অংশই পড়ে মডার্ণ স্কুলে। বস্তুত ছেলেদের ৮৮% এবং মেয়েদের ৮৫% উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ মডার্ণ স্কুল স্তরেই এদের পাঠ শেষ। এদেরও অভিজ্ঞান-পত্রের দাবী সোচ্চার হওয়ায় ১৯৬৫ সনে একটি পৃথক **পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রবর্তন করা হয়েছে।**

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলেই সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, নৌ এবং বিমান ইঞ্জিনিয়ায়ারিং, কৃষি ও গৃহবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। কৃষি এবং হর্টিকালচারের জন্য রয়েছে বিশেষ কাউন্টি স্কুল। তাছাড়া কারিগরি বিদ্যালয় রয়েছে বহু ধরনের। সপ্তাহে নিম্নতম একদিন সান্ধ্যক্লাসের ভিত্তিতে ৩।৪ বছর পাঠান্তে ডিগ্রীস্তরে পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। সাধারণ মানের আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষার কলেজ রয়েছে। উন্নত মানের ২ থেকে ৪ বৎসরের পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কলেজ রয়েছে। উন্নত মানের কারিগরি শিক্ষার জন্য আছে ২৫টি রিজিওন্যাল কলেজ। Advanced Technology-র জন্য আছে বিশ্ববিদ্যালয় মানের দশটি কলেজ এবং ৬টি জাতীয় কলেজ (national college)।

জি.সি.ই. পরীক্ষায় উন্নতমানে সাফল্যের ভিত্তিতে ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেট ডিক্রীর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় যোগ দেওয়া যায়। জি.সি.ই. পরীক্ষায় সাধারণ মানে সাফল্যের ভিত্তিতে নানা ধরনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া কর্মরত অবস্থায় সর্বসময় কিংবা আংশিক সময় কিংবা সান্ধ্য-বিদ্যালয়ে শিল্প, কলা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

উচ্চশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার কাল ৩ বছর। ইংলণ্ডে বর্তমানে আছে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে **অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যক্রমে বিশেষীকরণ নির্ধারণ করে।** এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ডিগ্রীদানের একমাত্র মালিক। কিন্তু সম্প্রতি Robbin Committee-র সুপারিশ অনুসারে Council for National Academic Awards গঠিত হয়েছে।

শিক্ষা-প্রশাসন

১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন সরকারী বেসরকারী-যৌথ দায়িত্বের নীতি গৃহীত হয়েছে. তেমনি **শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃত্বের যৌথ দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে।** ইংলণ্ডে এককেন্দ্রীক শাসনতন্ত্র (ইউনিটারী)। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় মন্ত্রীদপ্তরই প্রশাসনের কেন্দ্র, আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থানীয় প্রশাসক। **১৯৪৪ সনের আইনের সাহায্যে এদের মধ্যে দায় ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।**

ইংলণ্ডে **শিক্ষা-প্রশাসনের কেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।** মন্ত্রীদপ্তরের দায়িত্ব হলো দেশব্যাপী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং কার্যে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার দিক-নির্দেশনা ও উন্নয়ন। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা বলবার এবং নিয়ন্ত্রণের চরম অধিকার আইনগতভাবে মন্ত্রীদপ্তরের রয়েছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকৃত আছে যেমন, (ক) শিক্ষার সুযোগ, মান এবং

কল্যাণমূলক ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ; (খ) পিতামাতা ও শিক্ষকের স্বাধিকার নিশ্চিত করা; (গ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেণ্ট) নিশ্চিত করা; (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা; (ঙ) অবৈতনিক শিক্ষার স্তরে অবৈতনিকতা নিশ্চিত করা এবং বৈতনিক স্তরে বেতননিয়ন্ত্রণ ও ভাতা, বৃত্তির ব্যবস্থা করা; (চ) বিদ্যালয়ের গৃহ ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।

শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন সচিব ও কর্মচারীদের সহায়তায়। তাছাড়া মন্ত্রীদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন এক শ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক (Her Majesty's Inspectors—H.M.I.)। মন্ত্রীদপ্তরকে সাহায্য করেন দুইটি উপদেষ্টা-পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষিত হয় ইউ. জি. সি.-র মারফৎ।

বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে তালিকাভুক্ত করেন মন্ত্রীদপ্তর। তাদের মর্যাদা সম্পর্কে চুক্তি এবং তদনুযায়ী সাহায্যও দিয়ে থাকেন মন্ত্রীদপ্তর। **বস্তুত ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর-দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন না, বিদ্যালয়ের মালিক নন এবং শিক্ষকও নিয়োগ করেন না। কিন্তু শিক্ষাসম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকার রয়েছে সেখানেই।** অবশ্য খেয়ালখুশীমত কিছু করবার উপায় নেই, কারণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অতি সচেতন। **তাই দুই স্তরের সহযোগিতায়ই শিক্ষা-প্রশাসন পরিচালিত হয়।**

১৯৪৪ সনের আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আইনসিদ্ধভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হলো County Council এবং County Borough Council। এইগুলি সাধারণ স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান। **এদের শিক্ষা-কমিটীর সঙ্গে স্থানীয় বেসরকারী শিক্ষাবিদ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয় শিক্ষা-কমিটী—এল. ই. এ.।** প্রতিটি এল. ই. এ. তার প্রধান কর্মসচিব নিয়োগ করে। তাঁর অধীনে রয়েছেন অন্যান্য কর্মচারী এবং বিদ্যালয়-পরিদর্শকবৃন্দ (এরা LEA Inspector —H.M.I. নন্)।

কাউন্টি ও কাউন্টি-বরো কাউন্সিল ছাড়াও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সুসংহত করার জন্য রয়েছে "ডিভিশন্যাল অথরিটী"। কাউন্টি কাউন্সিল,

বরো কাউন্সিল, বিত্থালয় পরিচালক সভার প্রতিনিধি,—শিক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণভাবে এল.ই.এ.-র নির্দেশেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে।

এল.ই.এ. র প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—(ক) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা (বিশ্ববিত্থালয় ব্যতীত) ব্যবস্থার সুসংহত পরিচালনা, (খ) নার্শারী-শিক্ষায় উৎসাহ ও সাহায্য দান, (গ) স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিচালনা ও প্রস্তুতি, (ঘ) স্থানীয় শিক্ষাকর আদায় ও বণ্টন, (ঙ) অঞ্চলের মধ্যে বেসরকারী বিত্থালয় ও চার্চ-পরিচালিত বিত্থালয়গুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, (চ) বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, (ছ) বিদ্যালয়-পরিচালক-সভার সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষকনিয়োগ এবং এল.ই.এ, ও শিক্ষক-সমিতির যৌথ পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষকের বেতনক্রম ও কাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন, (জ) ছাত্রকল্যান-ব্যবস্থাপনা (ঝ) মন্ত্রীদপ্তর থেকে সরকারী সাহায্য গ্রহণ ও বণ্টন। (শিক্ষার ৬০ ভাগ ব্যয় বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার) এবং (ঞ) স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষামানের উন্নয়ন।

প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে পরিচালক-সভা (Board of Governors or Management)। পরিচালক-সভার দায়দায়িত্ব নির্ভর করে বিদ্যালয়ের চরিত্রের উপর। স্বভাবতই বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার দায়িত্ব ও অধিকার অনেক বেশী। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য একান্তই প্রয়োজন। ইংলণ্ডে সর্বশেষ রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমানের পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। সেই থেকে এ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তন রূপায়িত হয়েছে কয়েকটি পর্যায়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে। **প্রতিটি পর্যায়ের সংস্কারই তৎকালীন সমাজে**

বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আপোষরফার এক একটি অভিব্যক্তি। আমূল পরিবর্তন কোন পর্যায়েই হয় নি। শিক্ষার বিবর্তনও হয়েছে ধাপে ধাপে নানা আপোষরফার মাধ্যমে। তাই ইংলণ্ড ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরি তথা প্রয়োগবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। তেমনি ইংলণ্ডে জাতীয়তার প্রভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্ভব হয়েছে। একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারে বিশ্বাসী ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগত মালিকানার সুযোগ রক্ষা করেছে।

গণতন্ত্রের প্রভাবে শিক্ষায় সর্বজনীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। এর অভিব্যক্তি ঘটেছে শিক্ষায় বহুমুখীনতা তথা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কশিক্ষা-পরিকল্পনা, ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন প্রভৃতিতে। কিন্তু আভিজাত্যের ঐতিহ্য আজও ইংলণ্ডে রয়েছে; আর রয়েছে শ্রেণীবৈষম্য। তাই রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একটি বেসরকারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষিত হয়েছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমনি হয়েছে কেন্দ্রিকতা ও বিকেন্দ্রীকতার মধ্যে একটি আপোষ।

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা

অনেক দিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নীচের ছবিটি থেকে তোমরা বর্তমান ব্যবস্থাটি বুঝতে পারবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসরকারগুলিই শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক। এই রাজ্যগুলি আবার সংবিধান অনুসারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ ও প্রয়োজনে পার্থক্য রয়েছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-কাঠামো বিভিন্ন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোন একক শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাকাঠামো নেই। বিভিন্নতা রয়েছে বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সে। বিভিন্নতা রয়েছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-কালের দৈর্ঘ্যে, (কোথাও দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ১৬ বছর, কোথাও বা ৬-১৮ বছর)। বিদ্যালয়-জীবনের স্তরবিন্যাসও বিভিন্ন। কোথাও আছে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, কোথাও আছে ৬ বছরের প্রাথমিক এবং ৬ বছরের মাধ্যমিক, কোথাও

বা শেষোক্ত ছয় বৎসরকে ৩ বছরের জুনিয়ার হাই এবং ৩ বছরের সিনিয়র হাই হিসেবে ভাগ করা হয়। তবে সাধারণভাবে যে ধরনের ব্যবস্থা বেশীসংখ্যক রাজ্যে রয়েছে সেই অনুসারেই আমরা কাঠামো বিশ্লেষণ করছি। শিক্ষাকাঠামো মোটের উপর নিম্নরূপঃ

(ক) দুই থেকে চার বৎসর বয়স—নার্সারী বিদ্যালয়।
চার থেকে ছয় বৎসর বয়স—কিণ্ডারগার্টেন।

প্রাকপ্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষা রাষ্ট্রীয় উৎসাহ লাভ করলেও বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং ৬ বৎসর পর্যন্ত পিতামাতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষাও আইনগতভাবে এখনও স্বীকৃত; (খ) ছয় বৎসর থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৬ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষা; ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৩ বছরের সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষা। বিকল্পে ৬ বছরের প্রাথমিক ও একটানা ৬ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। অথবা ৮ বছরের প্রাথমিক ও ৪ বছরের মাধ্যমিক কিংবা বিকল্পে ৮ বছরের প্রাথমিক ও ৪ বছরের বাধ্যতামূলক continuation শিক্ষা।

শিক্ষা-কাঠামোর আভ্যন্তরীণ স্তরবিভাগ যেমনভাবেই হোক না কেন, সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয় ছয় বৎসর বয়সে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় ১৮ বছর বয়সে। সাধারণ বিচারে তাই ৬ থেকে ১৮ বছর

পর্যন্ত ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক, অর্থাৎ সমগ্র কৈশোর জীবন তথা মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরই সর্বজনীন বাধ্যতার অন্তর্গত।

পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নানা ধরনের স্কুল আছে। তবে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হলো কম্প্রিহেনসিভ স্কুল। বিভিন্ন প্রকৃতির মাধ্যমিক শিক্ষা একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগঠিত করে এই স্কুলের উদ্ভব হয়েছে।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ইংলণ্ডের মত ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় না, কিংবা আমাদের বর্তমান "প্রবাহ"-প্রথার মত ব্যবস্থাও নেই। বিভিন্ন প্রবণতার ছাত্রছাত্রী একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান থেকে গণিত, কারিগরি. বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকে। পঠিতব্য বিষয়ের মূল্যভেদ করা হয় না, কারণ প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী জীবনযাত্রার জন্য যে যে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন, তা সবই সমমূল্যের।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে সকল ছাত্রকেই কয়েকটি বিষয়কে অবশ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। ভাষা, সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিদ্যা প্রভৃতিই সাধারনতঃ অবশ্যপাঠ্য। সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষার নিম্নতম মান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক সংহতির স্বার্থেই এই আবশ্যিক পাঠের ব্যবস্থা। এই সব আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়গুলিকে বলা হয় 'Constants' অথবা 'Solids'. এ ছাড়া বহুবিধ বিষয়ের মধ্য থেকে পছন্দমত গ্রহণ করতে হয় ঐচ্ছিক বিষয়গুলি (ইলেকটিভ)। ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্ররা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, তথা গণতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুল ছাড়াও কৃষি, বাণিজ্য, বৃত্তি ও কারিগরি পাঠ্যক্রম অবলম্বন করে পৃথক মাধ্যমিক স্কুলও আছে অনেক।

(গ) ১৮ বছরের পরে হয় উচ্চশিক্ষার স্তর। এর মধ্যে মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষার প্রথম দুই বছরকে, অর্থাৎ কলেজীয় স্তরের প্রথম দুই বছরকে বলে জুনিয়ার কলেজ স্তর এবং পরবর্তী ২ বছর সিনিয়র কলেজ স্তর। শেষোক্ত স্তরের শিক্ষান্তেই স্নাতক উপাধি।

(ঘ) ১৮ বছরের পরে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষার পরিবর্তে ১।২।৩ বছরের

নানা ধরনের টেকনিক্যাল কোর্স আছে। নর্ম্যাল স্কুল কিংবা টিচার্স কলেজেও প্রবেশ করা যায়।

(ঙ) স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের টেকনোজিক্যাল পাঠক্রম অনুসরণ করা সম্ভব।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ আলোকসম্পাত প্রয়োজন।

(ক) এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য **জুনিয়র হাই স্কুল আন্দোলন**। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে কোন কোন শিক্ষাবিদ শিশুর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর জীবনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পৃথকভাবে দেখতে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর বিদ্যালয়ের মধ্যেই এই তিনটি শ্রেণীর পৃথক সত্তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের মতে **কৈশোর জীবনের এই প্রারম্ভিক পর্যায়কে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত কারণে বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।** তাই এ সময়ে সাধারণ পাঠ্যক্রমকে আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করা হয়। পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইংরেজী, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান মিশ্রিত পাঠকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। এই সঙ্গে কিছু হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

উদ্যোক্তাদের মতে **জুনিয়ার হাই স্কুলের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—** (ক) শিশুদের সহজাত প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আগ্রহ আবিষ্কার, (খ) বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটানো, যেন সিনিয়র হাই স্কুল স্তরে তারা সুবিবেচনার সাথে পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারে, (গ) শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সংহতিসাধন, (ঘ) শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার দিকনির্দেশনা (গাইডেন্স), (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ সাধন করা, (চ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ (ছ) শিশুদের সমাজীকরণ। যেহেতু জীবনের এই স্তরটিকে প্রবণতা ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের স্তর বলে গ্রহণ করা হয়, সেই হেতু জুনিয়ার হাই স্কুলে সহপাঠ্যমূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতি অনেক বেশী।

(খ) আমেরিকার শিক্ষা-ইতিহাসে **দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'জুনিয়র কলেজ' আন্দোলন।**

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাও যখন সর্বজনীনতার দিকে যাত্রা করলো এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হলো, তখন থেকে স্বভাবতই শিক্ষামানের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। তাছাড়া বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অতি দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশেষীকরণের শিক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে বিশেষীকরণের শিক্ষা সার্থক করার জন্য মৌলিক সাধারণ শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রয়োজন।

তাই **সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে ঐ শিক্ষার সময়কাল দীর্ঘতর করার এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। স্কুলে ১২ বৎসর পাঠের শেষে শিক্ষাজীবনের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসরকে দৃঢ়তর সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সময়রূপে গণ্য করা হয়।** এর অর্থ বিশেষীকরণের শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা নয়, গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষাবর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপের এই আন্দোলনই জুনিয়র-কলেজ আন্দোলন নামে পরিচিত। শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে এই দুইটি বৎসরের স্থান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে ৪ বছরের ডিগ্রীকলেজের প্রথম দুই বৎসরকে পৃথক সত্তারূপে জুনিয়র কলেজরূপে এবং শেষ দুই বৎসরকে সিনিয়র কলেজরূপে দেখা হয়েছে। কোথাও এই দুইটি বছরকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে ৮+৪+২ কিংবা ৬+৬+২ অথবা ৬+৪+৪ স্কীম অবলম্বন করা হয়েছে। আর কোথাও আবার পৃথক দুই বছরের জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(গ) আমেরিকার সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় **তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে "সাধারণশিক্ষা"-আন্দোলনে (General Education Movement)।** বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ্যার দ্রুত উন্নতির ফলে এবং শ্রমবিভাগ-পদ্ধতিতে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বিশেষীকরণের শিক্ষার প্রতি অতি মাত্রায় ঝোঁক এসেছিল, একথা নিঃসন্দেহ। **অতি-বিশেষীকরণের এই প্রবণতার ফলে শিক্ষা তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এসেছিল অতি সঙ্কীর্ণতা। বিশেষী-করণের চাপে জ্ঞানক্ষেত্র হলো খণ্ডিত এবং সঙ্কীর্ণ।** সামাজিক ভাব-

মানসে পারস্পরিক আদান-প্রদানের অভাবে সামাজিক সংহতিই বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হলো। মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখীনতা অবলম্বিত হওয়ায় বিশেষীকরণের প্রবণতা স্কুলশিক্ষাক্ষেত্রও প্লাবিত করে চললো।

শিক্ষাবিদগণ প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন যে **বিশেষীকরণের যেমন মূল্য আছে, তেমনি অতি-বিশেষীকরণের বিপদ আছে।** পিতা অথবা মাতা হিসাবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, সভ্য সমাজের মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের সমশিক্ষার ভিত্তি প্রয়োজন। সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতির সর্বনিম্ন জ্ঞান প্রতিটি নাগরিকেরই থাকা প্রয়োজন। সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় (common), Non-specialised, Nonvocational মৌলশিক্ষাই (Core) "সাধারণশিক্ষা" অর্থাৎ General Education-এর মূল তাৎপর্য।

এই সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—(ক) গণতান্ত্রিক নীতিবোধ সঞ্চার করা, তথা ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য বিধান নিশ্চিত করা, খ) গোষ্ঠি, রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নাগরিকের যোগ্য ভূমিকা পালনের শিক্ষা দেওয়া, (গ) ব্যক্তি-মানুষ ও বৃহত্তর মানবসমাজের সৌহার্দ এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া, (ঘ) প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞানসঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও অবদান অনুভব করতে সাহায্য করা, (ঙ) ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা, (চ) আবেগ-প্রক্ষোভের সুস্থ ভারসাম্য নিশ্চিত করা, (ছ) সাহিত্য ও চারুকলার মূল্য অনুভব করা (জ) পারিবারিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য ও কর্মদক্ষতার শিক্ষা অর্জন করা এবং (ঝ) সুস্থ চিন্তাশক্তির বিকাশ করা।

আলোচিত **সাধারণশিক্ষা "বিশেষ শিক্ষার" পরিপন্থী নয়, বরং পরিপূরক**; কারণ সাধারণ শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপরেই বিশেষ শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে। **এই শিক্ষা কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা নয়।** প্রাথমিক থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত এ শিক্ষা বিস্তৃত থাকবে। পাঠ্যক্রমে ও সমপাঠ্যমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে সর্বদাই সাধারণশিক্ষার প্রভাব থাকবে।

এই সাধারণ-শিক্ষানীতিকে অবলম্বন করেই পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ গণিত, সমাজবিদ্যা, আবশ্যিক হস্তশিল্প, সমপাঠ্যমূলক কার্যক্রম, 'কন-

স্ট্যাণ্ট" পাঠ্যবিষয় এবং কারিগরি পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাধারণ পাঠ্যক্রমের সংযোজনার ব্যবস্থা হয়েছে।

(ঘ) আমেরিকার শিক্ষায় **চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো শিক্ষার মান নির্ধারণ, তথা পরীক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব।**

শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। তাই আপন গতিতে এবং প্রবণতা অনুসারে শিশুর অগ্রগতির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর সম্ভাবনা, প্রবণতা ও ক্ষমতা ভিন্ন বলেই সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষামান নির্ধারণের রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্লাশ-প্রমোশন পরীক্ষার পরিবর্তে "গ্রেডক্রেডিট্" প্রথা প্রচলিত হয়েছে। সারা বছরে শিশুর কাজ অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি বিষয়ে তাকে ক্রেডিট্ দিয়ে থাকেন। সমগ্র বৎসরে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় ও সমপাঠ্যমূলক কার্যক্রমে সংগৃহীত ক্রেডিটই প্রমোশন নির্ধারণ করে।

স্কুলপাঠের শেষে সাধারণ বহিঃপরীক্ষার যে পদ্ধতি ইংলণ্ডে কিংবা আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে, তেমন কোন **সাধারণ "ফাইনাল" পরীক্ষাও আমেরিকায় নেই।** মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিই সার্টিফিকেট দানের অধিকারী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধীত বিষয়ে অর্জিত মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) এবং শিশুর দক্ষতার একটা সাধারণ পরিমাপের প্রয়োজন দেখা দিল। তখন "কার্ণেগি ইউনিট" প্রবর্তন করে সমস্যার সমাধান করা হলো। স্থির হলো যে সপ্তাহে পাঁচ দিন, প্রতিদিন ৪৫ মিনিটের ঘণ্টা হারে সমগ্র শিক্ষাবর্ষে একটি পাঠ্যবিষয় নিয়মিত ক্লাশে অধ্যয়ন করলে বৎসরান্তে ছাত্রের জমা'র খাতায় একটি কার্ণেগি ইউনিট যোগ হবে তার ক্রেডিট হিসাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ৪ বৎসর এইভাবে নিয়মিত অধ্যয়ন করলে এক একটি বিষয়ে হবে ৪টি ইউনিট। চারটি পূর্ণ ইউনিট যারা সংগ্রহ করতে পারবে তাদেরকেই সেই বিষয়ে উপযুক্ত মানসম্পন্ন বলে ধরা হবে। ১৫।১৬টি ইউনিট্কেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ কলেজে ভর্তির যোগ্যতা বলে গ্রহণ করা হবে। কার্ণেগি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছিল বলেই এই ক্রেডিটের নাম হয়েছে কার্ণেগি ইউনিট।

এখন আমরা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

প্রাথমিক শিক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য রাজ্যবিশেষে ৬ থেকে ৮ বৎসর। এই স্তরের শিক্ষায় সাধারণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শিশুর আত্মপরিচিতি ও অনুধাবনশক্তি বৃদ্ধি ; প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি ; ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্যের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির শিক্ষা এবং আনন্দময় পরিবেশে দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভ জীবনের স্থিরতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি। আরও নির্দিষ্ট অর্থে এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো লিখন-পঠন-গণিতের দক্ষতা, দৈহিক-মানসিক স্বাস্থ্য, ঐতিহ্য ও সমাজপরিবেশ পরিচিতি, ন্যায়নীতি, সহানুভূতি ও সৌন্দর্যপ্রীতি সঞ্চার। ভবিষ্যতের উপযোগী মৌলিক দক্ষতা অর্জনই হবে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই মৌলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞানে, আচরণে, অনুভূতিতে, সামাজিক সহযোগিতায়, ব্যক্তিগত প্রবণতায়। সুতরাং সংক্ষেপে বলা চলে যে **সামাজিক দক্ষতা এবং সুনাগরিকতার শিক্ষাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য।**

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে ভাষা ও সাহিত্য (এ ক্ষেত্রে মনোভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে), মৌলগণিত, আমেরিকার ইতিহাস ভূগোল ও পৌরনীতির মিশ্রিত পাঠ, প্রকৃতি পরিচয়, শারীর শিক্ষা, হাতের কাজ প্রভৃতি। পাঠ্যক্রম মূলত অনুবন্ধ-পদ্ধতিতে তৈরী। পাঠ-পদ্ধতিতে "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" নীতিই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তাই **আধুনিক সমস্ত পাঠপদ্ধতিই আমেরিকায় কমবেশী প্রচলিত**। এর মধ্যে প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূল্য সর্বাধিক।

রাষ্ট্রপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। রাষ্ট্রীয় কর-তহবিল এবং স্থানীয় সাধারণ করভাণ্ডার দ্বারা পোষিত বলেই বিদ্যালয়গুলি সাম্প্রদায়িক নয়। তাই রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। তবে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করে ঐচ্ছিকভাবে চার্চ-বিদ্যালয়ে ধর্মীয় পাঠগ্রহণের জন্য ছুটির ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে **ব্যাপকভাবে বেসরকারী উদ্যম স্বীকৃত। তাই বিভিন্ন চার্চপ্রতিষ্ঠান কিংবা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থারও বিদ্যালয় পরিচালনার, তথা বৈতনিক শিক্ষাদানের অধিকার**

আছে। স্কুল নির্বাচনের অধিকার রয়েছে পিতামাতারা। কিন্তু যে স্কুলেই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রায় ৪০ বছর আগে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যেরূপে ৭টি মৌলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল। নীতিগুলি ছিল স্বাস্থ্য, মৌলিক দক্ষতা, সুস্থ পারিবারিক জীবনের শিক্ষা, নাগরিকতা, ব্যক্তিগত দক্ষতা, নৈতিক চরিত্র, অবসর বিনোদনের শিক্ষা। বিগত চল্লিশ বছরের আদর্শগত বিবর্তনে এর কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন হয়েছে মাত্র।

বর্তমানে নাগরিকতার শিক্ষা, বৃত্তিজীবনের প্রস্তুতি, বৌদ্ধিক বিকাশ, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বর্তমানে একথাই মোটামুট স্বীকৃত যে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ ধরনের কাজ—Terminal Education, General Education, Pre-professional Education, Life Adjustment Education. **যুগপৎ এই চার রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য আমেরিকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হলো কম্প্রিহেনসিভ স্কুল।**

রাষ্ট্রপোষিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি **সমসুযোগের ভিত্তিতে প্রবাহ-বিহীন সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান।** অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই অবৈতনিক এবং অসাম্প্রদায়িক বলেই ধর্ম-নিরপেক্ষ। তবে এ ক্ষেত্রেও ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় পাঠের জন্য চার্চবিদ্যালয়ে যাওয়ার রীতি আছে।

তবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা অধিক, তবুও নানা ধরনের বহু সংখ্যক বৈতনিক প্রাইভেট স্কুল রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও স্কুল নির্বাচনের অধিকার পিতামাতার। তবে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার বয়স পর্যন্ত যে কোন বিদ্যালয়ে সন্তানকে প্রেরন করতেই হবে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিও অবশ্য রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সাধারণভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের অধীন।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলের বিচিত্র পাঠক্রম বৃত্তি ও

কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন বহুলাংশে সিদ্ধ করে। তা ছাড়া বিশেষীকরণের জন্য রয়েছে নানা ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর আছে কন্টিনিউয়েশন্ শিক্ষাব্যবস্থা।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রমদপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনের সাহায্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থে বহু ধরনের বৃত্তিগত শিক্ষাক্রম সমগ্র আমেরিকাতেই রয়েছে। কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা-বোর্ড এই শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও গৃহবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় বরাদ্দ করা হয়। কেন্দ্রীয় অর্থানুকুল্যে ১৪-১৮ বছর বয়সের তরুণদের জন্য বাধ্যতামূলক আংশিক সময়ের কন্টিনিউয়েশন্ শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রতিরক্ষা-শিল্পের জন্য কিংবা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের জন্য ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রচলিত আছে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন শিল্পগুলির নিজস্ব শিক্ষণব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য আছে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও নানা ধরনের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই করিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা, তথা প্রয়োগবিদ্যা আমেরিকায় সুসংগঠিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে আমেরিকা গ্রহণ করেছে—(ক) পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের শিক্ষা, (খ) সৃজনীচিন্তা ও কল্পনার শিক্ষা, (গ) সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বৌদ্ধিক শিক্ষা, এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির শিক্ষা।

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে বহু ধরনের—যেমন, ল্যাণ্ডগ্রাণ্ট কলেজ, লিবারেল আর্টস্ কলেজ, টিচার্স কলেজ, জুনিয়র কলেজ, কমিউনিটি কলেজ, পেশাগত "স্কুল", বিভিন্ন ইন্স্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আনুমানিক ৪৫% হলো সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫% জুনিয়র কলেজ, ১৬% পেশা কলেজ এবং ১৪% শিক্ষক কলেজ।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যম আমেরিকায় অত্যন্ত প্রকট। প্রোটেস্ট্যাণ্ট-চার্চ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার পরেই

স্থান বেসরকারী যৌথসংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের। প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যমের স্থান তৃতীয়। চতুর্থ স্থান অধিকার করে ক্যাথলিক চার্চ। সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ। এমন কি জুনিয়র কলেজও শতকরা প্রায় ৫০টি বেসরকারী।

উচ্চশিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই স্বশাসিত, স্বয়ম্ভর এবং সার্টিফিকেট প্রদানের অধিকারী। তাই সমগ্র আমেরিকায় কোন নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষামান নেই। অতি উন্নত মানের পাশাপাশি রয়েছে অতি নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান। তবে এ ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা-প্রশাসন

আমেরিকায় শিক্ষা-প্রশাসন নির্ধারিত হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক পন্থায়। আমেরিকার সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে সীমাবদ্ধ তালিকা-ভুক্ত ক্ষমতা। এই তালিকায় যা উল্লেখিত নয়, তাই অঙ্গরাজ্যসমূহের ক্ষমতা বলে ধরা হবে। উক্ত তালিকায় শিক্ষার স্থান নেই। সুতরাং **সংবিধান অনুসারে শিক্ষা হলো রাজ্যসরকারের এক্তিয়ার**। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে কিছু করার আইনসম্মত ক্ষমতা নেই।

তবুও সমগ্র জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষভাবে এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন। **জাতীয় সংকট অথবা জরুরী অবস্থাতেই হস্তক্ষেপের সুবিধে হয়েছে।**

সংবিধানসম্মতভাবে **কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে** যেমন, এস্কিমো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা, বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষা, হাওয়ার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, কংগ্রেস-লাইব্রেরী পরিচালনা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শিক্ষা, বিশেষ ধরনের শিক্ষা, আণবিক গবেষণামূলক শিক্ষা প্রভৃতি। তাছাড়া চিকিৎসা-শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। ভূমিদানের ভিত্তিতে ল্যাণ্ডগ্রাণ্ট কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত বলে এই সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় অধিকার স্বীকৃত রয়েছে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় অন্যান্য বিভাগের মাধ্যমে (উল্লেখযোগ্য যে কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ নেই) **নানা ধরনের শিক্ষা-প্রকল্প চালু করা হয়।** কেন্দ্রীয় কৃষি-বিভাগ ল্যাণ্ডগ্রাণ্ট কলেজ, কৃষিগবেষণা কেন্দ্র এবং কৃষি ও

গৃহ-বিজ্ঞানের 'এক্সটেনসন' কাজ পরিচালনা করে। বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগের অধীনে রয়েছে নানা ধরণের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। বস্তুত **কৃষি, বৃত্তি, পেশা, প্রতিরক্ষা, বিশেষ অঞ্চল অথবা বিকলাঙ্গদের শিক্ষাক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।**

কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালিত হয় বিশেষ শিক্ষা-প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্প গ্রহণ-বর্জনের অধিকার রাজ্যগুলির আছে। কিন্তু গ্রহণ করলেই আসবে প্রভূত অর্থসাহায্য। আর অর্থসাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে আসবে সাহায্যের অনুপাতে খবরদারী।

রাষ্ট্রপতির যেমন বিভিন্ন বিভাগীয় সচিব আছেন তেমন কোন সচিব শিক্ষার ক্ষেত্রে নেই, কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠাই সংবিধানসম্মত নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে শিক্ষা-বিভাগের সমতুল্যরূপে রয়েছে "ফেডারেল অফিস অফ এডুকেশন," এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান "শিক্ষা-কমিশনার" রয়েছেন শিক্ষাসচিবের সমতুল্য। অফিস অফ এডুকেশনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা, গবেষণা পরিচালনা করা, জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা, রাজ্যসমূহের অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে বিতরণ করা, শিক্ষাপত্রিকা প্রকাশ করা, রাজ্যগুলির প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করা এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থা পরিচালনা করা। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সাহায্য রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা এবং পূর্বালোচিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বগুলি পালন করাও এর দায়িত্ব। সুতরাং **প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সাংবিধানিক সুযোগ সংকীর্ণ হলেও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের তথা ভূমিকা পালনের ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে।**

দ্বিতীয়ত আলোচ্য রাজ্যস্তরে শিক্ষাপ্রশাসন। **সংবিধানের ভাবার্থে শিক্ষা সম্পূর্ণই রাজ্যের বিষয়।** রাজ্যগুলিও এই অধিকার সম্পর্কে অতি সচেতন। একদিকে যেমন স্থানীয় সংগঠনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে, অপরদিকে তেমন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্ব সমর্পণ করতে রাজ্যগুলি বরাবরই গররাজি। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আপোষে প্রশাসন সংগঠিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যগুলির বিরাট তালিকা প্রস্তুত করা যায়—যেমন, রাজ্যশিক্ষানীতি নির্ধারণ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিশ্চিত করা, বয়স্কশিক্ষা পরিচলনা করা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দান করা, কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন করা প্রভৃতি। সমগ্র রাজ্যের পাঠ্যক্রমে "কোর" নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাজ্য কর্তৃপক্ষের।

রাজ্যসরকারগুলির এই দায়িত্ব পালনের জন্য **প্রতি রাজ্যে আছে রাজ্য শিক্ষা-বোর্ড। প্রতিটি বোর্ডে আছেন এক প্রধান কর্মসচিব,** এবং তাঁর অধীনে আছেন বিশেষজ্ঞদল, পরিদর্শক এবং সাধারণ কর্মচারী।

রাজ্যশিক্ষাবোর্ডগুলির দায়িত্বের মধ্যে আছে—(ক) শিক্ষা-আইন প্রয়োগ, (খ) সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, (গ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ পরিচালনা এবং শিক্ষকদের সার্টিফিকেট প্রদান, (ঘ) লাইব্রেরী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যালয়গৃহ অনুমোদন, (ঙ) রাজ্যশিক্ষাবাজেট তৈরী এবং সাহায্য-প্রদান, (চ) কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন প্রভৃতি। রাজ্যের এই **শিক্ষানীতিসমূহ কার্যকরী করাই শিক্ষাকমিশনারের দায়িত্ব।** তা ছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান, শিক্ষাতথ্যসংগ্রহ, রিপোর্ট প্রকাশনা, গণসংযোগ রক্ষা করাও তাঁর কাজ।

সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসন রয়েছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে। সাংবিধানিক অর্থে রাজ্যকর্তৃপক্ষই শিক্ষানিয়ন্তা হলেও ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে **আইনসম্মত ভাবে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির হাতে বহু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়েছে।**

বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল তথা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি শুধু শিক্ষা প্রশাসক প্রতিষ্ঠান নয়, পৌর-প্রতিষ্ঠানও বটে। অর্থাৎ অন্যান্য পৌরদায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষাও এদের একটি দায়িত্ব। প্রতিটি অঞ্চলকর্তৃপক্ষ (লোকাল অথরিটি=এল. এ.) একটি শিক্ষাকমিটি গঠন করেন। কমিটির নাম এবং সভ্যসংখ্যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। **প্রতিটি এল.এ. তার Superintendent of Education নিয়োগ করেন।** এই নিয়োগ-পদ্ধতিও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করাই এল.এ.-র কাজ এবং সেই নীতি কার্যে পরিণত করাই সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের দায়িত্ব।

আমেরিকায় ক্ষুদ্রতম অঞ্চলকে বলে "জিলা" (ডিস্ট্রিক্ট)। প্রতিটি

জিলায় রয়েছেন নির্বাচিত স্কুল ট্রাস্টি। তাঁদের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় অর্থভাণ্ডার তৈরী করা এবং শিক্ষকদের বেতনব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা। **জিলার উচ্চতর স্তরের অঞ্চলকে বলে টাউন অথবা টাউন-সিপ।** এ ক্ষেত্রেও রয়েছে স্কুলবোর্ড। এদের ক্ষমতা জিলা-স্কুলবোর্ডের ক্ষমতার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। **"কাউন্টি" হলো প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাভাবিক স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল।** কাউন্টি-স্কুলবোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত এবং বহুক্ষেত্রে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও নির্বাচিত। কাউন্টি-বোর্ডের ব্যাপক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা-আইন প্রয়োগ, সাধারণ শিক্ষা-প্রশাসন, পরিদর্শন, বিদ্যালয়—বিশেষত গ্রামীণ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, পাঠ্যক্রম গঠন প্রভৃতি। **আর একটি উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল হলো সিটি।** এ ক্ষেত্রেও দায়িত্ব প্রায় কাউন্টি-প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য।

আমেরিকার বিভিন্নরাজ্যে আঞ্চলিক শিক্ষাপ্রশাসনের ব্যাপকতায় কিংবা শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রণালীতে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এদের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা যায়—শিক্ষানীতি নির্ধারণ, রাজ্যশিক্ষা-আইনের ভিত্তিতে উপ-আইন নির্ধারণ, বিদ্যালয়গৃহ ও আসবাবের ব্যবস্থাপনা, ছাত্রকল্যাণব্যবস্থা সংগঠন, পাঠ্যক্রম প্রস্তুতি, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন, শিক্ষাপ্রসার, আঞ্চলিক শিক্ষাপরিকল্পনা-প্রণয়ন, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, শিক্ষক-বেতনের ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক শিক্ষাকর সংগ্রহ। অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দ্বিখণ্ডিত অথবা খর্বিত নয়, অর্থাৎ **অঞ্চলের মধ্যে সকল স্তর ও সকল রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেই শিক্ষাকর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারেন।** কোন কোন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবাজেট তৈরীর ব্যাপারেও স্বয়ম্ভর; অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সামগ্রিক পৌর-প্রশাসনের নিকট দায়ী। তবে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন খাতে করধার্যের ব্যবস্থা আছে। বস্তুত, অঞ্চলভেদে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার মাত্র ১ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করেন, রাজ্যসরকার বহন করেন অঞ্চল ভেদে ১৭ থেকে ৩০ শতাংশ, আর অঞ্চলকর্তৃপক্ষ বহন করেন ৬৫ থেকে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত। এজন্যই আমেরিকায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রশাসন অত্যন্ত শক্তিশালী।

ফেডারেল রাষ্ট্র বলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রশাসন রয়েছে তিন স্তরে। রাজ্যকর্তৃপক্ষই সাংবিধানিকভাবে দায়ী, কিন্তু কেন্দ্র ও অঞ্চলকর্তৃপক্ষ

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিন স্তরের সহযোগিতায় বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে প্রশাসন পরিচালিত : শিক্ষাবোর্ড নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ অভিমত স্থাপন করেন। সেই অনুসারে নীতি নির্ধারণ করেন বোর্ডের সভ্য শিক্ষাবিদগণ এবং নীতি রূপায়িত করেন বিশেষজ্ঞ ও আমলাগণ। এক্ষেত্রেও ত্রয়ীসংযোগ ঘটে।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার অধিকার লাভ করেছে। তাই সমগ্র আমেরিকায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা। **আমেরিকাকে সেইজন্যই বলা হয় "শিক্ষার গবেষণাগার"।**

কিন্তু এক-কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রশাসন না থাকলেও, কিংবা রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট স্বাধিকার ভোগ করলেও এমন ধারনার অবকাশ নেই যে আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য নেই। **শিক্ষাক্ষেত্রে ৪টি মৌল উপাদান আজ সর্বজনস্বীকৃত।** এই উপাদানগুলি হলো **প্রয়োজনবাদ** (essentialism), **শিশুকেন্দ্রিকতা, প্রগতিবাদ এবং সমাজ-কেন্দ্রিকতা।** সমগ্র আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা আজ **দুইটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।** এই ভিত্তি হলো **শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিক ও নাগরিকতার উন্নয়ন এবং শিক্ষায় সমসুযোগ।**

ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থা

এইবার আমরা নীচের ডায়গ্রামের সাহায্যে ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থাটি বুঝবার চেষ্টা করব।

(১) ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থার **সর্বনিম্নে রয়েছে ম্যাটার্ণাল স্কুল এবং ইনফ্যাণ্ট ক্লাস।** এগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু যোগ্য এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উদারভাবে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মসংগঠন এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই সব প্রতিষ্ঠান মূলতঃ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন মেনে নিতে হয়। নার্সারীর সমকক্ষ এইসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে আছে শারীর শিক্ষা, খেলাধূলো, সঙ্গীত'

অঙ্কন, হাতের কাজ, বস্তু-নিরীক্ষণ, নৈতিক শিক্ষা। শেষ বছরটিতে কিছু কিছু লেখাপড়ার সূচনা হয়ে থাকে। ম্যাটার্ণাল স্কুল এবং ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ছাত্র-ভর্তি ক্রমবর্দ্ধমান। এই স্তরের শিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।
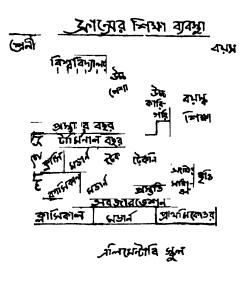
(২) বিদ্যালয়ের পড়া সুরু হয় ৬ বছর বয়সে। ছয় থেকে এগার বছর পর্যন্ত সকলের জন্য একই ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা। এই সময়টিকে আবার তিনভাগে ভাগ করে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়—(ক) ৬—৭ বছরে প্রস্তুতি কোর্স, (খ) ৭—৯ বছরে এলিমেণ্টারী কোর্স, (গ) ৯—১১ বছরে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে আছে ফরাসী ভাষা, নাগরিক ও নৈতিক শিক্ষা, লেখা পড়া গণিত, ফ্রান্সের ইতিহাস ও ভূগোল, বস্তুপাঠ, মৌলিক বিজ্ঞান, অংকন-সঙ্গীত-হস্তশিল্প এবং শারীর শিক্ষা। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁদের সাধারণ সংস্কৃতি—(general culture) সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাই শিশুকে সবকিছু পড়াবার বদলে "যে জিনিষ সম্পর্কে কোনভাবেই অজ্ঞ থাকা যায় না, তেমন শিক্ষা দিয়ে শিশুকে পুষ্ট করা করা উচিত," এই অভিমতই গৃহীত। সহপাঠ্যক্রমিক কাজ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতিও এই স্তরে আবশ্যিক প্রোগ্রাম। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের ভিত্তিতে শিক্ষকের অভিমত অনুসারে বাৎসরিক প্রমোশন হয়।

প্রাথমিক পাঠের শেষে বিদ্যালয়ের রিপোর্ট, শিক্ষকের মন্তব্য এবং একটি ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুরা মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

(৩) **মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় দুইটি উদ্দেশ্য**—(ক) সাধারণ শিক্ষায় ছাত্রদের তৈরী করা যেন তারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়, এবং (খ) বিশেষজ্ঞের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। সুতরাং যুক্তিশীল চিন্তা, বাচন এবং লেখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে ১১—১৩ বছরের সময়টিকে পর্যবেক্ষণ চক্র (cycle of observation) বলে ধরা হয়। এই সময়ে ছাত্রদের প্রবণতা এবং সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয়। ঐ সময়ের শেষে শিক্ষক-মণ্ডলীর সুপারিশ অনুসারে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ পড়ার বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে প্রস্তুতি পাঠও দেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষণ স্তরের উর্ধ্বে ছাত্রদের কয়েকটি পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। ছবিতে দেখ 'প্রাথমিকোত্তর' কথাটির উপরে দুটি ছোট ঘর রয়েছে। (ক) যে সব ছাত্রছাত্রীরা এখনই **বৃত্তি শিক্ষায়** যাওয়া উচিত বলে বিবেচিত হবে তাদের জন্য এই স্তরে রয়েছে কৃষি, গৃহবিজ্ঞান, হস্ত ও কুটির শিল্প শিক্ষার পথে শিক্ষা সমাপ্তির ব্যবস্থা। তিন বছর পড়ার শেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী পাঠ সমাপ্তির ডিপ্লোমা লাভ করে। (খ) এরই পাশাপাশি রয়েছে **সংক্ষিপ্ত সাধারণ শিক্ষার** ব্যবস্থা। এক্ষেত্রেও তিন বছর পড়ার শেষে সাধারণ শিক্ষার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের বয়স তখন ১৬ বছর। ফ্রান্সে এই বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

(গ) এবারে ছবির বাঁদিকে দেখ। **দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার** মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি পর্যায়, (১) প্রথম দুই বছরের পর্যায়ে তিন ধরনের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে—গ্রীক ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ক্ল্যাসিকাল, ল্যাটিন ভাষার ভিত্তিতে ক্ল্যাসিকাল, ফরাসী ও আধুনিক ভাষার পাঠ্যক্রম।

পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থাপনায় সাতটি ভিন্নধর্মী প্রবাহ। সর্বশেষ বছরে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রটি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। দর্শন, ফলিত বিজ্ঞান, গণিত, কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান—এই পাঁচটি শাখায়

ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রান্তে হয় 'baccalaureat' পরীক্ষা। ছেলেমেয়েদের বয়স তখন ১৭।১৮ বছর। এই শেষ পরীক্ষাটি দুই অংশে (পার্ট ১, পার্ট ২) গ্রহণ করা হয়। বাকাল-রিয়েট সার্টিফিকেটই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে রয়েছে গ্রীক, ল্যাটিন, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, নীতি শাস্ত্র, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠ।

এবারে ছবির মধ্য অংশটি দেখ। এখানে রয়েছে **কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা**। পর্যবেক্ষণ স্তরের শেষে ১৪-১৭ বছরের জন্য আছে সংক্ষিপ্ত কারিগরি শিক্ষা। দীর্ঘতর কারিগরি শিক্ষা চলে পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল ধরে। এবং এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটও পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সমমূল্যসম্পন্ন।

ফ্রান্সের পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম লাইসী (Lycee)। লাইসী রয়েছে প্রধানতঃ তিন ধরণের—Classical Lycee, Modern Lycee, Technical Lycee. সবগুলিই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমপর্যায়ভুক্ত।

(ঘ) পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে তিনটি পথ খোলা থাকে। (১) গ্র্যাণ্ড স্কুলে প্রবেশ করা। গ্র্যাণ্ড স্কুল ব্যবস্থাটি ফ্রান্সের এক বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের স্কুল থেকেই উচ্চপদস্থ সমস্ত কর্মচারী সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় এই স্কুলে ভর্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই স্কুলে ঢুকতে হয়। এই পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবেও এক বছরের প্রস্তুতি-পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। (২) **টেকনিক্যাল লাইসীর মধ্য দিয়ে বাকালরিয়েট পাশের পরে উচ্চতর কারিগরি** শিক্ষায় প্রবেশ করা চলে। (৩) **বিশ্ববিদ্যালয়** কিম্বা সমমর্যাদাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা চলে। বিভিন্ন ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকাল ৪ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফ্রান্সর উচ্চ শিক্ষায় এখনও দরিদ্রের স্থান বিশেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৭ জন কৃষি ও শ্রমজীবি পরিবারের সন্তান। তাছাড়া গ্র্যাণ্ড স্কুলগুলিও শ্রেণীবৈষম্য এবং বিশেষ সুবিধের ক্ষেত্র।

উন্নাসিকতাই এখানকার প্রকৃতি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলন ফ্রান্সে খুবই তীব্র। সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের এটিই অন্যতম কারণ।

ফরাসী শিক্ষা প্রশাসন মূলতঃ কেন্দ্রীকৃত। প্রশাসনের শীর্ষে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রীদপ্তরই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৬টি এ্যাকাডেমির (প্রশাসনিক বিভাগ) প্রতিটিতে আছেন এ্যাকাডেমি রেক্টর। তাঁর এলাকার মধ্যে তিনিই পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা প্রশাসক; অবশ্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দায়ী। কিন্তু আরও নীচের দিকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার অভাব রয়েছে। বস্তুতঃ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা খুবই নগণ্য। তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষা-প্রশাসনের জন্যও ফ্রান্সে চলেছে শিক্ষা আন্দোলন।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্প্রতি কালের মধ্যে ১৯৫৮ সনে রাশিয়াতে হয়েছে একদফা শিক্ষা সংস্কার। কিন্তু অতি সম্প্রতি ১৯৬৪ সনে আবার আর একদফা সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সংস্কার পর্ব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ নূতন রূপ এবং ফলশ্রুতি বিচারের সময় এখনও হয়নি বলে আমরা ১৯৫৮ সনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটি সামনে ধরেই আলোচনায় অগ্রসর হবো, এবং যেসব ক্ষেত্রে সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলির উল্লেখ করব। এবার তোমরা নীচের ডায়গ্রামটি দেখ।

(১) সোভিয়েট রাশিয়ায় মায়েরা ব্যাপকভাবে কৃষি, কল-কারখানা ও অফিসে কাজ করেন। তাই সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিয়োগ-কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রীয় নীতি, নির্দেশ এবং পরিদর্শন এখানে সুবিন্যস্ত। কলকারখানার সঙ্গে **ক্রেস ব্যবস্থা** ব্যাপকভাবে সংগঠিত।

শিশুরা একটু সক্ষম হয়ে উঠলেই তাদের জন্য রয়েছে **প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—নার্সারী স্কুল কিম্বা কিণ্ডার গার্টেনে।** অবশ্য রাশিয়াতে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রক্ষিত হয়না। স্বাস্থ্য, আচার আচরণ, সুস্থ মনোভাব গঠন, সমাজপ্রীতি ও মানবপ্রীতি সঞ্চারই এই শিক্ষার লক্ষ্য। তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে লেখা-পড়া গণিতের

অনুশীলনও আরম্ভ হয়। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়ীত্ব নিয়োগ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বলে অবৈতনিক ভাবেই সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

(২) ৭ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময়টি প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। এই স্তরে কোন বৈষম্যই বিবেচনা করা হয়না। সমগ্র রাশিয়ায় সকল শিশুর সমসুযোগের ভিত্তিতে একই রকমের বিদ্যালয় প্রচলিত। পাঠ্য-ক্রমও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর ঠিক করে দেন। ভাল-ভাবে পড়ার দক্ষতা অর্জন করা, লেখার ক্ষমতা অর্জন করা, স্থানীয় ভূগোল ও সমাজ-বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, খেলাধূলা এবং হাতের কাজই প্রাথমিক পাঠ্য-ক্রমে স্থান অধিকার করেছে। রাশিয়ায় সকল শিক্ষাস্তরেই যৌথ জীবন যাপনের শিক্ষা একটি বিশেষ দিক। প্রাথমিক স্তরেও ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠন এবং সহযোগিতামূলক কর্মোদ্যমের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা করা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ছাত্রদের।

রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা

শ্রেণী — বয়স

স্নাতকোত্তর

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক

টেকনিকাম

সান্ধ্য মাধ্যমিক

নিম্ন মাধ্যমিক

প্রাথমিক স্কুল

কিণ্ডারগার্টেন

ক্রেস

চারবছর প্রাথমিক শিক্ষার শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবে আমাদের দেশের মত নয়। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই ভিত্তিতে শিক্ষকরা ছাত্রদের সাহায্য

করেন। পরীক্ষার সময়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। পরীক্ষার পথে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

(৩) **মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়** (জুনিয়র মাধ্যমিক স্তর) আগে ছিল ৩ বছরের। ১৯৫৮ সনে এই স্তরটিকে চার বছরের করা হয়। ছবিতে চারবছরই দেখানো হয়েছে)। কিন্তু ১৯৬৪ সনে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাধারণত নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলি প্রাথমিক স্কুলের উপরিভাগেই যুক্ত থাকে। (সুতরাং এইসব স্কুলের মোট দৈর্ঘ ৪+৪ (অথবা ৪+৩) বছর। এগুলিকে বলা হয় 7 year (অথবা 8 year) school. এই শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই রাশিয়াতে সর্বাধিক।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে রয়েছে রুশ ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস ও রুশীয় সংবিধান, ভূগোল, রসায়ন, প্রাণী-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বিদেশী ভাষা, অংকন, সঙ্গীত, শারীর শিক্ষা, সামাজিক ও উৎপাদনী হস্তশিল্প। এখনও পর্যন্ত এই স্তরের শেষ অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স পর্যন্তই শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন এবং অবৈতনিক তো বটেই।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে আংশিক সময়ের **সান্ধ্যস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কিম্বা বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা** অনুসরণ করতে পারে। সাফল্যের ভিত্তিতে তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারও অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ তারা **টেকনি-কামে** প্রবেশ করতে পারে। টেকনিকাম প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে আমাদের পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের মত। তৃতীয়তঃ রয়েছে **School for the working or rural youth**, এগুলিতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। চতুর্থতঃ রয়েছে **সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।** এখানে পাঠ্যক্রমে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং উৎপাদনী শ্রম। মনে রাখতে হবে যে উপরোক্ত চারধরনের বিদ্যালয়ই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলে স্বীকৃত।

১৯৫৮ সনে নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার সময় এক বছর বাড়ানোর ফলে

স্কুল শিক্ষার সময় হয়েছিল ১১ বছর। কিন্তু ১৯৬৪ সনে আবার ১০ বছরের স্কীমে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে কাজ হচ্ছে।

মাধ্যমিক শক্ষার সমগ্র সময়টির মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক পাঠের শেষে আছে পরীক্ষা। এই বহিঃপরীক্ষাটি বিশেষ কষ্টসাধ্য।

স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো polytechnisation চেতনা। সামাজিক কর্মপ্রবাহের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো, উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং ক্রমান্বয়ে বয়সানুপাতে উৎপাদনী দক্ষতা অর্জন করা ও উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করাই 'polytechnisation' এর মর্মকথা। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতের কাজ, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ওয়ার্কসপের কাজ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলকারখানা ও কৃষি-খামারের কাজে অংশ গ্রহণকে আবশ্যিক করা হয়েছে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আমাদের কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত Work Experience প্রকল্প বহুলাংশে রুশ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত।)

(৪) যোগ্য ছাত্রছাত্রী সতের বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর স্তর রূপে বিবেচিত। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে নানা ধরনের। ছাত্র ভর্তিও হয় নানা পথ থেকে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, সান্ধ্য-বিদ্যালয়, শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা সূত্র থেকেই ছাত্র আসে। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে দুইটি ভাগ—সকলের জন্য সাধারণ পাঠ্য এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ পাঠ্য। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার পাঠকাল ২+২+১ বছরে বিভক্ত। এর পরে আছে আরও দুবছরের স্নাতকোত্তর কোর্স এবং গবেষণার ক্ষেত্র।

বাছাই করা ছাত্রছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। বৃত্তি ও স্টাইপেণ্ডের প্রাচুর্যের ফলে প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রই বিনা বেতনে পড়তে পায়। তাছাড়া সান্ধ্য ক্লাশ এবং 'Correspondence course' এর ব্যাপক ব্যবস্থাও আছে।

(৫) রাশিয়ার কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই সংগঠিত। মাধ্যমিক স্তরের আংশিক সময়ের স্কুল এবং টেকনিকাম ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন শিল্পের

জন্য নানা ধরনের বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সান্ধ্য ক্লাশ, বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের উচ্চতর প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট।

(৬) রাশিয়ার মৌলিক শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ ও প্রশাসনের দায়িত্ব **মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের**। তবে নীতি নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম প্রস্তুতি এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখনীয়।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রাজ্য ভিত্তিতে শিক্ষা প্রশাসনের অধিকার সংবিধান অনুসারে এর উপরই ন্যস্ত। এর নীচে রয়েছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক কমিটির ভূমিকা। সাধারণভাবে রাশিয়ার শিক্ষা প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সমগ্র দেশে এককেন্দ্রিক কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত বলে শিক্ষা প্রশাসনও এককেন্দ্রিক রূপে পরিচিত।

পশ্চিম জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থা

জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের আলোচ্য সূচীর অন্তর্গত। কিন্তু জার্মানী বলতে এখন যে দুই জার্মানী সে কথাও মনে রাখতে হবে। সুতরাং যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদনের স্বার্থে আমাদের দুইটি ব্যবস্থাই আলোচনার বিষয়। পশ্চিম জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নীচের ডায়গ্রামটি দেখ।

(১) এখানেও **সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে ক্রেস, নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডার গার্টেন**। কিণ্ডার গার্টেনে প্রধানতঃ ৬ বছর বয়সের শিশুরাই পড়ে। তবে কোন রাজ্যেই এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তা ছাড়া কেবল পশ্চিম বার্লিন ছাড়া এই শিক্ষাকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও ধরা হয় না। ৩—৬ বৎসরের শিশুদের জন্যও এক ধরনের কিণ্ডারগার্টেন আছে। সেগুলি সাধারণত: শ্রমিক মায়েদের সন্তানের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন কিম্বা ধর্ম সংগঠন দ্বারাই পরিচালিত।

(২) পশ্চিম জার্মানীতে **পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ বিভিন্ন রাজ্যে ৮ কিম্বা ৯ বছর**। এই সময়টি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম চারবছরকে বলা হয় বুনিয়াদি বিদ্যালয় (Grund schule)। উচ্চ প্রাথমিক স্তর ৩ কিম্বা ৪ বছরের। কোন কোন সহরে এই স্তরকে উচ্চ প্রাথমিক ব্যবহারিক

বিভাগও (practical branch) বলা হয়। এই স্তরের শেষেই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাকাল শেষ। প্রকৃতপক্ষে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ৮ বছরের প্রাথমিক স্কুলই পশ্চিম জার্মানীর গণবিদ্যালয়, এবং দরিদ্রের স্কুল, কারণ ৮০ ভাগ শিশুই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র।

পশ্চিম জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থা

শ্রেণী — বয়স

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা

ক্লাসিক্যাল জিমনাসিয়াম

আধা-ক্লাসিক্যাল জিমনাসিয়াম

আধুনিক জিমনাসিয়াম

ব্যবসা স্কুল

কারিগরি স্কুল

মধ্যস্কুল (মিটেল)

ব্যাক স্কুল (কারিগরি)

বেরুফ স্কুল (কারিগরি)

উচ্চ প্রাথমিক

প্রাথমিক

ক্রেশ, নার্সারী, কে-জি,

(৩) অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানরা পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার পরেই এরা প্রবেশ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় Gymnasium এ। পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্য অনুসারে জিমনাসিয়াম আছে তিন ধরনের—ক্লাসিক্যাল, আধা-ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক। প্রথমটিতে প্রাচীন ভাষা ও তত্ত্বমূলক পাঠের আধিপত্য, দ্বিতীয়টিতে প্রাচীনতা এবং আধুনিক গণিত বিজ্ঞানের মিশ্রণ, তৃতীয়টিতে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাষা, গণিত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আধিপত্য রয়েছে। তিন ধরনের স্কুলের দৈর্ঘ্যই ৯ বৎসর। তিন স্কুল থেকে ছাত্ররা আবিটুর (Abitur) পরীক্ষা দেয়। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে তিনটির মর্যাদা সমান। তবে বাস্তব বিচারে ক্লাসিক্যাল জিমনাসিয়ামের সামাজিক মূল্য এখনও অনেক বেশী।

এখানে প্রাথমিকোত্তর স্তরে রয়েছে আর এক ধরণের স্কুল—মধ্যস্কুল। এই স্কুলেও ঢুকতে হয় প্রাথমিক শিক্ষার পরে। স্কুলের দৈর্ঘ ছয় বছর। সুতরাং এগুলি ৪+৬=১০ বছরের স্কুল। সুতরাং এগুলি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক

স্কুল নয়। তবে মাধ্যমিক স্তরেই একে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সহরাঞ্চলে এইসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি বিশেষ ধরণের স্কুল আছে। (ক) এদের মধ্যে অন্যতম হলো Aufbauschulen. দেরীতে যাদের মানসিক বিকাশ ঘটে, তাদের জন্য এই স্কুল। এখানে ভর্তি হয় সরাসরি সপ্তম শ্রেণীতে এবং তার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ দৈর্ঘকাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জীবন।

(খ) মেয়েদের স্কুল Frauen schule. মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুল Lyzeum এ ১০ বছর পড়ার পরে ১১— ৩ বছর অতিবাহিত হয় এই স্কুলে। তত্ত্বমূলক এবং বিজ্ঞানমূলক বিষয়ের সঙ্গে শিল্প, গৃহবিজ্ঞান বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় পাঠ্যক্রম।

(গ) আর আছে Economic High school, আমাদের অনেক "কমার্সিয়াল কলেজের" মত। ১০ বছর মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ১১—১৩ বছরের বিশেষ পাঠের জন্য এই স্কুলে পড়া যায়।

(৪) জার্মানির কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ সংগঠিত। বাধ্যতামূলক শিক্ষাবয়সের উর্দ্ধে ৮০ ভাগ তরুণই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কিন্তু এদের জন্যও বাধ্যতামূলক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। (ক) এক ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া সকলেই আংশিক সময়ের Continuation শিক্ষার জন্য প্রবেশ করে Berufschuleতে। কিছু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষার (তত্ত্ব ও প্রয়োগ) সমন্বয়ে ১৫—১৮ বছরের জন্য তিন বছরের শিক্ষা দেওয়া হয় এই স্কুলে। (খ) অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ পূর্ণ সময়ের বৃত্তি শিক্ষাস্কুল Berufsfachschulen তে ভর্তি হয়। এখানে এক থেকে তিন বছরের পাঠ্যক্রম প্রচলিত। (গ) আর আছে পূর্ণ সময়ের জন্য advanced টেকনিকাল স্কুল Fach schule। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের দেওয়া হয় Master of Trade সার্টিফিকেট। এইসব ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবেশ করতে পারে। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দ্বার।

(৫) উচ্চ শিক্ষার স্তরে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Hochschulen)। উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া, বিশেষজ্ঞ তৈরী করা

এবং গবেষণা সংগঠন ও পরিচালন করাই এদের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বৎসর কোর্সের পরে একটি মাত্র ডিগ্রী আছে—ডক্টরেট।

পূর্ব জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থা

দুই জার্মানীকে নিয়েই একদা গঠিত ছিল পূর্ণাঙ্গ জার্মানী। তাই অতীতের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে উভয় অংশে অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এখন দুই জার্মানীতে পৃথক রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা এবং ভাবাদর্শ। তাই বৈসাদৃশ্যও আছে অনেক। এবারে পূর্ব জার্মানীর ছবিটি দেখ।

(১) পূর্ব জার্মানীতে **নার্সারী বিদ্যালয় খুব সংগঠিত এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ রূপে স্বীকৃত।** কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যাও অনেক। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু **১-২ বছরের ক্রেস, ২-৪ বছরের নার্সারী, ৪-৬ বছরের কিণ্ডারগার্টেন** শিক্ষা দিয়েই জীবন আরম্ভ হয়।
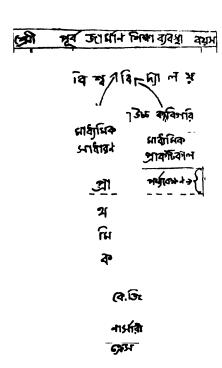
(২) **৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত একটানা প্রাথমিক শিক্ষা।** স্কুলের নাম বুনিয়াদি বিদ্যালয় (Grund schule)। সকল ছাত্রের জন্যই এক ধরনের স্কুল এবং পাঠ্যক্রম। এই স্তর পর্যন্তই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা। শেষ দুইটি বছরকে ধরা হয় পর্যবেক্ষণ স্তর হিসেবে। এই সময়ে ছাত্রের প্রবণতা এবং সম্ভাবনার ইঙ্গিত অবলম্বন করেই পরবর্তী শিক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়। পর্যবেক্ষণ করেন শিক্ষকরা।

(৩) ১৪ থেকে ১৭ কিম্বা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়। এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম প্রচলিত।

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিভাগে আছে ৩ বছরের আংশিক অথবা পূর্ণ সময়ের বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা। এখান থেকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্ররা উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারে।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষার এ্যাকাডেমিক বিভাগে আছে ৪ বছরের পাঠ্যক্রম (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানীর মত তিন ধরনের জিমনাসিয়াম রয়েছে। জিমনাসিয়াম থেকে ১৬ বছর বয়সে মধ্যস্কুলে যাওয়া যায়। সব ধরনের জিমনাসিয়ামই Abitur পরীক্ষার জন্য (১৮ বছরে) ছাত্রদের তৈরী করে।

(গ) পূর্ব জার্মানীতেও পশ্চিম জার্মানীর মত দশ বছরের পৃথক মধ্যস্কুল (Intermediate) আছে। এই দশ বছর শিক্ষার পরে ব্যবহারিক বৃত্তি শিক্ষা, পূর্ণ সময়ের কারিগরি শিক্ষা কিম্বা শিক্ষানবিশিতে যাওয়া চলে।

(৪) কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা তো মাধ্যমিক স্তরের প্র্যাকটিকাল বিভাগেই হয়। তা ছাড়া আছে Continuation শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(৫) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব জার্মানীতেও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা ধরনের Hochschule. কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে যেমন শুধু জিমনাসিয়াম এবং Master of Trade এর পথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছা যায়, পূর্ব জার্মানীতে তা নয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি বিদ্যালয় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সুতরাং পূর্ব জার্মানীতে শিক্ষার বৃত্তি প্রবণতা এবং সমসুযোগ অনেক বেশী প্রসারিত।

আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা শেষ হচ্ছে। কয়েকটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমরা পেয়েছ। এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যও নিশ্চয় তোমরা অনুধাবন কর। এখন এইসব ব্যবস্থার ছবিগুলির সঙ্গে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার ছবি মিলিয়েই বুঝতে পারবে যে আমরা বিদেশী ভাবধারা এবং অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি

স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জাতীয় আশা-আকাংক্ষা রূপায়নের দাবী স্বভাবতঃই মুখর হয়ে উঠলো। সকল স্তরের শিক্ষা প্রসার হলো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গণতন্ত্রসম্মত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হলো ততোধিক। তদুপরি উন্নত কৃষি এবং দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা হলো অবধারিত। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গরূপে সকল স্তরে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হলো।

প্রাক প্রাথমিক স্তর

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ইংরেজ আমলেও সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না, তবে উৎসাহদানের নীতি ছিল। স্বাধীন ভারতেও এ বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব কিংবা এই স্তরে আবশ্যিক শিক্ষানীতি এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। তবে উৎসাহদানের নীতিকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করা হয়েছে। এই স্তরে সরকারী অনুমোদিত বিদ্যালয়ে সাহায্যদানের নীতিও গৃহীত হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে যেখানে অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৩০৩টি, সেখানে তিনটি পরিকল্পনাকালের পরে ১৯৬৪ সনে সংখ্যা হয়েছে ২৫০২টি। প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা অতি নগণ্য। তদুপরি অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বিভিন্ন বেসকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত। শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে এই ক্ষেত্রে উদ্যোগী করবার জন্যে কোন আইনও এখন পর্যন্ত পাশ হয় নি।

উল্লেখযোগ্য যে অনুমোদিত বিদ্যালয়ের চেয়ে অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। এর অধিকাংশই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে পরিচালিত নয়। বস্তুতঃ এই ধরনের বহু বিদ্যালয়ই কলঙ্কের মত। **তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাশ করে বিধিবিধান নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন** এবং গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষা প্রসারের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পাঠশালা ও মক্তবের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল। সন্দেহাতীত দৈন্যদশা সত্ত্বেও এই অগণিত স্কুলের মধ্যেই ছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীগণও সেই ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেন নি। কিন্তু **ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই এই ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হলো।** প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের যুগে মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলা দেশের সমীক্ষায় সম্ভাবনাপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, এবং রেভাঃ এ্যাডামের জোরালো সুপারিশ সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার নীতি এবং "চুঁইয়ে পড়ার নীতি" গৃহীত হলো। তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দেরও এ বিষয়ে দৃষ্টিস্বচ্ছতা ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। কেবল বোম্বাইতে মহাত্মা ফুলে কিছু একক প্রচেষ্টা করে গেলেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপ নীতি সত্ত্বেও স্থানীয় পরিবেশকে অস্বীকার করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলির ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম অগ্রগতি ঘটে। উত্তর প্রদেশে গৃহীত নীতি বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে। কেন্দ্রীয় সরকারও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। **নীতিগত পরিবর্তন সূচিত হলো লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় থেকে।** লর্ড ডালহৌসি এই নূতন নীতিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় চেতনাতেও এসেছে নতুনত্ব। ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে দেশীয় নেতৃবৃন্দও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। সরকারী নীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বিধৃত হয় উড্ দলিলে। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ ও সাহায্য দানের নীতি গৃহীত হয়। ষ্ট্যানলি-র দলিল এই নীতিকে আরও শক্তিশালী করে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় পোষণের জন্য শিক্ষা সেস্ প্রস্তাবিত হয়।

বিমাতৃসুলভ সরকারী মনোভাব সত্ত্বেও ১৮৫৪ সনের উত্তরকালে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। হাণ্টার কমিশন এই সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করেন। (এই সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) হাণ্টার কমিশনের পরবর্তী কালে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও নিঃসন্দেহে এই সময় থেকেই আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় চেতনাও প্রসারিত হয়। সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় বরোদা রাজ্যে ১৯০৬ সনে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রাথমিক শিক্ষা চেতনাকেও একধাপ অগ্রসর করে নেয়। জাতীয় আকাংক্ষা প্রতিফলিত হয় গোখেল বিল-এ।

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতিও হয় ইতিবাচক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে নিয়ন্ত্রণ-নীতি সত্ত্বেও লর্ড কার্জন প্রাথমিক স্তরে প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক কালীন ঘোষণাও নূতন মনোভাবের পরিচায়ক। এই মনোভাব নীতিগত ভাবে ঘোষিত হয় ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে।

১৯১৯ থেকে ১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। এই প্রাদেশিক আইনগুলির মৌলিক চরিত্র সর্বত্রই মোটামুটি একরকম। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর। প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নাগরিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষা সেস্ এবং সরকারী পরিপূরক সাহায্য প্রস্তাব করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনের সমীক্ষার কথা বলা হয়। ৬ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রস্তাব করা হয়। প্রথমাবস্থায় বাধ্যতা সীমাবদ্ধ থাকে মূলতঃ সহরাঞ্চলে এবং বালকদের মধ্যে। ক্রমে সংশোধনী আইনের সাহায্যে বালিকা এবং গ্রামাঞ্চলকেও বাধ্যতার আওতায় আনা হয়। **১৯১৯ সনের শাসনসংস্কার এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।**

প্রাদেশিক আইন সমূহের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। হার্টগ কমিটি মানোন্নয়নের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও প্রসারের গতি অব্যাহত থাকে। এই কমিটি অবশ্য **অপচয় ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে এবং**

পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করেন। অপর দিকে নূতন জাতীয় চেতনা প্রতিফলিত হয় ১৯৩৭ সনে ঘোষিত বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রকল্পে। সেই সময় থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত নানা সমীক্ষা ও আলোচনার ফলে বুনিয়াদি প্রকল্পটি পূর্ণাবয়ব লাভ করে।

গান্ধিজীর প্রভাব

শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব অবদানের কথা আলোচনা না করে পারা যায় না। এ সূত্রে উল্লেখ করতে হয় গান্ধিজীর কথা। **গান্ধিজীর লক্ষ্য ছিল অহিংসার পদ্ধতিতে শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সমসুযোগসম্পন্ন এক সমাজ ব্যবস্থা।** তাঁর মতে স্বরাজ অর্থ সর্বোদয় অর্থাৎ হৃদয়ের পরিবর্তন তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এক রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রে উন্নয়ন। **সর্বোদয় পরিকল্পনার অংশরূপেই** তিনি ইংরেজী পরিত্যাগ করে, কর্মকেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন করে ৭ বছরের সর্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পরিকল্পনা করেন।

গান্ধিজীর শিক্ষাতত্ত্বে মূল আদর্শ হলো শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। অন্তরীণ সংঘাত জয় করতে পারলেই সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব। সুসমঞ্জস ব্যক্তিরাই গড়তে পারে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ। সুতরাং ভবিষ্যত সুন্দর সমাজের জন্য প্রয়োজন রয়েছে শোষণ-বিরোধিতা, অহিংসা, ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও সহযোগিতার মন্ত্রে দীক্ষিত নাগরিকের। **বুনিয়াদি শিক্ষা এই রকম মানুষ তৈরীর শিক্ষা।**

বুনিয়াদি শিক্ষা হলো জীবনের মাধ্যমে, সামাজিক মূল্যসম্পন্ন উৎপাদনী সৃজনীকর্মের মাধ্যমে জীবনের জন্য শিক্ষা। প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক শিল্প-কাজ বুদ্ধি ও কর্মশক্তির ব্যবধান দূর করে, কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করার মনোভাব দূর করে, শোষণের পথরোধ করে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হবে। "উৎপাদনী কর্ম" শিক্ষার ক্ষেত্রেও হবে উৎপাদনী।

গান্ধিজী গণ-শিক্ষার পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। তিনি শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের অন্তরীণ দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্মশক্তিকে

প্রকাশ করা। সুতরাং সাক্ষরতাই সব নয়, সাক্ষরতা প্রকৃত শিক্ষার সূচনা মাত্র। তিনি জ্ঞানের বোঝার উপর মূল্য আরোপ করেন নি। অভিজ্ঞতা এবং নিরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদ্যালয় হবে কাজ, গবেষণা ও আবিষ্কারের স্থান। বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আসবে সামাজিক দায়িত্ব এবং নাগরিকতা বোধ। শিক্ষা হবে জাতির ভাবমানসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে হৃদয়শুদ্ধি, চরিত্রগঠন, ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য অর্জন। এ শিক্ষা হবে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির শিক্ষা, তথা জীবনের শিক্ষা।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা

"হরিজন" পত্রিকায় ১৯৩৭ সনে বুনিয়াদি পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর **নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে** মাতৃভাষার মাধ্যমে, কায়িক শ্রমমূলক উৎপাদন-কেন্দ্রিক, স্বয়ংনির্ভর, ৭ বছরের সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা বিচার করা হয়। তদুপরি **ডাঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষা কমিটির** ইতিবাচক রিপোর্ট ১৯৩৮ সনের হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘোষণা করা হয় যে **পরিবেশকে অনুধাবন করার মত জ্ঞান এবং জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হবে বুনিয়াদি শিক্ষা।**

এর স্বল্প পরেই বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আরও সমীক্ষার জন্য কমিটি গঠিত হয় বি, জি, খের'এর নেতৃত্বে। **খেরকমিটি** সুপারিশ করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে ৬-১৪ বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে এই শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক এবং এর প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক গ্রামাঞ্চলে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠান্তে ইচ্ছুক শিশুরা অন্যান্য ধরণের বিদ্যালয়ে যোগ দেবার অধিকার পাবে। কমিটি প্রস্তাব করেন যে বুনিয়াদি শিক্ষাকালকে ৫ বছরের নিম্ন বুনিয়াদি এবং ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। তদুপরি ৫ বছরের প্রাথমিকোত্তর পাঠের সুপারিশও করা হয়, যেন উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা শিল্প বাণিজ্যে যোগদানের জন্য ছাত্ররা তৈরী হতে পারে।

১৯৩৯ সনে পুনা সম্মেলনে এবং **১৯৪১ সনের জামিয়া নগর সম্মেলনে** বুনিয়াদি শিক্ষার রূপরেখাকে আর একটু উন্নত করা হয়। পরিশেষে

১৯৪৫ সনে ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা ও গণ-শিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি **পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।** কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে ঘোষণা করা হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত কার্যে রূপায়িত হলো সামান্য। **স্বাধীন ভারতের জন্যই প্রশ্নটি গচ্ছিত রইল।**

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৬০ সনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সংবিধানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তা ছাড়া বুনিয়াদি পদ্ধতিকেই জাতীয় পদ্ধতি রূপে ঘোষণা করা হয় এবং চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও বুনিয়াদি ধাঁচে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ বাস্তবে আজও রূপায়িত হয় নি। তবে তিনটি পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সাহায্যে অগ্রগতি হয়েছে নিঃসন্দেহে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত

১৮৩৫ সনে রেভাঃ এ্যাডাম প্রাথমিক শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব না করলেও **প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। বোম্বাইতে মহাত্মা ফুলে সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যেও এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তারপরে ১৮৫২ সনে বোম্বাইয়ের রাজস্ব সমীক্ষা কমিশনার Capt. Wingate কৃষিজীবিগণের সন্তানদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সনে গুজরাটের স্কুলপরিদর্শক T. C. Hope করপোষিত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

১৮৮২ সন থেকে বিষয়টি পরিচ্ছন্নভাবে আসতে থাকে। হাণ্টার কমিশনের নিকট এই সম্পর্কে বহু প্রস্তাব এবং আবেদন পেশ করা হয়। ১৮৮৪ সনে ব্রোচ-এর সহকারী পরিদর্শক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করে। বোম্বাইতে চিমনলাল শীতলবাদ এবং ইব্রাহিম রহমতুল্লা এই সম্পর্কে

কিঞ্চিৎ আন্দোলন সংগঠন করেন। ১৯০৬ সনে বরোদা রাজ্যে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯১০-১১ সনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় গোখেল বিল উপস্থাপিত হয়। কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশন এবং মুসলীম লীগের নাগপুর অধিবেশনেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী উত্থিত হয়। তারপর ১৯১৮ সনে সর্বপ্রথম বোম্বাইতে প্যাটেল আইন পাশ হয়। স্বল্পকালের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশেও আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ঐসব আইনের পরিবর্ধন ও সংশোধনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং সীমায়িত প্রচেষ্টা হয়েছে।

তবুও ১৯৪৭ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র ভারতের মধ্যে ছিল মাত্র ১২৯টি সহর ও ১০৯০টি গ্রামে। ১৯৪৮ সনে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে দ্রুত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী উত্থিত হয়। ১৯৫০ সনে দশ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাংবিধানিক নির্দেশ গৃহীত হয়। তবুও অগ্রগতি হয় শম্বুক গতিতে ১৯৫২ সনে সমগ্র ভারতে মাত্র ৩৯৬টি সহর এবং ২০২৬টি গ্রামে বাধ্যতার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সনে সংখ্যা দুইটি হয় যথাক্রমে ১০৯৩ এবং ৩৯২৭৬। ঐ সময়ের দশ বৎসর পরেও, এখনও আমরা লক্ষ্যস্থল থেকে অনেক দূরে। তবে আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যে সাংবিধানিক নির্দেশ অপেক্ষাকৃত সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কেরালা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। তা ছাড়া বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে ব্যর্থতার কারণগুলিও প্রণিধানযোগ্য। এ্যাডাম রিপোর্ট অগ্রাহ্য করা এবং চুঁইয়ে-পড়া নীতি গ্রহণের মধ্যে এই ব্যর্থতার বীজ। উত্তরকালে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গরজের অভাব এর দ্বিতীয় কারণ। সরকার কোন দায়িত্ব বোধ করেন নি; তাই আইনও পাশ করেন নি। হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলিও অবহেলিত হয়। বেসরকারী উদ্যমের উপরই অধিক নির্ভরতার নীতি পরিচালিত হয়। তদুপরি যে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকেই অগ্রাধিকার দান করা

প্রয়োজন ছিল, তখনও তথাকথিত মানোন্নয়নের নামে শিক্ষা বিস্তারকেই বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলন তথা শিক্ষাচেতনার দুর্বলতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মোহগ্রস্ততা জাতীয় প্রচেষ্টাকেও পঙ্গু করে রেখেছিল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে রচিত হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান। ইংরেজী ভাষার জগদ্দল পাথরও ছিল অন্তরায় হয়ে। কিন্তু জাতীয় চেতনা যখন জাগ্রত হলো তখন অন্তরায় হলো বিদেশী সরকারের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ। বারে বারে কুসংস্কার, ধর্মীয় বাধা, সমাজসচেতনতার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থ-সমস্যার অজুহাতে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার উত্তর কালেও নীতিদৌর্বল্য রয়ে গেছে। এই দুর্বলতাই প্রকাশ পায় শিক্ষা-বাজেটে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে যে ক্ষেত্রে মোট শিক্ষা-বাজেটের ⅓ কিংবা ¼ ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অন্যান্য স্তরে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে প্রাথমিক শিক্ষার বিনিময়ে।

আজও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে হাজার সমস্যা। ভারতের প্রায় ⅓ গ্রামেই বিদ্যালয় নেই। সমস্যা রয়েছে বিদ্যালয় গৃহ, সরঞ্জাম, শিক্ষকসংগ্রহ, শিক্ষণ ও বেতনক্রমের। সমস্যা রয়েছে জীবনমুখী পাঠক্রমের, অপচয় ও বন্ধ্যাত্বের। বয়স্ক শিক্ষার অভাব প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অর্থ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমতালে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচেষ্টা অগ্রসর হতে পারছে না।

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা

তবুও স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য। সংবিধানে মৌলিক-নীতির তালিকায় ৪৫ নম্বর সূত্রে সংবিধান প্রবর্তনের **দশ বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৬০) সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।** তদুপরি **১৪ বৎসর বয়স পর্যন্তই** এই বাধ্যতার মধ্যে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়। এই প্রতিশ্রুতি কার্যক্ষেত্রে এখনও পালিত হয়নি। কিন্তু এই সম্পর্কে

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির। কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভ করবেন। অবশ্য সাংবিধানিক নির্দেশকে রূপায়নের শেষ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এইকথা আবার বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার

প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিকেই সরকারী প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়রূপে গঠন, পুরাতন ধরনের বিদ্যালয়ের উন্নতি এবং বুনিয়াদি ধরনে ক্রমরূপায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিকে প্রথম পদক্ষেপ রূপে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হস্তশিল্পকে আবশ্যিকরূপে প্রয়োগ করা হয়। বুনিয়াদি ধরনের পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষক-শিক্ষণকে সম্পূর্ণই বুনিয়াদি ধরনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সনে একটি সমীক্ষা কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপরূপে স্বীকৃতি দানের এবং সমস্তরের সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদা-দানের সুপারিশ করেন। এই কমিটি সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বুনিয়াদি শিক্ষার সংযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণের সুপারিশও করেন। ঐ বছরেই বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, হস্তশিল্প এবং আবশ্যিক সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য National Institute of Basic Education স্থাপিত হয়।

ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতায় কোন বিশেষ কর্মকে নির্দিষ্ট করে না রেখে সুতাকাটা, বয়ন, বাগানের কাজ, মিস্ত্রীর কাজ, চর্মশিল্প, বই বাঁধাই, মৃৎশিল্প, গৃহশিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মপ্রয়াসকেই গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সঙ্গতি থাকবে। এইসব সিদ্ধান্তের ফলে অধিকাংশ রাজ্যসরকারই বুনিয়াদি ও অবুনিয়াদি পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য সাধন করেছেন এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষার

আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সনে ছিল ৩৩৩৭৯টি, ১৯৫৬-৫৭ সনে ৪২৯৭১টি, ১৯৬০-৬১ সনে ৬৫৮৯১টি, এবং ১৯৬৪ সনে ৭৮৯৩৭টি। সর্বোপরি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে গান্ধিজী কল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ফলপ্রসূ হয় নি এবং সেই রূপটিও কার্যকরী হয় নি। জাতির জীবনে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটতে পারে নি। বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবক্তা ও প্রচারক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকরাও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বুনিয়াদির পরিবর্তে ইংরেজী স্কুলকেই শ্রেয় মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাংবিধানিক নির্দেশ ব্যর্থ হলেও বিগত বিশ বছর সময়ে এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ১৯৪৬-৪৭ সনে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৭৪৯৬৬টি। ৬-১১ বছরের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যেতো শতকরা মাত্র ৩০ জন। এদের মধ্যেও এই স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই পড়া ছেড়ে দিত ৬০ শতাংশ। অপর দিকে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ১৯৫০-৫১ সনে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ২০৯৬৭১ এবং ছাত্র ছিল ঐ বয়সের ৪২·৬ শতাংশ; ১৯৫৫-৫৬ সনে হয় বিদ্যালয় ২৭৮১৩৫ এবং ছাত্র ৫২·১ শতাংশ; ১৯৬০-৬১ সনে বিদ্যালয় ৩৩০৩৯৯ এবং ছাত্র ৬২·৪ শতাংশ; আর ১৯৬৫-৬৬ সনে বিদ্যালয় ৪০৮৯৩০ এর ঊর্ধ্বে এবং ছাত্র ৭৬·৪ শতাংশ। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই স্তরে ৯২·২ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আশা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিকেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল ভারতে মোট ৭৮২টি এবং শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন ৫৮·৮ শতাংশ। ১৯৫৫-৫৬ সনে এই সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৯৩০ এবং ৬০·২ শতাংশ; ১৯৬০-৬১ সনে ১১৩৮ এবং ৬৪·১ শতাংশ; ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৪২৪ এবং ৭৩·৯ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়

হয় প্রথম পরিকল্পনায় ৮৫ কোটী টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৫ কোটী, তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০৯ কোটী এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩.২ কোটী টাকা। অন্ধ্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ করা হয়েছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করা হয়েছে। 'National Institute of Basic Education' বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা পরিকল্পনা করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন একটি সর্বভারতীয় পরিষদ।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

কিন্তু **প্রাথমিক শিক্ষা আজও সমস্যাজর্জরিত**। এই সমস্যাগুলিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত বিভাগে আলোচনা করা চলে। **সামাজিক কারণগুলির মধ্যে** উল্লেখ করা চলে অনুন্নত অঞ্চল ও গোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা এবং রক্ষণশীলতা, পিতামাতার নিরক্ষরতা, বর্ণ-বৈষম্য, কুসংস্কারমূলক সামাজিক আচারবিধি, গ্রামাঞ্চলে যানবাহন ও পথঘাটের অসুবিধা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি। এই সব কারণেই ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত তারতম্য রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতার উত্তরকালে বাস্তহারা সমস্যা এবং বছরে এক শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করা চলে।

শিক্ষাগত কারণও রয়েছে অনেক। বাস্তব জীবনের সঙ্গে প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রচিত হয় নি। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এ শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট হয় নি। তাই পিতামাতা এর আবশ্যিকতা বুঝতে অক্ষম। ছাত্র-কল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতি হয় নি। সরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। এখনও পুরাতন পাঠপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এ-সবের ফলে শ্রেণী পরীক্ষায় **অনুত্তীর্ণতা** এবং **সম্পূর্ণ পাঠ সমাপণের পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করার ফলে অপচয়** হচ্ছে প্রচুর। শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা অত্যন্ত নিম্নস্তরের হওয়ায় তাঁরাও উৎসাহ পাচ্ছেন না। সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাও নিতান্ত দায়সারা এবং আমলাতান্ত্রিক।

বুনিয়াদি শিক্ষাকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার বিতণ্ডা অনেক

দিন পর্যন্ত এর প্রসারের অন্তরায় হয়ে ছিল। তার পর বাধা এলো সাধারণ শিক্ষার সাথে সমমর্যাদা এবং উচ্চতর শিক্ষার সাথে সংযোগের সমস্যা। কর্ম-কেন্দ্রিকতার মূল শিক্ষাগত নীতি থেকে এ শিক্ষা বিচ্যুত হয়েছে, এবং গান্ধিজীর দর্শনও এই শিক্ষায় প্রাণবন্ত রূপ পায় নি। বহু ক্ষেত্রেই স্থানীয় জীবন এবং শিল্পবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংযোগ ঘটে নি। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা অবাস্তব হয়ে উঠেছে। তাই এ শিক্ষার প্রসার হয়েছে মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে। তা ছাড়া প্রকৃত বুনিয়াদি পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকেরও অভাব রয়েছে।

আর্থিক কারণগুলির মধ্যে সর্ব প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী বরাদ্দ হয়েছে নিতান্ত অল্প। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাতেই সরকারী সাহায্য হওয়া উচিত ছিল সবচেয়ে বেশী, সেক্ষেত্রে আনু-পাতিক হারে অপরাপর স্তরের শিক্ষায় বরাদ্দ হয়েছে বেশী। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও সেস্ অথবা ট্যাক্স বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে গড়িমসি করেছেন। বরাদ্দ ব্যয়ের বহুলাংশই গেছে গৃহনির্মাণ এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে। শিক্ষা অবৈতনিক হলেও ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের মধ্যে বই খাতা প্রভৃতির আনুসঙ্গিক ব্যয় বহনের ক্ষমতা দরিদ্র অভিভাবকরা ক্রমেই হারিয়েছেন। সর্বোপরি দারিদ্রপীড়িত সংসারের জন্য শৈশবেই অনেক ছেলেমেয়েকে পিতা-মাতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে উপার্জনের সহায়করূপে দাঁড়াতে হয়েছে।

রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বলা চলে বহুক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-আইন, কিংবা আইন থাকলেও তা দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের অভাব। কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে কর্মচারীদের সন্তানের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয় নি। জিলা স্কুল বোর্ড কিংবা পঞ্চায়েৎ সংগঠনও গণ-তন্ত্রসম্মত নয়। প্রশাসন এবং পরিদর্শন দপ্তর আমলাতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্য।

এই সমস্ত কারণেই সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে এসেছে ব্যর্থতা। ব্যর্থতা সত্বেও আশার কথা এইটুকু যে শিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের সামগ্রিক আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল "ভাগ্যবানদের জন্য শিক্ষার" চেতনা আর নেই। সকলের জন্য "কমন স্কুলের" আদর্শও প্রচারিত হচ্ছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের দায়িত্ব দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

বাংলা দেশের কথা

দক্ষিণ ভারতের তুলনায় বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতকের মিশনারী কর্মোদ্যম পরিমাণগত ভাবে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক ছিল। এ্যাডাম রিপোর্টের চিত্রও ছিল যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক। কিন্তু বাংলা দেশেই ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বাপেক্ষা প্রথম। ঐ সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য। প্রাথমিক শিক্ষা সেই তুলনাতেই অবহেলিত হলো। তবুও ১৮৫৪ সনের পরে সরকারী নীতিতে পরিবর্তন এলো। বিদ্যাসাগর প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রচেষ্টাও সুরু হলো। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় শিক্ষাসেস্ নিয়ে বহু দিন পর্যন্ত বিতর্ক হলো, এবং সেই অনুপাতেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হলো। নূতন ধরনের সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো অল্পই। পুরাতন ধরনের পাঠশালাগুলিই দীর্ঘ দিন আত্মরক্ষার সংগ্রাম করলো।

১৮৮২ সন থেকে যে সংগঠিত প্রয়াস সুরু হলো তার ফলশ্রুতি হলো **১৯১৯ সনের প্রাথমিক শিক্ষা আইন**। এই আইনে সহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হলো। এর পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা-প্রসার পরিকল্পনা,—Biss Scheme। অপরাপর প্রদেশের তুলনায় বিলম্বিত হলেও ১৯৩০ **সনে পাশ করা হলো বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা (গ্রামীণ) আইন**। এই আইনের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হলো। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত জেলা স্কুলবোর্ডও এই আইনেরই অবদান। শিক্ষা সেস্ এবং রাষ্ট্রীয় অনুদানের সাহায্যে এবং জেলা সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়লো এই স্কুলবোর্ডের উপর। বার্ষিক সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ২ কোটি টাকার উপর। শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টাকে সুসংহত ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে স্যার আজিজুল হকের মন্ত্রীত্বকালে নূতন পরিকল্পনাও রচিত হলো। কিন্তু বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে সকল পরিকল্পনাই হলো ব্যর্থ। বস্তুতঃ ১৯১০ সনের আইন এবং ১৯৩০ সনের আইন (১৯৩২-এর সংশোধনীসহ) অবলম্বন করে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচেষ্টা শম্বুক গতিতে অগ্রসর হলো স্বাধীনতা প্রাপ্তি

পর্যন্ত। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্পও বাংলা দেশে বিশেষ দাগ কাটতে পারলো না, কারণ এখানে তখন ছিল অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব।

স্বাধীনতা এলো বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। উদ্বাস্তু সমস্যা শিক্ষা সমস্যাকে তীব্রতর করে তুললো। কিন্তু একদিকে গণআকাংক্ষার চাপ এবং অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সাংবিধানিক নির্দেশের চাপে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে।

বাংলা দেশেও বুনিয়াদি পদ্ধতিকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৯ সনে সিদ্ধান্ত হয় যে পুরাতন ধরনের বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদি ধরনে নব রূপে রূপায়িত করা হবে এবং সরকারী উদ্যোগ অথবা উৎসাহে নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে সম্পূর্ণ বুনিয়াদি ধাঁচে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে থাকবে পাঁচটি শ্রেণী এবং ৪ জন করে শিক্ষক।

প্রথম পরিকল্পনা কালে বাণীপুরে বুনিয়াদি শিক্ষার Intensive Block প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের অধীন রয়েছে একটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ, একটি করে সিনিয়ার ও জুনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ, জনতা কলেজ, ৩২টি নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, সমাজ কেন্দ্র, লাইব্রেরী ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় অনাথাশ্রম প্রভৃতি। অনুরূপ আর একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালিম্পং-এ। ১৯৪৮-৪৯ সনেই প্রথম স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর প্রথম পরিকল্পনা কালে আরও কয়েকটি সিনিয়ার ও জুনিয়ার শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা হয়। Employment Relief Scheme অনুসারে শিক্ষক (স্পেশাল ক্যাডার) নিয়োগ করে শিক্ষকসমস্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে** সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প সংযোজিত হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনা কালে** বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবরূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সহরাঞ্চলে বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল **১৯৬৩ সনে গৃহীত সহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-আইন** (Urban Primary Education Act, 1963)। এই

আইনে মিউনিসিপালিটিগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ উদ্দেশ্যে শিক্ষাকর ধার্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা, প্রয়োজনের হিসেব, স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয় এবং সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কে অবিলম্বে পরিকল্পনা প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে পরিপূরক সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক (তথা বুনিয়াদি) শিক্ষার পরিমাণগত প্রসারের ক্ষেত্রে যে পূর্বাপেক্ষা অগ্রগতি হয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। নীচের তালিকা থেকে এ কথা বোঝা যাবে :

বুনিয়াদি শিক্ষা

	বিদ্যালয়সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা
১৯৪৮	×	×	×
১৯৫০-৫১	৮৬	৬৮০৩	২৫৭
১৯৫৫-৫৬	৪৯২	৫৯৩২৪	২০,৬
১৯৬০-৬১	১৪৯০	১৫৮৯৩৩	৫৬৯২
১৯৬৫-৬৬	২০০০ এর বেশী	....	....

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৪৭-৪৮	১৩৯৫০	১০৪৪১১১	৩৫৪৩০
১৯৫০-৫১	১৪৬৯৭	১৪০৭৭২৩	৪২৯৩৫
১৯৫৫-৫৬	২২৫৮৯	২১১৯৭১৩	৭৮০৪০

প্রাথমিক ও বুনিয়াদি সর্বমোট

১৯৪৭-৪৮	১৩৯৫০	১০৪৪১১১	৩৫৪৩০
১৯৫০-৫১	১৪৭৮৩	১৪১৬৫২৬	৪৩১৯২
১৯৫৫-৫৬	২৩০৮১	২১৭৯০৩৭	৬৯১৭৪
১৯৬০-৬১	২৭৯৭২	২৬৩৪৯৮৯	৮৩৭৩০
১৯৬৫-৬৬	৩৩০০০	৪০০০০০০	৯৮৩০৬

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে প্রতি এক বর্গ মাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে ব্যর্থতার কথাও মনে রাখা দরকার। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে ছেলেদের

মাত্র শতকরা ৮৩'৭ ভাগ এবং মেয়েদের ৪৫'৯ ভাগকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ করা হয়েছে। ৩৮০০০ গ্রামের মধ্যে ১৪০০ গ্রামে কোন বিদ্যালয়ই নেই। পশ্চিমবঙ্গে তপশীলি উপজাতিরা মোট জনসংখ্যার ৫'৯ ভাগ। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এদের ছাত্রসংখ্যা মোট সংখ্যার ৩'৫ ভাগ মাত্র। স্কুল প্রতি গড়ে শিক্ষক আছেন তিন জন। শিক্ষক ও ছাত্রের গড় ১ : ৩১। আর ১৯৫৬ সনেও একজন শিক্ষক সম্বলিত বিদ্যালয় ছিল ৩৭৫৫টি। শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত বর্তমানে মাত্র ৩৮'৩ শতাংশ। শিক্ষকের বেতনক্রম পূর্বাপেক্ষা উন্নত হলেও আজও জীবনধারনের উপযোগী আকর্ষণীয় কিম্বা মর্যাদাসম্পন্ন নয়।

প্রাথমিক স্তরে প্রধান কয়েকখানি পুস্তক রাষ্ট্রীয়কৃত হয়েছে, এটা সুখের কথা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় শিশুরা মাথা তুলতে পারছে না। চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টি পৃথক বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। দু'খানা ব্যাকরণ বই সহ মোট বইসংখ্যা দশের উপর। এর সঙ্গে রয়েছে সাধারণ বৃত্তি পরীক্ষার ভীতি। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় হিন্দি সংযোজিত হয়। পুস্তকের সংখ্যা হয় প্রায় ১৪ খানা। বিচিত্র নয় যে অপচয়ের হার অতি বেশী। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পৌঁছবার পথে অপচয় ঘটে ৩৪'৮০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও কল্পনার বিষয়। কলকাতায় ৫টি, দার্জিলিংয়ে ৮টি ওয়ার্ডে, পুরুলিয়া সহরে এবং কয়েক শত গ্রামে সরকারী দলিলের হিসেবে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সরকারী আমলাদের নিয়ে Attendance Commitee-ও আছে, মাঝে মাঝে অভিভাবকের উপর নোটিশও দেওয়া হয়। কিন্তু এ সবই নিতান্ত মামুলী। গ্রামাঞ্চলে আইনগতভাবে শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। বাধ্যতা সম্পর্কে একটি সরকারী ঘোষণা আছে মাত্র, কিন্তু তাও নিতান্ত মামুলী। সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিকও নয়, আবশ্যিকও নয়। সুতরাং সেখানে শিক্ষা ক্রয় করতে হয় উচ্চমূল্যে। কিংবা বিনামূল্যে প্রাপ্ত শিক্ষার মান হয় অতি নিম্ন। তাছাড়া কলকাতার মত সহরেও শতকরা ৪০টি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে একক উদাহরণ, যেখানে ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা আজও আছে,

সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হয় নি এবং সংবিধানের নির্দেশ আদৌ পালিত হয় নি।

প্রাথমিক শিক্ষর জন্য অর্থবরাদ্দ বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। ছাত্রপিছু এখানে বার্ষিক গড় ব্যয় ২৪ টাকা মাত্র। মোট ব্যয়ের ৭৯.৯৬ ভাগ বহন করেন সরকার, ১১.৬৯ ভাগ স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৮.৩৫ ভাগ আসে বেসরকারী সূত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসিত হয় পরস্পরবিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক আইনের সাহায্যে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯১৯ সনের আইন, ১৯৩০ সনের (গ্রামীণ) আইন। ১৯৩১ সনের Bengal Municipal Act, ১৯৫১ সনের Calcutta Municipal Act, ১৯৬৩ সনের Urban Primary Education Act, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারা। **রাজ্যভিত্তিতে কোন প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড নেই।** তার ফলে গ্রাম ও সহরের কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে। জিলা স্কুলবোর্ডগুলির বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অভিযোগের তালিকা অতি দীর্ঘ। সর্বোপরি **কলকাতাকে ১৯৬৩ সনের আইনের বাইরে রাখা হয়েছে।** তাছাড়া ঐ আইনে এমন কোন ব্যবস্থাও নেই যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি উদ্যোগ গ্রহণ না করলে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন। বিচিত্র নয় যে ৮৮টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ১০।১২টির অধিক সংস্থা এই আইন কার্যকরী করে নি।

সমস্যা সমাধানের পথ

এই দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার পেতে হলে অবিলম্বে সংবিধানের ৪৫নং ধারা কার্যকরী করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করে ক্রমান্বয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি শ্রেণীকে প্রাথমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। দিল্লীর আইনের মত আইন পাশ করে সমগ্র রাজ্যের জন্য অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, এবং বোম্বাই আইনের অনুকরণে attendance machanism প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বুনিয়াদি অবুনিয়াদির ব্যবধান অতি সত্বর বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই স্তরে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যম এবং

কোন ভাষা পাঠের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রয়োজন। প্রতি শিশুর হাঁটা পথের মধ্যে স্কুল থাকা চাই। শিক্ষকের বেতনক্রম, অপরাপর সুযোগ এবং মর্যাদার আরও উন্নতি চাই। সর্বোপরি বেসরকারী উদ্যম সম্পূর্ণ বাতিল করে অবিলম্বে Common School ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

রাজ্য বোর্ডের অধীনে পুনর্গঠিত জেলা বোর্ডের পরিচালনায় শিক্ষা সেস্, সহরাঞ্চলে ন্যূনপক্ষে • শতাংশ এবং সাধারণভাবে জমির উপর ধার্য • শতাংশ হারে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকরের ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা আরম্ভ হলে অবস্থার উন্নতি অবশ্যই আশা করা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীনতার পরে সর্বপ্রথম কথা বলেন ১৯৪৮-৪৯ সনে **তারাচাঁদ কমিটি**। এই কমিটি সুপারিশ করেন ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বৎসরের পাক-মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ-বুনিয়াদি এবং ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ **বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ১২ বছরের শিক্ষাপ্রস্তুতি**। কমিটি সুপারিশ করেন নিম্ন-বুনিয়াদি স্তরের শেষ থেকে সমগ্র নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে এবং ইংরেজী প্রত্যাহৃত হলে সমগ্র মাধ্যমিক স্তরেই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষার অধ্যয়ন। এই কমিটি **বহুমুখী বিদ্যালয়** এবং **একটি মাত্র সমাপ্তি পরীক্ষার কথাও বলেন**। একই সময়ে **বাংলা দেশেও রায়চৌধুরী কমিটি** মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্বোপরি **ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** (১৯৪৮-৪৯) ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকেই দুর্বলতম অংশরূপে আখ্যা দেন। এই সবের ফলে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে নূতন সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। ডঃ **লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে গঠিত হয় মাধ্যমিক-শিক্ষা কমিশন** (১৯৫২-৫৩)।

মুদালিয়ার কমিশন

মুদালিয়ার কমিশন প্রথমেই **মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিবর্তনের কথা বলেন**। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—(ক) প্রজাতান্ত্রিক

স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী, (খ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি (গ) যুব সমাজের চরিত্রগঠন, (ঘ) উৎপাদনী এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি এবং (ঙ) মধ্যম স্তরের নেতৃত্বে শিক্ষণ। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কমিশন প্রস্তাব করেন ১৭ **বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে**: যারা উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাংক্ষী এবং সক্ষম, তাদের জন্য হবে **বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি** এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু, তাদের জন্য হবে **জীবনের প্রস্তুতি**।

কমিশন প্রস্তাব করেন ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৪ বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ মোট **১২ বছরের স্কুলশিক্ষা**। এর পরে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে **৩ বৎসরের প্রথম ডিগ্রী পাঠ**। সুতরাং কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট স্তর তুলে দিয়ে ঐ স্তরের পাঠকে স্কুলস্তরে নিয়ে আসার সুপারিশ করেন। (অন্তর্বর্তী কালে অবশ্য ১ বছরের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থাকবে)। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে (অষ্টম শ্রেণী) অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক শিক্ষার শেষ হবে। সুতরাং **ঐ স্তরের শেষে ট্রেড স্কুল এবং বৃত্তিগত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের** ব্যবস্থা করে ইচ্ছুক ছাত্রদের সুবিধার কথাও কমিশন বলেন। তেমনি **উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষেও নানা ধরনের বৃত্তি ও কারিগরি পাঠ্যক্রমের** কথা **বলা হয়**। শিল্প কারখানার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে পৃথক কারিগরি বিদ্যালয় কিংবা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই কারিগরি শিক্ষার সুপারিশ করেন এই কমিশন।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন যে (ক) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম হবে সকল শিশুর জন্য একই রকম। কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম রচিত হবে বিশেষীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে। (খ) উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম ব্যক্তি এবং সমাজ—উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সামাজিক সংহতির উদ্দেশ্যে সকলের জন্য আবশ্যিক পাঠ্যবস্তুকে নিয়ে গঠিত হবে '*Core*' এবং ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে বিশেষ পাঠ অনুসরণের জন্য থাকবে '*Periphery*' অর্থাৎ ঐচ্ছিক পাঠ্যবস্তুর সমাবেশ। সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কমিশন **ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমকে ৭টি প্রবাহে ভাগ করেন**। এইগুলি হলো মানবিক বিদ্যা,

বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য, গৃহ-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে কয়েকটি পাঠ্যবস্তু থেকে ছাত্ররা নির্দিষ্ট পাঠ বাছাইয়ের অধিকার লাভ করবে। তবে **যে ছাত্র যে বিভাগ বাছাই করবে, তাকে সেই বিভাগের মধ্যেই হেরফের করতে হবে, দুই কিংবা ততোধিক বিভাগ থেকে ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন চলবে না।** উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রথম দুই বৎসর (নবম ও দশম শ্রেণী) 'কোর' বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে, অর্থাৎ বিশেষীকরণ হবে না। **শেষের দুই বৎসর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বিশেষীকরণ সুরু হবে।** এই পাঠ্যক্রমের ফলে একদিকে যেমন প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ থাকবে, অপরদিকে তেমনি সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে।

মাধ্যমিক-শিক্ষা পুনর্গঠনের এই মৌল সুপারিশ ছাড়াও কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন। (১) শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম ও শিক্ষণীয় ভাষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার সমন্বয়ে একটি ত্রিভাষা সূত্র। (এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) (২) পুঁথিগত বিদ্যা ও ব্যবহারিক বিদ্যার সমন্বয়। (৩) স্বয়ং-সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্থক করবার জন্য, বিশেষত: বিশেষীকরণের স্তরে প্রকৃত দক্ষতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন। (৪) পরীক্ষাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ডরূপে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-মুখীনতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার। (৫) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ৭টি প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের জন্য Guidance and Counselling ব্যবস্থা প্রবর্তন। (৬) ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার প্রণয়ন। (৭) সৃজনশীল সমাজচেতনা এবং চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সহপাঠ্য-মূলক কর্মসূচী প্রবর্তন। (৮) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে যোগ্য শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষকের যোগান এবং এই উদ্দেশ্যে বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন। (৯) শিক্ষা-অধিকর্তার সভাপতিত্বে, কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে দশজন বিশেষজ্ঞসহ ২৫ জনের মাধ্যমিক-শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতি রাজ্যে প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন।

মুদালিয়ার কমিশনের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গে 'মে কমিশন' গঠিত

হয়। এই কমিশনও মূলতঃ মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশকেই সমর্থন করেন। কেবল রাজ্যশিক্ষাবোর্ড গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু সংশোধনের সুপারিশই এর একমাত্র অবদান।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার

মুদালিয়ার কমিশনের সকল **সুপারিশের মূল ভিত্তি ছিল ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা** প্রবর্তন এবং সেই অনুসারেই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ১২ বৎসরের স্কুল-শিক্ষা সম্বন্ধে সপ্রু কমিটি, তারাচাঁদ কমিটি, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশনের দ্ব্যর্থহীন **সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটি শিক্ষাকালকে এক বছর হ্রাস করেন** এবং এই ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা থেকে নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তিনটি পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রগতি হয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ১৯৪৭ সনে সারা ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২৬৯৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৫৩৯৯। বর্তমান কাল পর্যন্ত (স্কুলসংখ্যা হিসেব) তার নিম্নানুরূপ সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	৯৬৫-৬৬
(ক) নিম্ন মাধ্যমিক/উচ্চ বুনিয়াদি স্কুল	১৩৫৯৬	২১৭৩০	৪৯৬১৩	৫৫'৫৬
(খ) এই স্তরে (১১-১৪) মোট শিশু সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যার হার	১২'৭ শতাংশ	১৬'৫	২২'৫	২৯'৫
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা	৭২৮৮	১০৮৩৮	১৭২৫৭	২১.৫৬
(ঘ) ১৪-১৭ বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতে ছাত্র সংখ্যার হার	৫'৩ শতাংশ	৭'৮	১১'৭	১৫'০
(ঙ) বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	——	২৫৫	২১১৫	২০৪৬
(চ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	৫৩	১০৭	২৭৮	৩১২
(ছ) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার—				
নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে	২৩'৩ শতাংশ	৫৮'৫	৬৬'৫	৬৩'৪
উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৩'৮ „	৫৯'৭	৬৪'১	৬৬'২

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
(জ) মাধ্যমিক শিক্ষার সমকক্ষ কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৩৩৯	৩০৭৪	৪১৫৫	৩৮৪৪
(ছ) রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড	৭	১১	১৩	১৩

(ঞ) মাধ্যমিক শিক্ষাবাবদ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় „ ৫১ „ টাকা

তৃতীয় „ ২০৯ „ টাকা

উপরোক্ত প্রসার ছাড়াও *Central Board of Secondary Education* গঠিত হয় এবং এই সংস্থার অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় (৮৬টি কেন্দ্রীয় স্কুল সহ) মোট ৫২৩টি। মাদ্রাজ এবং জম্মু কাশ্মীর ব্যতীত সব রাজ্যেই Bureau of Educational and Vocational Guidance প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল। রাজ্যস্তরে রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথক করা হয়েছে। কিন্তু এখনও রয়েছে **শিক্ষাবোর্ড এবং সরকারী শিক্ষাবিভাগের মধ্যে দ্বৈতশাসন**। মিউনিসিপ্যাল সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠনের পথে কোন আইনগত অন্তরায় নেই। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক পৌর-সংস্থাই এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনযন্ত্রের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে স্কুল পরিচালন-সমিতি। কিন্তু এই সব ম্যানেজিং কমিটির অপদার্থতা এবং বহুক্ষেত্রে অনেক গলদের কথা সর্বজনবিদিত।

শক্তি-দুর্বলতা-সমস্যা

প্রচলিত ১১ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থায় লাভ লোকসানের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে **ইংরেজ আমলের তুলনায় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে**। মাধ্যমিক শিক্ষার সময় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়েছে। সমগ্র কৈশোর জীবনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে *Core-Periphery* **ব্যবস্থাও মূলতঃ শিক্ষা-**

বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক চেতনা, অর্থনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার আধুনিক প্রবণতা এবং সর্বোপরি সাম্প্রতিক শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভাব এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু লোকসানের দিকেই ওজনের পাল্লা ভারী। শিক্ষাকালকে ১২ বছরের বদলে ১১ বছর করা হয়েছে। কিন্তু তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সের জন্য ছাত্রদের তৈরী করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যবস্তুর ওজন স্বল্প সময়ের তুলনায় হয়েছে বেশী। প্রতিটি পাঠ্যবিষয়েই রয়েছে পুঁথিগত বিস্তারের প্রবণতা। ভাষার সমস্যাটি আজও নানা জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে। বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সংযোগবন্ধনী (অনুবন্ধ) স্থাপিত হয় নি। পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার হয় নি। সুতরাং পরীক্ষাভীতিই স্কুল, শিক্ষক ও ছাত্রকে তাড়না করছে। তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার মধ্যে বিস্তর বিষয়বস্তু আহরণ করে আত্মস্থ করার পরিবর্তে, পরীক্ষাপাশের তাগিদে ছাত্ররা সেই পুরাতন মুখস্থ পন্থাই গ্রহণ করে চলেছে। শিক্ষণ ও পঠনপদ্ধতি তাই আজও চিরাচরিত। সহপাঠ্যক্রমমূলক কার্যক্রম আজও গুরুত্ব লাভ করে নি, এবং অবসর বিনোদনের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যাকে কাজে লাগাবার দক্ষতা সৃষ্টি হয় না। এ শিক্ষা তাই জীবনকেন্দ্রিকও হয় নি। কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার অপ্রতুলতার ফলে সাধারণ উচ্চ শিক্ষার দিকেই ঝোঁক বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় আজও ক্রমবর্ধমান ভীড়। অথচ তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে উন্নত পাঠ্যক্রমের যোগ্য হওয়ার জন্য মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষামানের উন্নতিও ঘটেনি। সুতরাং এ শিক্ষা '*Preparatory*' ও পুরোপুরি হয় নি। অপরদিকে মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োগ ও ব্যবহারিক শিক্ষার অপ্রতুলতার ফলে এই স্তরের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার শিক্ষাও হয় নি। এক প্রান্তে প্রাথমিক শিক্ষা ও অপর প্রান্তে উচ্চশিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংহতি সাধিত হয় নি। স্কুলস্তরে যা পড়া হয় তেমন অনেক বিষয় কলেজীয় স্তরে পড়বার সুযোগ পাওয়া যায় না।

ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও অনেক ত্রুটি রয়েছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এলোমেলো অপরিকল্পিত ভাবে, এবং বহু ক্ষেত্রে নানাবিধ অশুভ চাপে।

তদুপরি শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুযোগ সুবিধারও তারতম্য আছে। সুতরাং শিক্ষায় সমানাধিকারের নীতিও কার্যকরী হয় নি। বিশেষীকরণের জন্য ছাত্র বাছাই আজও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিবর্তে অন্যান্য প্রশ্নাধীন প্রণালীতেই হয়। এর ফলে শিক্ষামানের সর্বাঙ্গীন অবনতি ঘটেছে। অতি অল্প বয়সে বিশেষীকরণের ঝোঁককেও শিক্ষাবিদরা নিন্দা করেছেন। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে যোগ্যতাসম্পন্ন উপযুক্ত শিক্ষক যোগানের দিকটি অতিশয় বেদনাদায়ক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অঞ্চলভেদে ৪০ থেকে ৫৫ শতাংশ শিক্ষকই পাস গ্রাজুয়েট, উচ্চতর পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত আংশিক সময়ের শিক্ষকদের মধ্যেও ৭ থেকে ১৪ শতাংশই পাস গ্রাজুয়েট এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অঞ্চল বিশেষে ২৩ থেকে ৪৩ শতাংশ শিক্ষক আজও আণ্ডার গ্রাজুয়েট। প্রায় সব কটি ঐচ্ছিক বিষয়েই অনার্স অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষকের হার ৫০ ভাগের অনেক কম। বহু স্কুলেই বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক-পদগুলি প্রায়শঃই শূন্য থাকে। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হারও অঞ্চলভেদে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ। এই অবস্থা আদৌ আশ্চর্যের নয়, কারণ শতকরা ৬৩ জন শিক্ষকের বেতন ১৫০ টাকা, শতকরা ৪ ভাগের বেতন ২৫০ টাকার উর্ধ্বে এবং অবশিষ্টাংশের বেতন ১৫০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে। এই বেতনে যোগ্য শিক্ষকের যোগান সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। সম্প্রতি এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উন্নতি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় বেতন ও মর্যাদা আজও আকর্ষণীয় নয়। আর শিক্ষক পাওয়া গেলেও অভাব রয়েছে উপযুক্ত সরঞ্জাম, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরীর। পশ্চিমবঙ্গেই এই অবস্থা হলে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ রাজ্যের কথা কল্পনাই করা যায় মাত্র।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ড ও সরকারী শিক্ষাদপ্তরের দ্বন্দ্ব নিত্য ঘটনা। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াও বহুক্ষেত্রে বিষাক্ত। সরকারী দপ্তর, বোর্ড, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক প্রভৃতি বহুবিধ প্রভুর ক্ষমতাপ্রবণতায় শিক্ষকরা ব্যতিব্যস্ত। মেয়েদের পক্ষে কোন কোন স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে শিক্ষায় সমানাধিকার আজও বহু দূরে। শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রির বরাদ্দ

বারেবারেই হোঁচট খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মাঝে এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশে ছাত্র অসন্তোষ বিস্ফোরিত হচ্ছে। বস্তুতঃ **প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষায় রয়েছে বহু সমস্যা**। সুখের কথা যে বিগত কয়েক বছর যাবতই এই ব্যবস্থা আবার পরিবর্তনের দাবীতে ক্রমাগত শিক্ষাবিদ্‌গণ মুখর হয়ে উঠেছেন।

উচ্চ শিক্ষার কথা

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত পাঠের জন্য সিলেবাসে দুইটি আলাদা গ্রুপের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার আলোচনা সকলের জন্য 'সাধারণ পাঠ'। অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হবে না বলে এখানেই একটু বিস্তৃত এবং ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থিত করা হচ্ছে। মনে হয় ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই বর্তমান অবস্থাটি ভালভাবে বোঝা সম্ভব হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্রমবিকাশ

১৮৪৫ সনে বাংলা দেশের শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক F. J. Mowat সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি C. H. Cameron এ সম্পর্কে আবার প্রস্তাব করেন। ততদিনে মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ স্তরে শিক্ষা যথেষ্ট দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। ইংরেজীকে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। ইংরেজী বিদ্যাকে চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনে কলকাতায়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হলো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হলো চ্যান্সেলর এবং সিনেটের উপর। কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌রা সিনেটে স্থান পেলেন নগণ্য সংখ্যায়, বিশেষত অনুমোদিত কলেজগুলির প্রায় কোন প্রতিনিধিত্বই রইল না। আমৃত্যু সভ্যপদে বৃত, সরকার মনোনীত

অশিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত আমলা দিয়েই সিনেট ভর্তি হলো। সিনেট সভ্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়লো। আইনসম্মত ভাবে গঠিত কোন সিণ্ডিকেটও ছিল না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন হলো ঢিলেঢালা।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দায়িত্ব নির্দেশ করা হয়েছিল, সেই অনুসারে ঢিলেঢালা প্রশাসনেও মারাত্মক ত্রুটি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো প্রবেশিকা, স্নাতক ও পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা পরিচালনা করা, সেই উপলক্ষে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা, এবং সার্টিফিকেট দান করা। উডের ডেসপ্যাচে প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষা এবং পেশাগত শিক্ষার জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টির যে নির্দেশ ছিল, তা কার্যকরী হলো না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের দায়িত্ব রইল না।

সাংগঠনিক দুর্বলতা যাই থাক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে কলেজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫৭ সন থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় মাদ্রাজে ১২টি, বোম্বাইতে ৪টি, বাংলাদেশে ১৭টি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৯টি, পাঞ্জাবে ৮টি।

এর পরবর্তী দশ বছরে কলেজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় বেসরকারী প্রয়াসও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কলকাতার বিদ্যাসাগর ও সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সনে। এই সময়ে দেশীয় পরিচালনাধীন ছিল কমপক্ষে পাঁচটি কলেজ। দেশীয় নৃপতিরাও এই সময় নিজ নিজ রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ের দুইটি জিনিষ উল্লেখযোগ্য—(১) অনেক কলেজে স্কুল স্তরের পঠন-পাঠন তখনও হতো। অর্থাৎ দুই স্তরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন সীমানা তখনও টানা হয় নি। (২) দেশীয় ভাষাগুলি উচ্চশিক্ষা স্তরে এই সময় থেকেই অবহেলিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৪ বছর দেশীয় ভাষাকেও পাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তার প্রস্তাবে ১৮৬২ সনে তাও বাতিল করা হয়। তৃতীয় আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ যুগের কলেজগুলি সবই ছিল আর্টস কলেজ। অবশ্য দেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক পরিবেশে যে শ্রেণীর কাছে উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত ছিল, সেই শ্রেণী এতে অসুখী ছিল না।

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পরবর্তী পর্যায় ১৮৮২ সনের পরে। হাণ্টার কমিশন সুপারিশ করলেন যেন কয়েকটি উচ্চমানের সরকারী কলেজ পরিচালনায়

দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। এই সুপারিশের পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার প্রসার হয় দ্রুত-গতিতে। ১৮৮১-৮২ সনে যেক্ষেত্রে আর্টস কলেজ ছিল ৬৮টি, সেক্ষেত্রে ১৯০১-০২ সনে কলেজ হয় ১৭৯টি; অর্থাৎ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। এর অন্যতম কারণ হলো দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তিলক, আগারকর, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবতরণ। কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েরও সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। লাহোর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো যথাক্রমে ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সনে। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হলো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এখানে প্রাচ্য এবং ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপক ও লেকচারার নিযুক্ত হলেন। একটি নতুন পদক্ষেপ সূচিত হলো।

শতাব্দীর শেষভাগে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি জিনিষ বলা প্রয়োজন। হাণ্টার কমিশন উচ্চশিক্ষার স্তরেও বিকল্প পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। সুতরাং অগ্রগতি হলো একপেশে। দ্বিতীয়তঃ, দ্রুত প্রসারের ফলে তখন থেকেই মানাবনতির অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। তৃতীয়ত শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির ভয় তখন থেকেই শিক্ষাচেতনাকে প্রভাবিত করে। লর্ড ল্যান্সডাউনের মন্তব্যেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত হয় ১৮৮৯ সনে। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে স্বাদেশিকতার প্রভাবে উচ্চশিক্ষাস্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যয়নের আন্দোলন তখন থেকেই দানা বাঁধে। বস্তুত ১৯০১ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবার নতুনভাবে ভারতীয় ভাষাকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্পর্কেও চিন্তার প্রসারতা ঘটে। শিক্ষাদানের দায়িত্ব এই সময় থেকেই বাস্তব হয়ে ওঠে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম যুগ ছিল কার্জন যুগ। এদেশে তাঁর আগমন কালেই ১৮৯৮ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ সংগঠিত হয়। লর্ড কার্জন নতুন করে লণ্ডনের ধাঁচে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করার নীতি গ্রহণ করেন। ১৯০২ সনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন প্রশাসন-সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কথা বলেন। তদনুসারে ১৯০৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পাঁচ বছর মেয়াদী ছোট সিনেট, আইনসম্মত সিণ্ডিকেট, সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর

সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনেই অধ্যাপক ও লেকচারার নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির কথা বলা হয়।

কার্জন যুগ কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখ্য, (১) এই যুগ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। (২) আইন অধ্যয়নের বিশেষ প্রসার ঘটে। (৩) এক্সটেনশন বক্তৃতা প্রচলিত হয়। (৪) আঞ্চলিক ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়। (৫) অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞান পাঠ সংযোজিত হওয়ায় পাঠ্যক্রমের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। (৬) গবেষণার সূচনা হয় এবং (৭) অধ্যয়নের জন্য বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গভঙ্গ তথা জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন উচ্চশিক্ষার চেতনাকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত প্রসার ঘটে। তা ছাড়া ১৯১৩ সন থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে বেনারস, মহীশূর, S.N.D.T. ওসমানিয়া, আলীগড় প্রভৃতি নতুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক চরিত্র নিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। তদুপরি বিশেষ অধ্যয়নের জন্য "ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠান" কিংবা "ভারতীয় দর্শন পরিষদের" মত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে নতুন পাঠ্যবিষয় সংযোজিত হলেও তখনও পর্যন্ত মানবিক বিদ্যারই ছিল একক জয়যাত্রা। বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনেও নানা জটিলতা অনুপ্রবেশ করে। এই অবস্থায় সংস্কারের সুপারিশ করেন স্যাডলার কমিশন ১৯১৭ সনে। স্যাডলার কমিশন নতুন চরিত্রের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। (এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পূর্ণ কার্যকরী না হলেও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যে দৃষ্টি-প্রসারতা আসে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তদুপরি দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, কারিগরি শিক্ষার সূচনা, অর্থনৈতিক সংকট এবং স্বাধীনতা আন্দোলন উচ্চশিক্ষার উপর গুণগত এবং পরিমাণগত প্রভাব বিস্তার করে। গুণগত প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হলো Teaching এবং Advancement of Learning-এর আদর্শ গ্রহণ। তদুপরি কারিগরি, বিজ্ঞান, কৃষি এবং নানা ধরনের পেশাকে অবলম্বন করে বিচিত্র পাঠধারার প্রবর্তনও গুণগত পরিবর্তনের দিক। পরিমাণগত প্রসারের কথা এইটুকু

বললেই যথেষ্ট যে ১৯২১-২২ সনে যে ক্ষেত্রে কলেজ ছিল ২৩১টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৯৫৯১, সে ক্ষেত্রে ১৯৪৬-৪৭ সনে কলেজ হলো ৯৩৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ১৯৯২৫৩।

তারপর এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতার উত্তর কালে উচ্চশিক্ষার স্তরে আরও পরিবর্তন সাধিত হয়।

স্বাধীনতার যুগে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য এই যে স্বাধীনতার উত্তরকালে সর্বপ্রথম সমীক্ষার প্রচেষ্টা হয় এই স্তরেই। **১৯৪৮ সনেই ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।** এই কমিশন সর্বপ্রথমেই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেন। উচ্চস্তরের শিক্ষায় থাকবে **ত্রিমুখী উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষা, উদার মতাদর্শের শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার শিক্ষা।**

কমিশনের মতে **বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য জগতের জন্য নেতা তৈরী।** বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা। **আধ্যাত্ম মূল্যবোধের সঙ্গে জড়-জাগতিক মূল্যবোধের সমন্বয় সাধিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে।** এরই মধ্য দিয়ে তৈরী হবে প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার সমগুরুত্ব আরোপিত হবে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার উপর।

বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রাপ্তদের স্থান। স্কুলে অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হবে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা হবে প্রশস্ত সাধারণ শিক্ষা, কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে উন্নত মানের প্রস্তুতি এবং উপযুক্ত বয়স ও মানসিক পরিপক্বতা। পাশ্চাত্যের কোন দেশে ১৮ বছর বয়সের পূর্বে অর্থাৎ ১২ বছরের পাঠ সমাপ্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার থাকে না: কিন্তু ভারতে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা হয় নিম্নমানের। তাই কলেজের প্রথম দুই বৎসর এই দুর্বলতা দূর করে নিতে হয়। বস্তুতঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নত শিক্ষার উপরই কলেজীয় স্তরে মনোন্নয়ন সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিংবা কর্মক্ষেত্রের জন্য উন্নত মানের ছাত্র তৈরীর দায়িত্ব নিতে হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। তাই কমিশন প্রস্তাব করেন উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজের স্তরে **দীর্ঘতর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের।**

কিন্তু কমিশন লক্ষ্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি ছাত্রসমস্যার চাপে পীড়িত। অপরদিকে যোগ্য শিক্ষকেরও অভাব ঘটেছে। সুতরাং **যুগপৎ মানোন্নয়ন এবং প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথাই কমিশন সুপারিশ করেন।**

উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য **আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করেন।** তবে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় কেবল পুরাতন ধরনের Affiliating কিংবা Affiliating and Teaching University-র বদলে Residential, Unitary এবং Federal প্রভৃতি রকমের কথাও সুপারিশ করেন। এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের নানাবিধ উন্নয়ন সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল-নীতি নির্ধারণ, মানোন্নয়ন, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়।

কমিশনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে টিউটোরিয়াল প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন, নানাবিধ ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, নানাবিধ সহপাঠমূলক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তথাকথিত ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা সমাধানের প্রস্তাবও ছিল।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা

কমিশন-রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল **গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নূতন চেতনা।** ভারতের ইতিহাসে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব আলোচনা করে কমিশন মন্তব্য করেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদৌ সংযুক্ত নয়। এই শিক্ষা গ্রামীণ তরুণকে করে সহরমুখী এবং সহরের পরিবেশে গ্রাম্য তরুণ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। **সহরকেন্দ্রিক শিল্পায়নের ফলেই শিক্ষার**

এসেছে নগর-প্রবণতা। কমিশন শিক্ষায় সর্বজনীনতার আবেদন করেন এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম ও সহরের ব্যবধান দূর করার পরামর্শ দেন। গ্রামের শিক্ষাকে গ্রামজীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে **গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সুপারিশ করা হয়।**

এই পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে অপরাপর দেশের উদাহরণ, বিশেষতঃ ডেনমার্কের গণ-কলেজের ভাবধারায় কমিশন অবশ্যই প্রভাবিত হন। আরও বেশী করে **প্রভাবিত হন গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারা।** ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রস্তাব ছিল। রাধাকৃষ্ণাণ **কমিশন এই পরিকল্পনাই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন।**

কমিশনের পরিকল্পনায় উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয়কেই গ্রামীণ উচ্চ-বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। এই স্তরে শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক এবং স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক। সাধারণ শিক্ষার সাথে মিশে থাকবে ব্যবহারিক উৎপাদনী শিক্ষা। এই রকম **কয়েকটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ কলেজ।** কলেজীয় পাঠ্যক্রমে একই সঙ্গে থাকবে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং গ্রামজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষীকরণের শিক্ষা। আবার **কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়।** গ্রামীণ জীবন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হবে পরস্পরের পরিপূরক। এই গ্রামীণ শিক্ষা কাঠামোয় থাকবে ৭ কিংবা ৮ বছরব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা, ৩ কিংবা ৪ বছরব্যাপী উত্তর বুনিয়াদি, ৩ বছরের কলেজ এবং ২ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা। **সমস্ত স্তরেই শিক্ষা হবে গ্রামকেন্দ্রিক এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা।**

উচ্চ শিক্ষার প্রসার

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন) রিপোর্টের পরে বহু বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই হয়েছে আবাসিক এবং কয়েকটি হয়েছে ইউনিটারি। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের যুগে সৃষ্ট বহু

প্রতিষ্ঠান (যাদবপুর কিংবা বিশ্বভারতী সমেত) সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। বোম্বাইয়ের Tata Institute of Social Science এবং দিল্লীর Indian Institute of International Studies প্রমুখ ৯টি প্রতিষ্ঠান, কিংবা হরিদ্বারের গুরুকুল-কাঙরি বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রমুখ শিক্ষাকেন্দ্রও **বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে** সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। সর্বোপরি University Grants Commission ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৯৪৫ সনে তিনটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থারূপে—U. G. Committee নামে। ১৯৫৩ সনে এর রূপান্তর ঘটে U. G. Commission-রূপে। এবং সর্বশেষে **১৯৫৬ সনে আইনসিদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রক সংস্থা**-রূপে এর পরিণতি লাভ ঘটে। এর কাজ হলো উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও সমন্বয়সাধন, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাননির্ধারণ, এবং গবেষণার প্রসারসাধন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় সাহায্য বিতরণের দায়িত্বও এর উপর ন্যস্ত হয়েছে।

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত এবং পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করে মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করা হয়েছে। গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত Rural Higher Education Commitee প্রস্তাব করেন গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি স্থাপনের। সেই অনুসারে ১৯৫৬ সনে গঠিত হয় মূলতঃ উপদেষ্টা চরিত্রের National Council of Rural Higher Education. এই কাউন্সিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে Rural Institute প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। তদনুসারে **সমগ্র ভারতে ১৪টি ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।** শ্রীনিকেতন এদের অন্যতম। উপরোক্ত রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ এবং উপাধি দান করবে। কিন্তু বাস্তবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তিন বছরের ডিপ্লোমা, ২ বছরের কৃষি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্যানিটারি ইনসপেক্টর কোর্স প্রভৃতি। এই সব উপাধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমমর্যাদা লাভ করতে বহু বেগ পেতে হয়েছে। পরিশেষে অবশ্য কোন কোন উপাধি বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কারিগরি শিক্ষা

পর্ষৎ এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় না হয়েছে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের সুপারিশের রূপায়ণ, না হয়েছে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিশিক্ষার রূপায়ণ।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উত্তরকালে তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধারণ উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি অবশ্যই ঘটেছে। ১৯৪৮ সনে সারা ভারতে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ছিল মোট ৫০০ এর কিছু বেশী। (এর মধ্যে শুধু আর্টস্ ও সায়েন্স কলেজ ছিল ২৮৫টি)। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১৮টি এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার। পরবর্তী তালিকা থেকে ক্রম বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায়।

	১৯৫০-৫১ সন	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৬
বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	৩২	৪৫	৬৪
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৯২	১১২	২০৪	২৫৭
আর্টস, সায়েন্স, কমার্স কলেজ	৫৪২	৭৭২	১১২২	১৪০০
পেশা ও বৃত্তি শিক্ষার কলেজ	২০৮	৩৪৬	৮৫২	১০৭৭
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১৮	৩৪	৪১	৪৪
মোট কলেজের সংখ্যা				২৫৬৫
মোট ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে বিজ্ঞান ও কারিগরির ছাত্র	২৮·১ শতাংশ,	৩৩ শতাংশ,	৩৪·১ শতাংশ,	৪২·৫
১৭-২৩ বছরের জনসংখ্যার অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র	০·৯ „	১·৫ „	১·৮ „	১·৯ „

উচ্চশিক্ষায় ব্যয় করা হয়েছে প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা।

উচ্চশিক্ষার সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বাড়বে, এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বাড়বে, এটা অতি স্বাভাবিক। পরাধীনতার আমলে উচ্চশিক্ষা ছিল সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী ভাগ্যবানের কাছে উন্মুক্ত। মাধ্যমিক শিক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতির

ফলে স্বাধীনতার উত্তরকালে সম্প্রতি মাত্র নিম্নমধ্যবিত্তের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খোলা হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমবৃদ্ধির দিকে ঝোঁকও আছে। কিন্তু আজও যখন ১৭-২৩ বছর বয়সের জনসংখ্যার শতকরা ২ জনও কলেজের স্তরে পৌঁছতে পারছে না, তখন উচ্চশিক্ষা "সংখ্যাভারাক্রান্ত" বলে আদৌ মনে হয় না। তবে এই অর্থে সংখ্যাস্ফীতির প্রবণতা রয়েছে যে আজও উচ্চশিক্ষা মূলতঃ একপেশে।

উচ্চশিক্ষার বিচিত্র পথ এবং বহুমুখীনতা আজও সৃষ্টি হয় নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ অতি সীমিত। সুতরাং মানবিক বিদ্যার দরজায় তরুণদের ভিড়। মাধ্যমিক শিক্ষার পরে বৃত্তিগত শিক্ষার সুযোগ সামান্যই। চাকুরীর বাজার সঙ্কুচিত। তাই উপায়ান্তরহীন তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে। সেখানেও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া মূলতঃ পুঁথিগত। তত্ত্বগত বিদ্যাকে প্রয়োগের স্তরে অনুধাবনের সুযোগ নেই। তত্ত্ব-প্রাধান্যের ফলেই শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে রয়েছে বক্তৃতা-প্রাধান্য। শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে গৃহীত অসার তত্ত্বসর্বস্বতা ছাত্রদের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে না—আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে না। লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য সুযোগের অপ্রতুলতাও সর্বজনবিদিত। পরীক্ষার গুরুভার আজও ভীতিপ্রদ। তদুপরি একথাও স্বীকার্য যে ছাত্রবন্যার সঙ্গে এমন কিছু ছাত্র ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করে যারা তত্ত্বমূলক উচ্চশিক্ষালাভের অযোগ্য। সর্বোপরি এ শিক্ষার ফলশ্রুতি এবং জীবনসংগ্রামে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে অধিকাংশ ছাত্রই সন্দিহান। ভবিষ্যৎ বেকারীর কালোছায়ার পটভূমিকায় যে শিক্ষা নিশ্চিন্ততার শুভ ইঙ্গিত বহন করে না, সেই শিক্ষা কোন রকমেই প্রাণবন্ত এবং ফলপ্রসূ হয় না।

তবুও অসংখ্য তরুণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ভিড় করে। গৃহে আর্থিক সমস্যার অন্ত নেই। সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে অধিকাংশেরই বাড়ীতে পড়বার স্থানটুকু নেই। স্বাস্থ্যসমীক্ষা এই নিষ্করুণ সত্যই উদ্‌ঘাটন করে যে অধিকাংশ ছাত্রই নানা ব্যাধিগ্রস্ত। অধিকাংশই অপুষ্টির ক্রমক্ষয়ী গ্রাসের কবলিত। অথচ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ছাত্রকল্যাণ প্রচেষ্টা নাম মাত্র। সৃজনশীল আত্মবিকাশ এই পরিবেশে অসম্ভব। উদ্দেশ্যহীন

শিক্ষায় এবং নোঙরহীন জীবনে ছাত্রবিক্ষোভ তাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

বিগত কুড়ি বছরে নূতন অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এগুলির সৃষ্টি হয়েছে অপরিকল্পিত ভাবে। বিশেষ শিক্ষা কিংবা বিশেষ অঞ্চলের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত কারণের উর্ধ্বে রাজনৈতিক এবং অপরাপর বিবেচনাই বেশী কার্যকরী হয়েছে। অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ ব্যয়িত হয়েছে দালান কোঠার জন্য, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমাজ-জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকৃত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছে। শিক্ষায় স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে। ক্ষমতা-প্রবণতার কোন্দল, এমন কি ধর্মীয় কোন্দলও শিক্ষার আবহাওয়াকে বিষাক্ত করেছে। ভাগ্য-বিড়ম্বিত শিক্ষকও হয়েছেন বিক্ষুব্ধ। এই সব-কিছুর ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান হয়েছে নিম্নগতি।

বাংলা দেশের কথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসুকে স্নাতক উপাধিদানের মধ্য দিয়ে ১৮৫৮ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত যাত্রারম্ভ। তদানীন্তন ছাত্রদের পাঠের আগ্রহ এবং দক্ষতাও ছিল সর্বজনস্বীকৃত। জর্জ ট্রেভেলিয়ানও ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহার উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন।

উচ্চশিক্ষার প্রসারও বাংলাদেশেই হয়েছে সর্বাধিক। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বেসরকারী ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু উচ্চমধ্যবিত্তের এই শিক্ষা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বাস্তবকেন্দ্রিক হয়নি। ইংরেজীর প্রতি মোহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীন চেতনার পথরোধ করেছিল। অবশ্য বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই নতুন চেতনার সঞ্চার হতে থাকে। নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলা দেশের সঙ্গে কার্জনের সংঘাত হয় সর্বপ্রথম। এই সংঘর্ষের অন্যতম কারণ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কার্জনের নিয়ন্ত্রণ-নীতিকে পরাজিত করে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হাতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯১২ সনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক এবং অন্তত ৫০ জন লেকচারার নিযুক্ত হন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও উচ্চ শিক্ষার বিষয়বস্তুরূপে স্বীকৃতি পায়। রাসবিহারী ঘোষ এবং তারকনাথ পালিতের দানকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান শিক্ষার যাত্রারম্ভ হয়। ১৯১৯ সনের মধ্যেই স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষা-কাউন্সিল গঠিত হয়। স্যাডলার কমিশনের প্রশাসনিক-সুপারিশগুলি বাংলা দেশে বেশী কার্যকরী হয় না (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ ব্যতিক্রম)। কিন্তু শিক্ষাগত সুপারিশগুলি বহুলাংশে কার্যকরী হয়। সেই থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নিত্যনূতন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হয়েছে বিশালকায়।

স্বাধীনতার উত্তরকালে সংযুক্ত বাংলার বহু কলেজ পড়ে পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমিত সুযোগের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। এই বোঝা হাল্কা করার জন্য ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়, "ডিস্পার্সাল স্কীম" অনুসারে বহু "স্পনসর্ড" কলেজ তৈরী হয়। বেসরকারী উদ্যম সংগঠিত হয় দ্রুততালে। ১৯৪৮ সনে যে ক্ষেত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫টি, ১৯৬৭ সনে সে ক্ষেত্রে কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ হয়েছে ১৭০টি। এ বছরেও হয়েছে কয়েকটি নতুন কলেজ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা দুই শতাধিক।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৭টি। কিন্তু এ কথা উল্লেখ করতেই হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধিতেই উচ্চশিক্ষা সমস্যার সমাধান হয় নি। স্থানীয় চরিত্রকে অবলম্বন করে কিংবা বিশেষ পাঠের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন ছিল, তা সিদ্ধ হয় নি। শুধু এক প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। ইউ, জি, সি-র অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করেই রবীন্দ্র ভারতীর প্রতিষ্ঠা

হয়েছিল। সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ যে উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপযোগী লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী নেই। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির কথা সর্বজনবিদিত। এ বছরের ঘাটতি ৭০ লক্ষ টাকা। অথচ ছাত্রসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান। সারা ভারতের ছাত্রসংখ্যার ১২ শতাংশই কলকাতার অধীন। বৃহত্তর কলকাতায় কলেজ ছাত্রের সংখ্যাই ১ লক্ষ ১০ হাজার।

আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রসংখ্যার যত চাপই হোক, মোট জনসংখ্যার অতি অল্প অংশই আজও উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার লাভ করে। প্রতি ১০ লক্ষ জনে মাত্র ৪'৬ হাজার জন, অর্থাৎ হাজারে ৪০ জন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। আলোচিত ৪'৬ হাজার জনের মধ্যে মাত্র ১'১ হাজার জন পাঠ করে বিজ্ঞান বিষয়ে, '১৫ হাজার টেকনিক্যাল, '১২ হাজার মেডিক্যাল এবং অবশিষ্ট সকলেই সাধারণ মানবিক কিংবা বাণিজ্য বিষয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ১২টি ফ্যাকাল্‌টি এবং ৩৫টির বেশী বিভাগ। কিন্তু ছাত্রবণ্টনের হার নৈরাশ্যজনক। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ফ্যাকাল্‌টির অংশ নিম্নরূপ :

আর্টস শতকরা ৪৯'২ ভাগ, বিজ্ঞান ২৩'২ ভাগ, বাণিজ্য ১৬'৮ ভাগ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি ৩'৮ ভাগ, চিকিৎসা ২'৩ ভাগ, আইন ২'১ ভাগ, শিক্ষা ১'৩ ভাগ, কৃষি ০'৩ ভাগ, পশুবিজ্ঞান ০'১ এবং অন্যান্য ০'১ ভাগ।

এই হিসেব থেকেই বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম দুর্বলতা—একমুখীনতার রূপটি ধরা পড়বে। এ ছাড়া রয়েছে আরও বহু সমস্যা যেমন কলেজে স্থানাভাব এবং সিফ্‌ট ব্যবস্থা, গবেষণার ও সরঞ্জামের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, মফঃস্বল কলেজে সাম্মানিক পাঠ-ব্যবস্থার অভাব, পরিকল্পনাহীন ভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পুরাতন পাঠ এবং পরীক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষায় বিরাট হারে অকৃতকার্যতার বোঝা। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আজও রয়েছে ইংরেজী। বহুমুখী শিক্ষাধারায় তরুণদের চালিত করার মত পথ নেই। অস্বাস্থ্য এবং দারিদ্রপীড়িত ছাত্রদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেই। ছাত্র বিক্ষোভ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিম্বা উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝায় কলেজ স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত। বরাবরই এই স্তরের শিক্ষায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের সম্প্রসারণ। প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক তত্ত্বক্ষেত্রেই এই জ্ঞানের প্রসার হয়েছিল সর্বাধিক। মধ্যযুগে জ্ঞানের ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ করা হলো এবং প্রাচীন জ্ঞানের চর্বিত চর্বণ হলো নানাভাবে। কিন্তু শিক্ষার তত্ত্বাশ্রয়িতা কমলো না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গবেষণা, চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যার প্রসার এবং নিত্যনূতন জ্ঞানক্ষেত্র জয় করা। এই উদ্দেশ্যই Advancement of Learning রূপে বিভিন্ন দেশে, এবং আমাদের দেশেও প্রচলিত।

কিন্তু জ্ঞানের নূতন জগৎ উন্মেষিত হলেই হবে না, নবলব্ধ জ্ঞানের প্রচার চাই। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে উচ্চজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান (teaching)। এই আদর্শও প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। আমাদের দেশেও হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এবং বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম লক্ষ্য এবং কাজ ছিল শিক্ষাদান।

বিমূর্ত জ্ঞান সাধনার ফলে প্রায়শই তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে বাস্তবতা বর্জিত। তাছাড়া তত্ত্বাশ্রয়ী শিক্ষার ফলে ছাত্রদের মধ্যেও এসেছে উন্নাসিকতা। গজদন্তমিনারে বাস করবার মনোভাব অনেক সময়ই তরুণ শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় ও জনজীবনের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের সঙ্গী। আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ক্রমে ক্রমে শিল্প সভ্যতার যুগে উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করাও তৃতীয় উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হলো।

পরিশেষে সমাজ সেবাকেও উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হলো। সমাজসেবার আবার দুটি দিক আছে—(ক) সাধারণের মধ্যে

শিক্ষার আলো ছড়ানো। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "এক্সটেনশন বক্তৃতা" প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন। খ) দ্বিতীয়তঃ শিল্পবাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে নূতন বিদ্যা সৃষ্টি করা, জাতির সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করা, জাতির জন্য বিশেষজ্ঞ নেতা তৈরী করা এবং জাতির নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করাই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি আদৌ সামনে রাখা হয়নি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার করা এবং বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারী তৈরী করাই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের পক্ষে পড়ানো কিম্বা গবেষণার দায়িত্ব ছিল না। পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস তৈরী করা, পরীক্ষা গ্রহণ করা, সার্টিফিকেট দেওয়া, অধঃস্তন কলেজ ও স্কুলগুলিকে অনুমোদন দেওয়াই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই আমাদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আসতে থাকে। মাতৃভাষার চর্চা, উচ্চতম স্তরে পড়ানো, গবেষণার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করা হতে থাকে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে থাকে। Teaching এবং Advancement of Learning'এর আদর্শ গৃহীত হয়। এইক্ষেত্রে স্যার-আশুতোষের মত ব্যক্তিদের দান অসামান্য। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র প্রসার করবার বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে নূতনভাবে ভাবা হয়। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন বলেন ত্রিমুখী উদ্দেশ্যের কথা— (ক) উন্নত সাধারণ শিক্ষা, (খ) বিজ্ঞানসম্মত অথচ উদার মতাদর্শের শিক্ষা, (গ) পেশাগত বিশেষজ্ঞ তৈরীর শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে শিল্প বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক জগতের জন্য নেতা তৈরী করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা। আধ্যাত্ম মূল্যবোধের সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে এবং সমন্বয়

করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে তৈরী হবে প্রকৃত মানুষ। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার উপর।

তারপর থেকে স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু, ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ প্রমুখ বিভিন্ন নেতা ও শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময়ে এবং সমাবর্তন উৎসবে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব, নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে দায়িত্ব, দেশের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব, গণজীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্গীকরণের দায়িত্ব এবং কৃষি ও শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরীর দায়িত্ব নানাভাবে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারি কমিশন, ১৯৬৪-৬৬) উচ্চশিক্ষার **উদ্দেশ্যকে নিম্নানুরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন** :—(১) নূতন জ্ঞান আহরণ, সত্যান্বেষণ এবং নতুন আলোকে পুরাতন জ্ঞানের নববিশ্লেষণ; (২) তরুণদের মধ্য থেকে প্রতিভা আবিষ্কার করে তাঁদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন করে, তাদের মধ্যে সুস্থ আগ্রহ এবং মনোভাব সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা; (৩) কৃষি, কলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য সুদক্ষ অথচ সমাজচেতনা সম্পন্ন তরুণ-তরুণী তৈরী করা; (৪) শিক্ষার প্রসার করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করা; (৫) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সমাজে শুভ জীবনের উন্মেষ করা।

এইসব মৌলিক আদর্শ ছাড়াও **কমিশন কয়েকটি আশু লক্ষ্যের কথাও বলেছেন**, যেমন (১) সহনশীলতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে নিশ্চিত করা; (২) বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course পরিচালনা করা, (৩) স্কুলগুলির শিক্ষামান উন্নয়নে সাহায্য করা; (৪) শিক্ষা ও গবেষণার মনোন্নয়ন এবং প্রসার করা; (৫) অন্ততঃ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক শিক্ষামানের স্তরে উন্নীত করা।

এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন (ক) উচ্চশিক্ষার মানোন্নতি, (খ) জনজীবনের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জনশক্তি পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চশিক্ষার প্রসার; (গ) বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ও প্রশাসনের উন্নতি। সম্প্রতি কলকাতায় একটি সমাবর্তন ভাষণে

ডঃ কোঠারি বলেছেন যে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—(১) সুস্থ নাগরিক তৈরী করা, (২) সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি, (৩) জাতীয় সংহতি বিধান করা, (৪) বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা

অন্যান্য দেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চরিত্র এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধন করেছে। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষণশীলতার প্রাচীর দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিঁকে ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেখানেও বহু পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একথা আমেরিকার হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও খাটে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় এগুলি অনেকাংশে নূতনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। রাশিয়াতে বিপ্লবোত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৃষ্টিই হয়েছে নূতন চরিত্র নিয়ে। তাছাড়া নূতনের দাবি মেটানোর জন্য নূতন ধরণের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট সৃষ্টি হয়েছে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়।

অবশ্য নূতন জীবনের চাহিদা যে সম্পূর্ণ ই মিটেছে এমন নয়। তাছাড়া বর্তমান জগৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই উচ্চশিক্ষার আদর্শ, সংগঠন ও প্রশাসনে আরও পরিবর্তন দরকার। এই প্রয়োজনের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। (১) আমাদের উচ্চশিক্ষা এখনও একমুখী 'লিবারেল শিক্ষার' বোঝায় ভারী। (২) উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে, এমন কি বিজ্ঞান ও কারিগরির ক্ষেত্রেও তত্ত্বের প্রাধান্য রয়েছে। (৩) গবেষণা ব্যবস্থা এখনও অনগ্রসর। (৪) সর্বশেষ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের পরিচিত হতে এখনও অনেক দেরি হয়। (৪) কৃষি, কারিগরি ও

অর্থ নৈতিক জীবনের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষ যোগ নেই। (৫) বয়স্ক শিক্ষা এবং দেশের সামগ্রিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বেদনাদায়ক। (৬) উচ্চশিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে সীমায়িত। (৭) আত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমাদের নেই। (৮) জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায় নীরব দর্শক। (৯) ছাত্র কল্যাণের ব্যবস্থা অতি সীমিত। (১০) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও বহুক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক এবং নানা দোষে দুষ্ট। আমাদের ব্যর্থতার তালিকা ইচ্ছামত অনেক দীর্ঘ করা চলে। সংক্ষেপে এইকথা বললেই যথেষ্ট যে চিরাচরিত ধ্যান ধারনা থেকে আমরা এখনও মুক্ত নই। **উচ্চশিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে আমরা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছি।**

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

আদর্শ ও উদ্দেশ্য পূরণে আমরা যখন ব্যর্থ হয়েছি তখন পরিষ্কার বুঝতে হবে যে আমাদের **উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে।** অসংখ্য ত্রুটির মধ্যে আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি মাত্র। (১) ভারতে ৭৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে উচ্চশিক্ষার পরিব্যাপ্তি আজও নগন্য। (২) তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার পূর্বে উপযুক্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম, স্থানীয় প্রয়োজন প্রভৃতির কথা বিচার করা হয়নি। (৩) এখনও উচ্চশিক্ষা মূলতঃ একপেশে। কেবল মানবিক বিদ্যারই প্রাধান্য রয়েছে। তদুপরি পাঠ্যক্রমে পৌরানিকত্ব আজও রয়েছে। বিভিন্ন মুখীনতা আজও আসেনি। (৪) বিজ্ঞান, বৃত্তি, কারিগরি শিক্ষার সুযোগও সামান্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মমুখীনতা এবং উৎপাদন মুখীনতা আজও আসেনি। তাই জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার কার্যকারিতা কম। (৫) পুরাতন ধর্মী (অর্থাৎ বক্তৃতাধর্মী) পাঠদান পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা। (৬) লাইব্রেরী, লেবরেটরি এবং অন্যান্য ছাত্র কল্যাণ ব্যবস্থাও সীমিত। (৭) পরীক্ষার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। (৮) শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। (৯) বয়স্ক-শিক্ষা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ

জনজীবনের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। (১০) অর্থ সমস্যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারাক্রান্ত। তা ছাড়া অর্থবণ্টন ব্যবস্থায় অসমতাও বেশী। (১১) সর্বোপরি শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, গবেষণা সংগঠন প্রভৃতি গলদে পূর্ণ। বহু ক্ষেত্রেই অগণতান্ত্রিক *কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

খুবই স্বাভাবিক যে এই অবস্থার প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপর। তারই ফল ছাত্রবিক্ষোভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই সম্প্রতি (সমাবর্তন ভাষণে) স্বীকার করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও ও পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার প্রকৃত কারণ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং বেকার সমস্যা। অন্য পথ না পেয়ে ছাত্ররা কলেজে ভিড় করে। কিন্তু এখানে পড়ে দেখছে ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। যা হতে চেয়েছিল, তা হতে পারেনি। বর্তমান শিক্ষায়তন এবং শিক্ষাপদ্ধতি যুব মনে খুব একটা আশার সঞ্চার করতে পারেনা।

সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা

সমস্যাগুলি নিয়ে চুপ করে বসে থাকলে হবে জাতির সর্বনাশ। সমস্যার সমাধান করতেই হবে। সমাধানের জন্য নিম্নানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা যেতে পারে।—(১) আরও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অবাঞ্ছনীয়। ছাত্রসংখ্যা ও চাহিদা অনুসারে, স্থানীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, উপযুক্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম এবং অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা উচিত। (২) বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির সমন্বয়ে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য আরও অনেক ইনস্টিটিউট জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। (৪) পাঠ্যক্রমের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে যেন পাঠ্যবিষয়ের সংযোগ থাকে এবং নির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্রের সর্বশেষ কথাটির সঙ্গে ছাত্ররা যেন পরিচিত হতে পারে। (৫) বক্তৃতা ধর্মী পাঠের বদলে আলোচনা, সেমিনার, টিউটোরিয়ালের উপর গুরুত্ব

দেওয়া দরকার। এ জন্য আরও বেশী সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। (৬) ছাত্রদেরকে সক্রিয় করবার জন্য গ্রন্থাগার এবং গবেষণাগারের অবাধ সুযোগ দরকার। (৭) গবেষণা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি প্রয়োজন। (৮) স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বই সরবরাহের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম যোগানোর ব্যবস্থা দরকার। (৯) পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই। (১০) উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি করা দরকার, যেন আমাদের ছাত্ররা বিদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হতে পারে। (১১) ছাত্র-নির্দেশনা ব্যবস্থা সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। (১২) উচ্চ-শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা উচিত। (এ সম্পর্কে আমরা পরে আলাদাভাবে আলোচনা করবো।) (১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ সেবা প্রকল্প গ্রহন করা, এবং জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দরকার। (১৪) শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পেশার জগতের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং কার্যকরী সংযোগ প্রয়োজন। (১৫) ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা এবং ছাত্র স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার। ছাত্র বিক্ষোভের কারণগুলি দূর করতে হবে। (ছাত্র-বিক্ষোভ সম্বন্ধে পরে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে)। (১৬) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাস, শিক্ষক কল্যাণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দরকার। (১৭) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। (প্রশাসন সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে।) (১৮) উচ্চশিক্ষার জন্য আরও অর্থ সংস্থান প্রয়োজন। তা ছাড়া অর্থবণ্টন ব্যবস্থাটিও প্রয়োজন ভিত্তিক করা উচিত। (অর্থ সমস্যার কথাও আমরা ভিন্নভাবে আলোচনা করবো)।

প্রশ্ন হলো সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কিভাবে এবং কতটুকু প্রচেষ্টা হচ্ছে। এই সম্পর্কে বলা চলে যে (ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এই প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করবার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বণ্টন করবার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রচেষ্টা উৎসাহিত করবার, উচ্চশিক্ষার সার্বিক মান উন্নত করবার এবং ছাত্রকল্যাণ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করবার। (খ) লাইব্রেরী, লেবরেটরি, গবেষণা ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্যও এই সংস্থা চেষ্টা

করছে। (গ) পাঠ্যক্রম সংশোধনের জন্য একদিকে ইউ, জি, সি, এবং অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্তৃপক্ষও আলোচনা করছেন। (ঘ) এই সংস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল আইন তৈরী করা হয়েছে। (ঙ) তা ছাড়া পাঠপদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র কল্যাণ এবং ছাত্রদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড, উপাচার্য সম্মেলন, বিভিন্ন সেমিনার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংগঠনে। (চ) ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে।

কিন্তু যে পরিমাণে আলোচনা হচ্ছে, সেই পরিমাণে কাজ হচ্ছেনা। প্রগতিশীলতা এবং রক্ষণশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এজন্য অনেকখানিই দায়ী। অনতিবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হলে বর্তমান সংকটের পরিণতিতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চশিক্ষায় ভাষার সমস্যা

ভাষার সমস্যা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। এখানে সমস্যাটি সরল, যদিও সমাধান সহজ নয়। স্কুল স্তরে ভাষার ক্ষেত্রে বিচার করতে হয় দুইটি বিষয়—শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এবং কয়টি ভাষা কোন স্তরে আবশ্যিকভাবে শেখানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরকে এই প্রশ্নে দুই ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে—স্নাতক স্তর এবং স্নাতকোত্তর স্তর। স্নাতক স্তরের প্রশ্ন হলো মাধ্যমের বিষয়ে এবং অন্য কোন ভাষা আবশ্যিকরূপে শিখবার বিষয়ে। (অর্থাৎ মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হলে ইংরেজী কিম্বা অন্য কোন ভাষা আবশ্যিকভাবে পড়তে হবে কি না, যেমন বর্তমানে আবশ্যিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজী পড়তে হয়)। স্নাতকোত্তর স্তরে আবশ্যিকভাবে অন্য কোন ভাষা শিখবার প্রশ্ন নেই, কারণ যিনি ইংরেজী কিম্বা হিন্দী অথবা বাংলাতে এম, এ, পড়বেন তাঁর ঐ ভাষা ও সাহিত্যই পড়তে হবে এবং মাধ্যমও ঐ ভাষা। প্রশ্ন হলো অন্যান্য বিষয়, যেমন ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিম্বা গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা পড়ানোর ভাষা কি হবে—মাতৃভাষা কিম্বা ইংরেজী (যা বর্তমানে চালু আছে)।

এই সম্পর্কে বর্তমান পর্যন্ত কতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়েছে তাই আগে দেখা যাক। বাংলা দেশের বাইরে, বিশেষ করে হিন্দীভাষী কোন কোন অঞ্চলে মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বাতিল করা হয়েছে এবং মাতৃভাষার একক দাবি স্বীকার করা হয়েছে। এর ফলে সে সব জায়গার ছাত্ররা অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে অসুবিধেয় যে না পড়ছে এমন নয়।

পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে ইংরেজী রয়েছে আবশ্যিক পাঠ্য ভাষা রূপে। আর শিক্ষার মাধ্যম রূপে সরকারীভাবে ইংরেজীই আছে, যদিও বাংলায় উত্তর দেওয়ার অধিকার ছাত্রদেরকে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ ইংরেজীই হলো teaching medium যদিও বাংলাকে examination medium রূপে স্বীকার করা হয়েছে)। অবশ্য অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদের কলেজে বাংলাতেই পড়ানো চলছে। যেসব ক্ষেত্রে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দুইরকম ছাত্রই আছে, সেক্ষেত্রে অধ্যাপককে বাংলা ও ইংরেজী দুইটি ভাষাই ব্যবহার করতে হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ের মাধ্যমই ইংরেজী, যদিও পড়ানোর সময় আজকাল বাংলাও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (এটি অধ্যাপকের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল)।

সমস্যার সমাধান রূপে বলা চলে যে (১) স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকেই (আমাদের এখানে বাংলা) শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। অবশ্য অন্য ভাষাভাষীদেরকে উপযুক্ত সময় দিতে হবে যেন তাঁরা বাংলা শিখে নিতে পারেন। কিম্বা ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হলে অন্যান্য ভাষার মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক কলেজ পরিচালনা করা চলতে পারে। স্নাতক স্তরে ইংরেজীকে একেবারে তুলে না দিয়ে আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক ভাগে ভাগ করা ভাল। আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হবে সহজ এবং শিক্ষার মানও উঁচুতে রাখবার দরকার নেই। ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমটি যথেষ্ট উচ্চমানের হওয়া দরকার।

স্নাতকোত্তর স্তরেও নীতিগতভাবে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাতারাতি এই কাজ করবার পথে অন্তরায় আছে বলেই নানারকম বিতণ্ডার সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজীর সমর্থকরা বলছেন যে বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল (ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী প্রভৃতি) বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয়; এবং এগুলিতে এমন অনেক শব্দসম্ভার এবং ভাববৈচিত্র্য

আছে যা আমাদের আঞ্চলিক ভাষার বর্তমান অবস্থাতে নেই। এই প্রশ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়ান্ত বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কথিত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক হলেও ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে নিজেদের ভাষাতেই এইসব বিষয় পড়ানো হয়। তাহলে আমাদের দেশেই বা হবে না কেন? প্রশ্ন হলো উপযুক্ত পরিভাষার ব্যবহার, প্রয়োজন হলে টেকনিক্যাল বিষয়ে দু'একটি ইংরেজী শব্দ কিম্বা ফর্মুলার ব্যবহার এবং ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার সমস্যা। এজন্য উপযুক্ত সময় নিয়ে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলন করা চলে। ইংরেজীকে বাতিল করলে শিক্ষার সর্বনাশ হবে, এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত হলেও গ্রন্থাগারে যথেষ্ট ইংরেজী কিম্বা অন্যান্য ভাষার রেফারেন্স বই রাখা দরকার, যেন উদ্যোগী ছাত্ররা স্বেচ্ছায় পড়তে পারে।

উচ্চশিক্ষা স্তরে ভাষা সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ হলো—(১) দশ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন; (২) কিছুদিন পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজীর ব্যবহার চলতে পারে; তবে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাই চলবে বেশী; (৩) ক্রমান্বয়ে সকল শিক্ষককেই দুই ভাষা জানতে হবে এবং ছাত্রদেরকেও আঞ্চলিক ও ইংরেজী ভাষা—উভয়ের মাধ্যমেই পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে; (৪) অহিন্দী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে হিন্দী কিম্বা উর্দু ভাষাতেও কলেজ চলতে দেওয়া উচিত; (৫) আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার; (৬) প্রাচীন ভাষা এবং ইংরেজীকে ঐচ্ছিকভাবে পড়বার যথেষ্ট সুযোগ রাখা দরকার, (৭) শুধু ইংরেজীই নয়, রুশীয় প্রভৃতি অন্যান্য ভাষারও যথেষ্ট চর্চা প্রয়োজন।

কমিশনের এই সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে পাঁচ বৎসর সময় সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করবার কথা বলা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণায় কোন সময় সীমার উল্লেখ না করে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম করবার কথা বলা হয়েছে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করবার সিদ্ধান্তটি অনতিবিলম্বে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘোষণা করা দরকার। নির্দিষ্ট সময়সীমাও ঘোষণা করা দরকার। সেই অনুযায়ী ধাপে ধাপে আঞ্চলিক ভাষাকে যোগ্য আসন করে দেওয়া উচিত।

ছাত্র বিক্ষোভের প্রশ্ন

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কিম্বা পরীক্ষা গৃহে বিক্ষোভ আজ নিত্য নৈমিত্তিক। এগুলিও ছাত্র অসন্তোষের আংশিক প্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ, আজ জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা, সামাজিক তথা শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি, ছাত্রজীবনের সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই বিস্ফোরণ ঘটে। এই জন্য একতরফা ছাত্রদের দায়ী না করে **বিক্ষোভের অন্তর্নিহিত কারণগুলির বিশ্লেষণ দরকার।** ছাত্রবিক্ষোভের কারণ অনেক। তার মধ্যে ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত কারণগুলিই প্রধান। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে, নূতন কোন সুস্থ মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। এই শূন্যতার মধ্যেই বর্তমান তরুণের দল জন্মেছে এবং বেড়ে উঠেছে। চেতনার জগতে সামাজিক নৈরাজ্য বাস্তব জগতেও এনেছে নৈরাজ্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে সমগ্র জাতি এক ভাবগত ঐক্যে আবদ্ধ হয়েছিল। সেই ঐক্য গেছে ভেঙ্গে। যে ত্যাগমন্ত্র তখন ছিল, তার বদলে এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও আদর্শভ্রষ্টতা। চারপাশে সংস্কৃতিহীনতা, শিক্ষাহীনতা, মূল্যহীনতা, অর্থকৌলিন্য এবং অসৎপথে অর্জিত সামাজিক সম্ভ্রমের পরিবেশে যে তরুণ বড় হয়ে ওঠে, তার পক্ষে বিক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান যুগের তরুণ স্বভাবতই সমাজ সচেতন। (এবং আমরাও তাদেরকে সমাজ সচেতন হতে বলি)। শোষণ, পীড়ন এবং মানবিক আদর্শের অপমৃত্যুতে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। যে ছাত্র অপুষ্টি ও রোগে জর্জরিত, বাড়ীতে পড়াশুনা করবার মত জায়গাটুকু যার নেই, ট্যুইশন করে যার শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করতে হয়, বই ও শিক্ষা সরঞ্জাম থেকে যে বঞ্চিত, শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা যে পায় না, সহপাঠ্যক্রমিক কাজ এবং আনন্দময় অবসর যাপনের সুযোগ যার নেই, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ যার অনিশ্চিত, তার পক্ষে শিক্ষার মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। স্বভাবতঃই সে বিক্ষুব্ধ।

শিক্ষা প্রশাসনও আজ গলদে ভরা। প্রতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দলাদলির কথাও আজ আর চাপা নেই। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে চলছে নানা স্বার্থ, এমনকি গোষ্ঠীস্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থেরও সংঘাত। শৃঙ্খলাহীনতার এই

চিত্র যদি সমাজের সকল স্তরেই প্রসারিত হয়ে থাকে, তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে কি হবে ?

বিক্ষোভের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ অবশ্য শিক্ষাগত। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্খা আজ অনেক ব্যাপক, অথচ কলেজে স্থানাভাব। বিভিন্নমুখী ব্যবহারিক এবং অর্থকরী শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ। উপায়ান্তর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের দরজায় লাইন দেয়। যারা প্রবেশাধিকার পায় তারাও দেখে সরঞ্জামের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রম, মামুলি শিক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আত্মিক যোগোযোগের অভাব। অর্থের মানদণ্ডে শিক্ষকেরও আজ সামাজিক মর্যাদা নেই, তাই ছাত্রের কাছেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেন না। সর্বোপরি পরীক্ষার খড়্গ রয়েছে মাথার উপর। পাশ করলেও অন্নচিন্তা।

বস্তুতঃ ছাত্রসমাজে আজ অসন্তোষ স্বাভাবিক। একমাত্র প্রশ্ন হতে পারে বিক্ষোভ প্রকাশের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে। কিন্তু অনেকে সহজ পন্থায় সমাধানের জন্য ছাত্রদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার হরণ করবার কথাও বলেন। অথচ রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন এবং সর্বশেষে কোঠারি কমিশন সমগ্র বিষয়টি সহানুভূতিশীল গঠনমূলক দৃষ্টিতে দেখবার প্রস্তাব করেছেন। বস্তুতঃ সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অসঙ্গতি দূর হলেই অসন্তোষ দূর হবে, কারণ **অসংগতিই বিক্ষোভের মূল।**

এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—(১) শিক্ষার প্রসার, বহুমুখীনতা এবং যোগ্যতানুসারে শিক্ষার সুযোগ; (২) পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং প্রতিনিয়ত নবীকরণ; (৩) ছাত্রছাত্রীর জন্য হোস্টেল এবং আবাসিক ব্যবস্থার প্রসার; (৪) গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ, (৫) ছাত্র নির্দেশনার ব্যবস্থা, (৬) হেলথ্ সার্ভিস; (৭) আরও বেশী সংখ্যায় বৃত্তিদান, অবৈতনিক শিক্ষা এবং আংশিক আয়ের ব্যবস্থা; (৮) ছাত্র স্বায়ত্তশাসন; (৯) শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক; (৯) শিক্ষা প্রশাসনে ছাত্রদের অংশীদারত্ব; (১০) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা; (১১) যথেষ্ট ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ।

যুবকল্যাণ ব্যবস্থার সামান্য প্রয়াস মাত্র এখন পর্যন্ত হয়েছে। যুব-

কল্যাণব্যবস্থার মধ্যে আন্ত-কলেজ এবং আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় উৎসবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে যুব কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরণের সহপাঠ্যমূলক কর্মপ্রয়াস সংগঠন করা। (উল্লেখযোগ্য যে এইসব বোর্ডের উদ্যোগে **ছাত্রদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সমীক্ষার ফলে বেদনাদায়ক চিত্র উদঘাটিত হয়েছে।**) বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Youth Employment Bureau. ভ্রমণ কনশেসন্ এবং 'Youth Hostels Association'-এ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু Leadership Training Camp একটি হাস্যকর প্রয়াসে পরিণত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যমকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ললিতকলা এ্যাকাডেমি, এবং সঙ্গীত এ্যাকাডেমি। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক চুক্তি, প্রদর্শনী, অধ্যাপক ছাত্র ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের সাহায্যে।

কিন্তু বিদেশের দিকে তাকালে আমরা অবাক হয়ে যাব। আমেরিকা ইংলণ্ড, রাশিয়ায় কলেজের ভিতরে ও বাইরে ছাত্রদের সংগঠন, সাহিত্য ও চারুকলা সংগঠন, বিতর্ক ও বক্তৃতা সংগঠন, খেলাধূলা শরীর চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা, শিক্ষা ভ্রমণের সুযোগ, সমাজসেবা প্রকল্প, অবসর যাপনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, স্বায়ত্তশাসন সংগঠন এবং অন্যান্য নানা ধরণের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুযোগ রয়েছে। এজন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় প্রচুর। তাছাড়া আঞ্চলিক কিম্বা জাতীয় ভিত্তিতে রয়েছে যুব-ছাত্র প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্রকল্যাণের ব্যবস্থা যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর হলো সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা। রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ইউনিয়নের বাৎসরিক অনুষ্ঠান কিম্বা বিভাগীয় রি-ইউনিয়নের ব্যবস্থা ছাত্ররাই করে থাকে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ থেকে আন্তঃকলেজ খেলা কিম্বা স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাভাব এবং অন্যান্য কারণে এর বেশী কিছু করা প্রায় কোন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্ভব হয়না। সুতরাং এক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দরকার। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে কোঠারি কমিশনও এবিষয়ে সুপারিশ করেছেন।

কোঠারি কমিশন উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবা-কেন্দ্র (Day Centre), সহপাঠ্যমূলক কার্যক্রম, আন্তঃকলেজ এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়

অনুষ্ঠান, ছাত্র-ইউনিয়ন এবং ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির সুপারিশ করেছেন। সমাজসেবায় কার্যসূচীতে চতুর্থ পরিকল্পনার পরে *N.C.C.* বাতিল করে তৎপরিবর্তে সমষ্টি প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছাত্র-অসন্তোষ দূর করবার জন্য এবং ছাত্র-প্রশাসন সম্পর্ক নিকটতর করার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্ষণের *Dean of Student Welfare* নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুপারিশ করেছেন।

উচ্চশিক্ষার প্রশাসন

উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করবার আগে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রকমভেদ আলোচনা করা দরকার, কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ভরশীল।

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা সাধারণভাবে তিনশ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(১) বিশ্ববিদ্যালয়, (২) পেশাগত ও কারিগরি ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক ইনস্টিটিউট (যেমন খড়্গপুরের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট কিম্বা ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউট)। (৩) গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয়তঃ বলা প্রয়োজন যে সাধারণ কলেজগুলি যেমন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, আইন, শিক্ষক শিক্ষণ এবং অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশে এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, রাজ্যসরকারেরও আছে; আবার উভয়ে যৌথ উদ্যোগেও দায়িত্ব নিতে পারে। তবে সাধারণভাবে ইনস্টিটিউটগুলি এবং অনেক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এ জন্য রয়েছে সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের। এদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য রয়েছে C.S.I.R. তেমনি কেন্দ্রীয় মালিকানাধীন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-গুলি নিয়ন্ত্রণ করে N.C.E.R.T.

মালিকানার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রীয় (যেমন বিশ্বভারতী, বেনারস প্রভৃতি) এবং রাজ্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল দায়িত্ব বহন করেন এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আংশিক দায়িত্ব বহন করেন রাজ্য সরকার। রাজ্য আইন সভায় নির্দ্ধারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি, গঠন এবং এক্তিয়ার। রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিস্তৃত নিয়মবিধি প্রণয়ন করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকারকেও কেন্দ্রীয় অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন পার্লিয়ামেন্টের আইনে গঠিত স্বয়ংশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ, জি, সি)।

প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) Affiliating, examining, certifying. আমাদের দেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষার যাত্রা সুরু হয় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের কোন দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান অপ্রচলিত। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর হলো Affiliating, Teaching, Examining, Certifying. এই ধরণের প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশে সর্বাধিক। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো Unitary. এই ক্ষেত্রে আলাদা কোন অনুমোদিত কলেজ থাকেনা। (যাদবপুর, বিশ্বভারতী এই শ্রেণীর। রবীন্দ্রভারতী এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীত ও নাচের কলেজকে অনুমোদন দিয়ে থাকে।) (৪) চতুর্থ শ্রেণীর হলো ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে সবগুলি কলেজ এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাকেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। দিল্লী এই শ্রেণীর। (৫) পঞ্চম শ্রেণীবিভাগ করা চলে আবাসিক (Residential) এবং দিবা (Day) চরিত্রের ভিত্তিতে। কল্যানী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি আবাসিক শ্রেণীর। কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্র সংখ্যার চাপ এবং আর্থিক অবস্থার জন্য শুধু আবাসিক চরিত্র রক্ষা করাই দুষ্কর। তাই অধিকাংশ আবাসিক প্রতিষ্ঠানকেই দিবাছাত্র গ্রহণ করতে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ টি। (১) বিশ্বভারতী (কেন্দ্রীয়),

(২—৭) কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী, বর্দ্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ। এগুলি সবই রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠান। এগুলির মধ্যে কলকাতা, বর্দ্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হলো Affiliating-Teaching. বিগত কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষক, সরঞ্জাম, সুযোগ সুবিধে, শিক্ষামান প্রভৃতির তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং সীমাবদ্ধ সঙ্গতির অসদ্ব্যবহার হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় নানা বৈচিত্র্য আছে—কারণ পার্লিয়ামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভার আইনের মধ্যে এইসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম। তবে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভিজিটর" হয়ে থাকেন ভারতের রাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধানমন্ত্রী, আর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার থাকেন রাজ্যপাল। নিত্যদিনের কাজের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত পরিচালক হলেন উপাচার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারও থাকেন। এঁদের নীচে প্রশাসনের জন্য থাকেন রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষার কণ্ট্রোলার এবং কলেজ পরিদর্শক প্রভৃতি।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণের জন্য থাকে সিনেট। (এই সংস্থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্ট, The University প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়েছে)। দৈনন্দিন প্রশাসনের জন্য থাকে সিণ্ডিকেট। (একে অনেক ক্ষেত্রে Executive Council বলেও অভিহিত করা হয়)। পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য শিক্ষাগত বিষয়ের জন্য থাকে এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল। এইসব সাধারণ সংস্থাগুলি ছাড়া বিভিন্ন পাঠ্য বিভাগের জন্য থাকে ফ্যাকাল্টি, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠের জন্য পৃথকভাবে কাউন্সিল ও বোর্ড অফ স্টাডিস। এই সব সংস্থার সভ্য নির্বাচন এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রচুর হেরফের রয়েছে। গণতান্ত্রিকতার মাত্রানুসারে নির্বাচনের প্রশ্নটি নির্দ্ধারিত হয়।

প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে হলো অনুমোদিত কলেজগুলির প্রশ্ন। অনুমোদনের নিয়মাবলী, কলেজ পরিদর্শন, কলেজ পরিচালক সমিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি পন্থায় কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রশাসন

বিশ্বভারতী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৬টি; স্নাতক কলেজ

দুই শতাধিক; (মেডিক্যাল কলেজ ৫ টি—অবশ্য এবার বর্দ্ধমানে প্রাক মেডিক্যাল ক্লাশ খোলা হয়েছে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬ টি)। এই ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে রাজ্য আইনসভার আইন করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠণতন্ত্রে আছে অনেক পার্থক্য। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুবই বেশী; তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় মনোনীত সভ্য এবং পদাধিকার বলে সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যাধিক্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষে আছেন চ্যান্সেলার (রাজ্যপাল), উপাচার্য, দুজন প্রো ভাইস-চ্যান্সেলার, রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তা। নীতি নির্দ্ধারণের জন্য আছে সিনেট, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বিভাগীয় ফ্যাকাল্টি, কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ-স্টাডিস। আর দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্য আছে সিণ্ডিকেট। (এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।)

উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থান

উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের উৎসকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে—কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ, ছাত্রবেতন, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান এবং বিদেশী সাহায্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বরাদ্দ দুই ধরণের—পরিকল্পনাখাতে এবং রাজস্বখাতে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যয় করা হয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, বিভিন্ন ধরণের বিশেষ স্কীমের জন্য, ছাত্রবৃত্তির জন্য, গবেষণার জন্য এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অনুদানের জন্য। এ ছাড়াও নানা ধরণের ব্যয় করা হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে। কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয় করা হয় U.G.C; A.I.C.T.E. (কারিগরি পরিষদ); C.S.I.R, ; N.C.E.R.T. প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়িত হয় প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক বিনিময়, বিশেষজ্ঞ আমদানী এবং বিদেশে যাওয়ার বৃত্তি প্রভৃতির জন্য, কিম্বা বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী স্কীমের জন্য।

রাজ্য স্তরে অর্থের উৎস হলো শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দান, ছাত্রবেতন, রাজ্য সরকারের অনুদান এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ যোগ করেও উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা (সংশোধিত বরাদ্দ ৮৭ কোটি)। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় খাতে ধরা হয়েছে ১৮১'৭১ কোটি টাকা। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য কিছু পৃথক বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

কিন্তু টাকার অঙ্কটিকে যতই বড় মনে হোক না কেন, প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ নিতান্তই অল্প। **এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা মূলতঃ অভিভাবকের পকেটের উপর নির্ভরশীল**। নীচের হিসাবটি থেকেই একথা পরিষ্কার হবে।

	কত ছাত্র বেতন দেয়	মোট ব্যয়ের অনুপাতে বেতন আদায়
কারিগরি প্রতিষ্ঠান—	৭২'০ শতাংশ	১৭'২ শতাংশ
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ—	৮৪'৯ "	৪৮'৫ "
পেশা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান—	৮৭'৯ "	২২'২ "

কোঠারি কমিশন অবশ্য অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছেন। ছাত্রপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে :—

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
স্নাতক (আর্ট ও কমার্স)—	৩২৮ টাকা	৭৩৩ টাকা	৯:৭ টাকা
" বিজ্ঞান ও কারিগরি—	১১৬৭ "	১৫০০ "	২০০০ টাকা
স্নাতকোত্তর (আর্ট ও কমার্স)—		৩০০০ "	৩৬০০ "
স্নাতকোত্তর (বিজ্ঞান ও কারিগরি)—		৫০০০ "	৬০০০ "

পশ্চিমবঙ্গে অর্থ সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ সমস্যা হলো আধুনিক যুগের প্রথম এবং ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য**। কয়েকটি উদাহরণ থেকেই একথা পরিষ্কার হবে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি আয় বার্ষিক ১৯২ টাকা; কলকাতায় ৭২ টাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলিতেই ছাত্রসংখ্যা ২ লক্ষ [লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ গুণ]। কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। কিন্তু সেখানকার আয় অনেক বেশী। পাঞ্জাবের আয় প্রায় কলকাতার দ্বিগুণ।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও অর্থবরাদ্দের বৈষম্য আছে। ১৯৬৬-৬৭ সনে স্নাতকোত্তর ছাত্র প্রতি মোট আয় যাদবপুরে ১৮৩৬৩ টাকা, কল্যাণীতে ৩৭১৫ টাকা, কলকাতায় ১০০২ টাকা। রাজ্য সরকারের অনুদানেও আছে বৈষম্য। ছাত্রপিছু রাজ্য সরকার থেকে বৎসরে দেওয়া হয় যাদবপুরকে ৭৮৭ টাকা, বর্ধমানকে ৩৭ টাকা, উত্তরবঙ্গকে ৩৫ টাকা এবং কলকাতাকে ১৪ টাকা।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য একদিকে প্রয়োজন সার্বিকভাবে আরও অর্থ সংস্থান, এবং অপরদিকে সুসম বণ্টন। **এজন্যই রাজ্যস্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দাবি উঠেছে।** এই ধরণের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু যে অর্থ বরাদ্দের ভারসাম্য আসবে তাই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষামানের সমতা, বিশেষীকরণ প্রচেষ্টার উন্নয়ন, সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার এবং দায়দায়িত্ব বণ্টন সহজতর হবে।

কোঠারি কমিশনের বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ বেরিয়েছে। উচ্চশিক্ষার আদর্শ হবে প্রজ্ঞা ও সত্যসাধনা এবং লব্ধজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার। বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতিকে নেতৃত্ব যোগাবে, বিভিন্ন পেশার জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরী করবে, সমাজ-জীবনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়নীতির সহায়ক হবে, সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যবধান হ্রাস করবে, এবং ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বস্ফূরণে সহায়তা করবে। তা ছাড়া সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষণমান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেওয়ার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের। উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণারত শিক্ষকগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সাহায্য আশা করতে পারেন। বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রেও থাকবে দায়িত্ব।

উচ্চশিক্ষা **প্রসারের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে শিক্ষামানের উন্নতি সাধনের।** তাই কমিশন অনুমোদিত কলেজগুলির সাজসরঞ্জাম, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের গুণাগুণ, শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং সর্বাত্মকভাবে শিক্ষামানের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-সংস্কার, শিক্ষা ও গবেষণামানের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত এই যে কেবলমাত্র শিক্ষামান উন্নয়নের স্বার্থে, অথবা বিশেষপাঠের প্রতি বিশেষ সুবিচার করার প্রয়োজনে, অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদনী কর্মপ্রবাহকে সাহায্য করার প্রয়োজনে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব অনুমতি নিয়েই মাত্র নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চলবে।

এই প্রসঙ্গে কমিশন মন্তব্য করেছেন যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে '*advanced centres*' প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তদুপরি একটি কারিগরি, একটি কৃষি এবং চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে "*Major University*"-রূপে গণ্য করে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার স্তরে ভাষাসমস্যাটি কমিশন আলোচনা করেছেন। সুপারিশ করা হয়েছে স্নাতকস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সহৃদয় চিত্তে হিন্দী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজী। অবশ্য এই স্তরে ভবিষ্যতে হিন্দী প্রচলিত হলেও ছাত্ররা ইংরেজী শিখবেন, কমিশন সে আশা ব্যক্ত করেছেন। উচ্চশিক্ষার স্তরে কোন ভাষাকে বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয় হিসাবে না রাখবার স্বপক্ষে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কোঠারি কমিশন উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবা-কেন্দ্র (Day Centre), সহপাঠ্যমূলক কার্যক্রম, আন্তঃকলেজ এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান, ছাত্র-ইউনিয়ন এবং ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির সুপারিশ করেছেন। সমাজসেবার কার্যসূচীতে সমষ্টি প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছাত্র-অসন্তোষ দূর করবার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্ষণের *Dean of Student Welfare* নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুপারিশ করেছেন।

আর্থিক সঙ্গতি, জনশক্তির প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছাত্রভর্তির ক্ষমতা ও শিক্ষামানের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষার্থীর সুযোগ এবং শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তির নীতি স্থির করা

হবে। কমিশন সুপারিশ করেছেন বাছাই নীতি (Selective Approach)। তবে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উদারনীতি গ্রহণ করা উচিত।

(সিলেবাস'এ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ঐচ্ছিক পাঠের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সমগ্র বিষয়টিই সাধারণ এবং আবশ্যিক পাঠ। তাই এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা প্রশাসন ও অর্থ সংস্থান

আমাদের সিলেবাস'এ শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই জমি, বাড়ী, পাঠ্যক্রম, সহপাঠ্যক্রম, অর্থসংস্থান এবং প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলা হয়েছে। আমরা আগেকার অধ্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব সমস্যা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় পর্বে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিটি সমস্যার কথাই পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। সুতরাং এখানে আর এইসব সমস্যার আলোচনা দরকার নেই। এখানে শুধু সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষা প্রশাসনের রূপ এবং অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা আলোচনা করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রশাসনের সার্বিক রূপ

স্বাধীনতার যুগে শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতে এসেছে এবং সংবিধান অনুসারে শিক্ষা প্রশাসনের উন্নতি করবার সুযোগ এসেছে। বিগত কয়েক বছরে একটি সার্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে **সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো জনসাধারণের শিক্ষালাভের অধিকার এবং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের স্বীকৃতি।** সংবিধানের মৌল নীতি এবং মৌলিক অধিকার পর্যায়ে, বিশেষতঃ ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর সূত্রে একথা স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এবং এই ত্রিশক্তির অংশীদারত্বে।

১৯৪৭ সনেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রিত্ব সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭ সনে এই দপ্তর স্বল্পদিনের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। ১৯৫৮ সনেই আবার দুইটি দপ্তর যুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরের দায়িত্ব হলো : (ক) আলীগড়, বেনারস,

দিল্লী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, (খ) সর্বপ্রকার গবেষণায় উৎসাহ ও সম্প্রসারণ, (গ) উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন, (ঘ) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন, (ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সমন্বয়, (চ) সর্বভারতীয় পরিষদের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যসমূহের প্রচেষ্টার সমন্বয় প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর ছাড়াও সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলন, উপাচার্য সম্মেলন, আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড প্রভৃতি সংগঠন। **নীতিগতভাবে আমলা ও শিক্ষাবিদ-গণের যৌথ প্রয়াসের কথাই বলা হয়েছে।** কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরের উপদেষ্টা-সহায়করূপে রয়েছে All India Council of Elementary Education, National Institute of Basic Education, All India Council of Secondary Education, University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Women's Education, Centre of National Fundamental Education, National Advisory Council for Special Education, এবং N. C. E. R.T. প্রভৃতি সংগঠন।

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রতি রাজ্যে রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীদপ্তর, শিক্ষা-অধিকর্তা এবং পরিদর্শন-বিভাগ। **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের।** এ ছাড়া নারীশিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, রাজ্যভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে দপ্তরের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে। **মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আধাসরকারী শিক্ষা বোর্ড।** এ ক্ষেত্রে প্রায় প্রতি রাজ্যেই শিক্ষাদপ্তর ও বোর্ডের মধ্যে দ্বৈতশাসন প্রচলিত। **বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এগুলি সম্পর্কে আইন পাশ করেন রাজ্যের আইনসভা।** বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী অর্থ সাহায্য ভোগ করে এবং এর পরিচালক-সভার মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকে।

স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রশাসনের ক্ষেত্রে রয়েছে কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, জিলা, তহশীল ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সংগঠন, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে গঠিত জিলা শিক্ষাবোর্ড

এবং সাম্প্রতিক কালে পঞ্চায়েৎ সংগঠন। এই সব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রয়াস মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই। শিক্ষা-প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটি প্রভৃতি।

শিক্ষা-প্রশাসন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও সর্বভারতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে, বৃত্তিদান ব্যবস্থা, U. G. C. সংগঠন, বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরিষদের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর হস্তক্ষেপ করেন।

শিক্ষায় অর্থসংস্থান

শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান করা হয় মূলতঃ পাঁচটি উৎস থেকে। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সরকারী অর্থভাণ্ডার। কিন্তু সরকারী রাজস্ব থেকে অর্থবরাদ্দ আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত অত্যন্ত অপ্রতুল। ১৯৫৮-৫৯ সনে কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র ৩'৫ শতাংশ এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে বিভিন্ন রাজ্যের গড় বরাদ্দ ছিল রাজস্বের ২০'৩ শতাংশ মাত্র। রাজস্বভাণ্ডার ছাড়া অন্যান্য উৎস হলো গ্রামাঞ্চলের জন্য স্থানীয় ভাণ্ডার এবং সহরাঞ্চলের জন্য মিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার, জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের দান, ছাত্রবেতন এবং সাম্প্রতিক কালে বৈদেশিক সাহায্য। বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি, উন্নয়ন সাহায্য, সরঞ্জাম সাহায্য এবং শিক্ষক আমদানী প্রভৃতি খাতে এই বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪৪ কোটি টাকা; এবং রাজ্যগুলির মোট বরাদ্দ ছিল ১২৫ কোটি টাকা। এই সম্পূর্ণ অঙ্কটি তদানীন্তন জাতীয় আয়ের ১'২ শতাংশ মাত্র। ১৯৬৫-৬৬ সনে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল জাতীয় আয়ের ২'৯ শতাংশ। এর ফলে মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৯৫০-৫১ সনে ৩'২ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সনে ৫'২ টাকা এবং ১৯৬৬-৬৭ সনে ১২ টাকা মাত্র। অন্য যে কোন প্রগতিশীল দেশের তুলনায় এ অবস্থাটি হাস্যকর।

এই বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথোচিত ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি। তিনটি পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দের হিসেব থেকেই তা পরিষ্কার হবে।

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	১ম পরিকল্পনা	২য় পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনা
প্রাথমিক স্তর—	৮৫ কোটি টাকা	৯৫ কোটি টাকা	২০৯ কোটি টাকা
মাধ্যমিক স্তর—	২০ কোটি টাকা	৫১ কোটি টাকা	৮৮ কোটি টাকা
উচ্চ স্তর—	১৪ কোটি টাকা	৫৮ কোটি টাকা	৮২ কোটি টাকা

তথ্য-তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে **প্রথম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব** আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই গুরুত্ব হ্রাস পায়। বরাদ্দকৃত অর্থেরও অনেকাংশ ব্যয় হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদি ধরণে রূপান্তরকরণের জন্য। তার বদলে **মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়**। এক্ষেত্রে বাড়তি বরাদ্দ ব্যয়িত হয় বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নয়ন এবং বহুমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। (অবশ্য দালান কোঠা তৈরীই অগ্রাধিকার লাভ করেছে)। এই পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার জন্য বেশী বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই বাড়তি ব্যয় অধিকাংশই যায় কারিগরি শিক্ষা বাবদে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যে ৬-১১ বছরের শতকরা ১০০ জন ছেলেকে এবং ৬০ শতাংশ মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা হবে। ১১-১৪ বছরের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে। অর্থাৎ এই বয়সের ৩০ শতাংশকে স্কুলে আনা হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বহুমুখীনতায় পূর্ণ রূপায়ণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, হোস্টেল, ছাত্রবৃত্তি, উন্নত স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করার সিদ্ধান্ত হয়।

বস্তুতঃ তথ্যাদি বিশ্লেষণে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা অন্যান্য স্তরে মানোন্নয়ন প্রভৃতি **যে যে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দানের প্রয়োজন ছিল, তাই কার্যতঃ পালিত হয় নি**। অথচ প্রশাসন-যন্ত্রের জন্য ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রশাসনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১ কোটি টাকা, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয় ৫৭ কোটি টাকা।

সরকারের সীমিত দায়িত্ব

একথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার যে **'রাষ্ট্র' আজও পর্যন্ত শিক্ষায় আংশিক দায়িত্ব বহন করে মাত্র**। ১৯৬৪ সনে সমগ্র ভারতে যে

৬৯৪১৮৮টি অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল তার মধ্যে সরকারের মাত্র ১০৫১৭৪টি, জেলা বোর্ডের ২৫৩৬২৩টি, মিউনিসিপ্যালিটির ১৩৬৯০টি, সাহায্য-প্রাপ্ত বেসরকারী ৩০৯১১০টি, এবং সাহায্যহীন বেসরকারী ১২৫৮৭টি। অর্থাৎ **আজও বেসরকারী উদ্যোগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।**

এখনও পর্যন্ত শিক্ষার জন্য সমগ্র ব্যয়ের **৬৯'৬ শতাংশ বহন করেন সরকার**, ৩'৩ শতাংশ জেলা বোর্ড, ৩'১ শতাংশ মিউনিসিপ্যালিটি, ১৩ শতাংশ ছাত্রবেতন বাবদ অভিভাবকগণ এবং অবশিষ্টাংশ আসে বিভিন্ন দান ও সাহায্য খাতে। সরকারী ব্যয়ের একটি প্রধান অংশ যায় প্রশাসন-যন্ত্র লালন করতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ। **মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষা আজও মূলতঃ অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল।** নীচের তালিকা থেকে এই বেদনাদায়ক সত্য অনুধাবন করা যাবে :

শিক্ষার স্তর	বেতন দেয় কত ছাত্র	মোট ব্যয়ের অনুপাতে বেতন বাবদ আদায়
প্রাক প্রাথমিক	৭৭'৫ শতাংশ	৩৭'২ শতাংশ
নিম্ন প্রাথমিক (I-IV)	৬'৯ ,,	১'৩ ,,
উচ্চ প্রাথমিক (V-VII)	১৬'৪ ,,	৭'৪ ,,
মাধ্যমিক (VIII-XI)	৬৪'৮ শতাংশ	৩৯'২ শতাংশ
বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৭২'০ ,,	১১'২ ,,
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৮৪'৯ ,,	৪৮'৫ ,,
পেশা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান	৮৭'৯ ,,	২২'২ ,,

[illegible]

নির্ভরশীল, তখন শিক্ষায় সমসুযোগ এবং *Common School* সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায় 'দিল্লী দূরস্ত'!

সপ্তম অধ্যায়

ভবিষ্যতের কথা

(কোঠারি কমিশন রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষানীতি, চতুর্থ পরিকল্পনা)

স্বাধীনতার যুগে শিক্ষার বিভিন্ন দিকে অগ্রগতি এবং সমস্যার কথা আলোচনা করেছি। অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার বিভিন্ন দিক এবং স্তরের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয়নি। আলাদা আলাদা ভাবে কয়েকটি কমিশন বসেছিল, নানাধরণের সমীক্ষাও হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দিক সুসংহত করে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই সামগ্রিক সমীক্ষা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সুপারিশ করবার জন্য ১৯৬৪ সনে গঠিত হয় একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন। এটিই কোঠারি কমিশন (ডঃ কোঠারি ছিলেন কমিশনের সভাপতি) নামে পরিচিত। ১৯৬৬ সনে এই কমিশন বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করেন। ঐ রিপোর্টেই রয়েছে ভবিষ্যৎ শিক্ষার ইঙ্গিত।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও ব্যাহতদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য আমরা দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচনা করবো। উচ্চশিক্ষার কথা বলা হয়েছে এই পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে। এখানে আমরা কমিশনের সাধারণ মৌলিক বক্তব্য উপস্থিত করছি।

কোঠারি কমিশন রিপোর্ট

কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বর্তমান ভারতের সর্বাপেক্ষা গভীর সমস্যা হলো খাদ্যসমস্যা। দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো বেকারসমস্যা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান নেই। তৃতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সমস্যা। আজও অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মীয় গোড়ামি, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি প্রতিক্ষণেই সংহতির পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতার আশংকা সৃষ্টি করছে। চতুর্থ বৃহত্তম সমস্যা হলো বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যায় ভারতের অনগ্রসরতা। পারমাণবিক যুগে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিস্তার এত

দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটছে যাকে বলা চলে এক দ্বিতীয় "বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লব"। দ্রুতগতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে না পারলে ভারতের পশ্চাৎপদতা কখনই ঘুচবে না। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলো **আত্মিক মূল্যবোধের সমস্যা।** বস্তুত বর্তমান ভারতে চলেছে এক **মূল্যবোধের সংকট**' এইসব সমস্যা ও সংকট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে জাতির সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বাত্মক শিক্ষা। **শিক্ষাই হবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের বাহন।** শিক্ষাই আনবে জনগণের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং নিশ্চিন্ততা। সুতরাং আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য **প্রয়োজন এক শিক্ষাবিপ্লব।** আজ প্রয়োজন হয়েছে জনজীবনের আশা আকাংক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

কিন্তু কি ভাবে শিক্ষার সঙ্গে মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও আকাংক্ষার সংযোগসাধন সম্ভব? **কাজের সাথে সংযোগ স্থাপনের পথেই জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ সম্ভব।** সুতরাং শিক্ষাকে নিয়োজিত করতে হবে কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পে উৎপাদনের স্বার্থে। জাতির আশা আকাংক্ষার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য দেশের **বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তির সদ্ব্যবহারই জাতীয় অগ্রগতির একমাত্র গ্যারাণ্টি।** শিক্ষাক্ষেত্রে যুগপৎ পরিমাণগত প্রসার এবং গুণগত উন্নতির মাধ্যমেই এই কাজ সম্ভব।

যে কোন ভাল শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি উপাদান একান্তই আবশ্যিক। প্রথম উপাদানই হলো সাক্ষরতা। এখানেই রয়েছে ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব। **দ্বিতীয় উপাদান গাণিতিক দক্ষতা।** অর্থাৎ, গণিত এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। **তৃতীয় উপাদান উৎপাদনী কর্মদক্ষতা।** সুতরাং বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং উৎপাদনী কর্মে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। **চতুর্থ উপাদান সামাজিক দক্ষতা।** এই সূত্রেই শিক্ষার অঙ্গরূপে সমাজসেবার গুরুত্ব। সর্বশেষে **উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্য সংহতি।** এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার **সমসুযোগ,** সকলের জন্য **সাধারণ স্কুল** (কমন স্কুল), বিদ্যালয়ের মধ্যে **সামাজিক জীবন,** সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সরিক হয়ে **জাতি ও সমাজসেবা,** উপযুক্ত ভাষা-প্রকল্পের সাহায্যে

পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীকরণ, তথা ভাবগত সংহতি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি সমগ্র ভারতের জন্য একটি সুসংহত জাতীয় শিক্ষাকাঠামো প্রণয়ন।

প্রস্তাবিত শিক্ষাকাঠামো

নূতন শিক্ষাকাঠামো হিসাবে কমিশন প্রস্তাব করেছেন :

এক থেকে তিন বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হবে।

—প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য একটি শিশুশ্রেণীর ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এই বছরটিতেই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব চলবে।

পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে একটানা ৭ কিংবা ৮ বছরের। এই সম্পূর্ণ স্তরটিকে সুবিধের জন্য ২ ভাগে ভাগ করা চলবে। এর মধ্যে নিম্ন-প্রাথমিক স্তর হবে ৪ কিংবা ৫ বছরের, উচ্চপ্রাথমিক স্তর হবে তিন কিংবা দুই বছরের। নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষাকে অনতিবিলম্বে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাকেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈতনিক করা হবে।

প্রাথমিকোত্তর স্তরে থাকবে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা কিংবা ২ অথবা ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরের বিশ শতাংশ শিশুকে বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হবে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। দশ বৎসরব্যাপী এই সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কোন বিশেষীকরণ থাকবে না।

—বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে থাকবে ২ বছরের সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা। শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রকেই বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বর্তমানের মত বিশেষীকরণের ভিত্তিতে ছাত্রবিভাগ (প্রবাহ) থাকবে না। (অর্থাৎ ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন বিশেষীকরণই থাকবে না। শেষ দুই বছরে বিশেষ পাঠের সূচনা হলেও চরম বিশেষীকরণ হবে না।) প্রসঙ্গত লক্ষ্যণীয় যে কমিশনের প্রস্তাবে

রয়েছে দুই রকমের মাধ্যমিক বিত্তালয়ের কল্পনা—দশ শ্রেণীর এবং দ্বাদশ শ্রেণীর।

—মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বিশ্ববিত্তালয় স্তরে থাকবে তিন বা ততোধিক বছরের প্রথম ডিগ্রী স্তর এবং তদূর্ধ্বে ২ বছরের দ্বিতীয় ডিগ্রী কিংবা গবেষণার স্তর। কোন কোন বিশ্ববিত্তালয়ে ৩ বছরের স্নাতকোত্তর পাঠের পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলতে পারে। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও থাকবে নানা ধরনের পূর্ণ সময় কিংবা আংশিক সময়ের শিক্ষা। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে সমচেতনা এবং সমধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের নামকরণ সমগ্র ভারতে একই রকমের হওয়া বাঞ্ছনীয়। (অবশ্যই ডায়গ্রামটি মিলিয়ে নিও।)
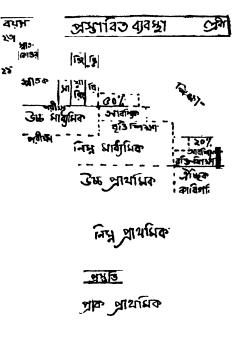
(প্রাক্‌-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কারিগরি কৃষি বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের মূল সুপারিশগুলি আমরা দ্বিতীয় পর্বে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করবো।)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

১৯৬৪-৬৬ সনের শিক্ষাকমিশন রিপোর্টের মধ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার :—

(১) দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। নিম্নপ্রাথমিক

স্তরে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীকে এক একটি চক্র (Cycle) রূপে বিবেচনার সুপারিশও ইতিবাচক। তা ছাড়া প্রাথমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষা বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ এবং মতবৈষম্য দূর করার সুপারিশ করা হয়েছে।

(২) মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পাঠ্যক্রম এবং কেবল একাদশ বর্ষে বিশেষীকরণের সূচনার কথাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে প্রবাহ ব্যবস্থার অবসান এবং ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। দশম শ্রেণীর পরে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা, পরীক্ষার সংস্কার এবং অভিজ্ঞানপত্রের নূতনত্ব সম্পর্কে সুপারিশগুলিও উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি অষ্টম শ্রেণী থেকেই সাধারণ ও অগ্রবর্তী মানে (Ordinary and Advanced levels) শিক্ষাদানের প্রস্তাবনা আমাদের দেশে এই প্রথম।

(৩) উচ্চশিক্ষা স্তরে সুপারিশের মূলকথা মানোন্নয়ন। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবণতাকে কমিশন সমর্থন করেন নি। তাই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাকে ইউ. জি. সি-র অনুমোদন-সাপেক্ষ করা হয়েছে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামানের উন্নতি, প্রশাসন-সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধেও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হলো *University Centre, Advanced Centre* এবং *Major University* সম্পর্কীয় সুপারিশ।

(৪) কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব, এবং কৃষি-শিক্ষায় *Extension* ব্যবস্থার অগ্রাধিকার সম্পর্কীয় বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। (৫) শিক্ষকদের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই ধরণের চাকুরীবিধি, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং বেতনক্রমের সুপারিশও উল্লেখনীয়। (৬) তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় পরিমাণগত অসাম্য দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (৭) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কমিশন পুনর্বার ঘোষণা করেছেন। (৮) পরীক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশের অভিনবত্বের- কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। (৯) কমিশন হুঁশিয়ার করেছেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যার তাগিদে যেন মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অবহেলিত না হয়। (১০) ভাষাসমস্যা সম্পর্কে কমিশনের

সুপারিশও পূর্ববর্তী সুপারিশসমূহ থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত। মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি নতুন ত্রি-ভাষা ফর্মুলা উপস্থিত করেছেন।

এই ফর্মুলাটি নিম্নানুরূপভাবে উপস্থিত করা যায়:

নিম্নপ্রাথমিক	মাতৃ/আঞ্চলিক ভাষা	×	×
উচ্চপ্রাথমিক	„	রাষ্ট্রীয়/সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা	×
নিম্নমাধ্যমিক	„	„	একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা
উচ্চমাধ্যমিক	মাতৃ/অঞ্চলিক ভাষা	এবং উপরিলিখিতগুলির মধ্যে একটি।	
বিশ্ববিদ্যালয় স্তর		কোন ভাষাশিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে না।	

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে ইংরেজী পাঠের বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পাঠের কথা বলেছেন। দশ বৎসর সময়সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চ-শিক্ষার বাহন করার সুপারিশ করেছেন। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকেই যোগসূত্র হিসাবে কমিশন স্বীকার করেছেন। তাই বিদ্যালয় স্তর থেকেই ইংরেজীর মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপাতত সর্বভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীই থাকবে ভাষামাধ্যম। তবে পরিণামে এই স্থান গ্রহণ করবে হিন্দী। কেবলমাত্র ইংরেজী অথবা হিন্দীকেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগসূত্র না রেখে কমিটি বহুমুখী যোগসূত্রের কথা বলেছেন।

কয়েকটি মূল নীতির সুপারিশ

কোঠারি কমিশন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি মৌল নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

(১) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষার সকল স্তরে কর্মপরিচিতির কথা (Work Experience)। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মনের সমন্বয় চাই, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার সমন্বয় চাই। তাই উৎপাদনী শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সংযোগের সুপারিশ করা হয়েছে।

(২) **দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো সমাজসেবা প্রকল্প** (Social Service)। সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন, সামাজিক দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের বাস্তব জীবন এবং সমস্যাবলীর সঙ্গে সাঙ্গীকরণ ছাড়া এই চেতনার উদ্রেক অসম্ভব। **এই অর্থে শিক্ষা সমাজ-সেবার নামান্তর মাত্র।** কমিশন তাই বাধ্যতামূলক সমাজসেবার কথা বলেছেন এবং সেবামূলক কর্মসূচীও সুপারিশ করেছেন।

(৩) **তৃতীয়ত কমিশন অধ্যাত্ম ও নৈতিক শিক্ষার সুপারিশ করেছেন।** মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মমতের সার সংকলন এবং নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পাঠকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৪) **চতুর্থতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিগত করণের কথাও গুরুত্বপূর্ণ।** এতদিন পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল তত্ত্বমূলক এবং মূলত উচ্চশিক্ষার সোপানস্বরূপ। কোঠারি কমিশন মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বৃত্তি শিক্ষার জন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। তাই সপ্তম শ্রেণীর শেষে এবং দশম শ্রেণীর শেষে বৃত্তিবিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট হারে ছাত্র-ভর্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

(৫) তদুপরি কমিশন **শিক্ষার সকল স্তরে "বাছাই নীতির"** (*Selective Approach*) **কথা বলেছেন।** একমুখী শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতাই সমাজের প্রয়োজন। তাই সমাজের প্রয়োজন, এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে **প্রতি স্তরে ছাত্র বাছাই করে বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত করা প্রয়োজন।**

(৬) **কমিশন বলেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কথা** (Education for Economic Growth)। যে শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করে না, সে শিক্ষা বাস্তবে নিষ্ফল। **যে শিক্ষা বাস্তব উৎপাদন-দক্ষতায় কার্যকরী হবে, তাই প্রকৃত শিক্ষা।** বহুমুখী উৎপাদনী ক্ষেত্রে শিক্ষা যদি কার্যকর হয়ে ওঠে, তবেই বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(৭) এই সূত্রেই কমিশন মন্তব্য করেছেন যে **অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জনশক্তি পরিকল্পনা করাই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল কথা।** জাতীয় জীবনে বিভিন্ন কর্মোদ্যমের

ক্ষেত্রে কোন ধরণের দক্ষতা-সম্পন্ন কত জনশক্তি প্রয়োজন, তা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে সেই অনুসারে জনশক্তির বণ্টন এবং শিক্ষা ও শিক্ষণই জাতীয় উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

(৮) দ্ব্যর্থহীন ভাবে কমিশন ঘোষণা করেছেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরির যুগ মানব সমাজের নিকট এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। যে জাতি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না, তার অস্তিত্বের অধিকার থাকবে না। ভারতবর্ষকেও হতে হবে এই যুগের সমকক্ষ।

(৯) শিক্ষায় সমসুযোগের সুপারিস গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষায় সম অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রই নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষার সম সুযোগ মৌলিক নাগরিক অধিকারের অন্যতম বলেই আজ পরিচিত। শিক্ষায় সম সুযোগের অর্থ সকলের জন্য এক শিক্ষা নয়। এর প্রকৃত অর্থ ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি কিম্বা স্ত্রী-পুরুষ অথবা অঞ্চল নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের স্বীয় প্রবণতা ও দক্ষতা অনুসারে আত্মবিকাশের শীর্ষে উন্নীত হওয়ার অধিকার। রাষ্ট্রের সাধ্যানুযায়ী ব্যয়ে সকলের প্রয়োজনমত সর্বোত্তম শিক্ষার সুযোগই শিক্ষায় সম-অধিকারের মূলকথা। জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার সকল দায়িত্ব অর্পিত হলেই সমতার আশা করা যায়।

(ক) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহই হবে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। পঞ্চম পরিকল্পনা সমাপ্তির পূর্বে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষাকেও অবৈতনিক করার সুপারিশ করা হয়েছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ এবং যথেষ্ট লাইব্রেরীর সুযোগ, বুক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোত্তম দশ শতাংশ ছাত্রকে পুস্তক ক্রয়ের সাহায্য দেবার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

(খ) ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে আর্থিক অনটনের জন্য প্রতিভার অবক্ষয় না হয়, সে জন্য উচ্চপ্রাথমিক স্তর থেকেই বৃত্তির ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমসুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত, কিংবা সন্তোষজনক, কিংবা বৈজ্ঞানিক নয়। তবুও নীতিগতভাবে সমসুযোগের প্রথম স্বীকৃতি হিসেবে কমিশনের সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ।

সমসুযোগ নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত রয়েছে Common School সমস্যা। বর্তমানে সরকারী ও বহু ধরণের বেসরকারী কর্তৃত্বে বিদ্যালয় রয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা মান ও সুযোগ যেমন অসমান, তেমনি শিক্ষকদের বেতন, চাকুরীর সর্ত এবং অপরাপর সুযোগও অসমান। অপরদিকে পিতামাতার পকেটের শক্তিতে ভাল শিক্ষা ক্রয় করা সম্ভব। উচ্চমূল্যে ক্রয়ে যারা অসমর্থ, তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে নিকৃষ্ট মানের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের শ্রেণীবৈষম্য এবং পিতামাতার শ্রেণীবৈষম্য ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেও শ্রেণীবৈষম্য রচনা করে। সামাজিক ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এ জিনিসটিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তাই "সকলের জন্য এক স্কুল" তথা সর্বসাধারণের স্কুল (Common School) নীতিই আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার সকল দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত না হয়, ততদিন প্রকৃত Common School সম্ভব নয়। কমিশন একে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষায় শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

Common School-এর দিকে পদক্ষেপ রূপে কমিশন প্রস্তাব করেছেন—(ক) বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, (খ) অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, (গ) বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি এবং (ঘ) আগামী ২০ বছরের মধ্যে Neighbourhood School নীতি কার্যকর করা। এই নীতির মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের চারিপাশের সকল শিশুই সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে, অঞ্চল ছাপিয়ে অন্য কোন বিদ্যালয়ে যাবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে সকল বিদ্যালয়কেই সমস্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন। কমিশন তাই প্রথমে নিম্নপ্রাথমিক এবং ক্রমে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে এই নীতি প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন।

Common School সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ যত দুর্বলই হোক, এই সম্পর্কে নীতিগত স্বীকৃতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে।

শিক্ষা-প্রশাসন

শিক্ষার নূতন কাঠামো কিংবা নূতন নীতিই যথেষ্ট নয়। ঐ নীতি কাজে প্রয়োগ করার উপরই নির্ভর করবে ফলশ্রুতি। আর কাজে প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা।

কমিশনের মতে ভারতের শিক্ষা-প্রশাসন সংগঠিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকার এবং রাজ্যসরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের অংশীদারী-ব্যবস্থায়। রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারিত হবে শিক্ষার স্বার্থে। তবে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েৎ এবং মিউনিসিপ্যালিটির উপর। সরকার এদেরকে আর্থিক সাহায্য দেবেন। **সরকারী সাহায্য ব্যয়িত হবে শিক্ষক-বেতন প্রভৃতি পৌনঃপুনিক প্রয়োজন, আর স্থানীয় অর্থ ব্যয়িত হবে উন্নয়নের প্রয়োজনে।**

জিলাভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনের জন্য থাকবে আইনসিদ্ধ জিলা স্কুলবোর্ড। জিলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং বেসরকারী শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হবে এই বোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সকল স্তরের শিক্ষাই এই বোর্ডের আওতায় আসবে। বোর্ড জিলাভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করবে এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করবে। **প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য থাকবে স্থানীয় বিদ্যালয় কমিটি।** মূলত বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গ সম্বন্ধেই দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির। **দুই রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।** এক শ্রেণীর পরিদর্শকের কাজ হবে শিক্ষামানের উন্নয়ন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব হবে বিদ্যালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত।

রাজ্যস্তরে প্রশাসনের জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, মূল্যায়ন-সংস্থা (Evaluation Organisation), Institute of Education, শিক্ষক-শিক্ষণ কাউন্সিল এবং সর্বোপরি রাজ্য শিক্ষা-পরিষদ।

সংবিধান অনুসারে উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত সকল স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। কিন্তু সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা, জনশক্তি পরিকল্পনা, পেশা ও বৃত্তিশিক্ষার সুব্যবস্থা, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, ব্যাপক হারে ছাত্র-বৃত্তি প্রবর্তন, শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বিধান, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা স্থাপন, অনগ্রসর উপজাতি ও গোষ্ঠী অথবা 'বিশেষ শিক্ষা', কিংবা নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্বও কমিশন স্বীকার করেছেন। তাই **জাতীয় স্কুলবোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মডেল আইন তৈরী এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত বিবৃতির সুপারিশ**

করা হয়েছে। ঐ বিবৃতির ভিত্তিতে রাজ্যসরকারগুলি শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করবেন।

ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়েছে, এই যুক্তিতে কমিশন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে স্বশাসিত বিদ্যালয় (Independent) এবং অনুমোদিত বিদ্যালয় থাকবার অধিকার স্বীকার করেছেন। তবে এগুলিকে সরকারী দপ্তরে তালিকাভুক্ত করে নিতে হবে মাত্র। বলা চলে যে এই অধিকারের স্বীকৃতিই Selective Approach, Equality of Opportunity এবং Common School সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির সমাধি রচনা করতে পারে।

শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য

কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাপ্রসারের সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হবে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সনের মধ্যে ৭ বছরের প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ বৎসরে উন্নীত করা হবে। ১৯৮৫ সনের পরে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায়॥

কোন্ সময়ের মধ্যে কোন স্তরের শিশুর কত শতাংশকে বিদ্যালয়ে আনবার লক্ষ্য সুপারিশ করা হয়েছে, তা বুঝা যাবে নিম্নোক্ত হিসাব থেকে।

শতাংশের হিসাবে

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
নিম্নপ্রাথমিক	৭৬'৪	৯২	১০০	×	×
উচ্চপ্রাথমিক	২৯'৮	৫০'৭	৬৯'২	৮২'৩	৯০'০
নিম্নমাধ্যমিক	১৫'৭	২৩'১	২৯'১	৩৬'০	৪৬'০
উচ্চমাধ্যমিক	×	৯'২	১১'০	১৪'৮	২০'৪
বিশ্ববিদ্যালয়	১'৯	২'৪			
কারিগরি ডিগ্রী	১৯১৪০ জন	৩০০০০ জন			
কারিগরি ডিপ্লোমা	৩৭৩৯০ "	৬৮০০০ "			

শিক্ষায় অর্থসংস্থান

শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ সম্পর্কেও কমিশন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন

১৯৬৫-৬৬ সনে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে জাতীয় আয়ের ২'৯ শতাংশ মাত্র। এই অর্থের মধ্যে আবার প্রাথমিক স্তরের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩২'৫ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৩৫'০ এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে ৩২'৫ শতাংশ। ছাত্রপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৫০-৫১ সনে ছিল বার্ষিক ৩৭ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সনে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে বার্ষিক ৬৪ টাকা মাত্র। লোকসংখ্যা অনুপাতে মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল বার্ষিক ১২ টাকা মাত্র। নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ প্রচুর বৃদ্ধির প্রয়োজন।

কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে ছাত্রপিছু বার্ষিক গড় ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন :—

(টাকার হিসেবে)

	১৯৬৫-৬৬	১০৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
প্রাক প্রাথমিক	৫৫	৭৪	১০৩
নিম্নপ্রাথমিক	৩০	৫২	৮০
উচ্চপ্রাথমিক	৪৫	৮৭	১১৯
নিম্নমাধ্যমিক (সাধারণ)	১০৭	২০৩	২৬৮
নিম্নমাধ্যমিক (বৃত্তি)	৪১৭	৫০০	৬০০
উচ্চমাধ্যমিক (সাধারণ)		৩৬৩	৪৪৪
উচ্চমাধ্যমিক (বৃত্তি)		৭০০	৮০০
স্নাতক (আর্ট ও কমার্স)	৩২৮	৭৩৩	৯১৭
স্নাতক (বিজ্ঞান ও কারিগরি)	১১৬৭	১৫০০	২০০০
স্নাতকোত্তর (আর্ট ও কমার্স)		৩০০০	৩৬০০
স্নাতকোত্তর (বিজ্ঞান ও কারিগরি)		৫০০০	৬০০০

কমিশনের মতে শিক্ষার মোট ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বৃদ্ধি করা হবে :

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১০৮৫-৮৬
মোট ব্যয়	৬০০ কোটি	৯৬৬'৪	১৫৫৬'২	২৫০৬'২	৪০৩৬'৪
জাতীয় আয়ের	২'৯%	৩'৪%	৪'১%	৫'০%	৬'০%
লোকসংখ্যার মাথাপিছু	১২'১ টাকা	১৭'৪	২৪'৭	৩৬'১	৫৪'০

ব্যয়ের বরাদ্দ করা সহজ, কিন্তু অর্থসংস্থান করা কষ্টকর। অর্থ সঙ্গতির

উৎসরূপে কমিশন দেখতে পেয়েছেন—(ক) বিভিন্ন সূত্রে সাহায্য ও দান, [খ] জিলা পরিষদের সেস এবং (গ) সরকারী বরাদ্দ। জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ হিসেবে কমিশন ১৯৮৫ সনে মোট ৪০৩৬ কোটি টাকা শিক্ষাব্যয়ের আশা পোষণ করেছেন।

সমালোচনা

কোঠারি কমিশন রিপোর্টের ত্রুটির দিক অবশ্যই আছে। এখানে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) ছাত্রভর্তির নীতিটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তত: নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। (২) বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রসারের মধ্যে ভারসাম্য আরও উন্নত হওয়া দরকার। (৩) ছাত্র-বাছাই (Selection) সম্বন্ধে আরও সাবধানতা দরকার, কারণ প্রত্যেকের জন্য উপযোগী বিকল্প ব্যবস্থা করবার আগে সিলেকশন পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিক্ষা-সংকোচন এবং নূতনভাবে অসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। (৪) উৎপাদনমুখী শিক্ষার চেতনা নিশ্চয়ই প্রগতিমূলক। কিন্তু কর্মপরিচিতির ব্যবস্থাটি (Work Experience) দায়সারা গোছের হলে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। (৫) এই কথা সমাজসেবার ক্ষেত্রেও খাটে। বিচ্ছিন্নভাবে দায়সারা সমাজসেবার কাজ মোটেই ফলপ্রসূ হবে না। (৬) তেমনি নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাটি। জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নীতিপাঠ পরিকল্পনা করলেও ভুল হবে। (৭) শিক্ষায় সমসুযোগ এবং কমনস্কুল ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র থেকে গ্রহণ করা হয়, তবে এই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভব। বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর করলে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা ক্রয় করবার সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে অসাম্যই বাড়বে (যেমন আজ হচ্ছে)। অথচ কমিশনের সুপারিশে বেসরকারী উদ্যোগের ব্যাপক সুযোগ রাখা রয়েছে। (৮) সর্বোপরি শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের যথোপযুক্ত অংশ ব্যয় করার উপর সুপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করে। অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দের তুলনায় কমিশনের সুপারিশ মোটেই আকাশচুম্বী নয়। কিন্তু এই সুপারিশের সঙ্গে পরিকল্পনাকারীদের মতবৈষম্য হতে বাধ্য; ফলে এই সুপারিশগুলিই ব্যর্থ হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একথা সত্য হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যতের কথা

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টটি বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে। পার্লামেন্টের শিক্ষা কমিটিতে রিপোর্ট আলোচিত হয়। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ৩ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা—অর্থাৎ মোট ১০ বছরের সাধারণ স্কুলশিক্ষা, অতিরিক্ত ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয়ে "সুসংহত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার" সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে ২ বছরের পাশ কোর্স এবং ৩ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা/কিংবা ৩ বছরের অনার্স কোর্স এবং ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রী সম্মেলন "neighbourhood school" নীতি আগামী বছর থেকেই প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ও উচ্চশিক্ষার স্তরে পাঠ্যপুস্তক-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারকে অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে যত সত্বর সম্ভব অবৈতনিক করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্তরূপে বিজ্ঞানশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগতকরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কেও নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন যুবকল্যাণ-কেন্দ্র, বাধ্যতামূলক এন.সি.সি অথবা জাতীয় সেবাকার্যক্রম এবং সাফল্য-অসাফল্যের মন্তব্যবিহীন অভিজ্ঞান-পত্রের স্বপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কিংবা কলেজীয় শিক্ষা সীমায়িত করা এবং যত্রতত্র বিত্যালয় ও বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার প্রস্তাবটিকেও সম্মেলন সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'advanced centre' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মপরিচিতি, জাতীয় সেবা, কমন স্কুল এবং উৎপাদনী-শিক্ষা নীতিকেও সম্মেলন অগ্রাধিকার দান করেন।

শিক্ষকসংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা এবং উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনকেও সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষণ কলেজগুলির উন্নতি, রাজ্য-প্রশিক্ষণ বোর্ড গঠন এবং "যুক্ত শিক্ষক উপদেষ্টা পরিষদ" গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক তেমনি ছাত্রমহলে আস্থা পুনস্থাপনের উদ্দেশ্যে "যুক্ত ছাত্র-শিক্ষক পরিষদ" গঠনের কথাও বলা হয়।

বেতনক্রম সংশোধনের জন্য সম্মেলন থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবী করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের বর্ধিত বেতনের জন্য ব্যয়বৃদ্ধির ৮০ ভাগ বহন করতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হয়েছেন।

ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে মন্ত্রী-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়। উচ্চ-শিক্ষাস্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রচলনের জন্য পাঁচবছরের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় ভাষা সম্বন্ধে **ত্রিভাষা সূত্রই গৃহীত হয়েছে**।

জাতীয় শিক্ষা নীতি

বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে ১৯৬৮ সনের ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিক্ষানীতি আলোচিত হয় এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। ১৭টি দফার এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে যে—(১) সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি কার্যকর করা হবে। (২) শিক্ষায় সমসুযোগ প্রবর্তন করা হবে। এজন্য (ক) আঞ্চলিক অসাম্য দূর করা হবে. (খ) গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে, (গ) সংখ্যালঘু, উপজাতি, বিকলাঙ্গের শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে. (ঘ) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হবে। (৩) ৭ বছরের প্রাথমিক, ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এই দুই বছর সুবিধেমত কলেজ কিংবা স্কুলে যোগ করা চলবে), এবং ৩ বছরের কলেজীয় শিক্ষার ভিত্তিতে একটি সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়া হবে। ভারতের সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থাটি সাধারণ বিচারে একইরকম হবে। (৪) ক্রমিক পর্যায়ে কমনস্কুল প্রথা প্রবর্তন করা হবে।

(৫) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course প্রচলন করা হবে (বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য)।

(৬) সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(৭) শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা-স্তরে এবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে।

(৮) মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার করা হবে। কৃষি, টেকনিক্যাল এবং শিল্পশিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে।

(৯) গণিতের শিক্ষা হবে আবশ্যিক, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষা ও গবেষণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

(১০) মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে।

(১১) কর্মপরিচিতি, জাতীয় ও সমাজ সেবা এবং চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

(১২) উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা এবং অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করা হবে।

(১৩) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে।

(১৪) শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার এবং উন্নতি করা হবে।

(১৫) সর্বস্তরে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ, উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ, উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক সম্মানের ব্যবস্থা করা হবে, বিজ্ঞান শিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাঁদের পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে।

(১৬) ত্রিভাষা সূত্র প্রয়োগ করা হবে। স্কুল স্তরের শিক্ষায় অহিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে— মাতৃভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী ; এবং হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে—হিন্দী, ইংরেজী এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা)। (স্কুলের কোন স্তরে কোন ভাষার সূচনা করা হবে এ সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি)। তাছাড়া সংস্কৃতকে সম্মানজনক স্থান দিয়ে ঐচ্ছিকভাবে পাঠের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেও উৎসাহ দেওয়া হবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি করা হবে। আঞ্চলিক ভাষাকেই করা হবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ; অবশ্য এজন্য কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ৫ বছরের সময়সীমার প্রস্তাব করা হয়েছিল)।

(১৭) শিক্ষার জন্য ক্রমিক পর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। (এজন্যও কোন সময়সীমা বাঁধা হয়নি)।

শিক্ষানীতির এই প্রস্তাবকেই চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার দিকদর্শনরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রকাশিত চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার রূপরেখা দেখে বোঝা যায় যে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত।

চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনা

আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার কাল শেষ হয়েছে ১৯৬৬ সনে। কিন্তু নানাবিধ সংশয় এবং বিতণ্ডার ফলে দুই বছর পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা রচনাই সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ১৯৬৯ সনে পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম যখন পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করা হয় তখন মোট ২৩৭৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১২১০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৫'১ শতাংশ। (প্রথম পরিকল্পনায় ছিল ৬'৪ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫'৪ শতাংশ)। সুতরাং দেখা যায় যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ নিম্নমুখী, এবং অপর্যাপ্ত তো বটেই।

যাই হোক, এই খসড়া পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছিল যে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ৬-১১ বছরের শিশুদের ৯২'২ ভাগ, ১১—১৪ বছরের কিশোরদের ৪৭'৪ ভাগ এবং ১৪-১৭ বছরের কিশোরদের ২২'১ ভাগের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষা প্রসারের কথাও বলা হয়েছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর্থিক মন্দা সুরু হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের কথাও বাতিল হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের টাকাও কমানো হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনায় আঘাত এসেছে ভীষণভাবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড রাজ্যগুলির পরিকল্পনার ১০ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করবার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই মাত্র ৫ ভাগ দিতে রাজি হয়েছে। মোট কথা পরিকল্পনার বরাদ্দ অনেক হ্রাস করা হয়েছে। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮০৯ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২৫৯ কোটি এবং রাজ্যগুলির ৫৫০ কোটি টাকা)। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার জন্য নিম্নানুরূপ বরাদ্দ ধরা হয়েছে। (পাশে তৃতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দও উল্লেখ করা হলো)।

প্রাথমিক শিক্ষা—২১৭'৮৭ কোটি টাকা; (১৭৯ কোটি টাকা);
মাধ্যমিক " ১২৬'২৫ " " ; (১০৩ " ");
বিশ্ববিদ্যালয় " ১৮১'৭১ " " ; (৮৭ " ");
শিক্ষক শিক্ষণ ৩৩'০০ " " ; (২৩ " ");
বৃত্তি ও কারিগরি ১২০'০০ " " ; (১২৯ " ");
সামাজিক শিক্ষা ১০'০০ " " ; (২ " ");

সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম	১৫.৬০	কোটি টাকা ;	(	৭	কোটি টাকা	);
অন্যান্য স্কীম	১০৪.৯১	„ „ ;	(	৬৬	„ „	);
মোট—	৮০৯.৩৪	„ „ ;	মোট	৫৯৬	„ „	

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি লক্ষ্যের কথা প্রস্তাব করা হয়েছে, যেমন—(১) শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান ত্রুটি দূর করা হবে, এবং শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অর্থ নৈতিক উন্নতির সংযোগ স্থাপন করা হবে। (২) বিগত তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে অসঙ্গতি প্রবেশ করেছে, তা দূর করা হবে। (৩) অর্থ নৈতিক প্রয়োজন এবং সামাজিক আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার প্রসার হবে। (৪) মাধ্যমিক স্তরে আরও কারিগরি ও বাণিজ্যিক পাঠ্যক্রম সংযোজন করা হবে। (৫) উচ্চশিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করা হবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বদলে স্নাতকোত্তর শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। (৬) এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা হবে। (৭) বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ নজর এবং কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হবে। (৮) C.S.I.R. সংগঠনের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু কিছু ভাল কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করবার ফলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যকে (target) অনেক ছাটকাট করতে হয়েছে। বর্তমানের তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনায় অগ্রগতির লক্ষ্যকে উপস্থিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মোট সংখ্যায় কত শতাংশকে পড়বার সুযোগ করে দেওয়ার আশা পোষণ করা হয়েছে তাই এখানে উল্লেখ করছি :—

	বর্তমান		চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য	
৬-১১ বছর—৫.৫৯ কোটি ;	৭৯%		৬.৮২ কোটি ;	৮৪.৯%
১১-১৪ „ ১.২৭ „ ;	৩৩.৪%		১.৮৪ „ ;	৪২.১%
১৪-১৭ „ ৬৫.৫ লক্ষ ;	১৯.৩%		১.০৩ „ ;	২৫.৯%

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের দান, দেশী ও বিদেশী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান, স্কুল ও কলেজে উন্নয়ন তহবিল এবং ছাত্রবেতন থেকে হয়তো আরও ১৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যেতে

পারে। এটি সম্ভব হলেও আনন্দ হওয়ার কিছুই নেই, কারণ ছাত্রবেতন এবং দানের উপর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরশীলতা মোটেই কাম্য নয়। আর্থিক পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হয় যে ছাটকাট করা লক্ষ্যেও বাস্তবে পৌঁছা যাবে কিনা। বস্তুতঃ কোঠারি কমিশনের সুপারিশ, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্যের যথেষ্ট অভাব আছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা

কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট এবং সুপারিশকে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাবও করা হয়েছে। এখানে ইতিমধ্যেই কয়েকটি ঘোষণা হয়েছে, যেমন—(১) অচিরেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। (৩) শিক্ষা প্রশাসন উন্নত করবার জন্য ম্যানেজিং কমিটি, জিলা স্কুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও গণতান্ত্রিক করা হবে। (৪) দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হবে। (৫) এখানে এখনও পর্যন্ত ত্রিভাষা সূত্রই গৃহীত আছে (যদিও দ্বিভাষা সূত্রের পক্ষেও জনমত রয়েছে)।

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা (প্রাথমিক শিক্ষা ৪৫ কোটি, মাধ্যমিক ২০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ কোটি, কারিগরি ১০ কোটি, বয়স্ক শিক্ষা ১০ কোটি টাকা)।

ঠিকমত অর্থসংস্থান হলে পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে—(১) অতিরিক্ত ১০ লক্ষ শিশুর জন্য, এবং আগামী কয়েকবছরে যারা স্কুলে পড়বার যোগ্য হবে তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; অর্থাৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ। (২) ৪২ লক্ষ প্রাথমিক স্তরের শিশুর জন্য অবৈতনিক শিক্ষা। (৩) চারক্লাশের প্রাথমিক স্কুলগুলির এক তৃতীয়াংশকে পাঁচশ্রেণীর স্কুলে উন্নয়ন। (৪) ২০০০ নূতন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন এবং এজন্য অতিরিক্ত ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ। (৫) দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল স্থাপন। (৬) প্রতি জেলায় মডেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। (৭) বিজ্ঞান ও অনার্স পড়বার সুযোগ সম্প্রসারণ (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে)। (৮) শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার (ইতিমধ্যেই স্যাণ্ডউইচ কোর্সের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)। (৯) বিকলাঙ্গ

এবং পশ্চাৎপদদের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা। (১০) কৃষি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব। (১১) নূতন কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বদলে পুরাতনগুলির পুনর্বিন্যাস এবং শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। (১২) উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন। (১৩) শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি। (১৪) প্রাথমিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষার অগ্রাধিকার।

প্রশ্নাবলী

১। কিভাবে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হলো এবং শিক্ষার ভাষা মাধ্যম প্রশ্নের সমাধান হলো আলোচনা কর।

(Discuss how Western Education was introduced in India and the question of medium settled.) (১২—১৫ পৃষ্ঠা)

২। ১৮৮২ সন থেকে লর্ড কার্জনের আমল পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তন ও অগ্রগতি আলোচনা কর।

(Discuss the evolution and progress of education in India from 1882 to the period of Lord Curzon.) (১৬—১৮ পৃষ্ঠা)

৩। ১৯১৭ সন থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কারের কি কি সুপারিশ করা হয়েছে, বিবৃত কর।

(Give an account of the suggestions for educational reform made from 1917 till Independence). (১৯—২২ পৃষ্ঠা)

৪। ১৯৪৮ সন থেকে আমাদের শিক্ষা সংস্কারের একটি রূপরেখা উপস্থিত কর।

(Give an outline of educational reforms made since 1948).

(২৭—২৮ পৃষ্ঠা)

৫। ভারতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

(Give an account of the present system of education in India).

(২৯—৪২ পৃষ্ঠা)

৬। নিম্নলিখিত দেশের যে কোন একটির শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ :— ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী।

(Write an essay on the system of education in any of the

following countries :—England (৪২—৪৯ পৃষ্ঠা) ; U.S.A. (৪৯—৬৩ পৃষ্ঠা) ; France (৬৩—৬৬ পৃষ্ঠা) ; Russia (৬৭—৭১ পৃষ্ঠা) West and East Germany (৭১—৭৫ পৃষ্ঠা) ।

৭। ১৯১৯ এবং ১৯৩০ সনের প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং গান্ধিজীর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখ করে বর্তমান শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন আলোচনা কর।

(Discuss the evolution of Primary Education in the present century, with special reference to the Acts of 1919 and 1930 and also Gandhiji's influence). (৭৬—৮১ পৃষ্ঠা)

৮। ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের বিবরণ দাও।

(Give an account of the attempts made for compulsory Primary Education in India and the success attained). (৮১—৮৪ পৃষ্ঠা)

৯। মুদালিয়র কমিশনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে স্বাধীনতার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি আলোচনা কর।

(Discuss the progress of Secondary Education since Independence, with special reference to the Mudaliar Commission). (৯২—১০০ পৃষ্ঠা)

১০। ভারতে আধুনিক উচ্চশিক্ষার ক্রমবিবর্তন আলোচনা কর।

(Discuss the evolution of modern Higher Education in India). (১০০—১০৪ পৃষ্ঠা)

১১। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন প্রস্তাবিত গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে টীকা লেখ।

(Write a note on the Rural University proposed by the Radhakrishnan Commission and the outcome). (১০৫—১০৬ পৃষ্ঠা)

১২। স্বাধীনতার যুগে উচ্চশিক্ষা প্রসারের বিবরণ দাও এবং সাধারণ সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

(Give an account of the expansion of Higher Education since Independence and point out the general problems.) (১০৬ পৃষ্ঠা)

১৩। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রসারের এবং সমস্যার বিবরণ দাও।

(Give an account of the expansion and problems of Higher Education in West Bengal). (১১০—১১২ পৃষ্ঠা)

১৪। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা কর। আমাদের দেশে ঐ উদ্দেশ্য কতটা পূর্ণ হয়েছে ?

(What are the aims of higher education ? How far have we achieved those aims ?) (১১৩—১১৭ পৃষ্ঠা)

১৫। আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি আলোচনা কর। সমস্যাগুলি সমাধানের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের বিবরণ দাও।

(Point out the defects in our system of higher education. What attempts were made to solve the problems and what achievements made ?) (১১৭—১২০ পৃষ্ঠা)

১৬। (ক) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, এবং (খ) বর্তমানের ছাত্রবিক্ষোভ সম্পর্কে টীকা লেখ।

(Write a note on (a) medium of higher education, and (b) the present student unrest.) (১২০—১২৬ পৃষ্ঠা)

১৭। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রকমভেদ আলোচনা কর। বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে প্রশাসিত হয় ? পশ্চিমবঙ্গে কয় ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় আছে ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কি ভাবে সংগঠিত ?

(Enumerate the types of Universities and other Institutions of higher learning. How is the University administered ? How many types of Universities exist in West Bengal ? How is Calcutta University administered ?) (১২৬—১২৯ পৃষ্ঠা)

১৮। ভারতে উচ্চশিক্ষার অর্থসংস্থান ব্যবস্থাটি কি ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা আলোচনা কর।

(How is higher education financed in India ? Discuss the financial problems of Calcutta University.) (১২৯-১৩১ পৃষ্ঠা)

১৯। ভারতে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের অভিমত এবং সুপারিশ আলোচনা কর।

(Discuss the views and suggestions of the Kothari Commission on higher education in India.) (১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠা)

২০ ভারতে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অথবা শিক্ষায় অর্থসংস্থান ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি রচনা লেখ।

(Write an essay either on (a) Educational Administration in India, or on (b) Educational finance in India). (১৩৩-১৩৭ পৃষ্ঠা)

২১। কোঠারি কমিশন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ করেছেন, তা আলোচনা কর।

(Discuss the aims and system of education suggested for India by the Kothari Commission). (১৩৮-১৪১ পৃষ্ঠা)

২২। শিক্ষাক্ষেত্রে মূলনীতি এবং ভাষা সমস্যা, শিক্ষার সমসুযোগ, কর্মপরিচিতি, সমাজসেবা প্রভৃতি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আলোচনা কর।

(Discuss the recommendations of the Kothari Commission in respect of the Fundamental Principles and Special Problems like language, equality of opportunity, work experience and social service.) (১৪১-১৪৬ পৃষ্ঠা)

২৩। অর্থসংস্থান এবং শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের বক্তব্য আলোচনা কর।

(Discuss the views of the Kothari Commission in respect of educational finance and targets of expansion.) (১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠা)

২৪। জাতীয় শিক্ষানীতি সম্বন্ধে টীকা লেখ।

(Write a note on the National Policy on Education.)

(১৫১-১৫৪ পৃষ্ঠা)

২৫। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনা আলোচনা কর।

(Discuss the 4th Educational Plan for India and for West Bengal.) (১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা)

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

দ্বিতীয় পর্ব

বিশেষ পাঠ

পূর্বালোচিত আবশ্যিক সাধারণ পাঠ ছাড়া 'খ' বিভাগের অন্তর্গত চারটি অংশের যে কোন একটি অংশকে বিশেষ পাঠ্য হিসেবে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করে নিতে হবে।

Group B :

A detailed study of any one of the following problems :

1. Problems relating to Primary education

Aims, methods, contents of nursery and infant education. Necessity of infant education—importance of the early years. Problems of nursery and infant education—properly trained teachers—social consciousness, attitude of parent, etc. Special problems of big cities—industrial areas, etc. Maladjustment and guidance. Historical development in our country and comparison with other countries, present day position—future plans.

2. Problems relating to Secondary Education

Aims of Secondary Education—its nature, methods—contents—Needs of the adolescent—individual differences—requirements of the country—employment opportunities, Guidance in the secondary school, plan of secondary education. Secondary and primary education—secondary and vocational education—secondary and higher education—upgrading and diversification

of higher secondary education—history—background—needs—comparison with other countries. Present day position—special difficulties and problems, Five-year plans, future plans.

3. Problems relating to Technical, vocational and professional education

Aims—relation with general education—individual aptitude—requirement of the country, planned economy, co-ordination between education and employment. Short history, present day position, special problems and future plans of the following :—

(*a*) Technical education, (*b*) Legal education, (*c*) Medical education, (*d*) Engineering education, (*e*) Teacher Education, (*f*) Agriculture, (*g*) Art and craft, (*h*) Other vocations and professions.

4. Problems relating to education for the handicapped

State responsibility. Present day position and future plans, Education and rehabilitation, comparison with some other countries, special problems, methods, present position and future needs of each of the following :

(*a*) Mentally handicapped—deficient and retarded children, (*b*) blind children, (*c*) deaf and mute children, (*d*) crippled children (*e*) other forms of handicap.

দ্বিতীয় পর্ব

'খ' বিভাগ—প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোন মানুষের জীবনধারা ভালমন্দে মিশিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলে। জীবনের এই গতিকে কয়েকটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না। তবু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে পরস্পরসংযুক্ত কয়েকটি পর্যায়ে জীবনকে বিবেচনা করা যায়। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে জন্ম থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সকে বলা চলে শৈশব, ৫ থেকে ১২ পর্যন্ত বাল্য, ১২ থেকে ১৮ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর এবং ১৮ বৎসরের ঊর্দ্ধে পূর্ণবয়স্কতা। **আমরা এখানে জীবনের প্রথম স্তর, অর্থাৎ ৫ বৎসর পর্যন্ত "শৈশব" (Infancy) নিয়ে আলোচনা করছি।**

=শৈশবের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব=

মানুষ যত শক্তিশালী হোক, বিজ্ঞানকে যতই জয় করে থাক, **জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সটি কিন্তু একান্তই পরনির্ভরতার পর্যায়।** ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ বীর কিম্বা শ্রেষ্ঠ মনীষীও এই সময়ে বেঁচে থাকা, খাওয়া, পরা, আরাম ও আনন্দের জন্য পরনির্ভরশীল। অসহায়তা থেকে আত্মনির্ভরতার স্তরে উত্তরণটি মানব জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

কিন্তু এই অসহায়তার স্তরেই চলে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। প্রকৃতিদত্ত এবং স্বভাবজাত ক্ষমতার সংহতি ও ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে বাকশক্তির বিকাশ হয় এবং ভাষায় দখল স্থাপিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে শিশু সামঞ্জস্য বিধান করতে

শেখে। শিশুর সক্রিয়তাও বাড়ে এবং চারপাশের সব কিছুকেই নেড়েচেড়ে দেখতে চায়।

জীবনের এই প্রথম স্তরে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি সুগঠিত থাকেনা। কিন্তু এই অভাব পূরণ হয় ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণতা দিয়ে। ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যেই পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা সৃষ্টি হয়, ক্রমে ক্রমে মননশীলতার উন্মেষ ঘটে। অনুসন্ধিৎসা শৈশবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুর কাছে সবকিছুই নূতন। তাই সে নিজেকে মনে করে আবিষ্কারক রূপে। জন্মক্ষণে পৃথিবী থাকে সম্পূর্ণ অবোধ্য বিস্ময়। তারপর নিত্য নতুন সত্য ও তথ্যের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে বিস্ময় কেটে যায়, শিশু লাভ করে পরম তৃপ্তি এবং আত্ম প্রত্যয়।

কিন্তু শৈশবকালটি আবেগ প্রধান। তাছাড়া শিশুর প্রক্ষোভ জীবন অস্থিরতায় পূর্ণ। প্রতি মুহূর্তে তার মনে কান্না, হাসি, রাগ-দুঃখের পট পরিবর্ত্তন হয়। প্রবৃত্তির তাড়না এ সময়ে বড়ই প্রবল। শিশুর জগত বহুলাংশে আত্মসর্বস্ব। অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে সে তখনও শেখে না। সংযমও সে জানে না। তাই কখনও সে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অপরের কাছে স্বীকৃতির দাবিতে মুখর, আবার কখনো বা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত। আত্মসুখ এবং আত্মপ্রীতির মোহে সে মুগ্ধ।

শৈশবের আবেগ জীবনে ভয়, রাগ, ভালবাসারই প্রাধান্য। কল্পনাশক্তি তখন তীব্র। বাস্তব জগতের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সংযোগ ত্যাগ করে কল্পনাচারী হওয়া শিশুর পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু অপরদিকে সামাজিক চেতনা এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে শিশু নিতান্তই শিশু। সমাজবোধ না থাকার ফলেই তার নীতিজ্ঞান খুবই সামান্য। কিন্তু এই সব ত্রুটিকে ছাপিয়েও **শৈশব জীবনে যা প্রাধান্য লাভ করে তা হলো স্বতঃস্ফূর্ত্তা, সক্রিয়তা, খেলা আর আনন্দ।**

সমাজচেতনার ক্রমবিকাশ

শিশুর সামাজিক চেতনার ক্রমবিকাশ পথের উপর আমাদের বিশেষ আলোকপাত করা দরকার। জন্মক্ষণে শিশুকে সামাজিক কিম্বা অসামাজিক—কিছুই বলা চলে না। সে তখন কেবলমাত্র সম্ভাবনাময় একটি জীবনসত্তা—

সীমাবদ্ধ পরিধি ও পদ্ধতিতে কর্মমুখর হওয়ার জন্য উন্মুখ। এই সমাজসম্পর্ক হীনতা অবশ্য বেশীদিন থাকেনা। অপরের উপর সে নির্ভরশীল। নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে, অপরের সেবা ও যত্নের ফলে সে বুঝতে পারে যে অন্যান্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে সে রয়েছে! তাই ক্রমে ক্রমে সে অপরের ভালবাসায় সাড়া দেয়। ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রম সংগঠনের ফলে পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ ক্রমেই নিবিড় হয়ে ওঠে, জীবন-সামঞ্জস্যের সূচনা হয়।

দুমাস বয়সে পরিচিত মুখ দেখলেই শিশু হাসে। সাধারণতঃ এ মুখখানি মায়ের অথবা অতি ঘনিষ্ট ও পরিচিত আপনজনের। পাঁচ মাস বয়সে অপরের হাসি, আদর এবং বিরক্তি বুঝতে পারে। ঠিক তেমনি তাকে বিরক্ত করলেও সে ক্ষেপে যায়। এক বৎসর পূর্ণ হলে অতি দ্রুত সমাজ চেতনা বিকাশ লাভ করে। প্রথম বছরে একাধিক ব্যক্তির আহ্বানে যুগপৎ সাড়া দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একযোগে সে খেলতে পারে এবং চায়। তৃতীয় বছর থেকে ক্রীড়াসঙ্গীর পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে। বাড়ীর বাইরে মাঠে, পার্কে তার বন্ধু জুটে যায়।

আলোচনা থেকে আমরা একথা বুঝতে পেরেছি যে অসংগঠিত সমাজ চেতনা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে জীবনের সুরু। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপরের সঙ্গে অংশীদারত্ব, সহযোগিতা, এবং বন্ধু বাৎসল্য উন্মেষিত হয়। তিন চার বছর বয়সে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসংহত বন্ধুচক্র গড়ে ওঠে। এই চক্রের পরিধি ক্রমেই বেড়ে চলে। দশবছর বয়সে প্রকৃত দলবদ্ধ জীবন এবং দলচেতনা দানা বাঁধে। ছয়বছর বয়সের মধ্যেই অনেক অভ্যাস ও আচরণ দানা বেঁধে ওঠে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে নিত্যনূতন বন্ধুত্ব লাভ হয়। **আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে সামাজিকতা দানা বাঁধে।** অবশ্য এজন্য খেলাধূলার নির্ভেজাল সুযোগ প্রয়োজন, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রয়োজন, বাড়ী, স্কুল ও বৃহত্তর সমাজের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই পথেই আচার, আচরণ, অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সুগঠন সম্ভব। **আর শৈশবের সুগঠিত জীবনই উত্তর কালে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচ্চরিত্র জীবনের ভিত্তি।**

শিশুর সামাজিক জীবনযাত্রার ধারায় তার স্বাস্থ্য এবং শারীরিক অবস্থার

ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্য এবং সুগঠিত শরীর কিয়দংশে নির্ভর করে বংশধারার উপর, আর কিয়দংশে নির্ভর করে পরিবেশের উপর। শিশুর জন্মগত ক্ষমতা, অন্তর্নিহিত প্রেরণা এবং সম্ভাবনা যেমন দায়ী, তেমনি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, শিশুর প্রতি বন্ধুত্ব এবং উৎসাহের মনোভাব, ভাইবোনের সংখ্যা, পারিবারিক জীবনের সৌন্দর্য প্রভৃতিও তেমনি দায়ী। তাছাড়া শিশু যখন পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে অন্যান্য বন্ধু সংসর্গ লাভ করে, তখন বন্ধুদের আচার আচরণ, শিক্ষা সংস্কারও খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

(শিশুর সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো এই জন্য যে শৈশবের এই গুরুত্বপূর্ণ বয়সটিই নার্সারী শিক্ষার স্তর। পরিবার ও পরিবেশের অক্ষমতা দূর করে সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করাই নার্সারী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।)

শিশুর প্রক্ষোভ জীবন

শিশুর দৈহিক ও সামাজিক বিকাশের কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবারে প্রয়োজন প্রক্ষোভ জীবনের আলোচনা, কারণ **আবেগপ্রবণ শিশুর আবেগ সমূহের অবদমন এবং সুসমঞ্জস বিকাশে সহায়তা করাই নার্সারী শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য।** শৈশবের আবেগ সম্বন্ধে গবেষণা করে ওয়াটসন সাহেব বলেছিলেন যে ভয়, রাগ, ভালবাসাই জীবনের মৌলিক আবেগ। জন্মক্ষণে কিংবা তার স্বল্প পর থেকেই এগুলির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে আরও গবেষণা করে সেরম্যান বলেন যে অতি-শৈশবে আবেগের কোন শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। Bridges বলেন যে দেড়মাস বয়স পর্যন্ত হাত পা নেড়ে উত্তেজনা প্রকাশ করাই আবেগের একমাত্র অভিব্যক্তি। তার পরে তিন মাস বয়স থেকে আনন্দ-বেদনার পৃথক অভিব্যক্তি ঘটে। এক বৎসর বয়সের সময়ে আনন্দ—ভালবাসা, বিরক্তি—রাগ—ভয় প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে আবেগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। তারপরে আরও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আবেগসমূহ সুসংহত হয়।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ক্রমবিকাশের ধারায় শিশুর আবেগ জীবন বিবর্তিত এবং সুসংহত হয়। বয়সের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে নির্দিষ্ট পর্যায়ে নির্দিষ্ট আবেগের পূর্ণতা এবং বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। বয়স, পরিবেশ এবং শিক্ষার প্রভাবে আবেগ প্রকাশের ভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। শিশুর আবেগ জীবন অত্যন্ত চঞ্চল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। তার কান্না মুহূর্তের মধ্যে হাসিতে পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া শিশুর কাছে লুকোচুরি নেই। রাগ বা দুঃখকে চেপে না গিয়ে সে তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশ করবেই। তবে বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগ প্রকাশের ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। আবেগকে গোপন করতেও শিশু শিখতে থাকে। তা ছাড়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগ জীবনে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়।

শৈশবের আবেগ জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে গভীরতর আলোকপাত করেছেন সিগমাণ্ড ফ্রয়েড। মনোসমীক্ষা তত্ত্বে তিনি বলেছেন ভাসমান বরফের যেমন মাত্র ১ দশমাংশ থাকে জলের উপর এবং $\frac{9}{10}$ সমুদ্রগর্ভে, তেমনি মনেরও আংশিক পরিচয় মাত্র বাইরে পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানসিক বৃত্তি ও আকাঙ্খাই থাকে অবচেতন ও অচেতন মনের গভীরে। মনের আদিম প্রবৃত্তি ও কামনাগুলি অচেতন মনের গোপন গুহায় চাপা পড়ে থাকে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না, বরং চরিতার্থতা ও পরিপোষণের জন্য প্রতিনিয়ত আকুপাকু করে। সচেতন মনের সমাজচেতনাই এ গুলির চরিতার্থতার পথ বন্ধ করে রাখে। তাই আদিম কামনা এবং সমাজচেতনার মধ্যে চলে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। ফাঁকে ফিকিরে যদি কখনও সমাজচেতনা ও বিবেকবুদ্ধি পরাজিত হয়, তখনই আদিম প্রবৃত্তিগুলি মনকে দখল করে বসে। তখনই অনুষ্ঠিত হয় অসামাজিক এবং সমাজের চোখে ঘৃণ্য আচরণ। তা ছাড়া গোপন মন ও চেতন মনের এই দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি হয় মানসিক জটিলতা, বিকার ও ব্যাধি।

মনোবিজ্ঞানীরা একথাও বলেছেন যে সুস্থ আবেগ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয় শৈশবে। এই সময়ের মানসিক জটিলতা সমগ্র জীবন ধরে মানুষকে পীড়া দেয়। শৈশবের জটিলতা ভবিষ্যতের মনোবিকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনের এই বিকার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্য কারণও অসংখ্য। বাপ মায়ের স্নেহহীনতা, অসুস্থ পারিবারিক জীবন, সহানুভূতিহীন শিক্ষক

শিক্ষিকা, অপূর্ণ আকাঙ্খা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, এমন কি কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয় কিংবা কাজের প্রতি বিরূপতাকে কেন্দ্র করেও মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যৌন কারণও এ সঙ্গে মিশ্রিত থাকে!

উত্তর জীবনে এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে শৈশব জীবনে অসুস্থ কামনার অবদমন এবং সুস্থ আবেগের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। স্নেহ ভালবাসায় আবৃত করে সমস্ত রকম মানসিক জটিলতা ও দ্বন্দ্ব থেকে শিশুকে রক্ষা করা প্রয়োজন। অস্বাভাবিক যৌন কৌতুহল থেকেও তাকে বাঁচানো দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে **উত্তর জীবনে সুসমঞ্জস আবেগের ভারসাম্যের জন্য শৈশবের প্রস্তুতি পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুদায়িত্ব বহন করাও নার্সারী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।**

বস্তুতঃ, সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুর মধ্যে থাকে অমার্জিত অবস্থায় এবং আচারে আচরণে তা প্রকাশ পায়। ভয়, ভালবাসা, কৌতুহল, স্বার্থপরতা, আত্মসমর্পণ, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি সব ধরনের প্রবৃত্তিই উৎকটভাবে শিশু প্রকাশ করে ফেলে, এবং এর জন্য তার লজ্জাবোধও হয় না। সমাজচেতনা উন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রেও ঘটে পরিমার্জনা এবং অবদমন। **উপযুক্ত পরিবেশে পরিমার্জণার কাজটি সুনির্দেশিত এবং সুগঠিত হয়। এ ক্ষেত্রেই নার্সারী শিক্ষার ভূমিকা, কারণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনাই নার্সারী শিক্ষার কাজ।**

আবেগ জীবনের ক্ষেত্রেও এ কথাই সত্য। আবেগচঞ্চল শিশুর জীবনই আবেগপ্রধান। তাই আবেগ জীবনকে দমন ও পীড়ন করলেই অস্বাভাবিকতা, মনোবৈকল্য, অপরাধপ্রবনতা কিংবা অসংবদ্ধ জীবনধারা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। আবার আবেগজীবনের সুপরিচালনার মধ্য দিয়েই সৃজনশীল আগ্রহ, গঠনমূলক মনোভাব, সুস্থ অনুভূতি এবং এই পথে আকর্ষণীয় চরিত্র গঠন করা সম্ভব। উপযুক্ত পরিবেশ, স্নেহ ভালবাসা, সহযোগিতাপূর্ণ খেলাধূলো, অনুকরণীয় উদাহরন প্রভৃতির সাহায্যেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। বস্তু, ব্যক্তি কিংবা আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ভাবজগতের সংগঠন। নৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করে যখন আবেগ

ও আচরণ গড়ে ওঠে, তখনই ভিত্তি রচিত হয় যথার্থ চরিত্র গঠনের। চরিত্রের **এই সুস্থ ভিত্তি রচনা করাই নার্সারী শিক্ষার উদ্দেশ্য।**

সাধারণভাবে আমাদের মনে হতে পারে যে শিশুর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু দেহ ও মন বিশিষ্ট মানব শিশুর ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টি হয় শৈশব থেকেই। পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সামঞ্জস্য বিধানের ধারায়, দেহ মনের ক্রমবিকাশ পথে, নানা অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের মাধ্যমেই সুগঠিত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। **শিশুর স্পর্শকাতর ব্যক্তিসত্তার উপযুক্ত সহায়তা, স্বীকৃতি ও পরিচর্যার মধ্য দিয়েই সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। তাই ভাবাবেগপূর্ণ শিশুমনের উপযুক্ত পরিচর্যা প্রয়োজন।**

পরিচর্যার প্রয়োজন হয় শৈশবের সবকয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ সম্পর্কেই। উদাহরণরূপে বলা চলে ভয়, রাগ, ভালবাসার কথা। অতিরিক্ত ভয়কাতরতা শিশুকে দেহে ও মনে পঙ্গু করে দিতে পারে। **সুতরাং অনাবশ্যক ভয় কিম্বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে শিশুকে রক্ষা করা প্রয়োজন।** কিন্তু অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ হিসেবেও ভয়ভীতির ইতিবাচক ভূমিকা আছে, ভূমিকা আছে লোকনিন্দা সম্বন্ধে ভয়ের। সুতরাং কখনো বুঝিয়ে, কখনো ভীতিজনক পরিস্থিতি ঘটতে না দিয়ে, কখনো সমবয়সীদের সাহায্যে পরিবেশ রচনা করে, আর কখনো বা ভীতিপ্রবণতাকে ভিন্নপথে চালিত করে শিশুর জীবনে সুস্থতা আনা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে শিশুর স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় এবং সেখানকার যৌথ জীবনের মূল্য অপরিসীম।

তেমনি বলা চলে রাগের কথা। দৈহিক অস্বস্তি, কাজে প্রতিবন্ধকতা, আবদারের অপূর্ণতা প্রভৃতি নানা ধরনের কারনেই শিশু ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধ প্রকাশিত হয় কান্না, চীৎকার, হাত পা ছোঁড়া, লাথি মারা কিম্বা অপরকে আঘাত করার মধ্য দিয়ে। অপূর্ণ আবদার পূরণের জন্য কখনো বা শিশু দীর্ঘকাল পর্যন্ত একঘেয়ে কান্না জুড়ে দেয়।

বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশিত শিশুর রাগের যেমন নেতিবাচক ভূমিকা আছে, তেমনি ইতিবাচক মূল্যও আছে। ঘৃণ্য এবং কুৎসিত বিষয় সম্বন্ধে শিশুর ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হওয়ার নৈতিক ও সামাজিক মূল্য সীমাহীন। অথচ সাধারণভাবে অসংবদ্ধ ক্রোধের বিপদ আছে। **সুতরাং সব কিছুই নির্ভর**

করে উপযুক্ত লালনের এবং পরিচালনার উপর। ক্রোধাবেগকে সুপথে পরিচালিত করাও শিশু-শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব।

সর্বশেষে উল্লেখ্য ভালবাসার কথা। শিশু ভালবাসা চায় এবং প্রতিদানে ভালবাসা দেয়। যে মানুষ তার স্বাস্থ্য পুষ্টি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রয়োজন পূরণ করে, সেই মানুষকে সে ভালবাসে। তাঁর সান্নিধ্যে শিশু পুলকিত হয়। স্নেহ ভালবাসার ক্ষেত্রে বৈকল্য কিম্বা কৃত্রিমতা শুধু শৈশব নয়, সমগ্র উত্তর জীবনকেও বিষময় করে তুলতে পারে। আবার ভালবাসায় পুষ্ট নিশ্চিন্ততা জীবনকে করতে পারে আনন্দময়। **শৈশবে আনন্দময় জীবন গড়ে তুলে সমগ্র ভবিষ্যতের সুস্থ জীবনযাত্রার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাই শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য।**

মানুষের সামাজিক জীবনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হলো ভাবজগত। বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য, যুক্তি ও অনুভূতির সামঞ্জস্য এবং আবেগ জগতের ভারসাম্যই জীবনের স্বাভাবিকতার লক্ষণ। স্বাভাবিক জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নির্দেশনা ও পরিচালনা। সুপরিচালনার অভাব থেকেই সৃষ্টি হয় মনের বিকার এবং অসামাজিক আচরণ। সুতরাং শিশুর সুস্থ ক্রমবৃদ্ধির জন্য চাই ভাল স্বাস্থ্য, পিতামাতার স্নেহপূর্ণ পারিবারিক জীবন, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ, অনাবশ্যক উত্তেজনা থেকে মুক্ত মনোবিকাশ, এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশু ও শিক্ষিকার ঘনিষ্ঠতম প্রীতির সম্পর্ক। প্রতিটি শিশুর প্রতি বিশেষ নজর প্রয়োজন। প্রয়োজন শিশুকে আত্মনির্ভর এবং আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। শিশু যাকে ভালবাসে তাকেই অনুকরণ করে। সুতরাং ভালবাসতে যিনি জানেন, তেমন আদর্শচরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ পরিচালিকার অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যই তার প্রয়োজন।

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি

এতক্ষণ আমরা শিশুর দেহ, মন ও সমাজ জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার কিছু আলোচনা প্রয়োজন তার বুদ্ধির জগত সম্বন্ধে। শিশুর দেহ যেমন পর্যায় পর্যায় ছন্দে ছন্দে বেড়ে ওঠে, তার বুদ্ধিও তেমনি পর্যায় পর্যায় বিকশিত হয়। বিকাশের ধারা সর্বদা সমগতি সম্পন্ন নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে মানসিক শক্তির ক্রম বিকাশ ঘটে।

প্রথমেই বলা চলে যে **দেহজগত, ইন্দ্রিয়জগত এবং ভাবজগতের তুলনায় শিশুর চিন্তা ও বুদ্ধির জগত অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ ও দুর্বল।** ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তার চিন্তা মূলতঃ বস্তুনির্ভর। ছয় থেকে এগার বছর বয়সের মধ্যে ধীরগতিতে বিমূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার ক্ষমতা দানা বাঁধতে থাকে। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করতে না পারার ফলে মানসিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় ধীরগতিতে। শিশুর মানসিক অবসাদও আসে অল্প সময়ে। কোন বিশেষ পরিস্থিতির বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক পৃথকভাবে হয়তো সে অনুধাবন করতে পারে; কিন্তু সামগ্রিক চেতনা ও অনুভূতি, কিংবা বিভিন্ন পরিস্থিতির আন্তসম্পর্ক অনুধাবন করার ক্ষমতা তার খুবই অল্প। তাই তার চিন্তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তার কল্পনা প্রবণতা যথেষ্ট থাকলেও কল্পনার বিষয় ও বাহনগুলি অসংলগ্ন। তিনবছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত অসংবদ্ধ। ঐ সময় পর্যন্ত অভিজ্ঞতাগুলি স্মরণ করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার স্মৃতিশক্তি ক্রমে ক্রমে সংগঠিত এবং প্রসারিত হতে থাকে। শিশুর কাছে ঘটনার গুরুত্ব এবং অর্থপূর্ণতা, তার মনোভাব, ভাবজগতের উপর ঘটনাটির প্রভাব প্রভৃতির উপরই স্মৃতির স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

শিশুর মনোযোগেরও রয়েছে তেমনি বৈশিষ্ট্য। তার মনোযোগ মূলতঃ ইন্দ্রিয়বাহী। সুতরাং **এ মনোযোগ প্রধানতঃ মূর্ত ও বস্তুনির্ভর।** শিশুর মনোযোগ ইতঃস্তুতঃ বিচরণকারী এবং ক্ষণস্থায়ী। তিন থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত কোন বিষয়ে ৮ থেকে ১২ মিনিটের বেশী একসঙ্গে মনঃসংযোগ করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি ছয় বছর বয়স পর্যন্ত একই সময়ে দু'তিনটি বিষয়ের বেশী শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে না। তাছাড়া আগ্রহই যে মনোযোগের উৎস একথাটি শিশুর ক্ষেত্রে খুবই বেশী প্রযোজ্য। আকর্ষণীয় বস্তুতেই শিশুর আগ্রহ। আর আনন্দদায়ক বস্তুই শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। **এজন্যই চিত্তাকর্ষক বস্তু সামগ্রী ও খেলার মাধ্যমে শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা, আগ্রহকে অবলম্বন করে মনঃসংযোগ ঘটানো, এবং মনঃসংযোগের মাধ্যমে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করাই শিশু শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।** শৈশবের এই প্রচেষ্টাই সমগ্র উত্তর জীবনকে প্রভাবিত করে।

চিন্তা ও মননশীলতার অন্যতম বাহন হলো ভাষা। ভাষার দক্ষতা নিয়ে শিশু জন্মায় না। দৈহিক ও মানসিক ক্রমবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত প্রভাবের ফলে ভাষার দক্ষতা অর্জিত ও আয়ত্তাধীন হয়। প্রাথমিক প্রস্তুতির শেষে দুই বছর বয়স থেকে অর্থপূর্ণ ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করা শিশুর পক্ষে সম্ভব এবং অপরের কথা বোঝাও সম্ভব। তারপর **পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় অতি দ্রুত। এই সময়টিই কিন্তু নার্সারী শিক্ষার সময়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নার্সারী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে।**

ব্যাপক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে দুই বছরের শিশুর শব্দ সম্ভার ২৭০টি, তিন বছরের শিশুর ১০০০টি, চার বছরে ১৫০০টি এবং পাঁচ বছরে ২০০০টি। বস্তুতঃ ৪।৫ বছর বয়সে পরিষ্কার উচ্চারণে অর্থপূর্ণভাবে ভাষা প্রয়োগ করে মনোভাব প্রকাশ করা শিশুর পক্ষে সম্ভব। বাকশক্তির এই বিকাশ যেমন একদিকে শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্রমবৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়, অপরদিকে তেমনি পরিবেশ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। শিশুর পরিবেশে প্রচলিত ভাষা ও শব্দসম্ভারকে অনুকরণ করেই সে ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করে। সুতরাং পরিবেশে ভাষার দৈন্য কিম্বা ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয় শিশুর ভাষাগত সীমাবদ্ধতা কিম্বা প্রসারতায়।

সুতরাং শিশুর ভাষাগত দক্ষতার জন্য একদিকে প্রয়োজন স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, স্নায়বিক দক্ষতা ও সহজাত বুদ্ধি, অপরদিকে প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশ, সমবয়সীদের সঙ্গে কথাবার্তার যথেষ্ট সুযোগ এবং নিত্যনূতন শব্দ সম্ভারের সঙ্গে পরিচয়। **শেষোক্ত ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।**

তা ছাড়া কোন কোন শিশুর ত্রুটিপূর্ণ বাকশক্তিও শিক্ষার অন্তরায় হতে পারে। তোতলামির ফলে অনেক সময় একই শব্দ পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে কথা সম্পূর্ণ আটকে যায় এবং কোন শব্দই বেরোয় না। শৈশবেই এই ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করে। কখনো কখনো বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই এই ত্রুটি সেরে যায়। **কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মতভাবে উচ্চারণ অনুশীলনের ফলে এই ত্রুটি সারে। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষালয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।**

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হলো ভাষা। সমাজ জীবনে পারস্পরিক মতামত কিংবা ভাব বিনিময়ের বাহনও ভাষা। চিন্তা ও যুক্তির বাহনও ভাষা।

আত্মপ্রকাশ করবার কৌশল এবং ভাবজগতে সমানুভূতি সঞ্চারের মাধ্যমও ভাষা। বস্তুতঃ সুস্থ সমাজ জীবনের অন্যতম উপাদানই হলো ভাষা। পূর্ণ বয়স্কতার স্তরে বাকশক্তির যথার্থ প্রয়োগই সমাজ জীবনে বেঁচে থাকবার অন্যতম গ্যারান্টি। আর এই গ্যারান্টির মৌল ভিত্তি রচিত হয় শৈশবে ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

ভাষার মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা শিশুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হলেও নানা ধরনের কল্পনাকে অবলম্বন করে শিশুর মনে তোলপাড় চলে অবিরত। নিত্যনূতন কল্পনার রাজ্য সে গড়ে তোলে আর ভাঙ্গে। কখনো অঙ্গভঙ্গি, কখনো খেলা, কখনো বা উদ্ভট গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই কল্পনা প্রকাশিত হয়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ কিংবা ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে মনের কল্পনা বাইরে রূপ পায়। কল্পনার রাজ্যে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই শিশুর সৃজনী প্রতিভা ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি মনের পর্দায় যে ছাপ রেখে যায় তাই নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার পথেই কল্পনাশক্তি রূপ পায়। সুতরাং শিশুর পরিবেশে বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ন্ত্রণ ক'রে, শুভ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে তার কল্পনাকেও সুপথে পরিচালিত করা সম্ভব। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যত পত্যক্ষ এবং যত গভীর, তার কল্পনাও তত সুসংবদ্ধ এবং ফলপ্রসূ। এই সুসংবদ্ধ কল্পনাশক্তির সদ্ব্যবহার করেই কাব্য সাহিত্য রচনা করা, শিল্পকলা সৃষ্টি করা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে যাত্রা করা সম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে অসংবদ্ধ কল্পনা, নিছক কল্পনা বিলাসিতা কিংবা দিবা স্বপ্ন কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং শৈশবের দিনগুলিতে কল্পনাশক্তির সাবলীল বিকাশ সমগ্র উত্তর জীবনের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রেও শিশু শিক্ষালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ইন্দ্রিয় শক্তির ভূমিকা

পরিশেষে আলোচনা করা প্রয়োজন শিশুর জীবনে ইন্দ্রিয়শক্তির ভূমিকার কথা। একথা আমরা গোড়াতেই বলেছি যে শিশুর ইন্দ্রিয়শক্তি প্রখর। কিন্তু এক্ষেত্রেও দুর্বলতা আছে। শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি সকল ক্ষেত্রে

সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, বরং ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার রংয়ে সে রাঙিয়ে নেয়। বয়স যত অল্প, ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতায় মনের প্রলেপ তত বেশী। সময় ও স্থান চেতনা তখন অত্যন্ত দুর্বল। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে বৈষম্য করার ক্ষমতাও শিশুর কম। বস্তুতঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় শক্তি বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তা নিয়ে সুসংগত হয়ে ওঠে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পৃথক অনুশীলন এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তির যৌথ অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নততর জ্ঞানের প্রবেশ পথগুলি ভালভাবে উন্মুক্ত করাই শিশু শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব।

এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রতি। শব্দগ্রহণ, বিভিন্ন শব্দের বৈষম্য নির্ধারণ এবং শব্দার্থ অনুধাবনের উপর কর্মজীবন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দৃষ্টি শক্তিরও রয়েছে সমগুরুত্ব। দৃষ্টির সংকীর্ণতা ছাড়াও রাত্রিকালীন অন্ধতা, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, স্নায়বিক শক্তি, মস্তিষ্কের সুস্থতা প্রভৃতির উপর ইন্দ্রিয়শক্তি নির্ভরশীল বলেই এ সবের প্রতি শিশু শিক্ষালয়ের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

পরিচালনার মূল্য

সর্বশেষে আলোচনা প্রয়োজন শিশুর জীবনে উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার মূল্য সম্বন্ধে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা এবং যুক্তিশীল ও মননশীল চিন্তার ক্ষমতা শিশুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাই অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সে স্বভাবতঃই দুর্বল। কিন্তু অপরের প্রভাবে সে শিক্ষা লাভ করে। দলবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করে, অনুকরণের পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে, বারে বারে চেষ্টার মধ্য দিয়ে ভুল সংশোধনের পন্থায় সে শিক্ষালাভ করে এবং সর্বোপরি প্রতিনিয়ত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের কাজ ও আচরণ সে আয়ত্ত করে ফেলে। শিশুর ক্ষেত্রে এগুলিকেই আমরা বলি শিক্ষা।

বস্তুতঃ শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে সুঅভ্যাস গঠনের বিরাট মূল্য আছে। সচেতন কিংবা যুক্তিশীল পূর্ব-চিন্তার আশ্রয় ছাড়া কোন কাজ কিংবা আচরণ

যখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভব, তখন তাকেই আমরা বলি অভ্যাস। অভ্যস্ত কাজটি সহজ ও সরল ভাবে, নিপুনতা এবং দ্রুততার সঙ্গে সমাধা করা সম্ভব।

অভ্যাসের দোষগুণ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ সমগ্র জীবনটাকেই অনেকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি রূপে বর্ণনা করেছেন। উপযুক্ত সদভ্যাস আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠিত হয়, এমন কথাও বলেছেন। অপরদিকে অভ্যাসের দাসত্ব সম্পর্কেও অনেকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

একথা সত্য যে **জীবনের নমনীয় স্তরেই অভ্যাস গঠন সহজ**। আবার একথাও সত্য যে অভ্যাস গঠনের ফলে নমনীয়তার অবসান ঘটে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতোই জীবন চলে। প্রবৃত্তি ও আগ্রহকে অবলম্বন করেই অভ্যাস দানা বাঁধে। কিন্তু স্থায়ী অভ্যাস একবার গঠিত হলে অনুভূতি ও ইচ্ছার চেয়েও অভ্যাসই বড় হয়ে উঠতে পারে। তবুও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সাধারণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কতগুলি সু-অভ্যাস গঠন হলে জীবনযাত্রার মধ্যে সময়ের মিতব্যয়িতা সম্ভব। অভ্যাসের বিনিময়ে অর্জিত সময়টি উন্নত মননশীলতার জন্য ব্যয় করা সম্ভব। **সুতরাং সুঅভ্যাস গঠন করে কাজকর্ম, আচার আচরণকে সুপথে চালনা করাই শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কাম্য।**

বস্তুতঃ শৈশবই অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময়, কারণ শিশুর নমনীয় জীবনকে অভ্যাসের ছকে ফেলা সহজ। এ জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রেরণা, অভ্যাস গঠনের সঠিক সূচনা, অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুর আত্ম-প্রয়াস এবং নির্দিষ্ট অনুশীলনের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই অভ্যাসের স্থায়িত্ব বিধান করা সম্ভব। তেমনি অনুশীলন না করার মধ্য দিয়ে অভ্যাসকে অনভ্যাসে রূপান্তর করাও সম্ভব।

শিশুর ক্ষেত্রে খাওয়া পরা, খেলাধূলো, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, আচার ও আচরণের অভ্যাস গঠনের সীমাহীন মূল্য রয়েছে। তেমনি নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে কু-অভ্যাস ত্যাগ করারও মূল্য রয়েছে। **শৈশবের সুঅভ্যস্থ জীবনের ভিত্তিতেই উত্তর জীবন অনেক সহজ এবং সুসমঞ্জস হওয়া সম্ভব।**

উপরের সমগ্র আলোচনার সারসংক্ষেপ করে এখন বলা চলে যে

সমগ্র জীবনের দৈহিক ও মানসিক ভিত্তিরূপে, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের বুনিয়াদ রূপে, আগ্রহ, মনোভাব এবং মনোযোগের স্তম্ভ রূপে, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সূচনা রূপে, স্মৃতি ও কল্পনার পটভূমি রূপে, আচার আচরণ দক্ষতা ও অভ্যাসের ভিত্তিরূপে, ভাষা শিক্ষার সূচনাকাল রূপে, স্বাস্থ্যকর যৌথ পরিবেশে সমাজী করণের প্রারম্ভিক পর্যায় রূপে, **অর্থাৎ সমগ্র জীবনের প্রস্তুতিপর্ব রূপে শৈশব জীবনের মূল্য প্রকৃত পক্ষে সীমাহীন।** এই সময়ে জীবনের ভাল কিম্বা মন্দ, সুস্থ কিম্বা অসুস্থ অভিজ্ঞতা সমগ্র জীবনকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং শিশুর নিজস্ব ভাগ্যের উপর তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়না। সুস্থ বিকাশের জন্য শিশুকে সাহায্য করা, তাকে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা, তাকে সকল রকম ভাবে লালন করা, তার সুস্থ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য সুন্দর পরিবেশ রচনা করা, সর্বোপরি ভালবাসার মধ্য দিয়ে তার জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করাই প্রকৃত শিশু শিক্ষা।

শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা ছিল প্রাচীন ভারত কিম্বা গ্রীস দেশে। আমাদের দেশে মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই ভবিষ্যৎ শিশু সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজনরা সচেতন হয়ে উঠতেন। শিশুর ভবিষ্যৎ আগমন বার্তায় নানা ধরনের আনন্দ উৎসবও প্রচলিত ছিল। মায়ের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে শিশুর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার রীতি ছিল। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সকল রকম যত্ন দিয়ে শিশুকে লালনের কথা আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন। ঠিক তেমনি প্রাচীন গ্রীস দেশেও শিশু লালনের রীতি ছিল। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সংগঠিত শিশু লালনাগারের কথাও জানা যায়।

কিন্তু মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগের প্রাকাল পর্যন্ত শিশু ছিল অবহেলিত। ধর্মান্ধদের মনে ছিল এই কুসংস্কার যে পাপ পংকিলতার মধ্যেই মানুষের জন্ম। সুতরাং শিশু ভূমিষ্ঠ হয় আদিম পাপের বোঝা বহন করে। শাসন পীড়ন এবং নিয়মাচরণের মধ্য দিয়ে শিশুকে পাপমুক্ত করা এবং শিশুর পরিশোধনই শিশু পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিশুরও একটা ব্যক্তিসত্তা আছে,

মন আছে এবং অনুভূতি আছে একথা আদৌ চিন্তা করা হতোনা। বিকৃত এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুর জীবনকে বিচার করা হতো বলে বয়স্কদের আচার আচরণ এবং বিচক্ষনতার বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। জ্ঞানতপস্বীদের পরিনত তত্ত্বজ্ঞানের বোঝা শিশুর উপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মতুষ্টি অনুভব করা হতো।

কিন্তু আধুনিক যুগের প্রাক্কালে একদিকে মানবিকতার প্রভাবে এবং অপরদিকে জীববিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং সমাজ চেতনার প্রভাবে **শৈশব জীবনের প্রতি মনোভাবের আমূল পবিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুর প্রভাবে শৈশবের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়।** মনোবিজ্ঞান এবং পরিশেষে মনঃসমীক্ষার প্রভাবে শৈশবের প্রক্ষোভ জীবনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, দেহযন্ত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তির সুস্থতা বিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। শিশুর প্রতি এই গুরুত্ব আরোপের ফলে শিশু সমীক্ষা আন্দোলন (child study) এবং শিশু নির্দেশনা (child guidance) আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে। শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য শিশু চিকিৎসালয়ও (child clinic) গঠিত হতে থাকে।

শিল্প-প্রধান আধুনিক পৃথিবীর প্রচণ্ড গতিশীলতা ও জটিলতার ফলে শিশুশিক্ষার প্রয়োজন আরও অনুভূত হতে থাকে। শিল্প সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিনতি হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে নগর সভ্যতা এবং নাগরিক শ্রম জীবন। এই নাগরিক সভ্যতার কলঙ্ক রূপে রয়েছে বস্তির অস্বাস্থ্যকর অমার্জিত পরিবেশ যেখানে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বর্জিত হয়ে হতভাগ্য শিশুরাও মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার অবসান আবশ্যক এবং তার জন্য সুন্দর পরিবেশে শিশুদের বিশেষ শিক্ষাও আবশ্যক।

আধুনিক জীবন অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। শৈশব থেকেই সুরু হয় জীবনের ঘাত প্রতিঘাত। মনের রাজ্যে চলে নানা ধরনের টানাপোড়েন। মনের উপযুক্ত লালনের অভাব থেকে, অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতার প্রভাবে এবং ভারসাম্যহীন আবেগের তাড়নায় **শৈশবেই মানসিক সংঘাত ও মনোবিকারের ঘটনা আজ ক্রমবর্দ্ধমান।** একদিকে মানসিক সংঘাত ও জীবনের অপূর্ণতা এবং অপরদিকে সন্তানের প্রতি উপযুক্ত যত্ন দিতে পিতামাতার

অক্ষমতার ফলে অপরাধপ্রবনতা ক্রমবর্দ্ধমান। এই ক্ষয়িষ্ণুতাকে প্রতিরোধ করার জন্যও উপযুক্ত শিশু লালন এবং শিশু শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে পিতামাতার সান্নিধ্যে ও ভালবাসায় এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের শিক্ষাই সর্বোত্তম শিক্ষা। কিন্তু পুরাতন একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের দিন ফুরিয়েছে। সমাজ জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত। ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যেও শিশুর বন্ধু এবং ক্রীড়াসঙ্গীর অভাব ঘটে। তা ছাড়া আধুনিক কালে মা ও বাবা উভয়েই অর্থোপার্জনে লিপ্ত থাকায় শিশুর প্রতি নজর দেওয়ার আর সময় ও সুযোগই হয় না। সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে বাস করেও পারিবারিক শুভস্পর্শ অনেক শিশুর ভাগ্যেই জোটেনা। বহু ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনও আজ ভগ্নদশাগ্রস্থ। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যও শিশু শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সমাজসংহতির জন্য প্রয়োজন সমাজচেতনাসম্পন্ন নাগরিকের। বিদ্যালয়ের পরিবেশে সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মোদ্যমের মধ্যেই সমাজীকরণ সম্ভব।

মনোবিজ্ঞান এবং মনঃসমীক্ষার দ্রুত অগ্রগতির ফলে শৈশবের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষাগত কারণেও শিশু শিক্ষা আন্দোলন বেড়ে উঠেছে। শিশু শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান, কিম্বা শিশু শিক্ষা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব, অথবা উত্তর জীবনের উপর শৈশব জীবনের প্রভাব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও নীতি প্রচারিত হওয়ার ফলেও শিশুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, শৈশবের আনন্দ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং শিশু অভীক্ষা ও শিশু সেবার মাধ্যমে জীবনের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করবার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের উন্নততর মানুষ সৃষ্টির প্রতি বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

(উপরের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার উপসংহার রূপে বলা চলে যে মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, সমাজবাদী চেতনার ফলে এবং আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রভাবে একথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে শৈশবেই

সমগ্র জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এবং বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের মধ্যে শৈশবের স্তরটিই সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। একথাও সর্ববাদীসম্মত যে শিশুর দেহ মন ও বুদ্ধির সুসম বিকাশ, অভ্যাস আচরণ ও সমাজচেতনার বিকাশ, ব্যক্তিত্ব চরিত্র ও নৈতিক বিকাশের জন্য পরিবারের মধ্যে কিংবা শিশু শিক্ষালয়ে সচেতন ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন। এ জন্যই সাম্প্রতিক দুনিয়ায় নার্সারী কিম্বা কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন এত শক্তিশালী।)

শিক্ষাগুরুদের অবদান

অবশ্য এই শক্তির পিছনে কাজ করেছে শিক্ষাগুরুদের অবদানে পুষ্ট শিক্ষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ। আদিম গোষ্ঠিজীবনে আজকের মত বিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু সমাজের ব্যবহারিক জীবনযাত্রার মধ্য থেকেই শিশু গ্রহন করতো কাজের ও আচরণের শিক্ষা, ভাষার দক্ষতা। সামাজিক বিধিবিধান, কর্তব্য ও সংস্কারের সঙ্গে ব্যবহারিক পরিচয়ই তখন শিক্ষা বলে গণ্য হতো।

তারপর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুশিক্ষার চেতনাও উন্মেষিত ও সংগঠিত হতে থাকে। ভারতের ঋষিকুল শৈশবের লালন কর্মকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্বও তাঁরা স্বীকার করেন। পাঁচ বছর বয়সে হতো বিদ্যারম্ভ। তার আগে পড়াশুনার কোন চাপই থাকতোনা। স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির সহায়তা করাই ছিল শৈশবের লালন-ধর্ম। ভারতের মত গ্রীসীয় সভ্যতা উন্মেষের যুগেও পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন কর্মের শিক্ষাই ছিল শিশুশিক্ষা।

অপেক্ষাকৃত উত্তরকালে প্রাচীন স্পার্টা ও এথেন্স'এ শিশু-শিক্ষা আরও সংগঠিত হয়। রোগগ্রস্থ কিম্বা ক্ষীণজীবি শিশুর স্থান স্পার্টাতে ছিল না। সুতরাং দৈহিক স্বাস্থ্য ও শ্রী বৃদ্ধি করাই ছিল স্পার্টান শিশুশিক্ষার লক্ষ্য। এ জন্য অবশ্য মায়ের উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত হতো। এ ক্ষেত্রে মায়েদের অধিকার ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট ছিল এবং তাঁরা রাষ্ট্রের কাছে দায়ী ছিলেন। অবশ্য মায়েদের জন্যও শিক্ষা ও শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে রক্ষণাবেক্ষণের পরে সুরু হতো প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষা।

প্রাচীন এথেন্সেও শৈশবের শিক্ষা ছিল পারিবারিক জীবনের মধ্যে। এ ক্ষেত্রেও দৈহিক স্বাস্থ্যই ছিল বড় কথা। কিন্তু মায়ের বদলে শিশু-রক্ষণের দায়িত্ব ছিল শিক্ষনপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কিম্বা ধাত্রীর উপর। শিশুদের জন্য নানাধরনের খেলাধূলো ও পুতুল, ছড়া আর ঘুমপাড়ানী গান প্রচলিত ছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয় রয়েছে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে। ছয় বছর বয়স থেকে সুরু হতো বিদ্যালয়ের শিক্ষা।

প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিশ, প্লেটো, এ্যারিষ্টোটল প্রমুখ সকলেই জীবন প্রভাতের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ছয় বৎসর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালিত শিশুলালনাগারের কথা পর্যন্ত বলেছিলেন দার্শনিক প্লেটো। প্রাচীন রোমেও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ব্যবহারিক শিশুশিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শিক্ষাচেতনাই ছিল ভিন্নধর্মী। মধ্যযুগের শিক্ষাচেতনায় শৈশবের বিশেষ মূল্য স্বীকৃত ছিল না। সুতরাং নিয়মানুবর্তিতা, শাসন এবং দণ্ডবিধান ছাড়া আর কোন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল না। মধ্যযুগের অবসান করে এলো নবজাগরণ এবং উদার মানবিক শিক্ষার প্রসার। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল শিক্ষাচেতনাও শৈশবের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিল না। নিয়মানুবর্ত্তী পুরাতন শিক্ষায় মূল্য আরোপ করা হয়েছিল জ্ঞানার্জনের উপর। শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত খেলা কিম্বা দেহ-মন-আবেগের মূল্যই তখন স্বীকার করা হয়নি। শৈশবের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত ছিল না বলেই শিশু শিক্ষারও প্রচলন ছিলনা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে পথিকৃত ছিলেন জন এমোস কোমেনিয়াস। সেই যুগটি ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও মানবিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তখন নূতন চিন্তা চেতনার উন্মেষ হচ্ছে। তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছে। জ্ঞানের প্রবেশদ্বার রূপে ইন্দ্রিয়শক্তির গুরুত্বও তখন ক্রমেই অনুভূত হয়েছে। এই সময়ে কোমেনিয়াস্ বললেন "প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার" কথা।

তাঁর "Didactica Magna" গ্রন্থে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে জীবনের সর্বপ্রথম পর্বে শিক্ষার জন্য কোমেনিয়াস প্রস্তাব করলেন 'School of the

Mother's Knee", অর্থাৎ শৈশবের শিক্ষা হবে মায়ের কাছে। এ জন্য মা, এমন কি ধাত্রীদেরও শিক্ষিতা হওয়ার এবং শিক্ষার কাজে পারদর্শিনী হওয়ার কথা তিনি বলেছেন। বস্তুতঃ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রস্তাব করেন ইনফ্যাণ্ট স্কুলের। এই সময়ে পুঁথিগত বিদ্যাচর্চ্চার কথা তিনি সমর্থনই করেননি।

কোমেনিয়াসের আগে শিশুদের বন্যজন্তুর বেশী জ্ঞান করা হতো না। কোমে-নিয়াস বলেন যে শিশুদের মানুষ হিসেবে জ্ঞান করা এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ করাই প্রকৃত শিক্ষা। তাই তিনি শিশু-শিক্ষালয়কে খেলার মাঠের সাথে তুলনা করেছেন, এবং শিশু শিক্ষার পন্থারূপে ছড়া, রূপকথা, গল্প, রসকাহিনী প্রভৃতির সুপারিশ করেছেন। শিশুশিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি ইন্দ্রিয়ানুশীলন, বস্তুভিত্তিক শিক্ষা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ, মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ততা এবং সরলতা থেকে জটিলতায় অগ্রগতির কথা বলেছেন। বিদ্যালয়কে পীড়ন যন্ত্রের পরিবর্তে আনন্দক্ষেত্র রূপে তিনি কল্পনা করেছিলেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শিশুশিক্ষাতত্ত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান জঁা জ্যাকস্ রুশোর। রুশোর মতে জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মধারা গ্রহণ করবার জন্য শিশু স্বাভাবিক আকাংক্ষা অনুভব করে। সুতরাং মানুষের মন যেমন ক্রমিক ধারায় উন্মেষিত হয়, শিশুর শিক্ষাও হবে তেমনি। শিশুর জীবনে খেলাই স্বাভাবিক। সে সময় শাসনের বন্ধনে তাকে আবদ্ধ করা অন্যায়।

শৈশবের শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে বাবা মায়ের বিশেষ ভূমিকার কথা রুশো উল্লেখ করেছেন। মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রুশো তাই পারিবারিক সৌন্দর্য আর পবিত্রতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে পুঁথির বোঝায় শিশুকে ভারাক্রান্ত করবার তিনি বিরোধী। বস্তুতঃ এই সময়ের শিক্ষা হবে মূলতঃ শারীরশিক্ষা। অনাড়ম্বর জীবন এবং পরিমিত স্নেহ ভালবাসার পরিবেশে সহর থেকে দূরে উদার প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত বিচরণ এবং খেলাধূলো ও আনন্দের মধ্যে শিশু বড় হয়ে উঠবে। তাকে বাধা দিলে কিম্বা শাস্তি দিলে তার ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নিজস্ব অনুসন্ধিৎসার জোরে প্রকৃতির পাঠশালায় শিশু শিক্ষালাভ করুক। এই পথেই তার দেহ হবে সুগঠিত। বস্তুতঃ জীবনের এই প্রথম স্তরে শিশুর শিক্ষা হবে মূলতঃ দৈহিক, মানসিক নয়। বয়স্কদের প্রভাব প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট আচরণ এবং অভ্যাস

গঠনেরও তিনি বিরোধিতা করেছেন। এমনকি কৃত্রিম সরঞ্জামের বদলে শিশুর খেলার সরঞ্জামও হবে ফুল ফল গাছ পাথর প্রভৃতি। শিশুর দেহকে সুগঠিত করা, সহজাত ক্ষমতা বুদ্ধি ও প্রবণতাকে সযত্নে স্বাভাবিকভাবে রক্ষা করাই শিশুশিক্ষার মূল লক্ষ্য। পিতা মাতা শিক্ষক কেবল শিশুর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করবেন, তাকে গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, কিন্তু শিশুকে নির্দেশ দিয়ে পরিচালন করবেন না। আত্মপ্রচেষ্টায় শিশু যা আয়ত্ত করবে, তাই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

রুশোর সব কথা শিশুশিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রয়োগ করা না গেলেও তাঁর কয়েকটি মূল্যবান কথা অবশ্যই স্মরণ যোগ্য। **তাঁর মতে শিশু বন্য পশুও নয়, পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণও নয়।** সুতরাং দমন পীড়নের বদলে সুন্দর ও পবিত্র শৈশবের পক্ষে প্রয়োজনীয় হলো মুক্তি ও ভালবাসা।

শিশুশিক্ষার তত্ত্বক্ষেত্রে রুশোর উত্তর সাধক ছিলেন পেস্তালোৎসি। তিনি বললেন যে জীবন বিকাশের সঠিক সহায়তাই শিক্ষার আদর্শ, এবং দেহ ও মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই শিক্ষা। সুতরাং শিশুকে জ্ঞানের তাড়নায় জর্জরিত না করে, যথাসময়ে উপযুক্ত ফসলের জন্য অপেক্ষা করে ক্রমবিকাশোন্মুখ শিশু মনকে সাহায্য করাই শিশুশিক্ষার মূল কথা। শিশুর সহজাত শক্তির সংরক্ষণ, পরিচর্যা এবং ক্রমবিকাশই প্রকৃত শিশুশিক্ষা। তাই তিনি শিশুর শিক্ষা ও বিকাশকে চারাগাছের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত জলসেচন।

পেস্তালোৎসির মতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অবাধ স্বাধীনতায় প্রকৃতির প্রভাবেই রাখা শ্রেয়। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রচেষ্টাই হবে মূল কথা। জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে বক্তৃতাসর্বস্ব প্রয়াসের বদলে অফুরন্ত ভালবাসার কথাই তিনি বলেছেন। **তাই তিনি বিদ্যালয়কে মনে করেছেন গৃহের দ্বিতীয় সংস্করণরূপে।** বিদ্যালয়ে থাকবে পারিবারিক জীবনের মত সম্পর্ক, স্নেহমধুর পরিবেশ। গৃহেরই মত বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং জাগতিক উন্নতি। শিক্ষনপদ্ধতি রূপে পেস্তালোৎসি বলেছেন ইন্দ্রিয়শক্তির প্রয়োগ, বস্তুনিরীক্ষণ, সক্রিয়তা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চয়নের কথা। এ ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং স্বকীয়তাকে স্বীকার করতে হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

যে কেবল তত্ত্বকথায় সীমাবদ্ধ না থেকে পেস্তালোৎসি কর্মপ্রয়াসেই মেতে ছিলেন। একের পর এক শিশুবিদ্যালয়ও তিনি পরিচালনা করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর রচনার মধ্যেই রয়েছে শিশুঅভীক্ষা আন্দোলনের সূচনা এবং আধুনিক শিশুশিক্ষা পদ্ধতিরও ভিত্তি। মায়েদের বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি 'Mother's Book' ও রচনা করেছিলেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ফ্রয়েবেল' এর। তাঁর মতে শিশুশিক্ষার সূচনা হওয়া উচিত তিন বৎসর বয়সে। সুতরাং সুশিক্ষিতা মায়ের প্রয়োজন। খেলা ও কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে শিশু শিক্ষা অগ্রসর হবে। Blankenburg নামক স্থানে তিনি ৩-৭ বৎসরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪০ সনে কিণ্ডারগার্টেন (কে, জি) অর্থাৎ 'শিশু উদ্যান' নামের উদ্ভাবন করেন। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে ফ্রয়েবেলের মতে শিশুবিদ্যালয় একটি আনন্দময় বাগানমাত্র। বাগানের মালি হিসাবে বিভিন্ন চারাগাছের সংরক্ষণ এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। সুতরাং যান্ত্রিক শিক্ষার বদলে অন্ততঃ ৫ থেকে ৭ বৎসরের শিশুদের খেলাচ্ছলে' স্বয়ংনির্বাচিত কাজে নিমগ্ন করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিশু শিক্ষার জন্য খেলা, গান ও গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার চাই।

ফ্রয়েবলের মতে শিশুর অন্তরকে বিকশিত করাই শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই বিকাশের ধারাটি হবে ক্রমবিবর্তনশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন। তাই তিনি শিশুকে উর্বর জমিতে চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই এই চারাগাছের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং জ্ঞানরূপ কুইনিন প্রয়োগের বদলে শিক্ষকের কাজ হলো শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকাংক্ষার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা। পরীক্ষা নিরীক্ষা আবিষ্কার ও সৃষ্টির আনন্দে মিশ্রিত স্বতঃস্ফূর্ত কাজই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। খেলা ও কাজের মধ্য দিয়েই পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশিত ও সুগঠিত হতে পারে।

কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ব্যক্তিত্ব সাধনা অসম্ভব। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে। শিশুবিদ্যালয় সৃষ্টি করবে শিশুর নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ। বস্তুতঃ ফ্রয়েবলের সমগ্র তত্ত্বের মধ্যে আত্ম উন্মেষণ এবং মুক্ত ক্রমবিকাশের কথাই বড়।

সুতরাং শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হবে মুক্তাঙ্গনে, বাগানে, স্কুলের আঙ্গিনায় কিংবা স্কুল গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মোদ্যম। এই কাজের মূল পরিচয় হবে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সৃষ্টিধর্মীতা।

ফ্রয়েবলের উত্তরকালে শিশুশিক্ষার তাত্ত্বিক হিসেবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাদাম মেরিয়া মন্তেসরি। স্বল্পবুদ্ধি কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক দরিদ্র শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি যে সুফল লাভ করেন, তা থেকেই তিনি তাঁর তত্ত্ব উপস্থিত করেন। বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পেশীশক্তি এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের তাৎপর্য নিরূপন করতে মন্তেসরি সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মতে শিশু ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যেই জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে। তাই ইন্দ্রিয়শক্তির শিক্ষাই মন্তেসরি তত্ত্বের মূল কথা।

শিশুপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতাই মন্তেসরির দ্বিতীয় বৃহত্তম নির্দেশ। শিক্ষার বিষয়বস্তু, উপাদান, উপকরণ এবং শিক্ষার গতি ও পদ্ধতি স্থির করতে হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তা হলে শিশু নিজে থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষিকা শুধু ধৈর্য সহকারে শিশুর কর্মপ্রবাহ লক্ষ্য করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করে ঠিক পথে পরিচালন করবেন। তাই মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষিকাকে বলা হয়েছে Directress.

মন্তেসরি তত্ত্বের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই যে প্রতিটি শিশুই একটি ব্যক্তিসত্তা। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতাই মূল কাম্য। স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে শিশু যা করবে তা থেকেই অর্জিত হবে জ্ঞান। সুতরাং শিশুর পক্ষে প্রয়োজন হলো দেহ ও মনের মুক্তি। মুক্ত মনে নিজের পছন্দমত কাজে শিশু যদি নিযুক্ত থাকে, তবেই সে মনোযোগী হয়ে ওঠে। এই ভাবেই শিশু আত্মপ্রত্যয় লাভ করে, সুঅভ্যাস গঠন করে, সংযত এবং শৃঙ্খলা পরায়ন হয়ে ওঠে। অপর শিশুর সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাবও গড়ে ওঠে। সুতরাং ভদ্র, দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল, উৎসাহী ও সহযোগী মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিশু সৃষ্টি করাই মন্তেসরি তত্ত্বের মূল কথা।

মন্তেসরি তত্ত্বে তিন থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। জীবনের তৃতীয় বৎসরকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ এই সময়ে শিশুর মানসিক গঠন এমন একটি স্তরে পৌছে যখন

সে কাজের আগ্রহ অনুভব করে। এই আগ্রহকে অবলম্বন করেই তার শিক্ষা সম্ভব। শিশুর আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাভাবিক অভাব পূরনই শিক্ষা।

মন্তেসরি তত্ত্বে শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো (১) আত্মপ্রত্যয় এবং আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক দক্ষতা সৃষ্টি করা, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অনুশীলন, (৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পেশীশক্তির অনুশীলন, (৪) লেখা, পড়া ও গণিতের দক্ষতা, (৫) সঙ্গীত, অংকন, হাতের কাজ, বাগানের কাজ এবং প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, (৬) নৈতিক শিক্ষা, (৭) ধর্মীয় শিক্ষা।

এই শিক্ষাতত্ত্বের মৌলনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) শিশুর পরিবেশই হবে শিক্ষার ভারকেন্দ্র। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশু নিজের জগৎ বলে অনুভব করবে। শিক্ষার উপকরণও হবে শিশুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (২) জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বনির্ভরতা শিক্ষা দিতে হবে। (৩) শিশুর মনোবিকাশের নিম্নতর স্তর থেকেই শিক্ষা সূচনা প্রয়োজন। (৪) বুদ্ধির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদনই বেশী প্রয়োজন। (৫) একদিকে পীড়ন কিংবা অপরদিকে পুরস্কৃত করার পরিবর্তে শিশুর নিজস্ব কাজের আনন্দই শিক্ষার গ্যারান্টি। (৬) শিক্ষাধারা হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরানুযায়ী। (৭) শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই। (৮) শিক্ষার পদ্ধতি হবে মনোবিজ্ঞান সম্মত।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন সাম্প্রতিক যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিক জ ডউইর কথা। তাঁর মতে জীবনের যৌথ কর্মোদ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন অংশ গ্রহণের সামাজিক দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবনের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাকে অবলম্বন করেই চলবে কর্মোদ্যম। সুতরাং সার্থক জীবনযাত্রাই শিক্ষার নামান্তর।

পুরাতন শিক্ষায় শিশুর বুদ্ধি এবং নীতিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো, শিশুর স্বকীয়তাকে স্বীকার করা হতো না। কিন্তু ডিউই শিশুর সৃজনশীলতাকে স্বীকার করেছেন। ইন্দ্রিয় ও পেশীর সদ্ব্যবহার করে, সৃজনশীল উদ্যমে, স্বতঃস্ফূর্ত খেলাচ্ছলে কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করবে।

তাছাড়া ডিউই বলেছেন যে শিশু কেবল ব্যক্তিই নয়, সামাজিক ব্যক্তি।

সুতরাং কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই শিশুর সামাজিক বিকাশ সম্ভব। তার সমাজচেতনা বিকাশের প্রধান সহায়ক হবে বিদ্যালয় পরিবেশ। শিশুর বিদ্যালয় জীবন যদি গণতান্ত্রিক সমাজজীবনরূপে পরিচালিত হয় তবেই সে বড় হয়ে উঠবে কর্মঠ, সুদক্ষ নাগরিক হিসেবে।

ডিউইর মতে জীবনের প্রথম চার বছরে গৃহের পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ। চার থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিবেশে খেলা ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি গঠনমূলক উপকরণ ব্যবহার করে স্বতঃস্ফূর্ত খেলার ছলে শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। তাঁর এই তত্ত্ব থেকেই সক্রিয়তা পদ্ধতি এবং প্রোজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে ডিউই তত্ত্বের তিনটি মূল ভিত্তি—(১) প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী শিক্ষা, (২) ব্যক্তিশিশুর বুদ্ধি বিকাশ, (৩) সামাজিক মানুষ হিসেবে দক্ষতা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার মূলনীতি হলো—(১) বাস্তব ভিত্তিতে জীবনের সমস্যা সমাধানই শিক্ষা। (২) কাজের মধ্য দিয়েই শিশু নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে। (৩) সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়েই হবে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা। (৪) বিদ্যালয় হবে গৃহের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ এবং শিশুদের একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ। (৫) সমগ্র শিক্ষা প্রয়াসই নির্ভর করবে শিশুর আগ্রহ এবং প্রবণতার উপর।

ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের সমগোত্রীয় তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর মতে সুসংবদ্ধ ও সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়তা করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ কেবল বুদ্ধির পিণ্ড নয়। তাই তিনি চেয়েছেন শিশুর দেহ মন ও আত্মার সমবিকাশ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে চরিত্র গঠন, অর্থাৎ হৃদয়ের শিক্ষা। সহযোগিতাপূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে সামাজিক তাৎপর্যসম্পন্ন গঠনমূলক কাজে শিশুদের সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই এই শিক্ষা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বড় করে ধরেছেন মানবাত্মার বিকাশকে। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে শিশুচিত্তের সংযোগ চেয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন। মানব জীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষা। তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশই

শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্যবহারিক দক্ষতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সমন্বয় প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিশুর মুক্তিই শিশুশিক্ষার অন্যতম পূর্বসর্ত। বিশ্ব-প্রকৃতির বিস্তীর্ণ ক্রোড়েই প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। কিন্তু এই মুক্তি ঘর-ছাড়া মুক্তি নয়। ঘর যদি উপযুক্ত ঘর হয় তবে বাল্যজীবনে গৃহশিক্ষাই শ্রেয়। কিন্তু আধুনিক 'ঘর' এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না বলেই শিশুশিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষার প্রধান হলো ইন্দ্রিয়ানুশীলন, অনুভূতি, প্রকৃতিবীক্ষণ এবং গঠনমূলক কর্মোদ্যম। এই কর্মধারা বয়ে চলবে ভক্তিস্নেহের পরিবেশে। শিশুর আত্মপ্রকাশ এবং সৃজনশীল সৌন্দর্য সাধনাই হবে শিশু-শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ!

শিশুশিক্ষা আন্দোলন

শিশু শিক্ষার তত্ত্ব কেবল তত্ত্বকথাতেই শেষ হয়নি। তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কোমেনিয়াস নিজেই শিশু-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। রুশো পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর অবাধ মুক্তির কথাই বলেছেন। সুতরাং শিশু-বিদ্যালয়ের কোন কথাই বলেননি। কিন্তু পেস্তালোৎসি নিজেই নিউহফ নামক স্থানে ১৭৭৯ সন পর্যন্ত একটি শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ঐ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি একটি অনাথাশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ সনে Stanz নামক স্থানে তিনি নূতন আর একটি অনাথাশ্রমের দায়িত্ব নেন। এর পরবর্তীকালে বার্গডফ্ এবং Yverdun নামক স্থানে তিনি দীর্ঘকাল শিশুশিক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলেই পেস্তালোৎসি শিশু শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়ে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আরও তিনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। (১) জে, এফ, ওবেরলিন'এর প্রচেষ্টায় ১৭৬৯ সনে আলসেস্'এ শিশু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এখানে পরিচালিকারা গল্প, ছবি, বস্তুনিরীক্ষণ

এবং ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানীতেও শিশু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। (২) দ্বিতীয় ধারার সূচনা হয় ১৮১৬ সনে স্কটল্যাণ্ডের নিউ লেনার্ক নামক স্থানে। রবার্ট ওয়েনের প্রচেষ্টায় যে শিশু বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেখানে তিনবছর বয়স থেকেই শিশুদের গ্রহণ করা হয়। (৩) তৃতীয় ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয় কিণ্ডারগার্টেন। ১৮৪০ সনে ফ্রয়েবল কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলনের সূচনা করার পরে মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে আলোচিত সময়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়! শ্রমিক পরিবারের জীবনে যে দৈন্যদশা এসেছিল, তার ফলে অনেক মানবদরদীই এই সেবাকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। বস্তুতঃ তৎকালীন বহু শিশু রক্ষণাগারের ক্ষেত্রেই শিক্ষার চেয়ে সেবার মনোভাব বেশী প্রকট ছিল। জীবনের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে উদ্ধার করবার মনোবৃত্তি ছিল বলেই তখনকার বহু শিশু বিদ্যালয়ই শিক্ষাকেন্দ্র হওয়ার বদলে শিশু কয়েদখানারূপে ব্যবহৃত হতো।

যাই হোক. শিশুজীবনের প্রতি যে দৃষ্টি পড়লো এটাই বড় কথা। ওবেরলিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ১৮৩৭ সনেই ফ্রান্সে প্রথম শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়। উদ্দেশ্য হলো মাতৃসুলভ যত্ন এবং বয়সানুপাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এগুলি ছিল দাতব্য প্রতিষ্ঠান। শিশু আশ্রয়াগার হিসেবেই এগুলি পরিচিত ছিল। ১৮৮১ সনে নূতন নামকরণ হয় 'Ecoles Matternelles'—অর্থাৎ মায়ের স্কুল। ছোট ছোট গ্রাম কিম্বা শহরে পৃথক বিদ্যালয়ের বদলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় শিশু শ্রেণী (infant classes)। তিন থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের এখানে ভর্তি করা হয়। কালক্রমে অবশ্য শিশুশ্রেণীর প্রচলন হ্রাস পায়। বর্ত্তমান ফ্রান্সে প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রধানতঃ আছে ক্রেস্ এবং মেটারনাল স্কুল।

ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন নার্সারী কিম্বা কিণ্ডারগার্টেনই ছিল না। তবে ওয়েনের অনুকরণে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

১৮৫০ থেকে ১৯০০ সনের মধ্যে অভিজাতদের সন্তানদের জন্য কিছু নার্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সর্বপ্রথম ১৮৭৩ সনে Sir William Mather'-এর প্রচেষ্টায়। কিন্তু তদানীন্তন ইংলণ্ডে ফ্রয়েবলীয় পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। কিণ্ডারগার্টেনগুলি উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নতর বিভাগরূপেই স্থাপিত হয়। দৈনিক সময় নির্ঘণ্টের একটি অংশ মাত্র কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ব্যয়িত হয়। খুব কম সংখ্যক বিদ্যালয়ই স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলি ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্রীয় সাহায্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলগুলি ধনীদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। তা ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে শিক্ষাগত মূল্যও তেমন ছিল না। এইসব প্রতিষ্ঠান তাই মূলতঃ মায়েদের প্রয়োজনই সিদ্ধ করেছে।

কিন্তু ১৮৭৪-৭৫ সন থেকে এবিষয়ে সামাজিক সচেতনতা আসতে থাকে। শ্রীমতী মেরী গ্রে প্রতিষ্ঠা করেন নার্সারী স্কুল এসোসিয়েশন। কিন্তু তখনও শিক্ষিকারা শিক্ষণপ্রাপ্তা নন। সুতরাং শিক্ষাগত আদর্শের পরিবর্তে সুবিধের দিকটাই প্রাধান্য লাভ করে। তবু মহিলারা এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন এটাই বড় কথা।

শতাব্দীর শেষভাগে বুয়র যুদ্ধকালে সৈনিকদের হীনস্বাস্থ্যের সূত্র ধরে জাতির শিশু সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আদৃষ্ট হয়। দরিদ্র সমাজে দুই থেকে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ভয়াবহ দৈন্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অস্বাস্থ্যকর গৃহ ও পারিবারিক জীবন, বিকলাঙ্গতা, মৃত্যুর উচ্চহার প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলের শতকরা ৪০টি শিশুই রোগগ্রস্থ। এই সচেতনতার ফলেই ১৯০৬ সনে বিদ্যালয়ে খাদ্য-বিতরণ এবং ১৯০৭ সনে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অপরদিকে প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযুক্ত যত্নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন জর্জ নিউম্যান।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শিশুশিক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলেন ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয়—র‍্যাচেল এবং মার্গারেট ম্যাকমিলান। ১৯১১ সনে লণ্ডনের ডেপ্টফোর্ড'এ মুক্তাঙ্গণ নার্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয় নার্সারী শিক্ষিকা শিক্ষণের জন্য কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

শিশুবিদ্যালয়ে ভর্তি হলো দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা। তাদের সারা দিনের জন্য স্কুলে নেওয়া হতো; খাদ্য, বিশ্রাম ও খেলা দেওয়া হতো। চেষ্টা করা হতো সুঅভ্যাস গঠনের। মুক্তাঙ্গণ নার্সারী বিদ্যালয়ের নীতি ছিল যথেষ্ট আলো বাতাস, কাজ ও বিশ্রাম, সুসম খাদ্য, স্বাধীনতা ও মুক্ত খেলা এবং সু-অভ্যাস। কোন নির্দিষ্ট পাঠ, যান্ত্রিক শিক্ষন কিম্বা পীড়ন ছিল না। যা কিছু শিক্ষা, তা হতো পরোক্ষে। সুতরাং নার্সারী বিদ্যালয়কে জীবনযাত্রাবিধি রূপেই কল্পনা করা হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই আন্দোলন দানা বাঁধলো এবং ১৯১৮ সনের মধ্যেই সাফল্য প্রমাণ করলো। সুতরাং তারপর থেকে আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য নানাধরণের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। জামাকাপড় পরা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা করা, খাওয়া দাওয়া, বাগানের কাজ, পোষা পশুপাখী পালন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্টকে খাওয়া, ঘুম, খেলা, মলমূত্র ত্যাগ করা, পোশাকপরা প্রভৃতি কাজের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে মায়েদের সংযোগ থাকে ঘনিষ্ট। বস্তুতঃ নার্সারী স্কুল গৃহ-পরিবারের বিকল্প নয়, বরং বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং দীর্ঘ প্রয়াসের মাধ্যমে ইংলণ্ডের নার্সারী বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত শিশু এবং পিতামাতার উপকারী বন্ধুরূপে পরিগণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু পিতা যখন সৈন্যদলে যোগ দেন এবং মায়েরা তাঁদের স্থানে কলে কারখানায় যোগ দেন তখন এক ভিন্ন ধরনের নার্সারী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দুই তিন মাস বয়স থেকে দুই তিন বছরের শিশুদের খেলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের বদলে এগুলি ছিল শিশু বিশ্রামাগার। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করতো স্বাস্থ্য বিভাগ এবং শিশুদের দেখাশুনো করতেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিতা মেট্রন ও ধাত্রীরা। যুদ্ধের পরে অবশ্য এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এবং এগুলি গুটিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে শিশু শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমগ্র জাতির সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে এই সম্পর্কে নির্দেশ বিধিবদ্ধ করা হয়।

ইংলণ্ডে যখন ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন আর

একজন স্মরণীয়া মহিলা কর্মরতা ছিলেন ইতালীতে। ১৯১২ সন থেকেই রোমের Casa dei Bambini-তে ডঃ মন্তেসরির গবেষণার প্রতি সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই গবেষণারই ফলশ্রুতি হলো মন্তেসরি পদ্ধতি। বহুদেশেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফ্রয়েবলের পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে পারেনি। পুরাতন ধর্মী পীড়নমূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রথম দিকের বিদ্রোহী নেতা। তাই রক্ষণশীলতার প্রতিরোধ তাঁর সামনে ছিল প্রবলতর। তাছাড়া ফ্রয়েবলীয় পদ্ধতিও বেশীমাত্রায় তত্ত্বঘেষা। সাধারণ লোকের পক্ষে এই পদ্ধতির মর্মকথা অনেকাংশে দুর্বোধ্য। তাছাড়া ফ্রয়েবলের অনুগামীগণই কোন নবরূপায়ণ গ্রাহ্য না করে অপরিবর্তনীয়রূপে এই পদ্ধতি সংরক্ষণ করে রয়েছেন। অপরদিকে মন্তেসরি দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য, বাস্তবধর্মী এবং সহজে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি। তিনি শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, দিয়েছেন বেশী স্বাধীনতা। এইসব কারণে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মন্তেসরি পদ্ধতি এক বিরাট স্থান দখল করেছে। তাছাড়া মাদাম মন্তেসরিও দেশবিদেশে ভ্রমণ করে এবং আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা পালন করেছে বিগত পঞ্চাশ বছরে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক গবেষণা, শিশু সমীক্ষা ও শিশু অভীক্ষা আন্দোলন, মনোসমীক্ষা তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রযুক্তি।

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে সারা বিশ্বে এত তোলপাড় সত্ত্বেও আমেরিকায় শিশুশিক্ষা আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে। খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে আমেরিকায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে বহু আগেই, সেই আমেরিকায় শিশু শিক্ষা আন্দোলন বিলম্বিত হয়েছে। অবশ্য একবার সূচনার পরে আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে তীব্র গতিতে।

আমেরিকায় আগত জার্মাণ ঔপনিবেশিকরা যদিও কিছু প্রাথমিক প্রচেষ্টা করেছিলেন তবুও সেখানে নার্সারী স্কুল আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা হয় ১৯৩০ সন থেকে। ঐ সময়ে বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেশে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধানের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বেকারদের

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে অনেকগুলি শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য অনুভূত হয় এবং শিশু বিদ্যালয়ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সনের মধ্যেই জরুরী পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত ১৫০০ বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা হয় ৮ লক্ষ। সে সময় এই বিদ্যালয়গুলি বসতো সরকারী বিদ্যালয় গৃহেই।

কিন্তু সংকটের অবস্থা কেটে যাওয়ায় জরুরী বিদ্যালয়ের বদলে ক্রমেই স্বাভাবিকভাবে শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ২—৩ বৎসরের শিশুর নার্সারী স্কুল এবং ৪—৫ বৎসরের শিশুর কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য পেতে থাকে। ক্রীড়াকেন্দ্র, ক্রীড়াসংঘ, শিশু উন্নয়ন সংঘ, শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, দিবা-নার্সারী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে শিশু বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও শহরতলি অঞ্চলে এবং ধনীক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে দরিদ্র পিতা, শ্রমজীবিনী মাতা কিম্বা বাস্তুহীনদের কাছে এই শিশু-বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

রাশিয়াতে বর্তমান শতাব্দীর সুরুতে শিশুশিক্ষা প্রচেষ্টা সুরু হয়। ১৯০৫ সনে শ্রীমতি স্লেগার এবং আলেকজাণ্ডার জোলেংকো এই ধরনের বিদ্যালয় গড়বার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজকীয় যুগে শিশুশিক্ষা আন্দোলন তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লবের পরে মহিলারা সর্বাধিক সংখ্যায় ক্ষেতখামার কলেকারখানায় কাজে যোগ দেন কিম্বা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সুতরাং মাতৃকল্যান ও শিশুকল্যান ব্যবস্থা অতি দ্রুত সংগঠিত হয়। কারখানা, অফিস ও খামারের সঙ্গে ক্রেস তৈরী হতে থাকে এবং কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। দুইটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৩১ সনে ঘোষণা করা হয় যে শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে (১) কর্মরতা কিম্বা শিক্ষারতা মায়েদের সহায়তা করা এবং (২) যৌথ সমাজতান্ত্রিক জীবনধারায় শৈশবকাল থেকেই অভ্যস্ত করা। বস্তুতঃ বর্তমানে রাশিয়ার শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী।

ভারতের কথা

যদিও মাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, মায়ের লালন, মাতৃগর্ভে থাকবার সময় থেকে

অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শৈশবের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারতের সচেতনতা অতি প্রাচীন, তবুও আধুনিক ধারায় শিশুশিক্ষা আন্দোলন ভারতে অতি নবীন। ইংলণ্ডে ম্যাকমিলান ভগ্নীদের আন্দোলনের প্রভাব ভারতেও অনুভব করা যায়। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে শিশুশিক্ষা আন্দোলন ভারতভূমিতে প্রবেশ করে। অপরাপর ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও আমরা মিশনারীদের কাছে ঋণী। বহু অনাথ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁরা এমনিতেই করতেন। এবারে তাঁরা নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠাতেও অগ্রনী হলেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টা মূলতঃ বড় বড় শহরকেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। যাই হোক লোরেটো, ডাইওসেসন প্রভৃতি সংগঠন কয়েকটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু কিছু অমিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্টানও শিশু বিদ্যালয় কিম্বা বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগ স্থাপন করেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ব্রাহ্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ। এদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি আদর্শ নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেন স্থাপিত হয়। সমসাময়িক কালেই কোন কোন শিশুদরদী ব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এঁদের প্রচেষ্টায়ও কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথও আনন্দদায়ক শিশুশিক্ষার স্বপক্ষে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত না ছিল বেসরকারী প্রচেষ্টার ব্যাপকতা, না ছিল সরকারী স্বীকৃতি, সাহায্য কিম্বা উদ্যোগ।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সরকারী সচেতনতার প্রকাশ পায় ১৯৮৪ সনে প্রকাশিত সার্জেণ্ট পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয় যে (.) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে, (২) কর্মরতা, বিশেষতঃ শ্রমজীবিনী মায়েদের সন্তানদের লালন পালনের জন্য বিশেষ সরকারী দায়িত্ব থাকবে, (৩) শিশুস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে, (৪) শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষনপ্রাপ্তা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে, (৫) ধাপে ধাপে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে, এবং (৬) দশ লক্ষ শিশুর শিক্ষার জন্য ৩:৮৪০০০০ টাকার পরিকল্পনা তৈরী করা হবে। বস্তুত: ১৯৪৪ সনেই "ভারতীয় শিশুশিক্ষা সংসদ" গঠিত হয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই

ভারতে শিশুশিক্ষা আন্দোলনের প্রকৃত প্রসার ঘটতে থাকে। কয়েকটি কারণে এই প্রসার ঘটেছে। ১৯৪০ সনে মাদাম মন্তেসরি এদেশে এসেছিলেন। তারপর থেকে নিয়মিত মন্তেসরি শিক্ষন শিবিরে শিক্ষিকা শিক্ষনের প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিত সমাজে মনোবিজ্ঞান সম্মত শিশুশিক্ষার চেতনা দানা বাঁধে। তৃতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বাস্থ্যসংস্থা এবং শিশু ও মাতৃসেবা প্রকল্পও ভারতকে প্রভাবিত করে। চতুর্থতঃ গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্পেও প্রাক-বুনিয়াদি শিক্ষান্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সর্বোপরি শিল্পায়ণের প্রভাবে এবং মায়েরা রুজি রোজগারে প্রবেশ করায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে শিশুশিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যাপকতর হতে থাকে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কয়লাখনি এবং চা-বাগান অঞ্চলে কিছু ক্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু আমাদের দেশের শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রধানত দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রথমতঃ ঘনবসতিপূর্ণ কিছু শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সন্তানের প্রয়োজন মেটায়। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালীদের আধুনিক শিক্ষার দাবি মেটায়। অধিকাংশ কৃষিজীবি এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনতা এই সুযোগ থেকে আজও বঞ্চিত।

তাছাড়া আমাদের দেশে শিশুশিক্ষালয়গুলি ব্যক্তিগত মালিকানা ও প্রয়াসে পরিচালিত। পঁচিশ বছর আগে সার্জেণ্ট-কমিটি সুপারিশ করা সত্বেও সরকারী দায়িত্ব আদৌ পালন করা হয় নি। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও সমীক্ষা কমিটি শিশুশিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করে নানারকম সুপারিশ করা সত্বেও কলকাতায় আলিপুরে হেষ্টিংস হাউসের প্রতিষ্ঠানের মত কয়েকটি মাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। তাছাড়া সাধারণভাবে উৎসাহদানের এবং অনুমোদিত বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদানের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় সমগ্র ভারতে ১৯৫০—৫১ সনে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ৩০৩টি। ১৯৬৪ সনেও ঐ সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০২। কলকারখানা কিম্বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে শিশু লালনাগার কিম্বা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করবার জন্য কোন আইন পাশ হয় নি। প্রাক-প্রাথমিক

শিক্ষা এখনও আমাদের মূল শিক্ষা কাঠামো এবং বাধ্যবাধকতার বাইরে। স্বভাবতঃই দেশব্যাপী কোন কার্যকরী সংগঠনও গড়ে ওঠেনি।

শত দুর্বলতা সত্ত্বেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে সমগ্র বিশ্বে বিগত পঞ্চাশ বছরে শিশু শিক্ষা আন্দোলন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। **এই আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতও সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষেও শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত হতে বাধ্য।** সুতরাং শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন, কারণ আমাদের দেশে বহু ক্ষেত্রেই শিশুশিক্ষা প্রচেষ্টা ভুল পথে পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন স্তরে শিশু শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার **প্রথম স্তরের প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ক্রেস।** এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নার্সারীও বলা চলে। নার্সারী এবং নার্সারী "বিদ্যালয়ের" মধ্যে পার্থক্যটি বুঝতে পারলেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। নার্সারীর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়সুলভ শিক্ষাদানের পরিবর্তে শিশু লালন পালনের দিকটিই মুখ্য। সাধারণতঃ কলকারখানা অফিসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপেই ক্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মরতা মায়েরা দৈনিক কাজের আগে শিশুদের এই লালনাগারে জমা করে দেন। প্রয়োজন বোধে কাজের সময়েও অবসর সংগ্রহ করে শিশুদের স্তন্য দিয়ে যান এবং কাজের ঘণ্টার পরে শিশুকে নিয়ে বাড়ী ফেরেন। মায়ের অনুপস্থিতিকালে শিশুদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করেন ক্রেস্ কর্তৃপক্ষ।

ক্রেসের সরঞ্জামও তাই শিশু লালনের উপযোগী। শিশুদের খাট ও শয্যা, জামা-কাপড় ন্যাপকিন, শিশুদের উপযোগী স্নান ও প্রসাধন দ্রব্য, বিবিধ শিশু খাদ্য, নানান ধরনের খেলনা এবং কিছু কিছু ওষুধই নার্সারীর মূল সরঞ্জাম। আলো-বাতাসপূর্ণ প্রশস্ত এবং সুবৃহৎ ঘরে নার্স ও মেট্রন, সাফাই ও আয়া প্রতিটি শিশুর প্রতি সামগ্রিক এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখেন। উপযুক্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মনোসমীক্ষক ছাড়া ক্রেস অথবা নার্সারী কল্পনাই করা যায় না।

শিশুদের স্বাস্থ্য এবং দৈহিক উন্নতি নিশ্চিত করা, রোগব্যাধি থেকে শিশুদের রক্ষা করা, শিশুদের কতগুলি প্রাথমিক অভ্যাস তৈরী করা, শিশুর জীবনকে খেলা ও আনন্দে ভরিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি মায়ের অনুপস্থিতি শিশুদের বুঝতে না দেওয়াতেই ক্রেসের কৃতিত্ব। খেলাধূলা এবং আমোদ আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশুরা পারস্পরিক সহযোগিতা শিখবে। সুতরাং খেলাই ক্রেস নার্সারীর একমাত্র কার্যক্রম এবং খাওয়া, ঘুমানো, অভ্যেস মত প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং ইচ্ছামত খেলা করাই শিশুদের সমগ্র দিনের কাজ। রুশীয় বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন যে চারমাস বয়স থেকেই কতগুলি দৈহিক ব্যায়াম এবং শারীরিক অভ্যাসের মধ্য দিয়ে দেহ গঠনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা সম্ভব। তাঁরা আরও বলেন যে, দেড় বছর বয়স থেকেই উপযোগী এবং কাম্য পথে শিশুর আচরণ ও ব্যবহারকে অভ্যস্ত করা সম্ভব।

নার্সারী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

ক্রেসের পরবর্তী পর্যায়েই সচেতন শিক্ষন প্রয়াসের স্তরে শিশু পদার্পণ করে। **এই স্তরের প্রতিষ্ঠানই নার্সারী বিদ্যালয়।** শিশুর দেহ মন ও প্রক্ষোভের সুসমঞ্জস বিকাশে সহায়তা করাই নার্সারী বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। শিশুর স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত যত্ন, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অনুশীলন, সুসম খাদ্য সরবরাহ, শারীরিক অভ্যাসগঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর শিশুর নিজস্ব দখল প্রতিষ্ঠা, উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রভৃতি নিশ্চিত করাই নার্সারী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। শিশুকে আত্মনির্ভর এবং আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন করে গড়ে তোলা, নিরীক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করা, সুস্থ কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন করা, বস্তুনির্ভর মনোযোগশক্তি বৃদ্ধি করা, বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে বাচনভঙ্গির উন্নতি, শব্দসম্ভার বৃদ্ধি এবং ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করাও নার্সারী বিদ্যালয়ের কাজ। স্বতঃস্ফূর্ত খেলা, আমোদ-প্রমোদ এবং সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনার উন্মেষে এবং সহযোগিতার মন্ত্রে দীক্ষিত করাও নার্সারী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য।

এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের শিক্ষাবোর্ডের মন্তব্য খুবই শিক্ষাপ্রদ। এই মন্তব্যে বলা হয়েছে, "Between the ages of two and five (years) the child is gaining knowledge of the world about him through his senses, and is learning to exercise these senses in themselves, and more specially sight, hearing and touch. The child's constant desire to look at things and handle them should be restricted as little as possible, and in school the child should be surrounded with objects and materials which will afford scope for experimentation and exploration.

In the ordinary and urban environment there is little to satisfy the child's natural impulses; it is important, therefore, to provide an environment which will do so by keeping the children in the open air surrounded by trees, plants, animals, places that they can explore, pools in which they can paddle and sand pits in which they can dig."

এই উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার হয় যে নার্সারী স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর দেহ ও মনের সযত্ন লালন, পরিবেশ পরিচিতি, চোখ কান ও স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতির অনুশীলন, কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা, আকর্ষণীয় বস্তু নাড়াচাড়া করার সুযোগ প্রদান এবং শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির উপযুক্ত পরিপোষণ।

শিশুর প্রতি নজর দেওয়া ছাড়াও নার্সারী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় আর এক ধরনের কাজ থাকে। তা হলো সমাজকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে মায়েদের শিক্ষাকেন্দ্র, সংবাদ আদান প্রদান ও পরামর্শ কেন্দ্র এবং দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্ররূপে দায়িত্ব পালন। সোভিয়েট রাশিয়াতে এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নার্সারী স্কুলের পাঠ্যক্রম

যে কোন স্তরেই হোক, শিক্ষার উদ্দেশ্যই নির্দ্ধারণ করে পাঠ্যক্রম এবং কার্যক্রম। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে "লেখাপড়া" বলতে আমরা যা বুঝি, নার্সারী শিক্ষায় তেমন কিছুর স্থান

নেই। শিশুর শরীর ও মনের সুস্থ বিকাশকে সাহায্য করাই নার্সারী শিক্ষার কাজ। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কাজের ভিত্তিতেই শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটবে। **সুতরাং অভিজ্ঞতা ও কাজের সমষ্টিই নার্সারী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম।**

অভিজ্ঞতা ও কাজগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য কয়েকটি মৌলিক নীতি অবলম্বিত হওয়া দরকার। এমন কাজ শিশুকে দিতে হবে যেন তার মধ্য দিয়ে শিশুর সহজাত সম্ভাবনা প্রকাশিত ও বিকশিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কাজের মধ্য দিয়ে শিশু যেন আনন্দ পায় এবং সেই পথে তার প্রক্ষোভ জীবনে সুস্থতা ও ভারসাম্য স্থাপিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই খেলা, গান, অভিনয়, বেড়ানো, নানাধরনের জিনিসপত্র দিয়ে ইচ্ছেমত ভাঙাগড়ার কাজ প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে গ্রহণীয়। শিশুর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা এবং সৃষ্টিধর্মীতা মেটানোও চাই। এই উদ্দেশ্যে পশুপাখী লালন, বাগানের কাজ, প্রকৃতি বীক্ষণ এবং যন্ত্রপাতির কাজ থাকবে পাঠ্যক্রমে। শিশুর মধ্যে সমাজমুখী সহযোগিতার মনোভাব এবং অভ্যাস গড়বার জন্য দলবদ্ধ কাজ, খেলা, অভিনয়, ভ্রমণ প্রভৃতি প্রয়োজন। আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাস্থ্যবান মানুষরূপে শিশুকে গড়বার জন্য তাকে শেখাতে হবে নিজের ও বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যেস, নিজের কাজ নিজে করবার অভ্যেস, খাওয়া দাওয়া পোশাক পরা, ঘুমানো, পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য আচরণগত অভ্যাস। সর্বোপরি শিশুর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পরিপোষণ এবং তার চরিত্র গঠনের সহায়ক কাজও দরকার। আত্মনির্ভরতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব, বন্ধুবাৎসল্য, সহনশীলতা, পরিশ্রমশীলতা, সততা, সৌন্দর্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এগুলিও সম্ভব ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজ, খেলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। **অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের মাধ্যমেই এইসব গুণের বিকাশ সম্ভব।**

সুতরাং সংক্ষেপে বলা চলে যে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করা, ঘরে ও ঘরের বাইরে নানা রকমের খেলা, জিনিসপত্র নিয়ে ভাঙাগড়ার কাজ, আগ্রহকেন্দ্রিক সৃষ্টিধর্মী কাজ, গল্প গান অভিনয়, প্রকৃতি বীক্ষণ এবং সুঅভ্যাস ও শুভ মনোভাব গঠনের জন্য ব্যক্তিগত ও দলগত অভিজ্ঞতা ও কাজই হবে নার্সারী শিক্ষার পাঠ্যক্রম।

এককথায় শিশুকে একটি সুন্দর ও আনন্দময় দৈনন্দিন জীবন যাপন করানোই নার্সারী বিদ্যালয়ের নিত্যদিনের কাজ।

নার্সারী স্কুলের দৈনিক সময় নির্ঘণ্ট

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে নার্সারী স্কুলের দৈনন্দিন সময় নির্ঘণ্টকে নিম্নানুরূপভাবে সাজানো চলে :—

সকাল ৮টায়—স্কুলে আগমন এবং পারস্পরিক প্রীতিজ্ঞাপন, হাত মুখ ধোওয়া, বাড়ীর পোশাক ছেড়ে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা প্রভৃতি।

সকাল ৮॥টায়—সমবেত সঙ্গীত, শিক্ষিকা কর্তৃক শিশুদের পরিদর্শন, দুধ কিম্বা ফলের রস পান ইত্যাদি।

সকাল ৯টায়—খেলা, গল্প, ছবি দেখা, বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে জিনিষ গড়ার কাজ প্রভৃতি। এগুলির কোন একটির সুরু কিম্বা শেষের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে না দেওয়াই ভাল, কারণ সবকিছু নির্ভর করবে শিশুর আগ্রহ ও মনোযোগের উপর।

(সকাল ৭টায় স্কুল আরম্ভ করতে পারলে সকালের এই কর্মসূচীকে আরও একটু বাড়ানো চলে। সে ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু মুক্ত ব্যায়াম এবং বাগানের কাজ দেওয়া চলে)।

১১।৩০ থেকে ১২টা—খেলার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা, খাওয়ার টেবিল চেয়ার সাজানো এবং হাত মুখ ধুয়ে খাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া।

১২—১২।৫৫ = দুপুরের খাওয়া, হাত মুখ ধোওয়া এবং বাথরুমের কাজ।

১—২।৩০ = শোওয়ার ব্যবস্থা করে ঘুমানো। (বাধ্যতামূলকভাবে ঘুমাতেই হবে এমন কোন কথা নেই। খেলা ও পরিশ্রমের পরিপূরকরূপে শিশুর প্রয়োজন উপযুক্ত বিশ্রাম। সুতরাং বিশ্রামই এক্ষেত্রে বড় কথা। মন ও দেহ ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বিশ্রামই ঘুমের সমকক্ষ)।

২।৩০ = বিছানা গুটানো, হাত মুখ ধোওয়া, জল কিম্বা অন্য পানীয় গ্রহণ, এবং তারপর গান, গল্প, খেলা।

৩।১৫ = হাত মুখ ধুয়ে বাড়ীর পোশাক পরা, কিছু পাণীয় গ্রহণ। সমবেত সঙ্গীত শেষ করে বাড়ীতে ফিরবার প্রস্তুতি।

৩।৩০ = ছুটি।

মোটামুটি দৈনিক সময় নির্ঘণ্টকে এইভাবে ভাগ করা চলে—খেলা ৩ ঘণ্টা, অন্যান্য দলবদ্ধ কাজ ২০ মিনিট, খাওয়া দাওয়া ১½ ঘণ্টা, হাতমুখ ধোওয়া ও বাথরুমের কাজ ১ ঘণ্টা, বিশ্রাম ১½ ঘণ্টা।

নার্সারী স্কুলের আসবাব ও সরঞ্জাম

আলোচিত পাঠ্যক্রম অর্থাৎ কার্যক্রম অনুসারে দৈনিক সময় নির্ঘণ্ট অনুসরণ করবার জন্য নিম্নানুরূপ জমি বাড়ী সরঞ্জাম দরকার। বিদেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ আইনও রয়েছে। এইসব না থাকলে সেখানে নার্সারী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং সরকারী সাহায্য পাওয়া দুষ্কর।

১। **বাড়ীঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম :—**

(ক) পিতামাতার বসবার ঘর (waiting room)।

(খ) খেলবার ঘর, কাজের ঘর এবং বিশ্রাম ঘর।

(গ) বাইরের উঠোন এবং খেলার মাঠ।

(ঘ) রান্নাঘর, পোশাকের ঘর, ওষধের গুদাম, হাত ধোয়ার ছোট ছোট বেসিন, ভাল বাথরুম প্রভৃতি।

(ঙ) মৌসুমী ফুলের বাগান।

(চ) শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় পশুপাখী ও মাছের চৌবাচ্চা। শিশুরা এদের লালন পালন করবে এবং খাওয়াবে। অবশ্য রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে প্রয়োজন।

(ছ) ছোট ছোট টেবিল, ডেস্ক, চেয়ার ও খাট বিছানা। এগুলি স্থানান্তর যোগ্য, হাল্কা কিন্তু শক্ত হওয়া প্রয়োজন, কারন শিশুরাই এসব নাড়াচাড়া করবে।

(জ) নানাধরনের খেলনা ও পুতুল, স্কিপিং দড়ি, ছোট হাড়ি কলসি, বল, পুঁতি, কাগজ, কাঁচি ও সুঁচ, কাঠের টুকরো, তুলো, ইটপাথর, মাটি, লাঠি, হাতুড়ী বাটালি, কাঠের চাকা, করাত, পিন প্রভৃতি। এগুলি রাখবার নির্দিষ্ট জায়গা প্রয়োজন। মাঠের মধ্যে কিছু বালি, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি চাই।

(ঝ) শ্লেট, ছবির বই, ধাঁধাঁর বই প্রভৃতির বুক-কেশ।

(ঞ) সৃজনশীল কাজের জন্য তুলি কলম পেন্সিল, ক্রেয়ন, নানা রকমের রং, কাঁচি, কাগজ, আঁঠা প্রভৃতি। এসবের জন্যও নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন। ছোট ছোট দেয়াল আলমারী হলেই ভাল। এই সব আলমারীতে নানাধরনের প্রাকৃতিক বস্তুর সঞ্চয় থাকলে আরও ভাল। আর প্রয়োজন শিশুদের উপযোগী বাদ্যযন্ত্র।

(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সরঞ্জাম যদি স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবেই ভাল। আমাদের দেশে এই সব জিনিসের ভারতীয় সংস্করনই হবে উপযুক্ত সরঞ্জাম।)

স্কুলের বাড়ী থেকে সরঞ্জাম পর্যন্ত সবকিছুই শিশুর কাছে আকর্ষণীয় রংয়ে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করে নেওয়াই শ্রেয়।

২। নার্সারী বিদ্যালয়ে বিতরণ যোগ্য খাদ্যের উপযুক্ত পুষ্টিগুণ থাকা প্রয়োজন। এই খাদ্যে থাকবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, চর্বি, জল, ধাতব পদার্থ এবং ভাইটামিনের সুসম মিশ্রন। ভাজা এবং মসলাযুক্ত খাবারের বদলে কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ করা খাবারই শ্রেয়। চাউল, দুধ, মূলো কফি পালং টমাটো, কলা, নেবু, কিসমিস প্রভৃতি জিনিষ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা চলে। সাধারণভাবে সুপ, চাউল দুধের পায়েস্, শুধু দুধ, সব্জি এবং ফলের রস কিম্বা স্যালাড হিসেবেও এই সব খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা চলে। মাছ মাংস ডিম দেওয়া বাধ্যতামূলক না করলেও চলে। ভাতের বদলে রুটি, ওট প্রভৃতিও দেওয়া যায়। তবে **যে খাদ্যই দেওয়া হোক তা যেন যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ সম্পন্ন হয়, সুস্বাদু হয়, দ্রুত প্রস্তুত করা যায় এবং অতিরিক্ত ব্যয় সাপেক্ষ না হয়।**

তাছাড়া বাড়ী থেকে খাদ্য সরবরাহের ফলে খাওয়ার মধ্যেও ধণী দরিদ্রের যে ব্যবধানটি বিদ্যালয়ের চত্বরেও প্রকট হয়ে ওঠে, তার সম্ভাবনা রোধ করবার জন্য **সকল শিশুর জন্য সমভাবে বিদ্যালয় থেকে খাদ্য বিতরণই শ্রেয়।**

(আমাদের দেশে অলিতে গলিতে প্রচলিত নার্সারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খাদ্যের ব্যাপারে দায় দায়িত্ব সযত্নে পরিহার করেন। তাই বাড়ী থেকে পাঠানো খাদ্যের তারতম্য শিশুদের মধ্যে অহংকার কিম্বা হীনমন্যতা সৃষ্টি করে)।

৩। **নার্সারী স্কুলের পোশাক সম্বন্ধেও উল্লেখ করা দরকার।** শিশুদের পোশাক হবে ঢিলেঢালা, যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এবং রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত না ঘটে। গরমের সময় পাতলা এবং শীতের দিনে মোটা পোশাকই ভাল। অবশ্য পোশাকটি সুন্দর ও পরিপাটি হওয়া চাই। সাদা কিম্বা হাল্‌কা রঙের পোশাকই শ্রেয়। (অন্তত কালো রংয়ের পোশাক যেন না হয়)। **সব শিশুর জন্য একই রকমের ইউনিফর্মই ভাল।**

৪। **সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন নার্সারী স্কুলের পরিবেশের কথা।** বিদ্যালয়ের ভিতরের মাঠ, গাছপালা, বাগান, কৃত্রিম জলাশয় প্রভৃতি যেন সুন্দর পরিবেশ রচনা করে। বিদ্যালয়ের চারপাশে ভৌগোলিক পরিবেশটিও যেন আকর্ষণীয় হয়। সমাজ ও লোকালয় থেকে নির্বাসন নয়, সুস্থ সামাজিক পরিবেশেই যেন বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বোপরি একটি আনন্দদায়ক মানসিক পরিবেশ যেন শিশুর দেহ মন বিকাশের সহায়ক হয়।

কিণ্ডারগার্টেন/ইনফ্যাণ্ট স্কুলের লক্ষ্য

কিণ্ডারগার্টেন স্তরের শিশুরা আরও একটু বড়। এরা অল্পদিন পরেই নিয়মিত প্রাথমিক স্তরের ছাত্র হয়ে পড়বে। সুতরাং এদের শিক্ষায় উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নার্সারী শিক্ষা থেকে একটু পৃথক।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য এবং শরীরের যত্ন অবশ্যই অব্যাহত থাকে, এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে শব্দসম্ভার বৃদ্ধি এবং বাচন দক্ষতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। দর্শনেন্দ্রিয় এবং হস্ত সঞ্চালনের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়, (eye-hand co-ordination)। শিশুর কল্পনাশক্তি, মনোভাব, আগ্রহ, প্রক্ষোভ ও প্রবনতাকে সুপথে পরিচালন করাই এই স্তরের শিক্ষায় বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন, নৈতিক অভ্যাস ও আচরণ গঠন এবং বাস্তব জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে নাগরিকতার শিক্ষাও এই স্তরের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

লেখা পড়া গণিতের নিয়মমাফিক পাঠ দেওয়া কিণ্ডারগার্টেনের লক্ষ্য নয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশের প্রস্তুতি রূপে লেখা পড়া ও অঙ্কের প্রথম পাঠ দেওয়া এই স্তরের কাম্য। অন্ততঃ শিশুরা যেন বইপত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে, এমন পরিবেশ রচনা করা চাই। সর্ব্বোপরি উল্লেখ্য যে মনের যে কোন রকম বিকার থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য সুস্থ ও আনন্দময় পরিবেশ রচিত হবে কিণ্ডারগার্টেনে। ঐ সঙ্গে থাকবে মাতৃমঙ্গল এবং শিশুপালন সম্পর্কে মায়েদের শিক্ষণের দায়িত্বও।

পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের শিশু শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারনা আরও স্বচ্ছ করবার উদ্দেশ্যে আমরা আবারও ইংলণ্ডের ইনফ্যাণ্ট স্কুলের ঘোষিত লক্ষ্য উদ্ধৃত করতে পারি—"It is the function of the infant school to supply children between the ages of five and seven with what is essential for their healthy growth,—physical, intellectual, spiritual, moral. The first place in training will still be given to the physical well being of the child. Speech training should be continued. Since it is natural in children to express their sense of Rhythm in movement, they should be encouraged to do so in various ways.

Constructive work of various kinds should occupy an important place in the activities of the Infant School. In general manual and aesthetic development are better secured when the child is left to make what he likes, how he likes, and, within reason, when he likes, rather than by any set of lessons.

The child should begin to learn the three 3 Rs when he wants to do so, whether he is three or six years old. Only in this way will the acquisition of 3 Rs come about incidentally as a part of widening interests and experiences. The principle underlying the procedure of the Infant School should be that, as far as possible, the child should be put in a position to teach himself, and the knowledge that he is to acquire should come, not so much from the Instructor as from an instructive environment.

The work of Infant School is to introduce the child to the discipline of formal learning—but still with an atmosphere of exploration and enjoyment.

The need is plenty of building and making things with different sorts of material, a constant acquaintanceship with music, good posture and Rhythmic movement, development of good health habits and social training."

সুতরাং কিণ্ডারগার্টেনের মূল লক্ষ্য হলো শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়তা করা, শিশুকে ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, রাগ উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত রাখা এবং এ সব বিষয়ে বাড়ীর কুপ্রভাব দূর করা, শিশুর মধ্যে সামাজিক বোধ সৃষ্টি করা। এই সব কিছু এবং আবেগের শুভ বিকাশ নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজন শিশুর জীবনে বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

কিণ্ডারগার্টেনের পাঠ্যক্রম

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিণ্ডারগার্টেন—ইনফ্যাণ্ট স্কুলের পাঠ্যক্রম তথা কার্যক্রম নির্দ্ধারণ করতে হবে। সুতরাং **এই স্তরের কার্যক্রমে থাকবে** স্বাস্থ্যকর আহার ও জলখাবার, খেলা ও ব্যায়াম ; দৃষ্টি ও পেশীশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং সমন্বয়ের জন্য কাগজ কিম্বা কার্ডবোর্ডের কাজ, আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে ছবিতে রংয়ের কাজ, সাধারণ ড্রইং, টুকরো কাঠের কাজ, কাদামাটির কাজ প্রভৃতি ; কল্পনাশক্তি বিকাশের জন্য বস্তু নিরীক্ষণ, গল্প বলা ও শোনা, পরিচিত বিষয়ের বর্ণনা ; চরিত্র গঠনের জন্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং সু-অভ্যাস গঠন ; নাগরিকতা ও যৌথ জীবনের জন্য দলবদ্ধ খেলা ও কাজ ; সম্ভাবনা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রকমের গঠনাত্মক কাজ ; অঙ্ক শিক্ষার প্রস্তুতিরূপে বস্তুগণনা, বইয়ের পৃষ্ঠা গণনা, ক্যালেণ্ডারের তারিখ দেখা ; শেষ বৎসরে লেখা-পড়া-গণিতের প্রারম্ভিক সূচনা। পড়াশুনার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিশুদের আকর্ষণীয় বই দিয়ে প্রতিনিয়ত ঘিরে রাখা প্রয়োজন।

এই স্তরের শিক্ষাকে সাধ্যমত বস্তুধর্মী এবং বাস্তব ভিত্তিক করা প্রয়োজন। এজন্য দরকার বস্তুপাঠ এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলন, মুক্ত ক্রিয়া, অবারিত

খেলা, দলগত জীবনে সততা, ভদ্রতা এবং ভাষার শিক্ষা, গান অভিনয়, বাগানের কাজ এবং ভ্রমণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ।

এই সূত্রে আমরা ফ্রোয়েবলীয় কিণ্ডারগার্টেনের পাঠ্যক্রমের কথা বলতে পারি। ধর্ম শিক্ষা, প্রকৃতি পাঠ, প্রাথমিক গণিত, ভাষা, অঙ্কন হস্তশিল্প, এবং সৌন্দর্য প্রীতি জাগ্রত করবার কার্যক্রম নিয়ে এই পাঠ্যক্রম গঠিত। তেমনি মন্তেসরি পদ্ধতির মৌলিক লক্ষ্য হলো শিশুর আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরতা এবং দেহ স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়শক্তির দক্ষতা সৃষ্টি। তাই ইন্দ্রিয়ানুশীলন, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালন, হাতের কাজ, বাগান, প্রকৃতিপাঠ, সঙ্গীত, ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা এবং লেখা-পড়া গণিতের প্রারম্ভিক সূচনা নিয়ে পাঠ্যক্রম গঠিত। অবশ্য এই শিক্ষা হবে শিশুর আত্মশিক্ষা (auto education)।

বিদ্যালয়ের সরঞ্জাম তালিকাও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম অনুসারে স্থির করা প্রয়োজন। ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে মাটি, তুলো, কাঠের গুঁড়ো, বাগান, ছোটদের প্রিয় জীবজন্তু, গল্পের বই ও ছবি, খেলার বিচিত্র সরঞ্জাম, নাচ ও গানের সরঞ্জাম, এবং ফ্রোয়েবলের gift সমূহের কথা বলা হয়েছে।

মন্তেসরি পদ্ধতিতেও বলা হয়েছে বিভিন্ন রংয়ের সুতো ও পশম, বিভিন্ন আকার গড়ন পরিমাপ ও ওজনের কাঠের ব্লক, লোহা কিম্বা কাঠের রড, ত্রিশিরা কাঁচ, বহুবিধ কার্ড, পুঁতি, এ্যাবাকাস প্রভৃতির কথা।

শিক্ষণ পদ্ধতি যাই হোক, পাঁচ থেকে সাত বছরের শিক্ষার স্তরে বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন প্রশস্ত মাঠ ও বাগান, সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর বাড়ী, সঙ্গীতের যন্ত্র, খাওয়ার ঘর, বাথরুম, চিকিৎসা ঘর, ক্লাবঘর প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্ট, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা, পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা নার্সারী বিদ্যালয় সম্পর্কে করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য।

শিশু-শিক্ষালয়ের রকম-ভেদ

শিশুর বয়স ও শিক্ষাগত কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিদ্যালয়েরও রকমভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। (১) একথা সর্ববাদীসম্মত যে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত

শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো **ক্রেস**। (২) দুই থেকে চার অথবা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **নার্সারী স্কুল**। আমেরিকার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে নার্সারী স্কুলের দৈর্ঘ ২—৪ বৎসর। মন্তেসরি স্কুলের সাধারণ দৈর্ঘ ৩—৫ বৎসর (৩) ৪।৫—৬।৭ বৎসরের শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **কিণ্ডারগার্টেন**। ইংলণ্ডে এই স্তরের (৫—৭) প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় Infant School (৪) আমাদের দেশে প্রাক-বুনিয়াদি স্কুলে ২।২½ থেকে একটানা ৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সকেই ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে এই তিনটি স্তর বিভিন্নভাবে সংগঠিত। ক্রেসগুলি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান রূপেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। ফ্রান্সে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Ecole Maternelles রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পৃথক প্রতিষ্ঠান, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এগুলি যুক্ত থাকে। ইংলণ্ডের ইনফ্যাণ্ট স্কুলও তেমনি বাধ্যতামূলক শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত এবং বহু ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। রাশিয়াতে একটানা ছয় বৎসর বয়স পর্যন্তই কিণ্ডারগার্টেনের মধ্যে ধরা হয়, অর্থাৎ সেখানে নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেনের মধ্যে ব্যবধান তুলে দেওয়ার দিকেই প্রবণতা বেশী। ইংলণ্ডেও কোন কোন ক্ষেত্রে ২—৭ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল ও ইনফ্যাণ্ট স্কুলকে যুক্ত প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচনা করা হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে শিক্ষার কোন স্তরভেদ করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতদ্বৈধ আছে। **একটানা সাত বৎসর বয়সের পরেই স্তরভেদ করবার স্বপক্ষে সাম্প্রতিক কালে অভিমত সংগঠিত হচ্ছে**।

নার্সারী স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেনের মধ্যে সংগঠনগত কিছু পার্থক্যের কথা এই সূত্রে মনে রাখা দরকার। নার্সারী স্কুল অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের জন্য, তাই এ ক্ষেত্রে স্কুল ও বাড়ীর মধ্যে ঘনিষ্টতর সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন। পিতামাতার শিক্ষার প্রতিও এ ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকৃত নার্সারী স্কুলের সময় নির্ঘণ্ট প্রায় সারা দিন ব্যাপী বিস্তৃত থাকে। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্য, খাওয়া, ঘুম, শৈশবকালীন অভ্যাস প্রভৃতির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিটি শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন এ ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু স্নেহ যত্নের মধ্য দিয়েও শিশুর স্বকীয়তা এবং আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের প্রতি নজর রাখা হয়। অবশ্য এইসব কিছুই করা হয় শিশুদের কর্মপ্রবণতার সদ্ব্যবহার করে। দলগত জীবনের চেয়েও এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়। তাই প্রতি শিক্ষিকার দায়িত্বে শিশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। নার্সারী বিদ্যালয়ের আসবাব এবং সরঞ্জামের আকারও ক্ষুদে শিশুর উপযোগী।

এই সূত্রে মনে রাখা দরকার যে **নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেনের মধ্যে পার্থক্যটি মৌলিক দৃষ্টিতে গুণগত নয়, বরং পরিমানগত।** সর্বোত্তম পন্থা হলো নার্সারী ও কে, জি'র মধ্যে, তথা মন্তেসরি ও ফ্রয়েবল পদ্ধতির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। এই ধরনের বিদ্যালয়ে সর্বমোট ১২০ টির বেশী শিশু ভর্তি করা অন্যায়। তাছাড়া বিদ্যালয়টি প্রাথমিক স্কুলের লেজ না হয়ে পৃথক, স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াই কাম্য।

শিশু শিক্ষায় গৃহের ভূমিকা

কিন্তু শিশু শিক্ষালয় যতই সুগঠিত এবং ভাল হোক না কেন, সুগঠিত, সুরুচিসম্পন্ন, আদর্শনিষ্ঠ এবং স্নেহসিক্ত গৃহের স্থান সে কখনোই নিতে পারেনা। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের শিক্ষার সূচনা হয়েছে পারিবারিক জীবনে। পারিবারিক জীবনের মধ্য থেকেই আচার আচরণ অভ্যাস ও আদর্শ শেখা সম্ভব হয়েছে। গৃহের আবহাওয়াতেই শিশু শিখেছে ভালবাসা, মায়া মমতা ত্যাগ ও ধৈর্য। ভাইবোন আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বড় হওয়ার মধ্য দিয়েই সহযোগিতার মন্ত্র ও কর্মে দীক্ষিত হয়েছে শিশু। শিশুর ভরন-পোষণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে আত্মীয়জনের। শিশুর প্রাথমিক লেখাপড়াও সুরু হয়েছে বাড়ীতেই। মা ঠাকুরমার কাছেই শিশু শুনেছে রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের কথা। ছড়া ও ঘুমপাড়ানীর গানে বিমুগ্ধ হয়েছে শিশু। নানা ধরনের ভাঙ্গাগড়া খেলাও সে খেলেছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পারিবারিক বৃত্তির সঙ্গেও যে পরিচিত হয়েছে। বাবা-মা'ই বরাবর সর্বোত্তম শিক্ষক-শিক্ষিকা রূপে গণ্য হয়েছেন।

বস্তুতঃ শৈশবের শিক্ষায় গৃহ পরিবেশ এবং পিতামাতার ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন বলেই **কোমেনিয়াস্** বলেছিলেন মায়ের স্কুলের কথা

(school of the mother's knee)। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর জীবনে বাবা মায়ের বিশেষ ভূমিকার কথা বলেছিলেন রুশো। লিওনার্ড এবং গাট্রুড' এর কাহিনীতে স্নেহময় পারিবারিক পরিবেশের কথাই বলেছেন পেস্তালোৎসি। ফ্রয়েবেল ও মন্তেসরির মুখেও একই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শও তাই। চার বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার সর্বোত্তম স্থান যে গৃহ পরিবেশ—এ কথা জন ডিউইও বলেছেন।

কিন্তু আধুনিক পারিবারিক জীবন ভগ্নদশাগ্রস্থ। সামাজিক ও আর্থিক সংকটের ফলে পারিবারিক জীবনও তার যথোচিত দায়িত্ব পালন করতে পারছেনা। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা রূপে শিশু শিক্ষালয়ের গুরুত্ব বাড়ছে। বিদ্যালয়ের রূপ, সংগঠন ও পরিচালনা যাই হোক না কেন, সকল দিক থেকে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তর সংস্করণ রূপে গড়ে ওঠাতেই শিশু-বিদ্যালয়ের সার্থকতা। শিশুর কাছে তার স্কুল কত প্রিয়, তাই হবে বিদ্যালয়ের সাফল্যের মানদণ্ড।

শিশু শিক্ষার পদ্ধতি

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষনের জন্য বহুবিধ পদ্ধতি এখন প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির কথা আগে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই আলোচনা করা হচ্ছে মন্তেসরি পদ্ধতির কথা। মাদাম মন্তেসরি সর্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রয়াসের কল্পনা করেছেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য (১) আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক দক্ষতা সৃষ্টি, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অনুশীলন, (৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পেশীর সঞ্চালন, (৪) লেখা পড়া ও গণিতের দক্ষতা, (৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, হাতের কাজ, বাগানের কাজ এবং প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, (৬) নৈতিক শিক্ষা, এবং (৭) ধর্মীয় শিক্ষা।

মন্তেসরির মতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ এবং পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে দৈহিক সক্রিয়তাই শিক্ষার মূল। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি-নির্ভর। শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি ও

গতি নির্দ্ধারিত হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে। সব শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং কিছুই শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

মন্তেসরির শিক্ষানীতি (Principles)

মন্তেসরির বিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচনার বয়স ৩ বৎসর এবং শিক্ষাকাল ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তিন বৎসরকেই সূচনাকাল ধরা হয়েছে এই জন্য যে এই সময়েই শিশুর কতগুলি স্বাভাবিক অভাব বোধ সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত ক্ষণে স্বপ্রচেষ্টায় এই অভাব পূরণই শিক্ষা। শিশুর কাছে বক্তৃতা করাই শিক্ষা নয়, নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় সময় নির্ঘণ্টকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাও শিক্ষা নয়। পুরাতন শিক্ষণপদ্ধতি ছিল সমষ্টিগত। কিন্তু প্রতিটি শিশুই স্বকীয়তাসম্পন্ন "ব্যক্তিশিশু"। সুতরাং শিক্ষিকার দায়িত্ব যুগপৎ সহজ ও কষ্টসাধ্য। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় চাই। তাঁকে হতে হবে সজাগ সচেতন ও স্নেহপ্রবণ, শিশুর প্রকৃতিকে সুগঠিত মূর্তরূপ দেওয়াই হবে তাঁর দায়িত্ব।

মন্তেসরি নীতিতে প্রধান কথাই হলো শিশুর স্বাধীনতা। তাদের আনন্দ ও খেলায় প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক বিকাশকেই রুদ্ধ করে মাত্র। মন্তেসরি মন্তব্য করেছেন যে সাধারণতঃ আমরা শিশুদের শ্রদ্ধা করিনা, আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করি। আমাদের আদর্শ আচরণই প্রথম প্রয়োজন, কারণ শিশুরা আমাদের অনুকরণ করে। শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের উপর। শিশুর উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলে আগ্রহ সৃষ্টি ও বাস্তবায়িত করা আদৌ কষ্টকর নয়।

শিশুর স্বাধীনতাই নূতন শিক্ষার মূলমন্ত্র। চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝায় পীড়ণমূলক প্রাণহীন পুরাতন শিক্ষাকে সকল আধুনিক শিক্ষাগুরুই নিন্দা করেছেন। রুশো থেকে ডিউই—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই মূলধ্বনি—স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কেবল দেহের স্বাধীনতা নয়, তবে দৈহিক স্বাধীনতা মানসিক মুক্তি এবং স্বনির্বাচিত কর্ম সম্পাদনের সহায়ক।

তাছাড়া স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। মন্তেসরি বিদ্যালয়ে সহযোগিতার পদ্ধতিতে শিশুরা নিজেই অনেক কাজ করে চলে। এই ভাবেই তারা সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আগ্রহশীল, নিয়ন্ত্রিত, ভদ্র এবং সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনুশীলনের ফলে তাদের চলাফেরা হয়ে ওঠে

হন্দোময়, এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সহযোগিতার মাধ্যমে তারা বন্ধুবাৎসল্য এবং সদভ্যাস আয়ত্ত করে। বস্তুতঃ ভদ্র, সৃজনশীল, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, উৎসাহী, সুদক্ষ এবং সমব্যথী শিশু তৈরীই মন্তেসরি-শিক্ষার উদ্দেশ্য। পুরাতন শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা হতো পীড়নের দ্বারা। কিন্তু মন্তেসরির শিক্ষা নেতিবাচক নয়। এই পদ্ধতিতে রয়েছে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আবেগ ও ক্ষমতার ইতিবাচক নির্দেশনা। শিক্ষিকা তখনই মাত্র হস্তক্ষেপ করেন, যখন একজনের কাজ আর একজনের ক্ষতিসাধন করে।

মন্তেসরি শিক্ষার অন্যান্য মৌল নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :—

(১) শিশুর পরিবেশই হবে শিক্ষার ভারকেন্দ্র। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশু নিজের জগত বলে অনুভব করবে। শিক্ষার উপকরণও হবে শিশুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(২) জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বনির্ভরতা শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) শিশুর মনোবিকাশের নিম্নতর স্তর থেকেই শিক্ষা সূচনা প্রয়োজন।

(৪) বুদ্ধির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের নিকট আবেদনই বেশী প্রয়োজন।

(৫) একটি ইন্দ্রিয়শক্তির স্বল্পতা অপরাপর ইন্দ্রিয়শক্তির প্রখরতা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে।

(৬) শিশুকে পীড়ন করা অন্যায়, পুরস্কৃত করারও প্রয়োজন নেই। তার নিজস্ব সাফল্য ও আত্মোন্নতিই তার সত্যিকারের এবং একমাত্র আনন্দ। এই আনন্দই তার পুরস্কার।

(৭) শিক্ষনধারা হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরানুযায়ী। পরিবেশও হবে সেই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিবেশের মধ্যেই শিশু আত্মশিক্ষার উপায় খুঁজে পাবে।

(৮) শিক্ষার উপকরণের মধ্যেই থাকবে ভ্রম সংশোধনের নির্দেশ। ব্যর্থতা থেকে শিশু নিজেই ভ্রম সংশোধন করতে শিখবে ; এবং অভিজ্ঞতার আত্মকরণ-পদ্ধতিতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করবে। অভিজ্ঞতা দিয়ে ভ্রমসংশোধনের শিক্ষাই আত্মশিক্ষার (auto education) মূল।

মন্তেসরির পদ্ধতিকে বলা হয়েছে Psychological Method। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল কথা—(ক) পাঠ্যক্রম কিম্বা শিক্ষকের পরিবর্তে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি এবং আগ্রহই হবে মূল বিবেচ্য। (খ) শিশুর প্রয়োজনবোধই শিক্ষা-

সফলতার গ্যারান্টি। ঠিক উপযুক্ত ক্ষণটি একবার হারালে সেই সময়টির যোগ্য শিক্ষার সুযোগ আর আসেনা। (গ) শিশু কোন ভুল করলে বুঝতে হবে নির্ভুল শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক এবং দৈহিক ক্ষণটি তখনও আসেনি। সুতরাং নির্ভুল কর্মসম্পাদনের জন্য সময় গুণতে হবে। (ঘ) বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্ট অনুসারে শিশুর শিক্ষা চলবেনা। শিশুর আগ্রহ ও নিবিষ্টতার দ্বারাই সময় নির্ঘণ্ট তৈরী হবে। সুতরাং প্রতি শিশুর সময় নির্ঘণ্ট হবে বিভিন্ন।

শিক্ষন পদ্ধতি

"মন্তেসরি স্কুলের" শিক্ষা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :—

(১) বাস্তব জীবনযাত্রা বিধির অনুশীলন। শিশুদের স্বাবলম্বীতা শিক্ষাই এই স্তরের লক্ষ্য। হাতমুখ ধোয়া, দাঁত নখ পরিষ্কার রাখা, পোশাক পরা ও খোলা, বিনম্রভাবে চলাফেরা করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য অভ্যাস গঠন করা হয়। দেহযন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কিছু কিছু শরীর চর্চার পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেছেন—যেমন সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা, লাইন বেঁধে হাঁটা, ব্যালেন্সের অনুশীলন প্রভৃতি। এ জন্যে তিনি নানাধরনের উপকরণও উদ্ভাবন করেছেন।

(২) দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলো ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানাধরনের অনুশীলন। মন্তেসরির উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়শক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি। এজন্য বস্তুর আকার, গঠন, ওজনের তারতম্য, উত্তাপের তারতম্য, শ্রুতিশক্তির প্রখরতা, বর্ণপার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য উপকরণ সম্বলিত অনুশীলনের প্রস্তাব করেছেন।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় থাকবে শিক্ষামূলক অনুশীলন (didactic exercises)। (ক) ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বস্তুর নামের সংযোগ স্থাপন, (খ) নাম থেকে বস্তু চিহ্নিত করা এবং (গ) স্মৃতি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর নাম উল্লেখ করা। এই তিন ধরনের অনুশীলন চলবে বর্ণ, স্পর্শ, ওজন, উত্তাপ প্রভৃতি সকল অনুভূতির ক্ষেত্রেই।

বর্ণানুভূতির উপকরণ হিসেবে তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন রংয়ের ৬৪টি রঙিন পশমের কার্ড; শিশুরা রংয়ের তারতম্য ও আনুপাতিক গভীরতা অনুসারে সাজাবে। অথবা অনেকগুলি জিনিষের স্তূপ থেকে কাঠের কিউব, ইট

প্রভৃতি বেছে রাখবে। মুদ্রা, শঙ্খ, নানাধরনের গম কিম্বা ধানও ব্যবহার করা চলে।

বস্তুর গঠন ও আকার সম্পর্কে ধারনা সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় জিনিস সাজাতে বলা হয়, অথবা রেখাচিত্রের উপর কাঠের টুকরো বসাতে বলা হয়, বিভিন্ন জ্যামিতিক টুকরোকে পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। স্পর্শেন্দ্রিয় কিম্বা পেশীশক্তির ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর নানারকম অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে।

মন্তেসরি পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত অনেক উপকরণের মধ্যে কয়েকটির নামোল্লেখ করা চলে—যেমন :—তিন প্রস্থ অন্তর্নিবিষ্ট ঘনবস্তু (solid insets) ; ক্রমিক পর্যায়ের (graded) আকৃতি বিশিষ্ট তিন প্রস্থ কাঠের টুকরো ; গোলাপি রংয়ের ঘনবস্তু (cube), বিভিন্ন দৈর্ঘের রঙীন দণ্ড (rod), বাদামী রংয়ের ত্রিশির ফলক (Prism) ; বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের কাঠের টুকরো ; মসৃন অথবা অমসৃন তল বিশিষ্ট চতুষ্কোণ কাঠ ; বিভিন্ন ওজনের কাঠের খণ্ড ; রঙিন কাপড়ের টুকরো ; ৬৪টি রংয়ের পশমের বাক্স ; বিভিন্ন তলবিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্তু বোঝাই ড্রয়ার-আলমারী ; জ্যামিতিক আকারের রঙিন কাগজ লাগানো তিনখানা কার্ড ; বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনকারী কয়েকটি গোলাকার বাক্স, বিভিন্ন শব্দ উত্থাপক দুই লাইন ঘণ্টা প্রভৃতি।

উপরোক্ত অনুশীলনের পটভূমিতে হবে 'didactic exercises'. লেখা, পড়া ও গণিতের অনুশীলনই এ ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য।

মন্তেসরি পদ্ধতিতে লেখার শিক্ষা হয় পড়ার শিক্ষার আগে। শিশু কি ভঙ্গিতে লেখে, তাই শিক্ষিকার বিবেচ্য, কি লেখে তা নয়। লেখার প্রস্তুতি পর্বে চলে আঙুল চালনার শিক্ষা। ক্রমে শিশু কলম ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে, লেখা অনুকরণ করে এবং পরিশেষে ধ্বনিবোধ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ লেখা আয়ত্ত করে। প্রথমে শিরীষ কাগজের অক্ষরের উপর আঙুল চালিয়ে স্পর্শের সাহায্যে আকারের ধারনা সৃষ্টি করে। তারপর সে কলমের ব্যবহার করতে শেখে। লেখা শিক্ষার তিনটি স্তর (১) কলম ব্যবহারের দক্ষতা, (২) শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে অক্ষর লিখবার দক্ষতা, (৩) ধ্বনি অনুসারে অক্ষর লিখবার দক্ষতা। এই তিনটি স্তর অতিক্রম করে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখবার প্রেরনা অনুভব করে। এই ক্ষণটিকেই শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

লেখা শিক্ষার উপকরণ রূপে তিনি ব্যবহার করেছেন শিরীষ কাগজের

অক্ষর, বিভিন্ন আকারের ও রংয়ের কাঠের অক্ষর, কার্ডের উপর লেখা সাধারণ অক্ষর, ঢাকনাওয়ালা ডেস্ক প্রভৃতি। চার বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন থেকে প্রথম শব্দ লেখা পর্যন্ত সময় লাগে এক থেকে দেড় মাস; পাঁচ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রায় এক মাস, এবং পুরোপুরি লেখা শিখতে তিনমাস।

পড়া শিক্ষার প্রস্তুতি পর্বে শিরীষ কাগজের অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করানো হয়, শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে সাহায্য করা হয়। অর্থপূর্ণ শব্দলিখিত কার্ডের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। লেখার মাধ্যমে শিশুর ততদিনে অক্ষর পরিচয় হয়েছে, সুতরাং শিশু তখন উচ্চারণ করতে পারে। অর্থপূর্ণ উচ্চারণ আয়ত্ত করবার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা আসে। মন্তেসরির মতে লিখন শিক্ষা সুরুর ১৫ দিন পরেই পঠন শিক্ষা সুরু হতে পারে। তিনি নীরব পাঠকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ সরব পাঠের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ও কণ্ঠের যুগপৎ জটিল ব্যবহার শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে।

গণনা কিম্বা নামতা মুখস্থ করার পরিবর্তে **অঙ্ক শিখবারও** নূতন পদ্ধতি দিয়েছেন মন্তেসরি। এক মিটার থেকে এক ডেসিমিটার পর্যন্ত দশটি রঙ্গিন দণ্ডের (rod) সাহায্যে খেলাচ্ছলে দৈর্ঘ্যের তারতম্য শেখা যায়। দৈর্ঘ অনুসারে রড সাজানো, গণনা করা, বিভিন্ন নামের রড চিনতে পারা, এবং পরিশেষে ১, ২, ৩ গুণতে ও বলতে শেখার মাধ্যমে সংখ্যার ধারনা সৃষ্টি হয়। অঙ্ক শিক্ষার উপকরণ রূপে ব্যবহার করা হয়—বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের লোহার পাত, শিরীষ কাগজের সংখ্যা, সংখ্যা-লিখিত কার্ড, অঙ্কিত রেখা প্রভৃতি।

ইন্দ্রিয় মার্জনার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ শিশুর কৌতূহল জাগায়, আগ্রহ জাগায়, ভ্রম সংশোধনের উপায় বলে দেয়। আবিষ্কারের গৌরবে শিশু দ্রুত অগ্রসর হয়। অঙ্কন, সঙ্গীত, ব্যাকরণ ও ছন্দ শিখবার ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগ করা চলে। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ঘন-পাতলা, হাল্কা-ভারী প্রভৃতি তারতম্যের জ্ঞান এই ভাবেই শিক্ষা করা সম্ভব। এই শিক্ষায় কল্পনা বিলাসিতার স্থান নেই, কারণ উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব জড়বস্তু। আর এই পদ্ধতি অনায়াসসাধ্যও বটে।

মন্তেসরি পদ্ধতিতে পৃথকভাবে **নীতিশিক্ষার** স্থান নেই। মন্তেসরির

মতে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকশিত হলেই নীতিবোধ জন্মে। নীতি ও ধর্মবোধ জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, চাপিয়ে দেওয়াও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্খা পূরণের স্বাস্থ্যকর ও সংগঠিত ব্যবস্থার অভাবে নীতিহীনতার জন্ম হয়। শিক্ষার লক্ষ্যই শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের পূরণ। সুতরাং এক্ষেত্রে রাগ, ভয়, লোভের স্থান নেই। শিশুর চাহিদা পূর্ণ হয় বলেই সে বিদ্রোহ করে না। নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনের চাঞ্চল্যই দুষ্টুমি রূপে প্রকাশ পায়, শিশু প্রকৃতিগত ভাবে মন্দ কিংবা দুষ্ট নয়।

মন্তেসরি বিদ্যালয়ে তাই প্রয়োজন প্রচুর জমি ও উপকরণ এবং আসবাবের সুব্যবস্থা ; সঙ্গীতের ব্যবস্থা, ফুলের টব এবং অন্যান্য আসবাবে সজ্জিত ক্লাবঘর ; শিশুদের উপযোগী খাবারঘর : তোয়ালে, সাবান ও জলের কলে সজ্জিত পোশাকঘর ; ওজন ও দৈর্ঘ পরিমাপের যন্ত্র ; প্রশস্ত বাগান এবং উপযুক্ত ডাক্তারী ব্যবস্থা। এই বিদ্যালয়ে জোরজুলুম নেই, মুখস্থ বিদ্যা নেই, ভুলের জন্য শাসন নেই। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করে। নীরবতা পালন করা, উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করাও মন্তেসরি বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কাজ।

ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষানীতি

ফ্রোয়েবলের মতে শিশুর ক্রমবিকাশের ধারানুযায়ীই শিশুর শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝাই শিক্ষা নয় ; স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিনতিই শিক্ষা।

শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটবে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কিন্তু শিশুর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত খেলার মাধ্যমে। দুইটি তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, "Self development" এবং "Free develop ment". সুতরাং শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হবে মুক্তাঙ্গণে, বাগানে, ফুলের আঙ্গিনায় কিম্বা স্কুল গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মোদ্যম। ফ্রোয়েবল'এর শিশুরা মাটি, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, তুলো প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদান নিয়ে নদীর বাঁধ, গমভাঙ্গা কল, দুর্গ কিম্বা প্রাসাদ তৈরী করেছে। বন থেকে আহরণ করেছে নানাজাতীয় প্রাণী, পাখী, পোকা ও ফুলফল। গণিতের বহু সমস্যার সমাধান করেছে বাস্তব অনুশীলনের পন্থায়। সমবেত সঙ্গীত, গল্প ও কাহিনী তাঁদের কল্পনায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছে।

যখনই শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্খার প্রেরনায় শিক্ষালাভ করে তখনই সে পরীক্ষা করতে চায়, সৃষ্টি করতে চায়। নিজের মনে সে বহু ছবি ও কল্পনার ভাঙ্গাগড়া করে। পরিবেশ সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে এবং পরিবেশকে নাড়াচাড়া করতে চায়। এটাই জীবনের বিধি, সুতরাং শিক্ষারও বিধি। সৃষ্টিধর্মই শিক্ষাপ্রয়াসের মর্মকথা। তাই ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে কেবল দার্শনিক দৃষ্টি থেকে নয়, শিক্ষনের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাতের কাজকে অসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরের কাছ থেকে কতটা গ্রহণ করলো—তাই বড় কথা নয়; শিশু কতটা সৃষ্টি করেছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই বড় কথা। আত্মবিকাশের বিচারে চিন্তা ও কথার সঙ্গে ভাঙ্গাগড়া ও সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যমের মূল্য মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে **প্রকৃতিপাঠ** একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতি একসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তর প্রকৃতির অনুধাবন সম্ভব। রহস্যময় প্রকৃতি ইঙ্গিতগর্ভ এবং আকর্ষণীয়। **বিজ্ঞান ও গণিত** অনুশীলনের পথেই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব। প্রকৃতির রহস্যের মধ্যেই শিশু খুঁজে পাবে ধর্মের মর্মবাণী।

হাতের কাজের কথা আবারও বলা দরকার। K. G. পদ্ধতিতে 'gift' গুলি যে ধ্যানধারনা সৃষ্টি করবে, তাই প্রকাশিত হবে হাতের কাজের মাধ্যমে। উভয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। Gift গুলিকে শিশু বিভিন্ন ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে সাজায়, কিন্তু হাতের কাজে সে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে জিনিস সৃষ্টি করে। তাই 'gift' এর সঙ্গে পরিচিতির চেয়েও হাতের কাজেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। মাটি, বালি, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে জিনিস গড়ার মধ্য দিয়ে শিশু ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারনা সৃষ্টি করে তেমনি কাগজ, মাদুর প্রভৃতির কাজে সৃষ্টি হয় তল (surface) সম্পর্কে ধারনা। এই কর্মোদ্যম শিশুর সৃজনী ক্ষমতাকে বাড়ায়; দৈহিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু আত্মশক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে; এবং যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে সহযোগিতার চেতনা সঞ্চারিত হয়। আধুনিক শিক্ষাচেতনায় উত্তরোত্তর হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নির্দ্ধারিত হাতের কাজ ছাড়াও বাগানের কাজ, পশুপালন, ছোট ছোট বাস্তব কুটির সংস্কার ও নির্মাণও কে, জি পদ্ধতির অন্তর্গত।

কে, জি, ব্যবস্থায় অংকনের বিশেষ মূল্য স্বীকৃত। ফ্রোয়েবল বলেন, "What man can draw or do—he can understand." অংকনের মাধ্যমে কেবল রেখা ও রংয়ের ধারনাই জন্মেনা, সুন্দর কল্পনার অভ্যাসও সৃষ্টি হয়। এই কারণে নৃত্য ও ছন্দের মূল্যও স্বীকৃত। ছন্দই ভাষা ও সঙ্গীতের প্রাণ। ছন্দানুশীলনের ফলে সৃষ্টি হয় দৃঢ়তা, একতা, সামঞ্জস্য ও পরিমিতি বোধ এবং সৌন্দর্যপ্রীতি।

তেমনি মূল্য আছে গল্প বলার। এইপথে শিশুর বুদ্ধি ও কল্পনার বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে 'হিতকথার' বিশেষ মূল্য আছে; আর মূল্য আছে "কাহিনীর"—কারণ এই সূত্রে অতীতকে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ইতিহাস পাঠের পটভূমি তৈরী হয়। ফ্রোয়েবলের মতে দেহের পক্ষে যেমন খেলা, মনের পক্ষে তেমনি গল্পের প্রয়োজন। বিশুদ্ধ স্নান যেমন দেহকে শান্তি দেয়, গল্পকথা তেমনি মনকে সুখী করে, বুদ্ধির শক্তি পরীক্ষা করে, কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগ্রত করে।

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতির মূল সুর '**খেলা**'। রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদীরা খেলাকে মনে করেছেন বিদ্যাচর্চার পরিপন্থী। কিন্তু ফ্রোয়েবল বলেছেন শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষা খেলার মাধ্যমেই সম্ভব। খেলাকে কিভাবে শিক্ষার বাহন রূপে সংগঠন করা যায়, তাও তিনি দেখিয়েছেন। শিক্ষা ও খেলা সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বলেন, "Play is the greatest side of the child's expression." শৈশবই হলো অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ও আবেগের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক বহিপ্রকাশের সময়। এই বহিপ্রকাশই খেলা। খেলাই শৈশবের নিষ্কলুষ কাজ। খেলার মধ্যেই শিশু পায় আনন্দ, মুক্তি, সুখ, মনের শান্তি এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। যে শিশু পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় নিমগ্ন থাকতে পারে, ভবিষ্যত জীবনে সে দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের কিম্বা অপরের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ হয়।

Gifts and Occupations

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে 'gift' এবং 'occupation' শব্দ দুটি ভাস্বর হয়ে আছে। ফ্রোয়েবল রূপকময় খেলার জিনিস (plaything) উদ্ভাবন করেছেন। শিশুর বয়সানুপাতে ছয়টি মৌলিক সত্যের রূপক হিসেবে তিনি ছয়টি 'gift' দিয়েছেন।

Gift গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য Ball. মনস্তত্ত্বের বিচারে নানা রঙ ও আকারে বল নিয়ে খেলার মধ্য দিয়ে আকার, গঠন, রঙ, বস্তু, গতি, দিক সম্পর্কে ধারনা এবং মাংসপেশী সঞ্চালন শিক্ষা সম্ভব। তা ছাড়া শিশু কর্মচঞ্চলও হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় gift হলো ঘন বস্তু (cube) এবং সমবর্তুল (cylinder)। এগুলি বলের বিপরীত ধর্মী। বল গড়িয়ে চলে, এগুলি স্থিতিশীল ; বলের নির্দিষ্ট তল (surface) নেই, ঘন বস্তুর ছয়টি তল। কিন্তু উভয়ই কঠিন ও নিরেট। তা ছাড়া বল এবং ঘনবস্তুর সমন্বয় করলেই পাওয়া যায় cylinder। সুতরাং বৈপরীত্যের মিলন তত্ত্ব এখানেও বাস্তব সত্য।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য gift হলো একটি কাঠের ঘনক্ষেত্রকে বিভক্ত করে আটটি ক্ষুদ্র ঘনক্ষেত্র। এগুলি দিয়ে শিশু সিঁড়ি, শেকল, দরজা, সিংহাসন প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরী করতে পারে। অবশিষ্ট ৩টি gift ও ঘনক্ষেত্রের বিভিন্নরকমের বিভাগ—যা থেকে শিশু আকার, গঠন প্রভৃতির ধারনা লাভ করে। এই ধারনা থেকেই জ্যামিতি কিম্বা ত্রিকোণমিতি অধ্যয়নের পটভূমি তৈরী হয়। ফ্রোয়েবল্ পরিশেষে আরও তিনটি gift যোগ করেছিলেন। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল তল (surface), রেখা (line) এবং বিন্দু (point) সম্পর্কে ধারনার উৎপত্তি।

ফ্রোয়েবল্-এর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাতটি মায়ের গান (mother song), এবং ৫০টি খেলার গান। এই গানের সঙ্গে থাকে ছবি, এবং গানের সাথে চলে নাচ কিম্বা অন্য কোন ভাবে দেহ সঞ্চালন। গানগুলিও শিশুর বয়সানুপাতে ক্রমিকরূপে শ্রেণীবদ্ধ। মায়ের গানের বিষয়বস্তু মা'র ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা। শিশু এই গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচবে। খেলার গানগুলির তিনটি বিশিষ্ট উপাদান—মায়ের জন্য আদর্শবাণী, ছন্দ ও সুর, এবং সঙ্গীতের চিত্রায়ণ। প্রতিটি গানের সঙ্গেই দেহ সঞ্চালনের বিধি আছে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে খেলার গানগুলিকে চারটি অংশে ভাগ করা চলে,—(ক) একেবারে শৈশবের (babihood) যোগ্য। এ ক্ষেত্রে শিশুর কেবল অঙ্গ সঞ্চালনই যথেষ্ট। (খ) একটু বড়দের জন্য। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতের সাথে পরিচয় ঘটে। (গ) গ্রহ নক্ষত্ররাজি সম্বন্ধীয়। এই গানে শিশুর কৌতুহল জাগ্রত হয় এবং বিশ্বচরাচরের ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। (ঘ) বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শিশুদের জন্য নীতিবোধ সৃষ্টিকারী গান।

খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার কথা ফ্রোয়েবল্ বলেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন খেলার কথা বলেননি। শিশুর ক্রীড়াপ্রবণতাকে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচালিত করে তার অনুভূতি ও কর্মক্ষমতার ক্রমবিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

ফ্রোয়েবল্-এর শিক্ষানীতিতে শৈশব ও বাল্যের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। শৈশবের শিক্ষা মূলতঃ সহজাত ক্ষমতা নির্ধারিত, বাল্যের শিক্ষা পরিবেশ নির্ধারিত ; এ সময়ের শিক্ষা কর্মভিত্তিক। উৎপাদনের ধারার পরিবর্তে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি শিশুর আগ্রহ বেশী। সুতরাং এই সময়ের শিক্ষা সচেতন উদ্দেশ্য-মূলক। শিল্পকর্মের প্রতি ঝোঁক এ সময়ে স্বাভাবিক। শৈশবে শিশু গৃহস্থালীর কাজ অনুকরণ করে, বাল্যে অনুকরণ করে পরিবেশ জীবনের কর্মসাধনা। সুতরাং এ সময়ের কাজগুলি প্রধানতঃ সমস্যামূলক, অনেকটা প্রোজেক্ট এর মত। সর্বোপরি বাল্যকালকেই তিনি instruction-এর স্তর বলে মনে করেছেন।

এই মতাদর্শ অনুসারেই তিনি পাঠ্যক্রম কল্পনা করেছেন। তাঁর পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে ধর্মচেতনা ও ধর্মীয় শিক্ষা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিত, ভাষা, অংকন, শিল্পকর্ম, সৌন্দর্যানুভূতি, হাতের কাজ প্রভৃতি।

শিক্ষন নীতির মূলমন্ত্ররূপে তিনি নির্দেশ করেছেন যে শিশুর প্রকৃতি জানতে হবে, শিশুকেই কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্বীকার করতে হবে ; শিক্ষার উদ্দেশ্য পন্থা ও পদ্ধতি সেই অনুসারে পূর্বনির্ধারণ করতে হবে; শিক্ষা হবে ব্যবহারিক এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর ; শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি স্থিরীকৃত হবে শিশুর বয়স এবং ক্রম বিকাশের স্তরানুসারে; শিশুর ব্যক্তিত্বের মূল্য স্বীকার করতে হবে, শিশুর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করতে হবে; সর্বোপরি চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি গড়তে হবে।

বিদ্যালয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ফ্রোয়েবল্-এর ধারনাও তার মূল শিক্ষানীতি থেকেই উদ্ভূত। শিশুর আত্মপ্রকাশে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ নিশ্চিত করাই কে, জি-র উদ্দেশ্য। এখানে মৌল লক্ষ্য থাকবে শিশুর আগ্রহ এবং কর্মপ্রবণতা সৃষ্টি, জ্ঞানআহরণ হবে পরোক্ষ ফলশ্রুতি। অবশ্য সর্বাঙ্গীন বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে জ্ঞানের দিকেও সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় হবে এমন স্থান যেখানে শিশুরা জীবনের মৌল সত্যের সঙ্গে পরিচিত হবে, এবং সত্য, নিষ্ঠা, উদ্যোগ এবং দায়িত্ববোধ শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করবে। এ কাজ কেবল জ্ঞানের দ্বারা হয় না, জীবনযাপনের দ্বারাই সম্ভব।

জন ডিউইর নীতি

ডিউইর মতে বর্তমানের সামাজিক পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রার অনুশীলনই বিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ।

এই শিক্ষা কিভাবে সম্ভব? বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি কার? শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বয়স্ক-দের পূর্ব নির্বাচিত অভিজ্ঞতা নয়। এখানেই ডিউইতত্ত্বে শিশুকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্য। শিশু ধাপে ধাপে বড় হয় এবং এই ক্রমবৃদ্ধির স্তরে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতাও স্তরভেদে বিভিন্ন। স্তরভেদ অনুসারে ১ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত স্তরে গৃহের পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ। ৪ থেকে ৮ বছরের স্তরে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিবেশে খেলা এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলন গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশবের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বাস্তব। তা হলেই শিশু জীবন পরীক্ষার মাধ্যমে শিখবে। এই শিক্ষার মর্মার্থ ইন্দ্রিয় ও পেশীর সদ্ব্যবহার করে স্বকীয়তা ও উদ্যোগের সাহায্যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, (learning by doing)। তাই ডিউই গঠনমূলক কাজে উপকরণের ব্যবহার এবং স্বতঃস্ফূর্ত খেলাচ্ছলে শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। অপরের চাপানো বোঝার কাছে শিশুর আত্মসমর্পণ এবং পরবশ্যতার পরিবর্তে মুক্ত আত্মশৃঙ্খলা আসবে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আসবে নূতন মূল্যবোধ।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে মূল্যবোধ হওয়া চাই ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ের কাছেই সন্তোষজনক। সুতরাং বিদ্যালয়কে হতে হবে শিশুর সামাজিক বিকাশের সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এর মৌলিক দায়িত্বই হবে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে জীবনযাপনের শিক্ষাদান। এই শিক্ষাও সম্ভব কেবলমাত্র শিশুদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই জন ডিউই উন্নত ভারসাম্য সম্পন্ন, পংকিলতামুক্ত সমাজের ক্ষুদ্রসংস্করণ রূপেই বিদ্যালয়ের নূতন সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছেন। এই সমাজে সরলীকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুরা যৌথ কর্ম এবং যৌথ জীবন যাপন করবে। এক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা এবং জীবন-কেন্দ্রিকতার কোন ব্যবধান থাকবে না, কারণ শিশুর নিজস্ব জীবনই হবে তার পরিবেশ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষাক্ষেত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও পেশী

অনুশীলনের সুযোগ, স্বকীয়তা এবং আগ্রহের সুযোগ এবং কাজের মাধ্যমে শিক্ষার পথে মুক্ত-শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত শক্তি ও গুণ। সমাজে গণতান্ত্রিক জীবনের শিক্ষা হবে বিদ্যালয়ে, তৈরী হবে স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, সুদক্ষ নাগরিক, যারা নেতৃত্ব করতে শিখবে, আবার নেতৃত্ব মেনে চলতেও শিখবে।

নূতন স্কুলের জীবন হবে স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধায় মণ্ডিত। আদর্শ গৃহের অনুকরণেই গড়ে উঠবে আদর্শ স্কুল। শৃঙ্খলা এবং নীতিবোধের মধ্যে থাকবেনা পার্থক্য। বিদ্যালয়ের কর্মপ্রবাহ বৃহত্তর সমাজের কর্মপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেনা, বরং সমাজের দৈনন্দিন বৃত্তিমূলক ও বাস্তব কর্মপ্রবাহই প্রতিফলিত হবে বিদ্যালয়ের কর্মপ্রবাহে। এই নীতি অনুসারেই জন ডিউই নিজে বিশ্ববিদ্যালয় লেবরেটরী স্কুলে তিন ধরনের কর্মপ্রবাহ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন—(ক) হাতেকলমে কাঠ ও যন্ত্রপাতির কাজ, (ক) রন্ধন (গ) বয়ন শিল্প।

শিক্ষন পদ্ধতি

সমস্যা সমাধানের পথে শিশুর গতিশীল সক্রিয়তার উপরই তিনি জোর দিয়েছেন। সমস্যা সমাধানের সক্রিয়তাই Laboratory Method এর মূল কথা। এই পদ্ধতির চারটি স্তর—(১) সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। (২) সমস্যার বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পরিকল্পনা করা, (৩) সমাধান সূত্রের প্রয়োগ, এবং (৪) সাফল্য-ব্যর্থতার সমালোচনা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন। (Problem—orientation—application—criticism). বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে শিশুকে গবেষকের ভূমিকায় দাঁড় করানো হয়। সেলাই, বয়ন, রান্না, কারিগরি প্রভৃতি বাস্তব কর্মের মাধ্যমেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্ভব।

শিশুর কাজের উপযোগিতাও থাকবে। সুতরাং সমস্যা পদ্ধতিতে বাস্তব পরিবেশ, বাস্তব সমস্যা, এবং শিশুর প্রকৃত আগ্রহ ও মনোযোগেরই মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। চলমান জীবনের আদর্শও পরিবর্তনশীল। জীবনের গতির সঙ্গে বিদ্যালয়কে তাল রাখতে হবে। সুতরাং বাস্তব জীবনের সমস্যার ক্ষুদ্র সংস্করণই বিদ্যালয় জীবনে উপস্থাপিত হবে। হাতেকলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুর অনুসন্ধিৎসা, গঠনপ্রিয়তা, এবং অন্যান্য সহজাত আচরণ সুব্যবহৃত

হবে। শিশুর কর্মোদ্যম যেন, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে এবং নূতন মূল্যান্বেষণের গৌরব সৃষ্টি করে। প্রতিটি শিশুর সর্বোত্তম সম্ভাবনার সুযোগ দেওয়াই স্কুলের কাজ। এই কাজে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।

Aotivity বলতে কিন্তু কষ্টসাধ্য কিছু বুঝায় না, কিম্বা প্রকৃত উৎপাদনী শ্রম বুঝায় না। সমাজ জীবনে প্রচলিত কর্মধারার সমান্তরাল রূপে বিদ্যালয়েও প্রচলিত হবে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন কর্মোদ্যোগের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

জন ডিউইর দর্শন এবং লেবরেটরী পদ্ধতির বাস্তব ফলশ্রুতি ঘটেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে। ডিউইর মন্ত্রশিষ্য W. H. Kilpatrick এজন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। শ্রেণীপঠন পদ্ধতিতে ব্যক্তির স্বকীয়তা স্বীকৃত হয় না। শিশুরা কেবল নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাতেও আত্মশ্লাঘা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার ভয় থাকে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে দুই নীতির সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে।

শিশু শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে উপরে আলোচিত তিনটি সুগঠিত বক্তব্য ছাড়া অন্যান্য শিক্ষাগুরুদের আলোচনার মধ্যেও যথেষ্ট মূল্যবান ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে। রুশো গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুক্ত পরিবেশে দেহ গঠনের উপর। পেস্তালোৎসি বলেছেন বস্তুপাঠ, সক্রিয়তা, আত্মপ্রকাশ এবং অভিজ্ঞতার আত্মকরন পদ্ধতির কথা। সরল থেকে জটিলে এবং মূর্ত থেকে বিমূর্তে অগ্রসর হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। তাছাড়া শিশু যেন আয়ত্ত অভিজ্ঞতা হাতেকলমে প্রয়োগের সুযোগ পায়। হার্বার্টও বলেছেন উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তার কথা' স্পেন্সার বলেছেন যে পূর্বনির্দ্ধারিত সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়ে শিশুর শিক্ষা সম্ভব নয়। শিশুর ইন্দ্রিয়শক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে হবে, নিরীক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, আনন্দের মধ্যে আকর্ষনীয় কাজে তাকে নিমগ্ন হতে দিতে হবে। এইভাবেই ঘটবে আত্মশিক্ষা। পেস্তালোৎসির পদ্ধতিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তিনি বলেছেন যে শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে ঐক্য থেকে বৈচিত্র্যে, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মননশীলতায়। এসব বিষয়ে শিশুর নিজস্ব সক্রিয়তাই মূল বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর অভিমতেও এই সব পদ্ধতির কথাই নূতনভাবে বলা হয়েছে।

উপরের সমস্ত বক্তব্যের সার সংকলন করে আমরা বলতে পারি যে **শিশু শিক্ষার পদ্ধতিতে নিম্নানুরূপ উপাদান থাকা প্রয়োজন।**

(১) বস্তুকেন্দ্রিকতা এবং বাস্তবধর্মীতা, (২) মনোবিজ্ঞানধর্মীতা, (৩) ইন্দ্রিয়ানুশীলন, (৪) প্রকৃতিপাঠ, (৫) অংকন, সঙ্গীত, হাতের কাজ, ভ্রমণ, অভিনয়, বাগানের কাজের মাধ্যমে একদিকে আত্মবিকাশ, অপরদিকে সুস্থ প্রক্ষোভ জীবন. (৫) শিশুর স্বাধীনতা এবং বাধাহীন সক্রিয়তা, (৬) ব্যক্তিগত ও দলগত অভ্যাস, (৭) সৃজনধর্মীতার মধ্য দিয়ে আত্মউন্মেষনের সুযোগ, (৮) বাস্তব আচরণের মধ্য দিয়ে নীতিশিক্ষা, (৯) সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, বাচনভঙ্গীর দক্ষতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার, (১০) Didactic Exercise প্রভৃতির সাহায্যে আত্মশিক্ষা, (১১) কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা-মূলক শিক্ষা এবং (১২) অবিমিশ্র খেলার আনন্দ।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় ছড়ার বিশেষ মূল্য আছে। ছড়ার সাহায্যে কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে অংকন শক্তিও বিকশিত হওয়া সম্ভব। ছড়া আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মপ্রকাশ সম্ভব। তা ছাড়া অনুকরণের শিক্ষা, স্মৃতির অনুশীলন, বাচনভঙ্গী গঠন, কথোপকথনের দক্ষতা সৃষ্টিতেও ছড়ার বিশেষ মূল্য রয়েছে। খোকাখুকুর ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, প্রকৃতি ও জীবজন্তুর ছড়া, খেলা, আমোদ প্রমোদের ছড়া—প্রভৃতি সবগুলিরই শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে।

তেমনি রয়েছে সঙ্গীতের। মানবশিশু স্বভাবতঃই শব্দে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গীতের সাহায্যে শ্রবনেন্দ্রিয় পরিমার্জিত হয়, ছন্দলয়ের ধারনা সৃষ্টি হয়, আবেগের সুস্থতা আসে, কর্মে উৎসাহ সৃষ্টি হয়, সৌন্দর্যবোধ জাগে, লাজুক কিম্বা বেদনাকাতর শিশুর মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার হয় এবং সমবেত সঙ্গীতের সাহায্যে ঐক্যবোধ, এবং নিয়মানুবর্তিতা জন্মে। আবার একক সঙ্গীতে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। মাদাম মন্তেসরি বলেছেন যে সঙ্গীত শিশুকে ভদ্র ও সভ্য করে তোলে। বস্তুতঃ গানবাজনা নাচ হলো দুষ্টুমির অন্যতম প্রতিষেধক। সুতরাং শিশুদেরকে সমবেত সঙ্গীতে অভ্যস্ত করা দরকার। কিন্তু তাই বলে একটানা ১০/১৫ মিনিটের বেশী সঙ্গীতও ভাল নয়।

উপযুক্ত ভঙ্গি ও ছন্দে গল্প বলতে পারলে শিশুরা তন্ময় হয়ে ওঠে। গল্পের সাহায্যে সৃজনশীল কল্পনাশক্তির বিকাশ সম্ভব। এমনকি রূপকথা কিম্বা

পরীর গল্পের সাহায্যেও সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তাই বলে শিক্ষিকা অনর্গল গল্প বলে চলবেন, এমনও নয়। শিশুরা গল্প বলায় অংশ গ্রহণ করবে। তাই গল্প নির্বাচনে সুচিন্তার প্রয়োজন। গল্পের দৈর্ঘ এবং বলার গতিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। গল্পের মূল ভিত্তি হবে বাস্তবনির্ভর। গল্পের সহায়ক হিসেবে অংকন, চিত্র প্রদর্শন, নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থাও ফলপ্রসূ।

গাছপালা, জীবজন্তু, পরী, রাজা, রাণী—প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করেই গল্প রচনা করা সম্ভব। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী কিম্বা বিদেশী উপকথা থেকেও বিষয় সঞ্চয়ন করা চলে। তবে গল্পে ব্যবহৃত শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। খোলা মাঠে গা এলিয়ে অবসরকালে যদি গলার স্বর দুলিয়ে এবং উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি করে শিক্ষিকা গল্পের আসর বসাতে পারেন তবে ভাষা শিক্ষার সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান করা যায়।

আকর্ষণীয় গল্পকেই নাট্যাকারে পরিবেশন করা সম্ভব। ঐ সঙ্গে হাতের কাজও করা চলে। নাটকের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায় ফলপ্রসূ রূপে। অবশ্য নীতিশিক্ষা দিতে গিয়ে শিশুর আনন্দ যেন কোন প্রকারেই ব্যাহত না হয়। আনন্দের উপকরণ রূপে মাঝে মাঝে পুতুল নাচ কিম্বা অন্যান্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও বিশেষ উপকারী।

শিশু শিক্ষার পদ্ধতিতে ড্রইং, ছবি আঁকা এবং গঠনমূলক কাজের বিশেষ মূল্য স্বীকৃত। অনেক শিশুর ভাষাগত দক্ষতা উপযুক্ত ভাবে বিকশিত হয়না। সেই ক্ষেত্রে ছবিই হয় মনের বাহন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধও ছবিতেই ধরা পড়ে। বর্ণচেতনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ জীবনেও ভারসাম্য আসে। অংকনের মধ্য দিয়ে কল্পনাশক্তি মুক্তি পায়। তাই এ ক্ষেত্রেও শিশুর স্বাধীনতাই বড় কথা। খেলার মনোভাবই থাকবে প্রবল।

ভাঙ্গাগড়ার কাজে শিশু তন্ময় হয়ে থাকে। তবে ৪ বছর বয়সে অবিমিশ্র ভাঙ্গার বদলে শিশু স্থায়ী কিছু গড়তে চায়। তাই এই বয়সে মাটি, কাগজ, কাঁচি, কাঠের টুকরো দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে শিশু তার সৃষ্টিধর্মীতার পরিচয় রাখবেই।

শিশুর ভাষাশিক্ষার সূচনা হয় মায়ের কোলে। কৌতুহল এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা তার ভাষা শিক্ষাকে সাহায্য করে। ৫/৬ বছর বয়সে

ভাষার দক্ষতা অর্জনের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। এই আকাঙ্খা চরিতার্থতার সুযোগ প্রয়োজন।

ভাষা শিক্ষার তিনটি দিক—পড়তে পারা, বলতে পারা এবং লিখতে পারা। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন শিশুকে কথা বলতে উৎসাহিত করা এবং অপরের কথা বুঝতে সাহায্য করা। তাই শিশুশিক্ষার পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বস্তু, স্বাস্থ্য ও শরীর, দৈনন্দিন কাজকর্ম, পূজা পার্বন অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে কথোপকথনের বিরাট মূল্য রয়েছে। আগ্রহ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে অগ্রসর হলে শিশুর শব্দ চয়ন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

পরিচিত বস্তুর নাম, নিজের কিম্বা অপরের নাম, দিন মাস ঋতুর নাম প্রভৃতি অবলম্বন করেই পড়ার অনুশীলন আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়। ক্রমান্বয়ে ছবির শিরোনামা এবং পরিচিতির মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পড়বার দক্ষতা সৃষ্টি হয়।

লিখবার ক্ষেত্রেও পরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে স্বল্পসংখ্যক শব্দ সমন্বয়ে গঠিত* বাক্যের ব্যবহারই শ্রেয়। ছোট ছোট বাক্য একের পর এক গ্রথিত করে যখন পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু তৈরী হয়, তখন শিশু নিজেই নিজের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর পরিধিতে পদার্পন করতে উন্মুখ হয়।

প্রাকপ্রাথমিক অংক শিক্ষার সূচনা হবে বস্তুর আকার, গঠন, ওজন, দূরত্ব ও সময় চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে। পুঁতি কিম্বা অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে হবে সংখ্যা গণনার শিক্ষা। নার্সারীর শেষ বছরে ৫০ পর্যন্ত গুণতে পারলেই যথেষ্ট। এজন্যও নানাধরনের খেলার সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপরে ক্রমে ক্রমে এ্যাবাকাস্ অথবা বল ফ্রেম প্রভৃতি সরঞ্জামের সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া চলে।

শিশু শিক্ষায় খেলার স্থান

পুরাতন শিক্ষা চেতনায় খেলা ও শিক্ষাকে বিপরীত ধর্মী বলে মনে করা হতো। "কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা"—এই ছিল প্রবচন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা চেতনায় খেলার নূতন মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। শারীর বিদ্যা, জীব বিদ্যা, মনস্তত্ব প্রভৃতির অগ্রগতির ফলেই আমাদের চেতনায় এই পরিবর্তন এসেছে।

খেলার প্রবণতা মানুষের মধ্যে সর্বজনীন। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে সৃষ্টিশীল খেলার পথেই শিশু বড় হয়ে ওঠে। খেলার এই স্বীকৃতির ফলেই এ সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বও প্রস্তাবিত হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় **"বাড়তি প্রাণশক্তির তত্ত্ব"** (surplus energy theory)। Schiller এবং হার্বার্ট প্রমুখ এই তত্ত্বের প্রবক্তা। জীবনধারনের জন্য শিশুর যতটুকু প্রাণশক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন, তার বাড়তি শক্তি প্রকাশ পায় খেলার মধ্য দিয়ে। অতিরিক্ত এই প্রাণশক্তি ব্যয় করার মধ্য দিয়ে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহ সুগঠিত হয় এবং শিশুর সুঅভ্যাস এবং দক্ষতা গঠিত হয়। কিন্তু এই তত্ত্বকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও শিশু খেলে এবং খেলার মধ্য দিয়ে তার দেহই শুধু গঠিত হয় না, তার বুদ্ধি এবং মনও বিকশিত হয়। তাই **খেলা সম্বন্ধে এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নি।**

জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে Karl Groos দিয়েছেন **"প্রস্তুতি তত্ত্ব"**, অর্থাৎ মানব শিশুর অপেক্ষাকৃত শৈশবকালে ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া চলে। শিশু নিজেকে বড়দের ভূমিকায় কল্পনা করে নানা আচরণ করে। এটাই Make Believe **খেলার রূপ।** মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্যানলি হল দিয়েছেন **পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব** (Recapitulation theory)। তাঁর মতে মানব জাতির বিবর্তন ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটে শিশুর জীবনে এবং খেলার রূপে। McDougall দিয়েছেন **'অবদমন তত্ত্ব'** (Sublimation)। শিশুর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং প্রতিযোগিতার যে প্রবণতা থাকে, তাই রূপ পায় এবং অবদমিত হয় খেলার মধ্য দিয়ে। Lazarus'এর **অবসর তত্ত্বে** (Recreation/ Relaxation) বলা হয়েছে যে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু অবসর যাপন করে এবং প্রাণশক্তি ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ করে। আর ফ্রয়েডীয় **মনোসমীক্ষা তত্ত্বে** বলা হয়েছে যে খেলার মধ্য দিয়ে অপূর্ণ আকাঙ্খা নির্গত হয়ে শিশুর আবেগ জীবনকে ভারসাম্যসম্পন্ন করে তোলে।

এতগুলি তত্ত্ব সত্ত্বেও **কোন তত্ত্বই এককভাবে গৃহীত** নয়, কারণ খেলা একটি জটিল প্রক্রিয়া বলেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। খেলা কোনও বিশেষ প্রবণতার প্রকাশ নয়। তাছাড়া খেলা কেবল মনের নয়, দেহ ও বুদ্ধির সম-উপকারী। **আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশই**

শিশুর খেলা। কোনও ফলাফলের মধ্যে নয়, খেলায়। আনন্দেই খেলার সার্থকতা।

"খেলা" এবং প্রচলিত অর্থে "কাজ" কথাটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কাজ কথাটির সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে পার্থিব জড়চেতনা, নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের ইঙ্গিত, সামাজিক বিধিনিষেধের প্রভাব এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কিম্বা লক্ষ্য। অপরদিকে খেলার মধ্যে রয়েছে শিশুর পছন্দ অপছন্দের বিচার, তার খেয়াল খুশী এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের তাগিদ নেই। তাই বিশেষ কোন বহিঃপ্রভাব কিম্বা উদ্দেশ্য ছাড়া শিশুর স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় এবং সৃজনশীল কর্মপ্রবাহকেই "খেলা" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ("Play is a creative activity, pursued for its own sake, accompanied by joy, freedom and spontaneity")—খেলা হলো স্বতঃপ্রনোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত, মুক্ত, সৃজনশীল কাজ। নিজস্ব সক্রিয়তায় শিশু নিমগ্ন হয়ে থাকে, আনন্দ লাভ করে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু আত্মপ্রকাশ করে, আত্মবিশ্বাস লাভ করে, নিজের মনটিকে উন্মোচিত করে, পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা লাভ করে, অপরকে প্রভাবিত করে, আবার অপরের প্রভাব গ্রহণও করে।

খেলার এই গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে বলেই বর্তমান শিক্ষা চেতনায় ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা কিংবা ক্রীড়া প্রণালী খুবই প্রচলিত। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে "ক্রীড়াপদ্ধতি" নামের কোন একটি বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি নেই। খেলার ছলে শিক্ষার প্রণালীকেই ক্রীড়া প্রনালী বলা হয়। সুতরাং আধুনিক যে সব শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে খেলার চরিত্র রয়েছে, সে গুলিকেই বলা হয় ক্রীড়াপ্রণালী (play way)। মন্তেসরি, কিণ্ডারগার্টেন, ডালটন, প্রোজেক্ট, হিউরিষ্টিক প্রভৃতি সব পদ্ধতিই ক্রীড়াপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত।

শিশু যখন নিবিষ্টমনে খেলায় মগ্ন থাকে, তখন সে উচ্ছৃঙ্খল হয়না। সুতরাং খেলার প্রণালীতেই প্রকৃত নিয়মানুবর্তিতা সম্ভব। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ গঠিত হয়। যৌথ ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে সভ্যতা, দয়া, বন্ধুত্ব, উদারতা এবং সামাজিকতা প্রভৃতি মানসিক গুণ বিকশিত হয়ে শিশুর মনও গঠিত হয়। সৃজনশীল খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর শিল্প দক্ষতা ও চেতনা বাড়ে, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে শিশুর কর্মপ্রবণতা,

বৃত্তি প্রবণতা, পছন্দ, ক্ষমতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতেই শিশুর শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার স্তরটি ভবিষ্যতের প্রস্তুতির স্তর। তাই বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ পরিচালিত হবে ক্রীড়ামূলভ আবহাওয়ায়। **ইউরোপে তাই প্রাক-প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বলা হয় খেলার স্কুল** (Play School)।

শিশুবিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থাপনায় শিক্ষিকার কর্তৃত্বমূলভ মনোভাব ত্যাগ করতে হয়, শিশুর স্বাধীনতা স্বীকার করে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হয়। নির্দিষ্ট কোন শিক্ষনপদ্ধতিও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব, কারণ, প্রতিটি শিশুর পছন্দ, মনোভাব, দক্ষতা এবং সম্ভাবনা সম্পূর্ণ একক শিশুর আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ততার সদ্ব্যবহার করে তার সহজাত সম্ভাবনার **পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য।**

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর আগ্রহের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রগুলি আবিষ্কার করাই শিক্ষিকার কাজ। আবিষ্কৃত আগ্রহের ভিত্তিতেই শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। শিশুও নিজেকে নিজে আবিষ্কার করে। তার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ পায়, সৃজনশীলতা এবং আবেগের ভারসাম্য স্থাপিত হয়, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বাড়ে। শিশুর কল্পনাও সুগঠিত হয়ে ওঠে। **কেউ কেউ বলেছেন যে শিশুর খেলার সামগ্রীর প্রকৃতি অনুসারে শিশুর চরিত্র গঠিত হয়।**

খেলার সরঞ্জাম স্থির করবার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সরঞ্জাম যেন বয়স অনুপাতে এবং শিশুর স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। খেলার মধ্য দিয়ে যেন যথেষ্ট দেহ সঞ্চালন ঘটে। সরঞ্জামগুলি যেন শিক্ষাগত সম্ভাবনাময় হয়, অর্থাৎ আত্মশিক্ষার সহায়ক হয়। মুক্তাঙ্গণের খেলা এবং ঘরের মধ্যকার খেলা—দুই ধরনের খেলাই প্রয়োজন। তেমনি ব্যক্তিগত এবং দলগত খেলা—উভয়ই প্রয়োজন। সরঞ্জামগুলি যেন সুদৃশ্য, শক্ত, এবং আকর্ষনীয় রংয়ের হয়।

শিশু শিক্ষায় প্রকৃতি বীক্ষণ

খেলা ছাড়া শিশু শিক্ষায় বিশেষ মূল্য রয়েছে প্রকৃতি বীক্ষণের। জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু স্বভাবতঃই শিশুকে আকর্ষণ করে।

এইসব বস্তু নিরীক্ষণ করা কেবল আনন্দদায়কই নয়, শিক্ষাগত সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রকৃতি বীক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর ইন্দ্রিয়শক্তি প্রখর হয়ে ওঠে, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়, মায়ামমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি মৌলিক বিজ্ঞান চেতনাও জাগ্রত হয়। জীবজন্তুর যত্ন আদরের মধ্যে যেমন আনন্দ আছে, তেমন আছে ভালবাসা ও আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ। গাছপালা রোপণ, জলসিঞ্চন ও অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির গৌরব। গাছের বড় হওয়া, ফুলফল হওয়ার পর্যায়গুলি নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চেতনা জন্মে। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাকৃতিক জীবনধারার সম্পর্কও শিশু অনুভব করে; প্রকৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কেও সে সচেতন হয়ে ওঠে। সর্বোপরি এইসব কাজের মধ্য দিয়ে শরীর ও দেহ গঠনও সুস্থ হয়। **তাই প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাগান এবং ছোট ছোট পোষ মানানো জীবজন্তুর সংগ্রহ থাকা একান্ত দরকার।**

শিশু শিক্ষায় পরীক্ষা ও প্রমোশন

শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবারে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে পরীক্ষার বিষয়ে। বস্তুতঃ আমাদের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে আমরা "শিক্ষা" কথাটির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রূপে পরীক্ষার কথা ভাবি। **কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়না।** বর্তমানে লিখিত কিম্বা মৌখিক পরীক্ষায় (তা রচনাধর্মী কিম্বা বস্তুধর্মী—যাই হোক না কেন) আমরা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করতে চাই। কিন্তু আমাদের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে শিশুকে পুঁথিগত বিদ্যা কিম্বা জ্ঞান দেওয়া শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম এবং পঠনপদ্ধতি দিয়েই পরীক্ষা পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়। শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিশুর দেহ গঠন, অভ্যাস গঠন, প্রক্ষোভ জীবনের ভারসাম্য বিধান, পেশী স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়ানুশীলন, পরিবেশ পরিচিতি ও প্রকৃতি বীক্ষণ, মানবিকতা ও সামাজিকতা এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও যদি সেইভাবে নির্দ্ধারিত হয়, তবে শিশুর ক্রমোন্নতির পরিমাপ করতে হবে এইসব গুণ ও দক্ষতার ক্রমবিকাশের ভিত্তিতে। এইসব গুণ ও দক্ষতা যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি প্রকাশিতও হয় শিশুর কর্মধারার মধ্য দিয়ে। সুতরাং শিশুর কর্মধারাকে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করে বিভিন্ন গুণ ও দক্ষতার

আনুপাতিক বিকাশ সম্পর্কে মতামত গঠন করাই পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা। শিশুকে লক্ষ্য করে এই মতামত গঠনের দায়িত্ব শিক্ষিকার। সুতরাং **কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষার বদলে শিশু তার কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিয়ে চলে।**

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ-ফেল-প্রমোশনের কেতাদুরস্ত ব্যবস্থারও অবকাশ নেই একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য নির্দ্ধারিত কাজগুলি যে শিশু সাফল্যজনকভাবে সমাধা করে, সে শিশুই সেই স্তরের বিচারে উত্তীর্ণ। নির্দিষ্ট বয়সের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত ধরনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনুসরণ করে এলেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি।

তা ছাড়া শিশুর বিকাশ হয় ধারাগতিতে। কখনো এই বিকাশ হয় ধীরে, কখনো দ্রুতগতিতে। সুতরাং **সমগ্র ধারাটিকে অবলম্বন ও বিশ্লেষণ করেই শিশুর সাফল্য পরিমাপ করা সম্ভব।** তাই শিশুবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় Cumulative Record পদ্ধতি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

তবে শিশু বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে লেখা, পড়া ও গণিতের সূচনা হয়। **এই সব ক্ষেত্রে শিশুর দক্ষতা বিচার করাও পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত।**

সর্ব্বোপরি উল্লেখ্য যে বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষাও পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। এইসব অভীক্ষার সাহায্যে দুর্বল ও শক্তিশালী স্থানগুলি আবিষ্কার করা যায় এবং সেইভাবে শিশুকে পরিচালনাও করা যায়। শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোকপাত করাও অভীক্ষার অন্যতম কাজ।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে **স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তির অভীক্ষা এবং শিক্ষিকার নিরীক্ষণ অনুসারে (Observation) ধারাবাহিক রেকর্ড প্রস্তুত করাই শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা।**

অপসঙ্গতির সমস্যা

ধারাবাহিক নিরীক্ষণের সাহায্যেই শিশুর জীবনে অসঙ্গতি, অপসঙ্গতি এবং মনোবিকারের সন্ধান মেলে। শিশুকে **এই অপসঙ্গতির হাত থেকে রক্ষা করাও শিশুশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।**

সব শিশুই দেহ ও মনে সমান নয় এবং সমান যোগ্যতাসম্পন্নও নয়।

সকলের ব্যক্তিগত প্রবণতা কিম্বা সামাজিক পরিবেশও এক নয়। ব্যক্তি-জীবন কিম্বা সামাজিক জীবনে অসঙ্গতির সূত্র ধরেই নানারকমের অসঙ্গত আচরণও শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।

মানসিক অসুস্থতার দৈহিক এবং মানসিক দুই রকমের কারণই হতে পারে। ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্বলতার ফলে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম অনুসরণে অক্ষমতা থেকে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। দেহ গঠনের কোন ত্রুটির জন্য শিশুর মধ্যে লজ্জাবোধ এবং হীনমন্যতা সৃষ্টির ফলে মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি হয়। শরীরের মধ্যে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডের ত্রুটির ফলেও বুদ্ধির স্বল্পতা এবং দৈহিক বিকৃতি ঘটতে পারে, এর ফলেও মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। অপরদিকে জন্মগত কারণে বুদ্ধির স্বল্পতা হলে, কিম্বা রোগ ও আঘাতের ফলে বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। সর্ব্বোপরি স্নায়ুমণ্ডলীর ত্রুটি, অবচেতন মনের বিসর্পিল প্রভাব প্রভৃতির ফলেও মানসিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মানসিক অশান্তি থেকে মনের জগতে যে আলোড়ন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তার প্রকাশ ঘটে নানাধরনের অস্বাভাবিক আচরণে। আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে মানসিক গোলযোগকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **অভ্যাসগত বিশৃঙ্খলা**, যেমন স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্পর্কে উদাসীনতা, বাচন ক্ষমতার ত্রুটি, আঙ্গুল চোষা, দাঁতে নখ কাটা, অতিরিক্ত পরনির্ভরতা ইত্যাদি। (২) **প্রক্ষোভগত বিশৃঙ্খলা**: যেমন—অতিরিক্ত লজ্জাবোধ, ভীরুতা, খিটখিটে বদমেজাজ, দিবাস্বপ্নের অভ্যাস, অতিরিক্ত ভীতি কিম্বা উৎকণ্ঠা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মনিয়ন্ত্রনের অভাব, নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি। (৩) **শিক্ষাগত বিশৃঙ্খলা**, যেমন—মানসিক খর্বতা, বয়সানুপাতে লেখাপড়ায় পশ্চাৎপদতা, বানান, লেখা ও পড়ায় ত্রুটি ইত্যাদি। (৪) **মানসিক ব্যাধিজনিত বিশৃঙ্খলা**, যেমন—তীব্র উৎকণ্ঠা, ভীতি ইত্যাদি। (৫) **সাধারণ ব্যবহারগত বিশৃঙ্খলা** যেমন—চুরি, মিথ্যেভাষণ, স্কুল পালানো, ভবঘুরে জীবন, সবকিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব, অপরের উপর জুলুম, স্বার্থপরতা, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি ইত্যাদি।

আচরণগত এইসব বিশৃঙ্খলা থেকেই প্রমাণিত হয় যে শিশুর মনোবৈকল্য কিম্বা অপসঙ্গতি ঘটেছে। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সামঞ্জস্যই সুস্থ জীবন-বিকাশের ধারা। সুস্থ সামঞ্জস্যই সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রন করে। সুতরাং

সামাজিক আচরণে অসঙ্গতি প্রকাশ পেলেই বুঝতে হবে যে সামঞ্জস্যের ত্রুটির ফলে অপসঙ্গতি হয়েছে।

শিশুর চাহিদার অপূরনই অপসঙ্গতির মূল কারণ। এই চাহিদা দৈহিক এবং মানসিক—উভয়ই। উপযুক্ত খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম প্রভৃতি ব্যক্তিগত দৈহিক চাহিদা, নিরাপত্তা, আগ্রহ ও কৌতুহল নিবৃত্তি, স্বাধীনতা, সক্রিয়তা এবং আত্মতৃপ্তি প্রভৃতিই ব্যক্তিগত মানসিক চাহিদা। অপরদিকে ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সামাজিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি প্রভৃতি সমাজ জীবনের চাহিদা। এইসব **চাহিদার অপূর্ণতাই অপসঙ্গতির কারণ।**

মানুষের সকল চাহিদা পূর্ণ হয় না। কখনো আংশিক পূর্ণ হয়, কখনো পুরোটাই পূর্ণ হয়, কখনো বা একেবারেই পূর্ণ হয় না। কিন্তু সব অপূর্ণতাই অপসঙ্গতি সৃষ্টি করেনা। ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনের তীব্রতা, এবং চাহিদা পূরণের রূপ ও পরিমানের দ্বারাই অপসঙ্গতি নির্দ্ধারিত হয়। সোজাপথে বাস্তব চাহিদা পূরণের যখন উপায় থাকেনা, তখন বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করে কাম্য লক্ষ্যে পৌছতে অক্ষমতার গ্লানি দূর করতে চায়। **বিকল্প লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে আচরণ করা হয়, তাকেই বলা হয় পরিপূরক আচরণ।** এই পরিপূরক আচরণ যদি সমাজের দৃষ্টিতে অনুমোদিত না হয়, তবে তাকেই বলা হয় অপসঙ্গতিমূলক আচরণ, অর্থাৎ ঐ **বিসদৃশ আচরণই অপসঙ্গতির বহিঃপ্রকাশ।** এই ধরনের অপসঙ্গতি যথাসময়ে দূর করতে না পারলে মানসিক ব্যাধি এবং সমাজবিরোধী অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

পিতামাতার অতিরিক্ত আদর কিম্বা অতিরিক্ত শাসন, বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন, শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধের অভাব, অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপরাধী-মনোভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির ফলেই অপসঙ্গতি ঘটে। অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও গভীরতায় তারতম্য ঘটে সন্দেহ নেই, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবার তাগিদে অপ্রত্যাশিত আচরণ সাধিত হয়।

শিশু শিক্ষালয়ের পরিবেশেও কোন কোন অবস্থায় অপসঙ্গতি ঘটে। ক্ষমতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিক্ষালাভের অভাব, কোন কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে পশ্চাৎপদতা, দিবাস্বপ্ন, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, সহযোগিতামূলক কর্মোদ্যমে গররাজি হওয়া প্রভৃতিই বিদ্যালয় জীবনে অপসঙ্গতির বহিঃপ্রকাশ।

গৃহ ও বিদ্যালয়ে পরস্পর বিমুখী অভিজ্ঞতা, গৃহে অতি-লালন, প্রক্ষোভের বিপর্যয় প্রভৃতি নানাকারণে অপসঙ্গতি ঘটে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা যদি শিশুর আনন্দের পরিপন্থী হয়, কোন বিশেষ পরিস্থিতি যদি অচেতন মনের দরজায় নাড়া দেয়, শিশুর ক্ষমতা এবং তার উপর চাপানো বোঝার যদি তারতম্য ঘটে, আবেগ জীবনে যদি গোলযোগ সৃষ্টি হয়, সমপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা যদি প্রীতিপদ না হয়, শিক্ষক যদি নিষ্ঠুর শাসক কিম্বা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন, তবেও অপসঙ্গতি ঘটে। এমনকি ক্লাসের সাধারণ পড়া কিম্বা কাজ যদি উচ্চমেধাসম্পন্ন শিশুর পক্ষে অনুপযোগী হয়, তবেও অপসঙ্গতি ঘটতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে হস্তক্ষেপ করলে অপসঙ্গতি দূর করাও সম্ভব। এজন্য **প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর চাহিদা মেটানো।** শিশু চায় নিরাপত্তা, স্বীকৃতি, সক্রিয়তা, স্বাধীনতা এবং ভালবাসা। দৈহিক সুস্থতা এবং ক্রমবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত খাদ্য-পানীয়, শারীরিক ব্যায়াম ও বিশ্রাম, ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সুযোগ থাকলে অপসঙ্গতির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। মানসিক দিক থেকে প্রয়োজন কৌতূহলের সুস্থ নিবৃত্তি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা, সহজাত প্রবণতার বিকাশ, অপরের বিশ্বাস প্রশংসা ও সাহায্য। আর এই সবকিছুর জন্য প্রয়োজন সুস্থ গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

অপসঙ্গতি যদি গভীর হয় তবে শিশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তাই বিড়ম্বিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য মনঃসমীক্ষামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিশুর গৃহ পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, জীবনেতিহাস, বিশেষ বিশেষ আচরণ, প্রক্ষোভ জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করে শিশুর মানসিক দ্বন্দ্বের উৎসটিকে আবিষ্কার করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মানসিক চিকিৎসাও প্রয়োজনীয়। শিশুকে সুস্থভাবে চালনা করে তার যথার্থ বিকাশকে নিশ্চিত করাই শিশু শিক্ষালয়, বিশেষতঃ শিক্ষক ও সমজাতীয় কর্মীদের দায়িত্ব।

উচ্চতর মেধাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সাধারণের চেয়ে উচ্চ বুদ্ধ্যাঙ্কসম্পন্ন শিশুরা বেশী উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী, প্রাণ ও কর্ম শক্তিসম্পন্ন, সমস্যা অনুধাবনে সক্ষম হয়ে থাকে। এদের প্রতি বিশেষ নজর রেখে প্রয়োজনীয় মানসিক খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব শিশু শিক্ষালয়ের।

এই সূত্রেই শিশু-নির্দেশনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির আলোচনা প্রয়োজন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা ও বৃত্তি জীবনে নির্দেশনার প্রয়োজন আছে (educational and vocational guidance), শিশুদের ক্ষেত্রে তেমনি নির্দেশনার (child-guidance) বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিশুর পিতামাতা, গৃহ ও পরিবেশ, শিশুর দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য, শিশুর বাচন ও অনুকরণ শক্তি, সহজাত প্রবণতা ও সম্ভাবনার বিশেষাত্মক দিক, সীমাবদ্ধতা ও প্রখরতা, সাধারণ বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা, প্রক্ষোভ জীবনের বিশেষত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ভিত্তিতে শিশুলালন এবং শিশুর ক্রমবিকাশকে সর্বোত্তম পথে পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ **বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুর জীবনযাত্রাকে ফলপ্রসূ করে তুলবার জন্য Child Guidance Clinic'এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।**

সার্থক শিশু শিক্ষার জন্য শিক্ষিকা, (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে নার্সারী ও কে, জি'র ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকের ভূমিকা আদৌ স্বীকৃত নয়), শিক্ষনপ্রাপ্তা ধাত্রী, আয়া এবং অন্যান্য পরিচারিকা ছাড়াও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, শিশুদের ব্যায়াম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, খাদ্য বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, মনঃসমীক্ষক প্রভৃতির সঙ্গেও শিশু বিদ্যালয়ের নিয়মিত সংযোগ প্রয়োজন।

শিক্ষিকার গুণাবলী

এই সূত্রে শিক্ষিকার গুণাবলীর আলোচনা প্রয়োজন। শৈশবের শিক্ষায় (১—৫ বৎসর) পিতামাতা কিম্বা শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে রুশো ঘোষণা করেছেন। শিক্ষক কেবল লক্ষ্য রাখবেন, শিশুর ক্রমবিকাশ অনুসরণ করবেন এবং গুরুতর বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন; কিন্তু শিশুর কর্মধারায় বাধা দিয়ে নিজের অভিমত অনুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে চাইবেন না। শিশুর সঙ্গে তিনি সহানুভূতি-সূচক আলাপ করবেন, কিন্তু "শিক্ষাদান" থেকে বিরত থাকবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে শিক্ষকের ভূমিকার এই সব মূল্যায়নকে আরও পরিচ্ছন্ন করে মাদাম মন্তেসরি শিক্ষিকাকে বলেছেন Directress.

পেস্তালোৎসি ছিলেন পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর অবাধ স্বাধীনতার সমর্থক। আত্মবিকাশের জন্য শিশুর আত্মপ্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য সাহায্য দেওয়াই শিক্ষকের কাজ। বিদ্যালয়কে তিনি দেখেছেন গৃহের দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে,

যেখানে পারিবারিক জীবনের পারস্পারিক সম্পর্ক ও স্নেহমধুর পরিবেশ প্রতিফলিত হবে। এখানে ভালবাসার মধ্য দিয়েই শিশু ভালবাসা শিখবে।

তৃতীয়তঃ আমরা উল্লেখ করতে পারি **ফ্রোয়েবলের অভিমত**। রুশোর মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে শিশু স্বাভাবিকভাবে সৎ, পবিত্র এবং ভাল। যদি সময় মত যত্ন ও শিক্ষার উদ্যোগ করা হয়, তবে সহজাত শক্তির সার্থক বিকাশ ঘটে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা আবিষ্কার এবং প্রতিবন্ধক অপসারণ। কিন্তু শিক্ষক কখনো নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকতে পারেন না। চরিত্র গঠনের জন্য সুপরিচালনার প্রয়োজন আছে। সুতরাং শিক্ষিকার ভূমিকা নেতিবাচক নয়। তিনি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যথাসময়ে শিক্ষনীয় বিষয় তার কাছে উপস্থাপন করবেন, শিশুর আগ্রহকে ব্যবহার করবেন, সমাজবোধ ও আদর্শ জাগ্রত করবেন। **সুতরাং শিক্ষিকার ভূমিকাও সৃজনশীল**।

কোমেনিয়াস বলেছিলেন, "Education is gardening". মন্তেসরি পদ্ধতিতে এই কথাটির ভাবার্থ নিহিত রয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও গতিপ্রকৃতি শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছুই চাপানো হয় না, কারণ সব কিছুরই নির্দিষ্ট সময় আছে। **এই উপযুক্ত সময়ের জন্যই শিক্ষিকা অপেক্ষা করবেন**। তাঁর দায়িত্ব ধৈর্যসহকারে নিরীক্ষণ এবং পরোক্ষ পরিচালনা। তাঁর কাজই হলো শিশুকে লক্ষ্য করা, তার মনের কর্মধারাকে পরিচালনা করা। তাই মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষিকার নাম হয়েছে Directress।

শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা সম্বন্ধে শিক্ষাগুরুদের উপরোক্ত অভিমতের পটভূমিতে আমরা শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে পারি। শিশু শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষিকা হলেন অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যদিও কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে শিক্ষিকা যবনিকার অন্তরালে প্রায় নিরপেক্ষ দর্শকরূপে অবস্থান করবেন, তবুও আমরা বুঝি যে শিশুকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার জগতে এবং চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত নয়, কারণ সে নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। শিশুর অন্তর্নিহিত পূর্ণশক্তির অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার, তার যথাযথ উন্মেষ, সুনিয়ন্ত্রণ ও পরিনতির জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষিকার উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

যিনি শিশু শিক্ষার কাজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তিনিই প্রকৃত শিশুশিক্ষিকা। কেবল উপজীবিকা হিসেবে এই কাজ নির্বাচন করা অন্যায়। প্রথমে নিজের মনকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে শিশুকে তিনি যথার্থ ভালবাসেন কিনা! রক্ত-সম্পর্কহীন অনাত্মীয় যে শিশু, তার কার্যকলাপ, মলমূত্র ত্যাগ, আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে শিক্ষিকার মনে বিরাগ জন্মিতে পারে। শিশুর খেলাধূলোর ব্যবস্থা করা, অথবা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সময় বুদ্ধিমতী শিক্ষিকার পক্ষে সহজ, কিন্তু অসহায় অবস্থায় হঠাৎ কাপড় জামা নষ্ট হয়ে গেলে, নাক দিয়ে সর্দি পড়লে, খাওয়ার সময় বমি করে ফেললে অথবা অসুস্থ হলে শিক্ষিকা আপন সন্তানের মত স্নেহ ও যত্নের দ্বারা শুশ্রূষা করতে পারবেন কিনা তাও বিবেচ্য।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "বিদ্যা যে দেবে, এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু, সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুধু কর্তব্য ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে, তবে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।...মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশীল। ....তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাদের স্বাভাবিক।" মন্তেসরিও এইরকম কথাই বলেছেন........"Instead of the proud dignity of one who claims to be infallible, she assumes the vesture of humility." বস্তুতঃ শিশুবিদ্যালয়ের শিক্ষিকার উচ্চ শিক্ষাগত ডিগ্রী না থাকলেও চলতে পারে, কিন্তু শিশুর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসার উচ্চতম ডিগ্রী থাকা চাই। বস্তুতঃ সন্তানস্নেহে শিশুলালনের দায়িত্ব নিতে হয় বলেই শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষকের বদলে শিক্ষিকা নিয়োগ আবশ্যিক।

ধীরস্থির বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশীলা হলে ক্ষেত্র বুঝে শিক্ষিকা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। শিশুদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে দেওয়া প্রয়োজন। লোহা পিতলের মত ছাঁচে ঢেলে শিশুদের গড়ে তোলা শিশুশিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার কথা চিন্তা করা দরকার। প্রতিটি শিশুর সঠিক বয়স জেনে প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার আগে সে দেহ মনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত

কিনা সেকথা বিভিন্ন অভীক্ষা এবং ক্রমাগত নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে জানতে হবে। শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের চিকিৎসকের সঙ্গে শিক্ষিকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। তা ছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক তত্ত্ব ও নিয়মাবলীর সঙ্গেও শিক্ষিকার পরিচয় থাকা চাই। আদর্শ শিশু বিদ্যালয় শিশুর বাড়ীরই বৃহত্তর সংস্করণ. সুতরাং শিক্ষিকার পক্ষে শিশুর পিতামাতা এবং অভিভাবকদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব থাকা প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করা এবং তাঁদের কাছে শিশুর অগ্রগতি এবং ত্রুটির রিপোর্ট পাঠানো প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষিকা এমন পরিবেশ রচনা করবেন যে শিশু নিজের চিত্তের গতি অনুসারে, শিক্ষার বিষয়গুলি নিজের চোখে দেখে, কানে শুনে, হাতে ধরে, কিম্বা ভাবে আভাসে প্রকৃতির মধ্য থেকে খুঁজে বার করবে এবং শিখবে। এই পর্যায়ে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি অপরিনত থাকে বলেই পৃথিবীটা তার কাছে ধাঁধাঁর মত। সুতরাং ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণতার সাহায্যে ক্রমে পরিবেশ এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ধারনা সৃষ্টি হতে থাকে। তাই এ সময়ে শিক্ষকার সহানুভূতি ও হৃদয়বত্তার প্রয়োজন সর্বাধিক। নার্সারী অথবা কিণ্ডারগার্টেন গতানুগতিক বিদ্যালয় নয়। কিণ্ডারগার্টেনের অর্থই তো শিশুউদ্যান! বাগানের ফুলগাছের মত এখানে শিশু আপন স্বভাবধর্মে আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। **অনুকূল পরিবেশ রচনা করে শিশুর স্বাভাবিক আত্মবিকাশের পথকে সুগম করা, এবং তার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যাই শিক্ষিকার কর্তব্য।** এই কর্তব্য পালন করতে হলে শিশুর ক্রমবিকাশ ধারা এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা দরকার, কারণ সে ক্ষেত্রেই শিশুর প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও প্রবণতাকে যথাযথ মূল্য দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় পরিচালন করা সম্ভব।

কিন্তু শিশুকে কেবল মায়ের মত ভালবাসলেই চলবেনা, শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করবার জন্য শিক্ষিকার বিশেষ প্রস্তুতি এবং শিক্ষনের প্রয়োজন। তাঁকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিনী হতে হবে। শিশুর ক্রমবিকাশ ধারা, শিশু মনোবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি, এবং মৌলিক অভ্যাসের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। শিশুমনোবিজ্ঞান জানা থাকলে শিশুর আচরণ

লক্ষ্য করে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি শিশুর সহজাত সম্পদগুলি বিকাশের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

শিশুদের যে সব বিষয়বস্তু শেখানো হবে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে শিক্ষিকা পরিচিত হবেন এবং যথাসম্ভব প্রত্যেক কাজে অংশ গ্রহণ করবেন শিশুদের সহযোগিনী রূপে। শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা তাঁর থাকা চাই। শিশুশিক্ষার শেষ ধাপে লেখা পড়া ও সংখ্যা শেখানোর বৈজ্ঞানিক প্রণালী পদ্ধতিতে শিক্ষিকার দক্ষতা প্রয়োজন।

শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রম (কার্যক্রম) ও পদ্ধতিতে শিল্পকলা, হাতের কাজ, আবৃত্তি, গল্প, সঙ্গীত এবং বিচিত্রধর্মী খেলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিশুদের সঙ্গে সমতালে অংশ গ্রহণ করতে হয়। শিশুকে অনেক সময় শেখাতেও হয়। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য কিছু মৌলিক ট্রেনিংও শিশু-শিক্ষিকা শিক্ষনের অন্তর্গত।

বর্তমানের জটিল জীবনযাত্রার দিনে শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ব্যাখা করা সম্ভব নয়। ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও সকল গুণ সকলের মধ্যে থাকা বোধহয় আরও অসম্ভব। তবু শিক্ষিকার কাজ ও আচরণ শিশুর কাছে জীবন্ত উদাহরণ ও প্রেরনা, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। শিক্ষিকা যা করবেন, অনুকরণপ্রিয় শিশু তাই করবে। সে জন্যই শিক্ষিকাকে হতে হবে কর্মদক্ষ। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা মেলামেশা, বেশভূষা হওয়া চাই সুমার্জিত। শিষ্টতা, সরলতা, সভ্যতা, স্নিগ্ধতা যেন তাঁকে অনুকরনীয় করে তোলে।

শিশুশিক্ষার বর্তমান অবস্থা—বিদেশে

শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ইতিহাস, পণালী পদ্ধতি প্রভৃতি আমরা আলোচনা করেছি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশে **এই স্তরের শিক্ষায় বর্তমান অবস্থাটি** এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। (বইয়ের প্রথম পর্বে উপস্থাপিত বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ডায়গ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বিষয়টি অনেক সহজবোধ্য হবে)।

ফরাসী দেশে ম্যাটার্ণাল স্কুলটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে পৃথক বাড়ীতে, শিক্ষনপ্রাপ্তা শিক্ষিকার দ্বারা, নিজস্ব প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত হয়। ঘরবাড়ী, সরঞ্জাম উপাদান, শিক্ষিকার গুণাবলী প্রভৃতি সবকিছুই জাতীয় আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং শিশুদের অনুপস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়। **ইনফ্যাণ্ট ক্লাসগুলি** (৩-৬ বৎসরের শিশুর জন্য) সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও শিশুশ্রেণীগুলি একটি পৃথক ইউনিটরূপে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। শিশুশিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিগুলির উপর ইদানীং বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে 'লেখা-পড়া-গণিতের' প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ঝোঁক হ্রাস করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাদী পিতামাতা এ বিষয়ে আপত্তি তুলছেন। তবুও মন্তেসরি এবং ডেক্রলি পদ্ধতি ফ্রান্সে আজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং শিক্ষা প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাধীনতা শিক্ষিকাদের রয়েছে।

ফ্রান্সের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তবে রাষ্ট্রীয় সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রাপ্ত। প্রতিটি কমিউনেরই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার আছে। স্কুলটি অন্ততঃ দশবছর টিকিয়ে রাখবার সর্ত্তে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেই. কিন্তু চুক্তিবদ্ধ হলে সর্বদাই সরকারী সাহায্যের উদারতা নিশ্চিত হয়। বেসরকারী, বিশেষতঃ চার্চ্চ প্রতিষ্ঠানের অনেক সাহায্যহীন স্কুল আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিক্ষামন্ত্রণালয় বিদ্যালয় পরিদর্শন, পরামর্শ এবং নির্দেশনার অধিকার প্রয়োগ করেন। প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলেও ন্যাটার্ণাল স্কুল ও ইনফ্যাণ্ট শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯৬৩ সনে সরকারী ম্যাটার্নাল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩৫৬ এবং সরকার-অনুমোদিত বেসরকারী স্কুল ছিল ২০০টি। বিগত পাঁচ বছরে ঐ সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

পশ্চিম জার্মানীতে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য রয়েছে কে, জি। কোন কোন অঙ্গরাজ্যে শ্রমিক মায়েদের সন্তানের জন্য ৩—৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইসব বিদ্যালয় প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নয়। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিম্বা স্থানীয় জনপ্রতিষ্ঠান সমূহই সাধারণতঃ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। শিশুশিক্ষা এখানেও বাধ্যতামূলক নয়, তবে ছাত্রসংখ্যা এখানেও ক্রমবর্দ্ধমান। দশবছর আগেই বিদ্যালয়ে পাঠরত

৬ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ এবং ছয় বছরের কম বয়স্ক ছিল ২ লক্ষ। ইদানীং এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইংলণ্ডে—১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে কেবল শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুমতিই দেওয়া হয়নি, স্থানীয় চাহিদা মেটাবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। চল্লিশটির কম ছাত্রসংখ্যা সম্পন্ন নার্সারী বিদ্যালয়ের দিকেই সাম্প্রতিক ঝোঁক বেশী। তবে ইংলণ্ডে নার্সারী স্কুলকে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করাও চলে। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে ৫—৭ বছরের শিশুদের ইনফ্যাণ্ট স্কুলেই গ্রহণ করা হয়। ইনফ্যাণ্ট স্কুলের শিক্ষা অবৈতনিক।

ইংলেণ্ডে আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও সম্ভাবনার তুলনায় সাফল্য হয়েছে অল্প। ১৯৬২ সনে ইনফ্যাণ্ট স্কুল ছিল ৭২৭৬টি, সরকারী নার্সারী স্কুল ৪৫৫টি সাহায্যপ্রাপ্ত ২০টি এবং সাহায্যহীন বেসরকারী ২১৫টি মাত্র। বিগত পাঁচ বছরে এই সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এজন্য আর্থিক সমস্যা বহুলাংশে দায়ী।

আমেরিকায়—১৯৩৩ সনের আগে স্বল্পসংখ্যক নার্সারী স্কুল ছিল কেবল মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর জন্য। শ্রমিক জননীর সন্তানের জন্য কিছু সংখ্যক দাতব্য বিদ্যালয় অবশ্য ছিল। অর্থনৈতিক সংকট ত্রাণের অন্যতম পন্থারূপে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শিশুশিক্ষায় সাহায্যদানের নীতি গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সাহায্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে ১৯৩৯ সনে নার্সারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নার্সারী স্কুল ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটে, তাছাড়া "শিশু প্রযত্ন কেন্দ্রও" খোলা হয়। ১৯৪৪ সনে এইসব কেন্দ্রে শিশুর সংখ্যা ছিল ৫১২২৯। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৯৪৬ সনে এই বাবদে কেন্দ্রীয় সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়।

ততদিনে অবশ্য কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন আমেরিকার মাটিতে শিকড় পেয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যমে বহু প্রতিষ্ঠানও তৈরী হয়েছে। ১৯৫০ সনের মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব রাজ্যেই কিণ্ডারগার্টেন প্রোগ্রাম চালু করা এবং এজন্য ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করার আইন পাশ হয়ে যায়। ২০টি রাজ্যে অর্থবরাদ্দ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অবশ্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি কোথাও।

এখন আমেরিকায় শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী। বিভিন্ন রাজ্যে

রয়েছে মাতৃসংঘ। শিশুশিক্ষায় পারদর্শিনী "travelling mother" অনবরত ভ্রমণ করেন এবং শিশু লালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে মায়েদের অবহিত করেন। বহু সংখ্যক Child Bureau গঠিত হয়েছে। ১৯৬৩ সনেই কেবল সরকারী কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১ লক্ষের বেশী। বিগত কয় বছরে এই সংখ্যা অনেক বেড়েছে। অনেক বিদ্যালয়ই দুই সিফ্‌ট'এ কাজ করে। শিশু-প্রতি বাৎসরিক ব্যয় হয়ে থাকে ৩৭৫ ডলার। এইসূত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকায় উন্নতমানের নার্সারী বিদ্যালয়গুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণা বিভাগ কিম্বা মনঃস্তাত্বিক গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাধিক সংগঠিত। শিশু লালন, সংরক্ষণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব রাশিয়াতে স্বীকৃত। প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন কারখানা ও যৌথ খামার কিম্বা সমবায়গুলি। কিন্তু পরিদর্শন, নির্দেশনা এবং প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রায় প্রতি কারখানার সঙ্গে ক্রেস্‌। এর উপরের স্তরে রয়েছে নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন (৩—৬ বৎসর)। শিশুশিক্ষা ছাড়া প্রচার কেন্দ্র, পরামর্শ কেন্দ্র এবং দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র রূপেও এইসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে। কয়েকটি আবাসিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দিবাকালীন। যে ধরনের বিদ্যালয়ই হোক না কেন, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের শেষ কথা রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে।

যে কোন সংগঠিত প্রতিষ্ঠান কিম্বা জনসমষ্টিই নার্সারী স্কুল প্রতিষ্ঠার অধিকার ভোগ করে। বাসগৃহ অঞ্চলের 'হাউসিং কমিটিগুলি' শিশু বিদ্যালয়ের জন্য স্থান সংরক্ষণ ও জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি বড় বড় আবাসিক অট্টালিকায় শিশু বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্দিষ্ট রাখা হয়। কারখানাগুলিও জমি বাড়ী সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। শিশুদের খাদ্যের বাবদ অভিভাবকেরা সামান্য ব্যয় বহন করেন। বৃহৎ পরিবারের ক্ষেত্রে এই ব্যয়ও বহন করতে হয় না। সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

রাশিয়াতে মায়ের দৈনিক কাজের সময় অনুসারে কিণ্ডারগার্টেনের কাজের সময় বাঁধা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো সপ্তাহটাই শিশুকে বিদ্যালয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষিকাকেই পালন করতে হয় মায়ের ভূমিকা।

সুতরাং স্নেহ ও শান্তিই বিদ্যালয়ের আদর্শ। স্কুলের সময়টি যেন শিশুর সুখের অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়। প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগত যত্নে রাখা হয়। কিন্তু যৌথ জীবনে অভ্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে শিশুদের খেলার সরঞ্জামও যৌথ খেলার উপযোগী করে পরিকল্পনা করা হয়। রাশিয়াতে নার্সারী থেকে কিণ্ডারগার্টেনে উত্তরণের ব্যবস্থাটিও বেশ আকর্ষনীয়। বৎসর শেষ হওয়ার আগে থেকেই কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষিকারা নার্সারী বিদ্যালয়ে যেতে থাকেন শিশুদের সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। তাঁরা শিশুদের বাড়ীতেও দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকেন। তারপর প্রমোশনের সময় শিশুদের সঙ্গে নার্সারী স্কুলের শিক্ষিকাও কয়েকদিন গিয়ে কিণ্ডারগার্টেনে থাকেন। সেখানে শিশুদের মন বসলে তিনি আবার ফিরে আসেন নার্সারীতে। তবে নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেনকে সংযুক্ত করার দিকেই সম্প্রতি ঝোঁক রয়েছে। ১৯৬০ সনের পরে প্রতিষ্ঠিত সব শিশু বিদ্যালয়েই দুইটি স্তরকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

যুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। যে সব গ্রামাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়নি সেখানে গ্রীষ্মকাল কিম্বা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে কিণ্ডারগার্টেন পরিচালনা করা হতো। তবে বিগত সপ্তবর্ষ পরিকল্পনায় কে, জি'র সংখ্যা দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা হয়। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা যারা চাইবেন, তারা কেউই যেন বঞ্চিত না হন্—এই ব্যবস্থা করতে রাশিয়া ১৯৬৫ সনেই সক্ষম হয়েছে।

শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—এদেশে

বিদেশের পটভূমিতে আমরা এখন স্বদেশের কথা আলোচনা করতে পারি। এ সম্পর্কে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে **ভারতের শিশুশিক্ষা আন্দোলন অতি নবীন**। সুতরাং চেতনার প্রসারতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সরকারী উদারতার অভাবে **শিশু শিক্ষার প্রসার হয়েছে অতি নগণ্য**। ১৯৫০-৫১ সনে সারা ভারতে অনুমোদিত বিদ্যালয় ছিল মাত্র ৩০৩ টি। দশ বৎসর পরে সংখ্যাটি হয় ১৯০৯। এমনকি ১৯৬৬ সনেও বিদ্যালয় ছিল ৪ হাজারের কম। বস্তুতঃ সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত শক্তিতেও প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে দুইটিও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পায়না।

প্রতিষ্ঠান অবশ্য ইতিমধ্যে কয়েকধরণের তৈরী হয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে

কিছু-কিছু মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ঐ সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু প্রযত্ন কেন্দ্র (Child Care Centre)। বিহারের ধানবাদ ও পশ্চিম-বঙ্গের রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে কিছু ক্রেস স্থাপিত হয়েছে খনি মালিকদের সৌজন্যে। চা বাগান কিম্বা অন্যান্য শিল্পেও কিছু ক্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অফিস-কর্মী মায়েদের উদ্যোগে অফিস্ অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক শিশু লালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে শিল্পাঞ্চল কিম্বা বড় বড় শহরে মাত্র। সেখানেও আন্দোলনের পরিধি এবং জনচেতনার ব্যাপ্তি সংকীর্ণ।

প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে আমাদের আছে নার্সারীস্কুল, কিণ্ডার-গার্টেন এবং প্রাকবুনিয়াদি স্কুল। তা ছাড়া কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে—যেমন, উত্তর প্রদেশের ১০ হাজার শিশু-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান বালকানজি-বারি, পশ্চিম ভারতে বালনিকেতন, অন্যান্য কোন কোন স্থানে বাল সঙ্ঘ, কিম্বা বালবাড়ী, বালমন্দির প্রভৃতি।

শিশুদের আমোদপ্রমোদের জন্যও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন কলকাতায় C. L. T. মাঝে মাঝে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয় (Sankar's Competition)। প্রতিবছর ১৪ই নভেম্বর শিশুদিবসে সর্বভারতীয় শিশুকল্যাণ পর্ষৎ, পশ্চিমবঙ্গের শিশু কল্যাণ পরিষদের মত অনেক প্রতিষ্ঠানের কথা ফলাও করে সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয়। কিন্তু এইসব সমিতির নেতৃত্বে প্রতিনিয়ত শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা কিম্বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপক কোন সাংগঠনিক উদ্যোগের কথা সাধারণ দেশবাসীর কাছে সারা বছরের দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

তাই আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা এখনও মূলতঃ বে-সরকারী ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানগতভাবে কোন কোন সংগঠন সামান্য দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা কিম্বা কয়েকজনের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। শহরাঞ্চলে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা কিঞ্চিৎ বেশী থাকায়, শিশুদের মুক্ত বিচরণের সম্ভাবনা সীমিত থাকায়, বহু ক্ষেত্রে বাপ-মা-সন্তানকে নিয়ে গঠিত পরিবারের বাপ মা উভয়েই চাকুরীতে আবদ্ধ থাকায় এবং সর্বোপরি আর্থিক সামর্থ্য কিছু বেশী থাকায় শহরে এবং

শিল্পাঞ্চলেই প্রাক প্রাথমিক স্কুলগুলি গড়ে উঠেছে। পশ্চিম বঙ্গের উদাহরণ থেকেই সর্বভারতীয় অবস্থাটা বোঝা যায়। এখানে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং জিলা শহরগুলিতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাক প্রাথমিক স্তরটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত নয়। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যেমন সরকারী বিধিবিধান রয়েছে, তেমন কোন বিধিবিধান শিশুশিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে নেই। শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি, বাড়ী, সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন আইন নেই। বিদ্যালয়টি পরিদর্শনের কোন প্রশ্ন নেই। বিদ্যালয়কে সরকারী তালিকাভুক্ত করবার জন্য রেজিস্ট্রি করা কিম্বা লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ব্যাঙের ছাতার মত স্কুল গজাবার পথে কোন অন্তরায় নেই। অলিতে গলিতে নতুন নতুন এবং বিচিত্র নামের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাড়ম্বর ঘোষণা দেখা যায় পোষ্টার ফেষ্টুন এবং প্রচারপত্রের মারফৎ প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্কুলেরই নিজস্ব বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে ২/৩ খানা স্বল্পপরিসর কোঠার বেশী ঘর নেই, ঘরগুলোতে অনেক সময়ই আলো হাওয়াকে "No admission" করে রাখা হয়, আর শিশুদের খেলবার জায়গার তো প্রশ্নই ওঠে না। স্কুলের ভিতরে তাকালে দেখা যাবে নার্সারী স্কুল কিম্বা কিণ্ডারগার্টেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী এবং শিক্ষাগত সাজসরঞ্জামের অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশের মাত্র অস্তিত্ব আছে। যানবাহনের ব্যবস্থা অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণই ঐচ্ছিক। নিজেদের গাড়ীর অভাবে পায়ে হেঁটে শিশুকে দেয়া-নেয়ার দায়িত্ব অভিভাবকের। অথবা উচ্চ হারে বাস ভাড়া দিয়ে বাস'এ রূপান্তরিত জীপ-গাড়ী কিম্বা ষ্টেশন ওয়াগনে খাঁচায় ভর্তি পাখীর মত এক গাদা বাচ্চাকে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়ে স্কুলে পাঠাতে হয়। স্কুলের একমাত্র সম্বল একখানা গাড়ীতে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হবে ভোর সাতটায়, আর অবসন্ন শিশুকে ফেরত দেওয়া হবে বেলা আড়াইটায়। তা ছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুবিদ্যালয়গুলিই শিশুদের কোন খাদ্য পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব বহন করেনা। নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বৈষম্যমূলক আহারের ও ফ্ল্যাস্ক ভর্তি জলের বন্দোবস্ত অভিভাবককেই করতে হয়। কিন্তু এইসব

কিছুই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং অবৈধ। শিশুশিক্ষার এই সমগ্র প্রয়াসটি আরও কৌতুককর হয়ে ওঠে যখন বিজ্ঞাপন যন্ত্রে প্রচার করা হয় "শিক্ষিকা" দ্বারা পরিচালিত এবং "Co-educational" প্রভৃতি কথাগুলি, কারণ শিশুশিক্ষায় মহিলাদের দায়িত্বই বিজ্ঞানসম্মত নীতি এবং ছেলেমেয়ের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞান সম্মত রীতি। সুতরাং "শিক্ষিকার পরিচালনায় কো-এডুকেশন্যাল" বিদ্যালয়ের প্রচার পত্রের প্রশ্নই ওঠেনা।

আমাদের শিশু শিক্ষালয়গুলির স্তরবিভাগও (২-৫ এবং ৫-৭) ঠিক নেই। ফলে মন্তেসরি কিম্বা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির কোনটিই ঠিক মত অনুসৃত হয়না। কলকাতার কথাই উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা চলে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিশু বিভাগ, গোখেল স্কুলের কে, জি বিভাগ, হেষ্টিংস হাউসের নার্সারী স্কুল কিম্বা ডায়োশেসন, লোরেটো হাউসের মত কিছু প্রতিষ্ঠান স্তরবিভাগ এবং পদ্ধতিগত যথার্থতা কিছু পরিমাণে মেনে চলবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে Reception-Infant 1-Infant II অথবা K. G. I-KG. II কিম্বা Infant I, II এর পরেই Form I, II, III, Prep I, Prep II, কিম্বা Class I, II, III' ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রচলিত। কোন কোন স্কুলে "Transition" নামেও একটি স্তরকে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নাম-বৈচিত্র্যও এইভাবে নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। কোন কোন সাড়ম্বর প্রচারপত্রে "নার্সারী থেকে নিম্নমাধ্যমিক" পযন্ত পাঠব্যবস্থার ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

পাঠ্যক্রমের প্রভাব পড়ে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে শিশুর স্বাভাবিক আত্মবিকাশে সহায়তা করবার জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তার প্রয়োগ এই সব স্কুলে অতি সীমিত। এ জন্যে না আছে জমি জায়গা বাড়ী বাগান, না আছে সাজ সরঞ্জাম। সুতরাং ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা তো দূরের কথা, কর্মভিত্তিক শিক্ষারও সম্ভাবনা থাকে না। শিক্ষিকা-শিক্ষণের অভাবও এজন্যে কিয়দংশে দায়ী। নার্সারী বিদ্যালয়ে কর্মরতা শিক্ষিকাদের অধিকাংশই শিক্ষণ-প্রাপ্তা নন। সদ্য স্কুল কলেজ থেকে পাশ করেছেন এবং বিকল্প চাকুরী পাওয়া পর্যন্ত অল্প বেতনেই কাজ করতে রাজি, এমন মেয়েদের স্বল্প পারিশ্রমিকে নিয়োগ করে স্কুল-মালিকরা লাভের অঙ্কটা আরও কাঁপিয়ে তোলেন। অভিজ্ঞতা ও

শিক্ষণহীন এইসব শিক্ষিকারাই "Miss" কিম্বা "Aunty" হয়ে বসেন। প্রধানা শিক্ষিকা শিক্ষণ-প্রাপ্তা হলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর নামের পিছনে দু'একটা বিদেশী ডিগ্রী-ডিপ্লোমা থাকলে কর্তৃপক্ষ আরও খুশী, কারণ বিদ্যালয়ের আকর্ষণ শক্তি সে ক্ষেত্রে আরও বাড়বে।

ভাল সাজ সরঞ্জাম, জায়গা বাড়ী যে একেবারেই নেই তাও নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে **বিদ্যালয়ের মধ্যে আবার জাত-কৌলিন্য আছে।** শিশুশিক্ষার নগণ্যতাই যে দেশের পক্ষে ব্যাপক সত্য, সে দেশে শিশু বিদ্যালয়ের পঙ্গু এবং অপভ্রংশ সংস্করণগুলিও নিজেদের কুলীন বলে মনে করে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেও আবার কৌলিন্যের স্তরভেদ আছে। কলকাতার অন্যতম বৃহৎ শিশুবিদ্যালয়ে মাথা পিছু মাইনে মাসিক পঞ্চাশ টাকা, বাস ভাড়া পঁচিশ টাকা, ইউনিফর্ম এবং টিফিন খরচ সমপর্যায়ের; এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবদ বিশেষ ব্যয় মোটা অঙ্কের। ভর্ত্তির সময়ে এককালীন দেয় কমপক্ষে দেড়শত টাকা। তবুও এইসব প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্ত্তির জন্য এক বছর বয়সেই নাম রেজিষ্ট্রীর প্রয়োজন হয়, এবং আসন প্রাপ্তির জন্য পশ্চাদ্দ্বারে নানাধরনের উমেদারীর দরকার হয়। মধ্যম পর্যায়ের বিদ্যালয়ে মাইনে কমপক্ষে পঁচিশ টাকা এবং বাস ভাড়া আরও পঁচিশ টাকা। এর কম যেখানে মাইনে, সে সব স্কুল প্রায় "জনতার স্কুল" বলেই গণ্য। বস্তুতঃ আমাদের দেশের পারিবারিক মাসিক গড় আয়ের চেয়েও শিশু বিদ্যালয়ে মাথাপিছু ব্যয় যেখানে বেশী, সেখানে শিশু-শিক্ষার প্রসার যে ঘটবে না, একথা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না।

আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় ব্যর্থতা শিশুশিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত অভ্যাস, ইন্দ্রিয়-পেশী-স্নায়ুর সজীবতা, প্রক্ষোভ জীবনের সুস্থ বিকাশ, আনন্দের মধ্যে শিশুর আত্মপ্রকাশ এবং আচার আচরণ ন্যায়নীতির যে আদর্শ থাকা উচিত, তার বদলে আমাদের শিশু বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর উপর "পড়াশুনার" চাপ বেশী। ভর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই একটি দীর্ঘ পুস্তক তালিকা অভিভাবকের হাতে আসে। স্কুলে "পড়াশুনা" করিয়ে অনেক কিছু না "শেখালে" অনেক বাপ মাও স্কুলের "খেলাফেলার" প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। অপরদিকে বাড়ীতে ভালভাবে "পড়াশুনা" করাবার জন্য স্কুল থেকে অভিভাবককে চাপ দেওয়া হয়, এমন অনেক তথ্যও গ্রন্থকারের কাছে আছে। এমন অভিভাবকও তিনি জানেন যিনি শিশুশ্রেণীর পুত্রের জন্য বাড়ীতে

"দিদিমণি" নিয়োগ করেছেন এবং "পরীক্ষার" আগে দুইমাস ধরে রোজ রাত্রি ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শিশুকে নিজেও পড়িয়েছেন বলে গর্ব করেন। এই সমস্ত ব্যাপারটিই বৈজ্ঞানিক শিশুশিক্ষার প্রহসন মাত্র। বস্তুতঃ আমাদের দেশের অনেক পিতামাতাই শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে অবহিত নন। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অতি নিকৃষ্ট। ভাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য চাহিদা এবং প্রতিযোগিতা তাই অতি তীব্র। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য "ভাল লেখাপড়া" করিয়ে উন্নত মানের প্রস্তুতিপর্ব রূপেই তাঁরা শিশু বিদ্যালয়গুলিকে বিচার করেন। তাই দেখা যায় মা চাকুরীজীবিনী না হলেও, পারিবারিক পরিবেশ যথেষ্ট হৃদ্যতাসম্পন্ন হলেও এবং গৃহে শিশু অসুখী না হলেও পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি থাকলে প্রচলিত শিশু বিদ্যালয়েই সন্তানকে ভর্তি করবার জন্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ঝোঁক। এই প্রবণতা আজ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজকেও স্পর্শ করছে, কারণ শিশুশিক্ষাকে "ভাল স্কুলে" ভর্ত্তির সোপান রূপেই মাত্র বিচার করা হয়।

বাপ মাকেও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সন্তানের "ভবিষ্যৎ" সৃষ্টি করতে তাঁরা উদগ্রীব হবেনই। বর্তমানের "বণিকি সভ্যতার" যুগে Salesmanship'এর মূল্য আছে। কেতাদুরস্ত, চটপটে, ইণ্টারভিউতে চৌকোষ ছেলেমেয়ের "ভবিষ্যৎ" সুনিশ্চিত। তাই দেখা যায় শিশু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ "English Medium" কথাটি সাড়ম্বরে প্রচার করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মণ্ডলীর মধ্যে যদি একজন শ্বেতাঙ্গিনী কিম্বা অর্দ্ধশ্বেতাঙ্গিনী তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন, তবে ছাত্রভর্ত্তি এবং অর্থাগমের কোন সংশয়ই থাকে না।

তাই বলা চলে যে **আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য, নীতি ও ব্যবহারিক কার্যক্রম আদৌ সার্থক হয়নি।** এই অবস্থা চলতে থাকলে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হবে। গৃহ পরিবেশ ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা এবং স্কুল পরিবেশের মধ্যে অসঙ্গতির ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বও হবে দ্বিখণ্ডিত। অপসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রহরী রূপে শিশু বিদ্যালয়ের দাঁড়াবার কথা। কিন্তু শিক্ষাগত পটভূমি এবং বাস্তব জীবনধারার মধ্যে অসঙ্গতির ফলে শিশুর জীবনেই আসবে অপসঙ্গতি।

কিন্তু এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন অপরিসীম এবং আমাদের মত দেশেই বেশী প্রয়োজন। তাই জনবহুল অঞ্চলে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে নিত্য নূতন স্কুল সৃষ্টি হচ্ছে, জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং পিতামাতার ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সংকট সত্ত্বেও ছাত্রভর্তির সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। এর কারণ একদিকে শিক্ষাচেতনার অগ্রগতি এবং অপরদিকে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা

পুরাতন ধরনের পারিবারিক জীবন এখন আর নেই। বাবা মায়ের ক্ষুদ্র পরিবারে শিশুর কোন সমবয়স্ক বন্ধু জোটে না। শিশুর খেলা ও আনন্দের চাহিদা পূরণ করবার সামর্থ্যও সব পিতামাতার থাকে না। বাবা-মা উভয়েই চাকুরী করায় শিশুকে প্রতিনিয়ত সঙ্গ দেওয়ারও উপায় থাকে না। বেতনভোগী আয়া কিম্বা দাস দাসীর উপরও শিশুর দায়িত্ব অর্পন করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত বাধা পায়। এর ফলে পিতামাতার শান্তি ভঙ্গ হয় শিশুর দৌরাত্মে, নতুবা শিশু হয়ে ওঠে সংকীর্ণমনা কুণো স্বভাবের। এ অবস্থায় মনোবিকৃতি ঘটা খুবই সম্ভব। অনেক সময় অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়াও যায় না, কারণ শিশু হয়তো ঐ সূত্রে নানা ধরনের অশোভন আচরণও আয়ত্ত করে। প্রতিটি আবাসিক অঞ্চলে মুক্ত আলোবাতাস কিম্বা খেলার মাঠও সহজপ্রাপ্য নয়। সর্ব্বোপরি পিতামাতা প্রতিনিয়ত প্রখর দৃষ্টি রাখতে না পারলে শিশুর জীবনে ভাল অভ্যেস, আচরণ, সামাজিক মনোভাব অর্জন করাও সম্ভব নয়।

এই হলো শিশুবিদ্যালয়ের স্বপক্ষে সামাজিক যৌক্তিকতার দিক। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজন ছাড়া শিক্ষাগত কারণেও শিশুবিদ্যালয় আজ জনপ্রিয় হওয়া স্বাভাবিক। খেলার জন্যে হোক আর পড়ার জন্যে হোক, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে স্কুলমুখীনতা সৃষ্টি হয়, বন্ধুপ্রীতি জন্মে, শিক্ষিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্য পাঁচটি শিশুর সাহচর্যে শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি শিক্ষাগত সাফল্য আনয়ন করে। বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে শিশু হয়ে ওঠে নিবিষ্টচিত্ত এবং নিয়মানুবর্তী। বিদ্যালয়ের যৌথ জীবনে

আবেগের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। সর্বোপরি একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্বে লেখা-পড়া-গণিত পাঠের ভিত্তি অনেক দৃঢ় হয়। এই মূলধন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হলে অপেক্ষাকৃত বেশী সাফল্য অবশ্যই নিশ্চিত।

সুতরাং বিভিন্ন রকমের শিশু বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এদের অস্তিত্বও সমর্থনযোগ্য। কিন্তু যে ভাবে ও ভঙ্গিতে বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, তার মৌলিক সংশোধন প্রয়োজন। শহরাঞ্চলেও শিশুশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে। এই শ্রেণীদ্বয় স্বভাবতঃই শিক্ষা-সচেতন এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। শহরাঞ্চলের দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত এখনও নার্সারী-কিণ্ডারগার্টেনকে বিলাসিতা বলেই মনে করেন। সর্ব্বোপরি যাদের কাছে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রয়োজন সর্বাধিক, সেই বস্তিবাসী শ্রমজীবি জনসাধারণের কাছে প্রগতিশীল শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা স্বপ্নতুল্য। তা ছাড়া ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন অধিবাসীই গ্রামীণ। কিন্তু গ্রাম ভারতে নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থা আজও প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মলাভই করেনি। **তাই সামগ্রিক বিচারে আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা প্রয়াস সম্পূর্ণ ই অপ্রতুল এবং সংকীর্ণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।**

প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার কারণ

এই পশ্চাৎপদতার কারণ অনেক। এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রামের প্রতি দৃষ্টির অভাব, শহরের মধ্যে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা এবং শহরের মধ্যেও ক্ষুদ্র অংশের উপর নির্ভরশীলতাই অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে শিশুশিক্ষায় উচ্চ ব্যয়ের জন্যও প্রসারতা আসেনি। এমনিতেই নার্সারী কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য। তদুপরি আমাদের দেশে মুনাফাশ্রয়ী শিশুশিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই ব্যয় নাগালের বাইরে। উপযুক্ত সরকারী সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য পেলে হয়তো আরও বেশীসংখ্যক পরিবারের কাছে শিশুশিক্ষার সুযোগ পৌছতো। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী উদাসীনতার সীমা নেই। যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাও এখন পর্যন্ত অবৈতনিক ও সর্বজনীন হতে পারেনি, এবং যেখানে শিক্ষা বাজেটের উপর প্রতিনিয়ত খড়্গা ঝুলছে, সে দেশে শিশুশিক্ষায় সরকারী দায়িত্ব বোধহয়

মুর্খের স্বর্গবাসের মত। আর্থিক সরকারী দায়িত্ব দূরের কথা, এ বিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ আইনও নেই। শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি, বাগিচা, কল কারখানা, সওদাগরী অফিস প্রভৃতির শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ক্রেস-নার্সারী প্রতিষ্ঠার কোন বাধ্যতামূলক দায়িত্ব মালিকপক্ষকে দেওয়া হয়নি। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিও এ বিষয়ে উদাসীন। যেখানে পৌর অঞ্চলেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি, যখন কলকাতা মহানগরীতেই শতকরা ৪০টি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যখন পৌরসভাগুলি শিক্ষাকর চালু করতে পরাঙ্মুখ, তখন শিশুশিক্ষায় অগ্রসরতা কল্পনাই করা যায় না।

প্রত্যক্ষ সরকারী প্রয়াসও অতি নগণ্য। পশ্চিম বঙ্গের কথাই ধরা যায়। হেষ্টিংস হাউস'এর স্কুলের মত কয়েকটি পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সারা রাজ্যে রয়েছে মাত্র ২ শতটি প্রাক-বুনিয়াদি বিদ্যালয়। এই প্রচেষ্টা অপ্রতুল তো বটেই, তদুপরি প্রাক-বুনিয়াদি স্কুলের আভ্যন্তরীণ চিত্র উদ্‌ঘাটন না করাই বোধ হয় শ্রেয়।

আর্থিক ও রাজনৈতিক এইসব কারণ ছাড়া সামাজিক কারণেরও অভাব নেই। পিতামাতার শিক্ষা এবং শিক্ষা চেতনার উপর সন্তানের শিক্ষা বহুলাংশে নির্ভরশীল। আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৮৫ ভাগ লোক নিরক্ষর। বয়স্ক শিক্ষার সংকীর্ণতা শিশুশিক্ষার পশ্চাৎপদতার জন্য নিশ্চয়ই কিছু পরিমানে দায়ী। তা ছাড়া সমাজ চেতনারও অভাব রয়েছে। শিশু শিক্ষার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আজও অধিকাংশ লোক সচেতন নয়। অনেকেই শিশুকে অতি লালন করতে অভ্যস্ত। তাই অল্প বয়সের শিশুকে স্কুলে পাঠাতে তাঁরা নারাজ। অনেকে আবার আনন্দ ও খেলার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার মর্মকথাই বুঝতে অক্ষম। কোন কোন পিতামাতা কড়া শাসনকেই শিক্ষার অঙ্গ রূপে মনে করেন। আবার পুরাতন পন্থী বাপ মায়ের বিবেচনায় হাতেখড়ির আগে স্কুলে যাওয়া নাস্তিকতার সামিল।

কিন্তু সামাজিক সচেতনতা আপন গতিতে যেমন ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়, তেমনি সংগঠিত প্রচেষ্টার সাহায্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ত্বরান্বিতও করা যায়। এদিক থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু তেমন প্রতিষ্ঠানেরও অভাব আমাদের রয়েছে। যেসব "শিশুদরদী" প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রচার মাঝে মাঝে শোনা যায়, তাদেরও প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

তবে ভরসার কথা যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী চেতনাও ইদানীং বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টই তার প্রমাণ। এই রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্য ও সুঅভ্যাস গঠন করা, দেহযন্ত্রের উন্নতি সাধন করা, পোশাক পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করা, পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে যৌথ সামাজিক আচরণ, সুস্থ প্রক্ষোভ জীবন এবং সৌন্দর্যবোধ উদ্বুদ্ধ করা, সুস্থ অঙ্গ সঞ্চালন এবং বাচনশক্তি আয়ত্ত করা, পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহল জাগানো এবং সৃজনশীল খেলার মাধ্যমে আত্মবিকাশে সহায়তা করাই হবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আগামী কুড়ি বছরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা উপস্থিত করে ১৯৮৫ সনের মধ্যে লক্ষ্য রূপে সুপারিশ করা হয়েছে (ক) ৩—৫ বছর বয়সের শিশুদের অন্ততঃ শতকরা ৫ জনকে শিশু শিক্ষালয়ে ভর্তি করা (এই পাঁচ শতাংশের সংখ্যা হবে ২৫ লক্ষ।) (খ) ৫—৭ বছর বয়সের শিশুদের অন্ততঃ অর্দ্ধেককে ইনফ্যাণ্ট স্তরে ভর্তি করা। (এই সংখ্যা হবে ৭৫ লক্ষ)। সুতরাং ১৯৮৫ সনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পাঠরত শিশুর সংখ্যা হবে এক কোটি। সম্ভাব্য শিশু সংখ্যার তুলনায় বিঘোষিত এই লক্ষ্য এমন বিরাট কিছুই নয়। তবু এই সাফল্য অর্জন করতে পারলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধন্য।

কোঠারি কমিশন স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং ব্যাপক শিক্ষণ পরিকল্পনারও সুপারিশ করেন। কিন্তু এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আর্থিক দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি। সরকারী অনুদান এবং সাহায্যের ভিত্তিতে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান, গণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কৃষি সংগঠন, এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। তাই অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

বস্তুতঃ আমাদের দেশে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা খুব সহজ-সাধ্য নয়, কারণ এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে অনেক। সাধারণ সমস্যাগুলি

উল্লেখ করতে গেলে বলতে হবে প্রথমতঃ উপযুক্ত জমি ও পরিবেশ যোগানোর সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত বাড়ীঘর, তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহের সমস্যা। তারপরেই উল্লেখ্য হলো সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উদ্ধার করে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত বিস্তার। এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিত্তশালী অংশের ফ্যাসানে পর্যবসিত না হয়ে, সমাজের যে অংশের মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, সেই নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রমজীবি জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মূল কথা হলো আরও বহু সংখ্যক শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমস্যা। এই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু সংখ্যক শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং তাঁদের শিক্ষণের সমস্যা। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষণের সুযোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত নগণ্য। স্বল্প সংখ্যক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে ওখানে ছড়ানো, আর অস্থায়ীভাবে মন্তেসরি শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের কথা। এখানে কে জি. পদ্ধতিতে শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কেবল-মাত্র গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে। প্রাক-বুনিয়াদি শিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতার—বাল সেবিকা শিক্ষণ প্রকল্প। বিগত ছয় বছরে এখানে ট্রেনিং পেয়েছেন মাত্র ২৪০ জন শিক্ষিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁরাও অনেকে উপযুক্ত চাকুরী পাচ্ছেন না। সুতরাং শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষিকার চাকুরীর স্থায়িত্ব, আকর্ষনীয় সর্তাবলী এবং উপযুক্ত বেতনক্রম নির্দ্ধারণের সমস্যা। তাছাড়া শিশুর গৃহের কাছেই স্কুল প্রতিষ্ঠা কিম্বা উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা, শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পুষ্টিকর স্কুল টিফিন সরবরাহের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান হলে উপরোক্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধানও সহজ-সাধ্য হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জন-চেতনা জাগ্রত করার সমস্যা, দ্বিতীয়টি উপযুক্ত উদ্যোগ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা, এবং তৃতীয়টি সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে প্রচুর অর্থ যোগানের সমস্যা।

শহরাঞ্চলের বিশেষ সমস্যা

সমস্যার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে আবার তারতম্য আছে। শহরে স্কুলের জন্য উপযুক্ত জমি ও প্রশস্ত বাড়ী সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। শহরাঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ

হওয়ায় ফলে অল্প এলাকার মধ্যেই বহু সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে বস্তি অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার। শহরাঞ্চলে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের বিশেষ সমস্যা রয়েছে। কর্মরত মায়েদের কাজের সময় নির্ঘণ্ট অনুসারে স্কুল পরিচালনার সমস্যা আছে। ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য থেকে শিশুদের রক্ষা করে পুষ্টিকর এবং খাদ্যপ্রাণ সম্পন্ন খাদ্য বিতরণের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। অসামাজিক প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য।

কিন্তু শহরাঞ্চলে বিশেষ সমস্যাও যেমন আছে, সুবিধেও তেমনি আছে। এখানে সাধারণভাবে নাগরিকদের সচেতনতা বেশী, সঙ্গতি ও সাচ্ছন্দ্যও বেশী, উপকরণ সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ, শিক্ষিকা সংগ্রহ করাও সহজ, অর্থ-বিনিয়োগের সম্ভাবনাও বেশী। তা ছাড়া শিশু-চিকিৎসক, শিশু মনঃস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত সহায়তা লাভও সহজতর। শহরাঞ্চলে শিশুদের আমোদ প্রমোদের সুযোগ, চিড়িয়াখানা, প্রদর্শনী এবং দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ কিম্বা স্কুলে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুযোগও বেশী। শহরে এমনিতেই নানা ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বৎসর কিছু না কিছু কাজ করে, এবং পৌর-সংস্থাগুলিও অপেক্ষাকৃত বেশী সংগঠিত। কলকারখানা এবং অফিসের মালিকদের মাধ্যমে স্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও শহরে বেশী।

গ্রামাঞ্চলের বিশেষ সমস্যা

অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে জমি পাওয়া গেলেও উপযুক্ত ঘরবাড়ী তৈরীর সমস্যা রয়েছে। গ্রামাঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ না হওয়ায় প্রতি শিশুর বাড়ীর কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে যানবাহনের সমস্যাটিই অন্যভাবে দেখা দেয়। ঝড়জল রোদবৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত পথে পায় হাঁটা দীর্ঘপথে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আসতে হবে। গ্রামের শিশুদের ক্ষেত্রে পরিধেয় যোগানের সমস্যা, চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সহায়তা সংগ্রহের সমস্যা, শিক্ষিকা সংগ্রহ ও শিক্ষণের সমস্যা, প্রয়োজনীয় আমোদ প্রমোদ খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ যোগানোর সমস্যাও বেশী তীব্র। গ্রামীণ পৌরসংস্থা কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান-গুলিও তেমন কর্মতৎপর নয়। সর্বোপরি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীর আর্থিক সঙ্গতি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, পিতামাতার নিরক্ষরতা অনেক বেশী, এবং সাধারণ শিক্ষার অনগ্রসরতার ফলে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতাও অল্প।

এই অসুবিধাগুলির বিপরীতে গ্রামাঞ্চলে আবার বিশেষ কতগুলি সুবিধাও আছে। স্কুলের জন্য জমির যোগান এখানে সহজতর। তাছাড়া প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে, প্রত্যক্ষ স্পর্শে এবং আলো হাওয়ার প্রাচুর্যে শিশুদের আনন্দ যেমন সহজলভ্য, মুক্ত খেলার সুযোগ যেমন বেশী, শারীরিক স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি খাদ্যে অপুষ্টিজনিত ক্ষয়ের সম্ভাবনা কম। তাছাড়া গ্রামীণ সামাজিক জীবন অপেক্ষাকৃত সুসংহত। গ্রামীণ মানুষের মানসিকতাও অপেক্ষাকৃত উদার। গ্রামীণ পরিবেশে অসামাজিক প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করাও অনেক সোজা।

সমস্যা সমাধানের পথ

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাম ও সহরকে পৃথক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। উভয়ের মধ্যে সুবিধে অসুবিধের হেরফের থাকলেও সমস্যাটি সামগ্রিক এবং জাতীয় সমস্যা। সুতরাং সমাধানের চিন্তা ও পরিকল্পনাও সামগ্রিকভাবেই করতে হবে। এই সূত্রে প্রথমেই বলা দরকার যে সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে শিশুশিক্ষার উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু শিক্ষালয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্, পরিকল্পনাকারী এবং প্রশাসকদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় এবং আস্থা প্রয়োজন। শিশুদের প্রতি কেবল মৌখিক দরদ এবং সভাসমিতিতে বাগাড়ম্বর তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল। নিজেদের স্থির বিশ্বাস নিয়ে জনসাধারণের সুস্থ চেতনা এবং স্থির বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সরকারী বেসরকারী সকলরকম প্রণালী পদ্ধতি সংগঠন ও প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার অভিযান দরকার। এক্ষেত্রে রেডিও, সংবাদপত্র, সিনেমা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ভূমিকা আছে শিক্ষক সংগঠন, বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রমোদ সংগঠন, শিশু দরদী প্রতিষ্ঠান এবং মাতৃ সংগঠনের। তাছাড়া শিশুশিক্ষার কাজে প্রমোদ সংস্থা, সিনেমা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহন সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষ সাহায্যও করতে পারেন। গণপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন জনবসতি অঞ্চলে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও ক্ষেতমজুর এবং সহরে শ্রমজীবিদের বস্তি অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। "প্রতি শত শিশুর জন্য একটি বিদ্যালয়"—এই-ই হওয়া উচিত লক্ষ্য ও প্রতিজ্ঞা।

শহরাঞ্চলে হয় ছেলেমেয়ের পায়ে হাঁটবার সামর্থ্যের মধ্যে স্কুল স্থাপন করতে হবে, নইলে প্রত্যেকের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলটি হওয়া চাই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, সকলের বাড়ী থেকে সমদূরত্বে। সকল শিশুবিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক টিফিন, দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দায়িত্বও অভিভাবকের ব্যক্তিগত না হয়ে প্রতিষ্ঠানিক হওয়া উচিত, অর্থাৎ বিদ্যালয় থেকেই সব শিশুর জন্য সমভাবে পুষ্টিকর আহার্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। এজন্য শিশুদরদী প্রতিষ্ঠান, সেবা সংগঠন, মাতৃসংগঠন, চিকিৎসক সংগঠন এবং সরকারের যৌথ উদ্যম চাই।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মুনাফা শিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিতাড়ন প্রয়োজন। সুতরাং সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য নাগরিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কলকারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি খামারের মালিকদের আইনের সাহায্যে বাধ্য করা উচিত নিজ নিজ কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারী এবং পূর্বালোচিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তেমনি বেসরকারী উদ্যমও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নাকচ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি বাড়ী আসবাব ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ করা, শিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষিকা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, প্রতিটি বিদ্যালয়ের লাইসেন্স গ্রহণ করা এবং শিক্ষিকাদের বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধে সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি বিধিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে আইন পাশ করা দরকার। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতনের সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ সুবিধা এবং মানগত পার্থক্য হ্রাস পায়। এজন্য সকল ধরনের বিদ্যালয়কেই সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীন করা প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী সকল বিদ্যালয়ের জন্য অভিভাবিকা ও স্থানীয় চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠন করা দরকার।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণের ভারতীয়করণের জন্য যথোপযুক্ত গবেষণার প্রয়োজন আছে। এইসব উপকরণ উৎপাদনের

জন্য সরকারী কিম্বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তা হলেই বিনামূল্যে, কিম্বা নাম মাত্র মূল্যে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গ্রামের জন্য গ্রাম থেকে শিক্ষিকা সংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু গ্রাম ও সহরের সকল শিক্ষিকার শিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বৎসরে অন্ততঃ দুই-দল শিক্ষিকার ট্রেনিং সম্ভব। কিন্তু দুইটি দলেই শিক্ষিকার সংখ্যা হওয়া উচিত সীমায়িত। কোন্ পদ্ধতি অথবা কোন্ কোন্ পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশে সর্বোত্তম শিশুশিক্ষা সম্ভব এবং তার জন্য কি কি সরঞ্জাম প্রয়োজন—এ সম্বন্ধেও শিশুশিক্ষাবিদ্‌দের স্থির সিদ্ধান্ত করে দেওয়া দরকার।

শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, এবং শিক্ষিকাদের সংগঠিত যৌথ উদ্যোগ এবং উত্তম প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক এবং শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র দরকার। শিশুশিক্ষার সমান্তরালরূপে দরকার পিতামাতার শিক্ষা এবং মাতৃমঙ্গল।

সরকারী বরাদ্দ, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ, শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ, জনসেবা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ প্রভৃতি সূত্র থেকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ সম্ভব। ভবিষ্যতে অবৈতনিক ও সর্বজনীন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তার জন্যে এখনই এই স্তরের শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা বাজেটের অংশরূপে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে নিয়মিত অর্থবরাদ্দ করা প্রয়োজন। এই অর্থ বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধিই হবে লক্ষ্য। সর্বোপরি কেন্দ্রীয়, রাজ্য, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে উদ্যোগগ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন করা দরকার। এই ভাবে সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

১। শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the important characteristics of infancy.)

(৩—১৪ পৃষ্ঠা)

২। শৈশবকালের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the importance of early years in man's life.)

(৬—১৬ পৃষ্ঠা)

৩। শিশুশিক্ষা ও নির্দেশনার প্রয়োজন আলোচনা কর।

(Discuss the necessity of infant education and guidance.)

(১৫—১৯ পৃষ্ঠা)

৪। "জীবনের অন্য যে কোন স্তর অপেক্ষা শিক্ষাগত কারণে শৈশবের স্তরই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।" আলোচনা কর।

("The Nursery School stage is educationally more important in the life of the child than any other period of life." Discuss.)

(* এই প্রশ্নের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের সমন্বয় রয়েছে।)

৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ এবং এই ক্ষেত্রে মহৎ শিক্ষাগুরুদের অবদান আলোচনা কর।

(Trace the growth of the consciousness in favour of Pre-Primary education, and estimate the contributions of Great Educators in this respect.) (১৯—২১ পৃষ্ঠা)

৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরির অভিমত এবং নীতি সম্বন্ধে টীকা লেখ।

(Write a note on the viewpoints and principles enunciated by Froebel and Montessori in the field of Pre-Primary education.)

(২৩—২৫ পৃষ্ঠা)

৭। (ক) অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে এবং (খ) ভারতবর্ষে নার্সারী স্কুল আন্দোলনের ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

(Trace the development of Nursery School movement in (a) other progressive countries, and (b) in India.) (২৭—৩৫ পৃষ্ঠা)

৮। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা পর্যায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর এবং ক্রেস্ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(Analyse the different phases of Pre-Primary education and the nature of the respective institutions and add a note on the Creche.) (৩৫-৪৭ পৃষ্ঠা)

৯। নার্সারী স্কুলের উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রম আলোচনা কর।

(Discuss the aims and curriculum of the Nursery School.) (৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

১০। নার্সারী স্কুলের জন্য একটি ভাল সময় নির্ঘণ্ট প্রস্তুত কর।

(Make a plan of a good time table for a Nursery School.) (৩৯ পৃষ্ঠা)

১১। নার্সারী স্কুলের উপকরণ ও সরঞ্জাম, বিশেষতঃ জমি বাড়ী, আসবাব এবং খেলার জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(Make a list of Nursery School equipment, specially land, building, furniture and playthings and explain their significance') (৪০ পৃষ্ঠা)

১২। নার্সারী-স্কুল শিশুদের খাদ্য, পোশাক এবং স্কুল-পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the necessity and quality of food and dress of the Nursery School children, and also the school environment.) (৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

১৩। ফ্রয়েবলের অভিমত উল্লেখ করে কে, জি,—ইনফ্যাণ্ট স্কুলের উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম আলোচনা কর এবং ঐ সূত্রে মন্তেসরির অভিমতও উল্লেখ কর।

(Discuss, with special reference to the viewpoint of Froebel, the aims and curriculum of K G-Infant School, and in this connection make a reference to the viewpoint of Montessori.) (৪২-৪৫পৃষ্ঠা)

১৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the methods of Pre-Primary education. (৪৮-৬৪পৃষ্ঠা)

১৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ফ্রয়েবল এবং মন্তেসরির পদ্ধতি সম্বন্ধে টীকা লেখ।

(Write a note on the methods proposed by Froebel and Montessori for Pre-Primary education.) (৪৮-৬২পৃষ্ঠা)

১৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় খেলার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the importance of Play in Pre-Primary Education.)

or

'Nursery Schools and Kindergartens in Western countries are called Play-Schools, with provisions for incidental learning of the 3Rs.' Discuss the character of such schools and the significance of the term Play." (৬৪-৬৭পৃষ্ঠা)

১৭। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় (ক) ছড়া, (খ) গান ও নাচ, (গ) গল্প প্রভৃতির গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the importance of (a) Rhyms, (b) Music and dance, (c) Story telling etc. in Pre-Primry education.) (৬২-৬৪পৃষ্ঠা)

১৮। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উন্নতি এবং শিশুদের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা এবং অভীক্ষার প্রকৃতি নির্ণয় কর।

(Discuss the nature of tests and examinations for evaluation and promotion of education at the Pre Primary stage.) ৬৮-৬৯পৃষ্ঠা)

১৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুদের অপসঙ্গতি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং সমাধান আলোচনা কর।

(Discuss the problem of maladjustment and mental disorder of children at the Pre-Primary school stage and suggest remedies,) (৬৯-৭৩পৃষ্ঠা)

২০। নার্সারী স্কুল শিক্ষিকার আবশ্যিক এবং আকাঙ্খিত গুণাবলী আলোচনা কর।

(Write a note on the essential and desirable qualities of the Nursery School teacher.) (৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

২১। নার্সারী ও ইনফ্যাণ্ট স্কুলের রকমভেদ এবং সংগঠন আলোচনা কর।

(Discuss the types and organisation of Nursery and Infant Schools.) (৪৫-৪৭পৃষ্ঠা

২২। বর্তমানে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

(Give an account of the present state of Pre-Primary education in the other progressive countries.) (৭৭-৮১পৃষ্ঠা)

২৩। বর্তমান ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বিবৃত কর।

(Give an account of the present state of Pre-Primary education in India, specially West Bengal,) (৮১-৮৭ পৃষ্ঠা)

২৪। অন্যান্য দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সাথে ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার তুলনা কর।

(Make a comparison between Pre-Primary education in India and the same in other countries.)

(আগেকার দু'টি প্রশ্নের আলোচনাকে এখানে সমন্বয় করতে হবে।)

২৫। আমাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি নির্দেশ কর।

(Point out the defects in our Pre-Primary education.)

(৮৩-৮৭ পৃষ্ঠা)

২৬। ভারতের বিভিন্ন শহরে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে অনেক নার্সারী স্কুল ও কে.জি. গড়ে উঠেছে। এই সব স্কুলের জনপ্রিয়তার কারণ কি? এদের প্রয়োজন আছে কি? এই সব স্কুলের অস্তিত্ব তুমি সমর্থন কর কি এবং কেন?

(There has been a growth of Nursery Schools and Kindergartens in the urban areas of India, specially West Bengal, Explain the causes of their popularity. Discuss their utility, Can you justify their existence ? If so, why ?) (৮৭-৮৮পৃষ্ঠা

২৭। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ নির্দেশ কর।

(Find out the causes of our backwardness in the field of Pre-Primary Education.) (৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

২৮। (ক) সামাজিক চেতনা, (খ) পিতামাতার মনোভাব, (গ) শিক্ষণ-প্রাপ্তা শিক্ষিকা সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নার্সারী ও শিশু শিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা কর। সহর ও গ্রামের (বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে) বিশেষত্ব মূলক সমস্যাগুলি নির্দেশ কর।

(Discuss the problems of Nursery School and Infant Education with special reference to (a) social consciousness, (b) attitude of parents, (c) properly trained teachers. Find out the

special problems of (i) urban and (ii) rural areas, particularly of West Bengal.) (৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

২৯। প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তোমার অভিমত জ্ঞাপন কর।

(Offer your suggestions for the solution of the problems of Pre Primary education.) (৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা)

৩০। ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে টীকা লেখ।

(Write a note on the future plans of Pre-Primary education in India.) (৯০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা

নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন কিম্বা ইনফ্যাণ্ট স্কুলের পরে শিশুরা ভর্তি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই সময় থেকেই তাদের নিয়মমাফিক এবং রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হয়। এই স্তরের বয়ঃসীমা সাধারণতঃ ৬ কিম্বা ৭ বৎসর থেকে (বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম রয়েছে) ১১ বৎসর পর্যন্ত। অর্থাৎ জীবনের বাল্যকালটিই প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল। সুতরাং বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব আগে আলোচনা করা দরকার।

বাল্যজীবনের বৈশিষ্ট্য

শৈশব অতিক্রান্ত হলে কয়েক বছর পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি হয় অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে। ৬ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত উচ্চতা বাড়ে দ্রুত এবং সমহারে। তারপর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৯ বছর বয়সে বৃদ্ধির গতি কমে যায়। ঐ বয়সে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ওজনও বেড়ে চলে। ওজনের বেলায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং ছেলেদের ১১ বছর বয়সে বৃদ্ধির হার কমে যায়। দৈহিক বৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষমতাও বেড়ে যায়, নানা ধরনের কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

এই বয়সে মানসিক বিকাশের ধারাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সমবয়সীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং দলগত চেতনা বৃদ্ধি পায়। দলগত জীবনের টানে শিশু হয়তো এমন অনেক সু এবং কুকাজ করতে পারে যা সে একা করতে পারতোনা। দলের নীতিবোধ ব্যক্তিশিশুর নৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। শিশু তখন হয়ে ওঠে বহির্মুখী এবং পরিবেশ সচেতন। দুঃসাহসিকতার রোমাঞ্চ অনেক সময় শিশুকে পেয়ে বসে। বাস্তব জড়জগৎ সম্বন্ধে সে অনেক বেশী সচেতন হয়। সাধারণ মানুষ এবং তার কর্মধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। তার ফলে মানবপ্রীতি দেখা দেয়। অপরদিকে দৈহিক বৃদ্ধি ও দলচেতনার প্রভাবে খেলাধূলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়, বীর-পূজা সুরু করে, সাধারণ আনন্দ উৎসবে শিশু মেতে ওঠে। মানসিকতার

জগতে শুধু বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তার বদলে বিমূর্ত চিন্তার সূচনা হয়। স্থান ও সময় চেতনা ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধে।

এইসব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার রূপ, প্রকৃতি এবং সমস্যাগুলি আলোচনা করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষা চেতনার বিবর্তন

এইসূত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য যে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও বিবর্তনশীল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দানখয়রাতের মনোভাবই ছিল প্রবল। দরিদ্রের জন্য দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ছিল তদানীন্তন রীতি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারনার পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। কিন্তু তখনও ভবিষ্যৎ জীবন ও শিক্ষার ভিত্তিরূপে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিবেচনা না করে দরিদ্রের জন্য কিঞ্চিৎ প্রারম্ভিক শিক্ষা (elementary) রূপেই একে বিচার করা হয়েছে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে চেতনার জগতে আমূল পরিবর্তন আসে। গণতন্ত্রের যুগে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সুসংবদ্ধ সর্বজনীন শিক্ষার যে চেতনা রূপ পেতে থাকে, তারই প্রভাবে ভবিষ্যৎ শিক্ষার সূচনা রূপে "প্রাথমিক শিক্ষা" চেতনা সংগঠিত হয়। এই চেতনা বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং শিল্পবিজ্ঞানের বর্তমান যুগে আরও সম্প্রসারিত এবং সুসংবদ্ধ হয়েছে। আজ আর এমন চেতনার স্থান নেই যে সাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং ভাগ্যবানের জন্য উচ্চশিক্ষা, অথবা সাধারণের জন্য মাতৃভাষা এবং ভাগ্যবানদের জন্য বিদেশী ভাষা, কিম্বা সাধারণের জন্য বৈচিত্র্যহীন শিক্ষা এবং ভাগ্যবানদের জন্য বহুমুখী শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা আজ সর্বসাধারণের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃতি আজ যে কোন দেশের প্রগতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিকতার অন্যতম নিদর্শন। পরন্তু আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে পার্থক্যমূলক শিক্ষা-সুযোগের বদলে সকলের জন্য সমব্যবস্থা তথা 'কমন-স্কুল' প্রথার আদর্শও আজ ব্যাপকভাবে গৃহীত। চেতনাজগতে এই বিবর্তনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার রূপ ও আদর্শ, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি আলোচনার সময় বাল্যকালের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথমেই উপস্থাপিত অংশটি মনে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এই সাধারণ বিচার ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বিশেষ পরিবেশ ও প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ফরাসী দেশের চেতনায় অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে সত্যের সংরক্ষণ, বিচারশক্তির দৃঢ়করণ এবং পরিচ্ছন্ন বিবেকবোধ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। **জার্মানীতে** নীতিবোধ, সমাজচেতনা, ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং নাগরিক চেতনার প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। **ইংলণ্ডে** গুরুত্ব পেয়েছে স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, সুস্থ অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রগঠনের আদর্শ। **রাশিয়াতে** বলা হয়েছে বর্তমান জীবন সম্বন্ধে বাস্তবচেতনা সম্পন্ন, শক্তিমান, কর্মঠ, সংগ্রামী ও সমাজমুখী মানুষ গড়বার প্রারম্ভিক সূচনার কথা। **আমেরিকায়** প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শকে অনেক সময় "skill objective" রূপে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। বস্তুতঃ লেখা, পড়া ও প্রাথমিক গণিতে মৌলিক দক্ষতা এবং দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি আরোপিত গুরুত্ব থেকেই ঐ নামকরণ হয়েছে। অবশ্য এই সঙ্গে প্রকৃতি সম্পর্কে কমনীয় অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, সহানুভূতি ও ন্যায়বোধ, ভালবাসা ও সমাজবোধের আদর্শও স্থান পেয়েছে। সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতার কথা বিশেষ জোর দিয়েই বলা হয়।

আমাদের দেশে ইংরেজ যুগের আগে পাঠশালার মাধ্যমে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল তার কোন বিঘোষিত আদর্শ না থাকলেও ব্যবহারিক ফলাফলের বিচারে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে লেখাপড়া হিসেব নিকেশের যে প্রয়োজন ছিল, চিরাচরিত পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতি অনুসরণ করে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করাই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। তারপর ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে পুরাতন প্রাথমিক শিক্ষা ভেঙে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীনতাই প্রকট হয়ে ওঠে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পরে নূতন ধরণের আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে ওঠে। পুরাতন

যুগের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়, অথচ নূতন কোন উদ্দেশ্যও ঘোষিত হয়না। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষাও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। গান্ধিজী এই পরিস্থিতি থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ প্রচার করেন। সমাজচেতনা সম্পন্ন, উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ গড়বার ভিত্তিরূপেই বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণিত হয়। সর্বশেষে কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষাজীবনের মৌল ভিত্তি রচনা এবং দায়িত্বশীল ও উপযোগী নাগরিক সৃষ্টির সূচনাকেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন দেশে প্রচলিত উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নদিকে গুরুত্বের তারতম্য রয়েছে সত্য, কিন্তু মৌলিক পার্থক্য কিম্বা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভাবধারা নেই। সুতরাং সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি সাধারণ সূত্রে (common features) পৌঁছতে পারি। দৈহিক সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি নিশ্চিত করা; চলতি দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় এবং সমাজ-মুখীনতা সৃষ্টি করা; ব্যক্তিগত পারদর্শিতা এবং কর্মঠতা বৃদ্ধি করা; স্বভাবজাত ক্ষমতা ও সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করে মৌলিক দক্ষতা নিশ্চিত করা; মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্থ অনুভূতি জাগ্রত করা; সমাজীকরণ ও চরিত্রগঠন; ব্যবহারিক পন্থায় নাগরিক চেতনার উদ্রেক করা; সুস্থ কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তির ভিত্তি স্থাপন করা এবং উচ্চতর শিক্ষার মৌলিক হাতিয়াররূপে লেখাপড়া ও গণিতে সুদৃঢ় দক্ষতা সৃষ্টি করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে **আলোচিত উদ্দেশ্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা কিম্বা মানসিক শৃঙ্খলার কোন উল্লেখ নেই**। তা ছাড়া বুদ্ধির তারতম্য কিম্বা ব্যক্তিবৈষম্যের ভিত্তিতে বিভিন্নমুখী শিক্ষা কিম্বা সমাজের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কথাও নেই। বস্তুতঃ প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার সকল শিশুর জন্মগত মৌলিক অধিকার বলে আজ সকল প্রগতিশীল দেশে স্বীকৃত। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রভাবে 'Common-School' চেতনাও ক্রমবর্দ্ধমান। প্রাথমিক স্তরের সকল শিশুর জন্য সমভাবে সুযোগ-সুবিধা এবং কল্যাণ ব্যবস্থার নীতিও আজ স্বীকৃত। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ও দায়িত্বে, সকলের জন্য সমসুযোগসম্পন্ন 'Common School' ভিত্তিতে,

সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই আজ প্রগতিশীলতার লক্ষণ।

এই সূত্রে আরও উল্লেখ্য যে পুঁথিগত বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার আলোচিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। প্রাণচঞ্চল শিশুর কর্মচাঞ্চল্যকে অবলম্বন করেই মৌলিক দক্ষতা ও পারদর্শিতা, স্বাস্থ্য ও নীতিবোধ, সামাজিকতা, নাগরিকতা এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র, শিশুর স্বাধীনতা এবং কর্মপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ। **বস্তুতঃ প্রাথমিক শিক্ষা হবে মূলতঃ কর্মভিত্তিক, শিশু কেন্দ্রিক এবং জীবন কেন্দ্রিক।**

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার স্বরূপ

"শিশুকেন্দ্রিক" ও "জীবনকেন্দ্রিক" কথা দুটির একটু ব্যাখা প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু, শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় এবং স্কুল—এই চারটি মৌল উপাদানের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষণীয় পাঠ্যক্রমের প্রাধান্যই ছিল প্রাচীনপন্থী শিক্ষাচেতনার বৈশিষ্ট্য। জন্মগত পাপের বোঝা নিয়েই শিশু জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং নিয়মনিষ্ঠ এবং কঠোর শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুকে পাপমুক্ত করাই শিক্ষার মূল কথা, এই ছিল পুরানো ধারনা। তাই বিদ্যালয় ছিল শিশুর কাছে কারাগারের মত।

শিশুর স্বকীয়তার দাবী নিয়ে এই **প্রাচীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন রুশো।** তিনি বলেন সহজাত প্রবণতা ও সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত শক্তি ও প্রবণতাই শিশুর প্রকৃতি। কলংকমুক্ত পরিবেশে নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে শিশুর সম্ভাবনা বিকশিত হয়। সুতরাং অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় সক্রিয় কর্মদ্যোগ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের পথেই শিশুর আত্মবিকাশ ঘটে। শিশু প্রকৃতির প্রতি এই গুরুত্ব আরোপের মধ্যেই রয়েছে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাচেতনার সূচনা। শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়ে **পেস্তালোৎসি** এই চেতনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেন। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকার ভালবাসার পরিবেশে স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানসঞ্চয়ের পথে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা বলেন। তারপর **হার্বার্ট ও ফ্রোয়েবলের** চেষ্টায় এই চেতনা আরও সুগঠিত হয়। পরিশেষে

বিংশ শতাব্দীতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। ফলিত মনোবিজ্ঞানের উন্নতি, শিশু-অভীক্ষা আন্দোলন প্রভৃতিও স্বীকৃতির পথকে সুগম করে দেয়। বর্তমান শতাব্দীতে ডালটন, মন্তেসরি, গ্যারী, প্রোজেক্ট, উইনেটকা, বাটাভিয়া, ডেক্রলি প্রভৃতি যত ধরনের শিক্ষা প্রণালী ও পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তার সবই মূলতঃ শিশুকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পরিকল্পিত।

শিশুকেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে দুইটি স্বীকৃতি—প্রথমতঃ শিশু হলো প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনাপূর্ণ ক্রমবর্দ্ধমান একটি জীবন্ত সত্তা ; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা হলো আত্মবিকাশ এবং আত্মোন্নতির একটি স্বাভাবিক ধারা। সুতরাং শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুই হবে কেন্দ্রস্থ নায়ক এবং অন্যান্য উপাদান ও প্রণালীকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে।

সুতরাং শিশুকেন্দ্রিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—

(ক) সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিশুর ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ,

(খ) বিমূর্ত পুঁথিগত ও যুক্তিশীল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তে শিশুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং আত্মপ্রকাশের সহায়ক রূপে বিচিত্র, আকর্ষনীয় এবং ব্যাপক পাঠ্যক্রম,

(গ) তার্কিক পদ্ধতির পরিবর্তে শিশুর আগ্রহ, প্রেরণা এবং সক্রিয়তার ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি,

(ঘ) বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্যান্য মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বাধাহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ,

(ঙ) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং খেলার ছলে শিক্ষার আবহাওয়া,

(চ) মুক্ত এবং স্বভাবজাত শৃঙ্খলা,

(ছ) ঘনিষ্টতম শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, যেখানে শিক্ষক হবেন শিশুর সুস্থ অভিজ্ঞতার সংগঠক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

(জ) বিদ্যালয় হবে গৃহের সমতুল্য এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নততর ক্ষুদ্র সংস্করণ, যেখানে শিশু তার বাস্তব জীবন নাট্যের নায়ক রূপে কর্মব্যস্ত থাকবে।

শিশু-কেন্দ্রিকতার এই আদর্শও বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে এসেছে। শিশু প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে প্রথমাবস্থায় এককভাবে এবং বিচ্ছিন্নরূপে ব্যক্তি শিশুর স্বকীয়তাকেই বিচার করা হয়েছিল। পেস্তালোৎসি বলেছিলেন যে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশই শিক্ষা। ফ্রোয়েবলও বলেছিলেন

যে আত্মসক্রিয়তার পথে আত্ম-উন্মেষণই শিক্ষা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর চেতনায় পরিবেশকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজ পরিবেশে ও প্রক্রিয়ার ধারায় আত্মবিকাশকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিতে জীবন বিকাশের চেতনাই আধুনিক চেতনা। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবন পরিক্রমায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া এই ধরনের আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুর নিজস্ব সামাজিক জগতে মুক্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রণালী ও পদ্ধতিকে। তাই যদি হয়, তবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকেনা। বয়স্কদের অভিজ্ঞতার বদলে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জীবনধারার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রণালী সংগঠিত হলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বস্তুতঃ শিশুকেন্দ্রিক ও জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার চেতনা প্রগতিশীল শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জীববিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের সমর্থন পুষ্ট। এই নীতি অনুসারেই আজ পাঠ্যক্রম রচনা এবং পাঠপদ্ধতি পরিকল্পিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

বিদ্যালয় সংগঠন

প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করবো প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠনের কথা। সাধারনতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় ৬ কিম্বা ৭ বছর বয়সে। প্রাথমিক স্তরের দৈর্ঘ রয়েছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। অবশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রমের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা অনুসারেই শিক্ষাকালের দৈর্ঘ নির্ণিত হয়। তবে সাধারণভাবে একথা সর্ববাদীসম্মত যে চার বছরের কম সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হতে পারেনা। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে এই স্তরটি চার বছরের। আমেরিকায় বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, কোথাও ৬ বছর, কোথাও বা ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত।

আমাদের দেশে চিরাচরিত ব্যবস্থা ছিল ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু মুদালিয়ার কমিশন সুপারিশ করেন ৫ বছরের দৈর্ঘ। সেই অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তর বলে প্রচলন করা হয়েছে।

কিন্তু ৪ বছরের শিক্ষাও কোন কোন অঞ্চলে চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবিষয়ে অন্যতম উদাহরণ। এখানে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলই এখনও চার বছরের।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে একটানা আট বছরের শিক্ষাকেই, অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই প্রাথমিক স্তর রূপে বিবেচনা করতে হবে বলে কোঠারী কমিশন অভিমত দিয়েছেন। এই স্তরের শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স হবে ১৪ বছর, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক শিক্ষার সমগ্র স্তরটিই প্রাথমিক স্তর রূপে বিচার করতে হবে। অবশ্য কমিশন এই সময়টিকে ৫ বছর এবং ৩ বছরে বিভক্ত করে পরস্পর সংযুক্ত নিম্ন-প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায়রূপে বিবেচনা করবার সুপারিশ করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটি একদিকে ইনফ্যাণ্ট-কেজি প্রমুখ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। নিয়মিত শিক্ষাজীবনে প্রবেশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরে যে প্রস্তুতি পর্ব চলে, সেই ভিত্তিতেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটি সার্থক হয়ে ওঠে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষাই সমগ্র শিক্ষাজীবনের প্রকৃত সোপান রচনা করে। আধুনিক চেতনায় সমস্ত শিক্ষাজীবনকেই একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে মনে করা হয়। তবে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সম্পূর্ণ ধারাটিকে তিনটি পরস্পর সংযুক্ত ধাপ রূপে সংগঠন করা হয়ে থাকে। তাই বর্তমান কালে "এলিমেণ্টারী" কথাটির বদলে "প্রাইমারী" কথাটিই সাধারনতঃ ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণী কয়টিকে যে কোন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে "প্রাথমিক বিভাগ" হিসেবেও যুক্ত করা চলে, আবার সম্পূর্ণ পৃথক "প্রাথমিক বিদ্যালয়" হিসেবেও পরিশাসন করা চলে। স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয় রূপে পরিচালনার দিকে ঝোঁক কোন কোন দেশে বেশী। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের পথে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার যৌক্তিকতাও আজ ব্যাপকভাবে আলোচিত। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা দাবি করেন, তাঁরাও কিন্তু বাইরের কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে বলেছেন। তবে বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। আমেরিকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে বহিঃপরীক্ষার সীমারেখা নেই। সেখানে শ্রেণীর প্রমোশনেও 'গ্রেড ক্রেডিট' ব্যবস্থা প্রচলিত। রাশিয়াতে চতুর্থ শ্রেণীর শেষে "ট্রান্সফার পরীক্ষার" প্রথা রয়েছে। তবে এই পরীক্ষা মূলতঃ মৌখিক এবং

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে পরিদর্শন বিভাগের প্রতিনিধিকে যুক্ত করে গঠিত হয় পরীক্ষা বোর্ড। ইংলণ্ডের ভলাণ্টারী স্কুল সমূহে এই ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সরকারী (এল, ই, এ) স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে, (এগার বছর বয়সে) প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফলের ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য ছাত্র নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডেও নানাধরনের মত বৈষম্য রয়েছে।

আমাদের দেশে এ সম্পর্কে কোন সর্বভারতীয় নীতি কিম্বা বিধান নেই। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রথা প্রচলিত। **পশ্চিমবঙ্গে সরকারী পরিচালনায় (জেলা স্কুল বোর্ড) একটি প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষা প্রচলিত আছে।** অবৈতনিক সরকারী বিদ্যালয় কিম্বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি বাধ্যতামূলক এবং তিনটি বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের পক্ষে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। আইনের বিচারে প্রাথমিক ফাইনাল পাশ করা যে কোন শিশুই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থান লাভের অধিকারী, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই আবার ভর্তি পরীক্ষা প্রচলিত আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম বিচারের আগে **পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত মূল নীতিগুলি** আলোচনা করা প্রয়োজন। আধুনিক জগতের সভ্য নাগরিক জীবন যাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতাসমূহ পাঠ্যক্রমে স্থান পাওয়া প্রয়োজন। এই মৌলিক জ্ঞানের ভিত্তিতে উন্নততর জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াও শিক্ষার্থীর আয়ত্ব হওয়া চাই। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা কিম্বা দক্ষতার জটিলতা নির্দ্ধারিত হবে শিক্ষার্থীর বয়স এবং মানসিক বিকাশের অনুপাতে। মানসিক বিকাশ ঘটে ক্রমাগত ধারায়, সুতরাং মনোবিকাশের ধারা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমও ক্রম-প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ব্যক্তি বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া এই বয়সটিও বিশেষীকরণের বয়স নয়। সুতরাং **পাঠ্যক্রম হবে সাধারণধর্মী এবং সকলের জন্য একই ধরণের।** কিন্তু এই স্তরের শিক্ষা সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক বলেই পাঠ্যক্রমে সমাজমুখীনতা এবং বাস্তব জীবনের স্পর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ ক্রমবিকাশমান শিশুমনের সুস্থ কল্পনা শক্তি গড়ে ওঠে, তাও কাম্য। বস্তুতঃ প্রাথমিক স্তরের

পাঠ্যক্রমে দেহ, মন ও বুদ্ধির উপর সমগুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। দেহ মনের সুস্থ বিকাশের জন্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্থান থাকা প্রয়োজন এবং শিক্ষাগত জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকতার শিক্ষণ প্রয়োজন।

পাঠ্যক্রমের নীতি সংক্রান্ত এই আলোচনার পটভূমিতে বলা যায় যে মাতৃভাষা অঙ্ক, ইতিহাসের গল্প, পরিবেশ ও সমাজ পরিচিতি রূপে ভূগোল ও সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি, প্রকৃতিপাঠ এবং শারীর শিক্ষার সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম গঠন করা প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখা এবং অর্থপূর্ণ সরব ও নীরব পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তাছাড়া একক ও দলবদ্ধ ক্রিয়া-কলাপ, গঠনমূলক কাজ কিম্বা হস্তশিল্পের মাধ্যমে দেহ সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক পাঠ্যক্রমের উদাহরণরূপে আমরা আমেরিকায় প্রচলিত পাঠ্য-ক্রমের উল্লেখ করতে পারি। ভাষা ও সাহিত্য, প্রাথমিক গণিত, মার্কিণ ইতিহাস-ভূগোল-পৌরশাসনের মিশ্রিত পাঠ, প্রকৃতি-পাঠ, শারীর-শিক্ষা ও হাতের কাজের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে পাঠ্যক্রম। তাছাড়া সমগ্র পাঠ্যক্রমটিই কর্মভিত্তিতে সংগঠিত। বস্তুতঃ আমেরিকার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় কর্ম-কেন্দ্রিকতার নীতিকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে।

এই সূত্রে পাঠ্যক্রম সংগঠনের পদ্ধতিও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। মনের জগতটি অবিভাজ্য, এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনই মনের ধর্ম। অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গতাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বে সমর্থিত। সুতরাং বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় এবং কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করে অভিজ্ঞতার জগতকে খণ্ডিত না করাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্মত। তাই বিভিন্ন বিষয় ও কর্মের মধ্যে স্বাভাবিক অনুবন্ধ রচনা করাই শিক্ষা বিজ্ঞানের নির্দেশ।

অনুবন্ধের আবার বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ উল্লেখ করা যায় অনুগামিতা সূত্রের ব্যবহার। (Sequential arrangement)। এ ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন অংশের সংযোগ স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সাহায্যে অনুবন্ধ। এরও রয়েছে আবার রকমফের যেমন, প্রাসঙ্গিক অনুবন্ধ, সহযোজনা, এককেন্দ্রিক অনুবন্ধ। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য হলো বিষয়-সংহতি অথবা বিষয়-মিশ্রণ পন্থায়

অনুবন্ধ। এই প্রণালীতে বিষয় বিভাজন থাকেনা ; সকল পাঠ্য বিষয় মিশ্রণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রমটি একটি অবিভাজ্য জ্ঞানক্ষেত্র কিম্বা ক্রিয়া (activity) রূপে উপস্থাপিত হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতি কিম্বা ওয়ার্দ্ধা পদ্ধতি বিষয়-মিশ্রণ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র পাঠ্যক্রম পূর্ণাঙ্গ অনুবন্ধ পদ্ধতিতে তৈরী করা না গেলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা খুবই প্রয়োজন। প্রকৃতি বিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়-গুলিকে নিয়ে অনুবন্ধ সৃষ্টি করা সহজও বটে। অনুবন্ধের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, একথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়কে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার বদলে **পরস্পর সংযুক্ত কিম্বা সম্বন্ধযুক্ত বিষয়সমূহকে সাধ্যমত অনুবন্ধ প্রনালীতে উপস্থাপন করাই ভাল।**

পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে **দ্বিতীয় সমস্যা হলো কর্মকেন্দ্রিক কিম্বা শিল্পকে-ন্দ্রিক পাঠ্যক্রম।** অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষা। আত্মসক্রিয়তার পথেই আসে আত্মপ্রকাশ তথা আত্মোন্নতি। নিষ্ক্রিয়ভাবে সংগৃহীত জ্ঞানও জীবনের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় না। সুতরাং নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের বদলে ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ জ্ঞানের জন্য শিশু ও তার পরিবেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। বাস্তব পরিবেশে সক্রিয় কর্মধারা অনুসরণ করেই শিশু অর্জন করবে জ্ঞান, দক্ষতা, সুঅভ্যাস, সামাজিক আচরণ এবং আদর্শ। এই ধরণের শিক্ষায় তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যবধান থাকবে না। **এই হলো কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার মর্ম কথা** (Learning by doing)।

এই নীতির উপর ভিত্তি করেই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের কথা বলা হয়ে থাকে। সমাজ জীবনে প্রচলিত যে কোন কর্মধারাকে অবলম্বন করে জ্ঞানের ক্ষেত্রটি সংগঠিত হবে। শিশুর প্রয়োজন ও চাহিদা, আকর্ষণ ও মনোযোগ এবং তার কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করেই পঠিতব্য বিষয়সমূহকে উপস্থাপিত করতে হবে। **প্রজেক্ট পদ্ধতি কিম্বা বুনিয়াদি পদ্ধতিতে অনুসৃত পাঠ্যক্রম মূলতঃ এই নীতিতেই সংগঠিত।** বুনিয়াদি পদ্ধতিতে অবশ্য যে কোন কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করার বদলে একটি উৎপাদনী হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে পাঠ্যক্রম সংগঠনের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রম সংগঠনের প্রকৃতি যাই হোক, প্রাথমিক স্তরের **পাঠ্যক্রম মূলতঃ শিশুকেন্দ্রিক হতেই হবে। তাছাড়া পাঠ্যক্রমটি হবে জীবন কেন্দ্রিক।** (শিশু কেন্দ্রিকতা ও জীবন কেন্দ্রিকতার মূল বৈশিষ্ট্য আমরা আগেই আলোচনা করেছি)।

সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যক্রমে একদিকে যেমন শিল্প কিম্বা উৎপাদনমূলক কাজকে গ্রহণ করা দরকার, তেমনি দরকার খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যকর্ম, আনন্দদায়ক ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনমূলক কাজ, সমাজ সেবা এবং নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগের সুযোগ। **শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রম কখনও শিশুর নিজস্ব চাহিদা, প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনা।** সাম্প্রতিককালে যে সব অভিনব পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা হয়েছে সে ক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তা, সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশ এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাকৃত অনুশীলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম

এই সূত্রে আমরা বুনিয়াদি পাঠ্যক্রমের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করতে পারি। গান্ধীজির প্রাথমিক প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে জাকির হোসেন কমিটি এই পাঠ্যক্রমের রূপরেখা উপস্থিত করেন। তারপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সংশোধনের পথে পাঠ্যক্রমটি রূপ পেয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্থ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভ্যাস, দক্ষতা ও আচরণ দিয়ে শিশুকে তৈরী করা। সুস্থ নাগরিকতার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের জন্য একদিকে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও অর্থকরী জীবনের সঙ্গে মৌলিক পরিচয় ঘটানো, এবং অপরদিকে গৃহ, বিদ্যালয় ও গ্রাম জীবনের পরিবেশে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। আজকের শিশু যেন ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানে স্বয়ম্ভর হতে পারে এই উদ্দেশ্যে কৃষি কিম্বা বাগানের কাজ, সুতো কাটা ও তাঁতের কাজ, কিম্বা এই ধরণের উৎপাদনী কাজের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানোও পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য। চলমান জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার প্রয়োজনে সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিতের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় ইংরেজীকে সম্পূর্ণই বর্জন করবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু

পরবর্তীকালে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজীকেও গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দী শিক্ষাও বাধ্যতামূলক। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। বুনিয়াদি পাঠ্যক্রমটি হস্ত-শিল্পকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ অনুবন্ধ প্রনালীতে রচনা করবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজ-পরিচিতির ভিত্তিতে অনুবন্ধ রচনার সুপারিশ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই মন্তব্য করতে পারি যে শিক্ষাগত মুল্যের বিচারে বুনিয়াদি পাঠ্যক্রমের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। কিন্তু আমাদের আদর্শগত ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করবার ব্যর্থতার ফলে আজ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্পও ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

বর্তমান পাঠ্যক্রমের ত্রুটি

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে তত্ত্ব ও আলোচিত সমস্যার পটভূমিতে সহজেই বোঝা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ আদর্শ ও চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। এই পাঠ্যক্রম শিশুর চাহিদা এবং আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। শিশুর সক্রিয়তা ও সৃজন ক্ষমতার বদলে নিষ্ক্রিয়তা এবং ভাষাগত দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষয়-বিভাজনের নীতি এখনও প্রবল। তত্ত্ব ও পুঁথিসর্বস্বতার এখনও মাত্রাধিক্য। পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং জ্ঞান সর্বস্বতার প্রতি এখনও দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাছাড়া শিক্ষক সমস্যা, পাঠ্যপুস্তক সমস্যা এবং শিক্ষোপকরণ সমস্যার ফলে এই পাঠ্যক্রমের ভাল দিকটি আরও দুর্বল হয়েছে।

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজানো দরকার। শিক্ষার ব্যাপক আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনার ভিত্তিতে শিশুর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, শিশুর অভিজ্ঞতা ও জীবন-যাত্রাকে কেন্দ্র করে, যথেষ্ট সক্রিয়তা ও কর্মপরিচিতির সুযোগ রেখে নমনীয় পাঠ্যক্রম গঠন করা দরকার। বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যেন পাঠ্যক্রমটি বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য হয় এবং ফলশ্রুতি নিশ্চিত করবার জন্য উপযুক্ত শিশু নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজী ভাষা

পাঠ্যক্রম সংগঠনের ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন মতবৈষম্য এখন আর নেই যে মাতৃভাষাই হবে

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষার বাহন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এ বিষয়েও যথেষ্ট ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে মাতৃভাষাই প্রাথমিক শিক্ষার বাহন। শহরাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পরিচালিত কিম্বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়েও মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে শহরাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে "ইংলিশ মিডিয়াম" শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত প্রবল। এই ধরনের স্কুলের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক কালের এই ঝোঁক শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্যেরই পরিচায়ক।

শিক্ষামাধ্যম প্রশ্ন ছাড়াও ভাষা সমস্যার আর একটি দিক হলো প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সমস্যা। সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো যে একটি ভাষা শেখবার পরে ঐ ভাষাতে যথেষ্ট দখল প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে দ্বিতীয় আর কোন ভাষার চর্চা সুরু না হওয়াই ভাল। মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট দখল প্রতিষ্ঠা করতেই শিক্ষা জীবনের প্রথম ৪।৫ বছর লেগে যায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আর কোন ভাষার চর্চা বাধ্যতামূলক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় যদিও হিন্দী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তবুও মুদালিয়র কমিশন কিম্বা অন্যান্য কমিশনও দ্বিতীয় কোন ভাষাকে প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক করবার কথা বলেননি। সর্বশেষে কোঠারী কমিশনের ত্রিভাষা সূত্রেও প্রাথমিক স্তরে (বিশেষতঃ নিম্ন-প্রাথমিক স্তরে) কেবল মাতৃভাষার কথাই বলেছেন। আমরাও অভিমত দিতে পারি যে এই স্তরে শিক্ষার মাধ্যম এবং একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাই কাম্য।

কিন্তু ইংরেজীর দাবিকে কেন্দ্র করে সমস্যাটি বর্তমানে জটিল হয়ে উঠেছে। ইংরেজী ভাষার প্রশ্নে ঐ ভাষার সাহিত্যিক কিম্বা জ্ঞানগত মূল্য ছাড়াও জাগতিক এবং আর্থিক মূল্যের সমস্যাটি বিশেষ জরুরী। সমাজের চোখে কোন ভাষার মূল্য দিয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ভাষার মূল্য অনেকাংশে নিরূপিত হয়। আজও আমাদের দেশে সর্বভারতীয় ভাষারূপে ইংরেজীই প্রচলিত এবং যতদিন হিন্দীভাষা ঐস্থান দখল না করবে ততদিন ইংরেজীর প্রাধান্য চলবে। সুতরাং সর্বভারতীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার মূল্য আছে। শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও ইংরেজীই ব্যবহৃত হয়। আন্তরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্যও ইংরেজীই প্রচলিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কারিগরি এবং

বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীই এখনও প্রতিষ্ঠিত। তাই মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মহলে ইংরেজী শিক্ষার দাবী প্রবল। ছোটবেলা থেকে না শিখলে ইংরেজীর উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না—এই যুক্তিতে প্রাথমিক স্তরেই শিখবার দাবীও প্রবল। বুনিয়াদি পাঠ্যক্রমে ইংরেজী বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে এই সমাজের কাছে বুনিয়াদি শিক্ষাও গ্রহণীয় হয়নি। এমন কি বুনিয়াদি শিক্ষার পরিচালক-দেরকেও বিষয়টি ভেবে দেখতে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গেও এ ব্যাপারে নীতিগত জটিলতা দেখা গিয়েছে। স্বাধীনতালাভের পরে স্বভাবতঃই মাতৃভাষার স্বপক্ষে যে জনমত তৈরী হয়, তার প্রভাবে প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকে **ইংরেজী তুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী পড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল,** অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরেজীর প্রাধান্য আগের মতই রইল। এই অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষায় মানের যে অবনতি ঘটলো তার ফলে হলো বহু সমালোচনা। **বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে** এবং প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষায়ও ইংরেজীর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাই অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী পড়ার সূচনা হয়, যেমন আগে ছিল।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমরূপে ইংরেজীর মূল্য আছে। যতদিন সকল ধরনের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবেই মাতৃভাষা ব্যবহৃত না হচ্ছে, ততদিন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজীর দাম থাকছে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজীকে একেবারে বাতিল করা বর্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটি সর্বজনীন শিক্ষার স্তর। অনেক শিশুর পক্ষেই হয়তো ভবিষ্যতে ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে না। **সুতরাং সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার চাপ না থাকাই শ্রেয়।** তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের অভিমতটিও স্মরণযোগ্য। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের শেষ একটি কিম্বা দুটি বছরে ইংরেজী শিক্ষার প্রারম্ভিক সূচনা হলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শ্রেণী থেকে উন্নত পদ্ধতিতে পড়ালে হয়তো ইংরেজীতে বাক্যালাপ করা কিম্বা আদব কায়দায় চৌকোষ দক্ষতা তখনই সৃষ্টি হবে না। কিন্তু ইংরেজী লেখা ও পড়ার মৌলিক ভিত্তি স্থাপিত হবে। তবে এজন্য "Direct Method" কিম্বা এমনি কোন ভাল পদ্ধতি এবং ক্রমে ক্রমে "Structural Method" এর সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া ইংরেজী

ব্যাকরণের জটিলতার মধ্যে না ঢুকে পরিচিত বিষয়, বস্তু ও পরিবেশকে অবলম্বন করে লেখা ও পড়ার দক্ষতা (skill) বৃদ্ধির চেষ্টা হলে আনন্দের মধ্যেও শিশু ইংরেজী শিখতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি

পড়ানোর পদ্ধতি নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর যেমন, শিশুর বয়স এবং মনঃস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি ও গভীরতা, শিক্ষাকালের দৈর্ঘ, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, শিক্ষকের দক্ষতা এবং শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি। সুতরাং পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভাল স্কুল ও মন্দ স্কুলের তারতম্য থাকবেই। তবে সাধারণভাবে প্রাথমিক স্তরে অনুসরণীয় পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করতে পারি।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদেরও ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং অনুসন্ধিৎসা তীব্র। এই বৈশিষ্ট দুটির সুযোগ গ্রহণের জন্য বস্তু নিরীক্ষণ এবং প্রকৃতিপাঠ পদ্ধতির যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। কিন্তু এই বয়স থেকেই সময় ও স্থান চেতনা দানা বাঁধতে থাকে, বিমূর্ত চিন্তার সূচনা হয়, অনুধাবন ক্ষমতা দেখা দেয়, সমস্যার মুখামুখি হয়ে সমাধানের কৃতিত্ব অর্জনের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে দৈহিক ক্রমবৃদ্ধির ফলে হাতে পায়ে কাজ করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা বাড়ে। দলচেতনা এই সময়ে প্রবল, সুতরাং দলবদ্ধ কর্ম সম্পাদনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে সমস্যা ও কাজের সন্ধান পেলে শিশু যতটা কর্মমুখর হয়, চাপানো কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ততটা নয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে **শিশু কেন্দ্রিকতা, শিশুর জীবন তথা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিকতা এবং কর্মকেন্দ্রিকতাই হবে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল পরিচয়।** এক্ষেত্রে মূলনীতি—নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে, সরল থেকে জটিলে, পরিচিত নিকট থেকে অপরিচিত দূরে, মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাওয়া। শ্রেণীপাঠ পদ্ধতির মধ্যেও বস্তু নিরীক্ষণ, প্রকৃতি বীক্ষণ এবং কাজের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। ইতিহাসের পাঠ হবে গল্পের আকারে। ভূগোলের পাঠ হবে স্কুলের আঙ্গিনা এবং পল্লী প্রান্তরকে অবলম্বন করে। সমাজবিদ্যার পাঠ হবে গ্রাম সমাজকে জানা এবং সমাজ সেবার কর্মসূচীকে ঘিরে। গণিতের পাঠ হবে বাস্তব জীবনের উদাহরণ অবলম্বন করে। এইসব

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই শিশু ক্রমে ক্রমে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব অনুধাবন করতে শিখবে।

তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলে শ্রেণীপাঠ পদ্ধতিতেও শিক্ষার উপকরণ যথেষ্ট ব্যবহার করা দরকার। নানা ধরণের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা দরকার। বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ ও খেলার সুযোগ দরকার। মোট কথা ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা তথা খেলার ছলে পড়ার নীতিটি প্রাথমিক স্তরেও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই স্তরের পাঠ পদ্ধতিতে মূলমন্ত্র হলো শিশুদের সক্রিয়তা।

সক্রিয়তার তত্ত্বকে অবলম্বন করেই উইনেটকা, বাটাভিয়া, ডেক্রলি, প্রোজেক্ট প্রভৃতি নানাধরনের আধুনিক পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান কিম্বা সমাজে প্রচলিত যে কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেই প্রোজেক্ট পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। বিদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এই পদ্ধতি বেশ প্রচলিত, যেমন ফ্রান্সে প্রচলিত ডেক্রলি পদ্ধতি। কর্মভিত্তিক পাঠপদ্ধতির ভারতীয় সংস্করণ হলো ওয়ার্দ্ধা তথা বুনিয়াদি পদ্ধতি। উৎপাদনী শিল্পে কর্মপ্রবাহ অবলম্বন করেই এই পদ্ধতি গঠিত। অবশ্য বর্তমানে সংশোধিত রূপে যে কোন আকর্ষনীয় কর্মপ্রবাহের নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে পাঠ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সর্বশেষে উল্লেখ করা দরকার ব্যক্তিগত নির্দেশনার কথা। প্রতিটি শিশুর প্রবনতা প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখবেন এবং সেইভাবে পরিচালনা করবেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে অনুসৃত পাঠ পদ্ধতিই এখনও সেকেলে এবং অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষকদের প্রশিক্ষনও কার্যকর হচ্ছেনা। পাঠ্যক্রম সংশোধিত হলে এবং শিক্ষকরা উপযুক্ত শিক্ষনপ্রাপ্ত হলে শ্রেণীপাঠ পদ্ধতির মধ্যেও এবং নানাধরনের বাস্তব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেক উন্নতি যে সম্ভব এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষার সমস্যা

শিক্ষা কখনও উদ্দেশ্যহীন নয়। এই উদ্দেশ্য কত খানি পূর্ণ হলো তার

পরিমাপও প্রয়োজন। সুতরাং যে কোন ধরণেরই হোক একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা দরকার। মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই যাচাই হবে পাঠ্যক্রম ঠিক আছে কিনা, ছাত্র ছাত্রী আত্মপ্রয়োগ করেছে কিনা, বিভিন্ন দিকে তাদের কতখানি উন্নতি হলো, তারা উচ্চতর স্তরে যাওয়ার যোগ্য কিনা। মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই দুর্বল স্থানগুলি আবিষ্কার করে প্রতিষেধক প্রয়োগ করা এবং সার্থক নির্দেশনা সম্ভব ; সুতরাং শিক্ষার ফলাফল পরিমাপ করবার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন হলো পরিমাপ যন্ত্র এবং পরিমাপ পদ্ধতি সম্বন্ধে। **প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা এইরকম একটি পরিমাপ পদ্ধতি।** পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও রকমফের আছে। রচনা ধর্মী পরীক্ষা, নূতন ধরনের অভীক্ষা (Objective test) এবং মৌখিক পরীক্ষা—এর মধ্যে যে কোন একটি কিম্বা তিনটির সমন্বয় করা সম্ভব। আমাদের দেশে আগে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন ছিল। ক্রমে রচনাধর্মী পরীক্ষাই আসর দখল করে নেয়। কিন্তু শিশুদের পক্ষে লেখা কিম্বা ভাব-প্রকাশের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এখন আমাদের চেতনায় এসেছে। তাই ছোট ছোট প্রশ্নের সঙ্গে অবজেকটিভ টেষ্ট মিশিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার প্রতি বর্তমানে ঝোঁক এসেছে। **কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থার আরও সংস্কার প্রয়োজন।** এই সূত্রে আমরা বিদেশে প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি একবার তাকাতে পারি।

ফ্রান্সে প্রাথমিক স্তরেও ক্লাস প্রমোশন এবং প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা ব্যবস্থার কড়াকড়ি এখনও আছে। **ইংলণ্ডে** শ্রেণী প্রমোশনের ক্ষেত্রে সারা বছরের কাজের সঙ্গে অভীক্ষার ফলাফল মেশানো হয়। কিন্তু সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপরীক্ষা প্রচলিত। এই পরীক্ষার ফলা-ফলের ভিত্তিতেই মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাই করা হয়। অবশ্য ১১ বছর বয়সে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল জনমত রয়েছে। **আমেরিকায়** গ্রেড স্কুলে সারা বছরের কাজের উপর গ্রেড ক্রেডিট ব্যবস্থা প্রচলিত। তা ছাড়া সেখানে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় অনুযায়ী প্রমোশনও সম্ভব। মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের জন্য বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞান পত্রই যথেষ্ট। **রাশিয়াতে** শ্রেণী প্রমোশন এবং ট্রান্সফার পরীক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বঘোষিত পরীক্ষার পড়ার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের যুগ্ম পরিচালনায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে ক্লাশ প্রমোশন কিম্বা প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন সর্বভারতীয় নীতি নেই। পশ্চিম বঙ্গে এই ক্ষেত্রে ত্রিমুখী নীতি। সরকারী সাহায্যবিহীন স্কুলগুলিতে এবিষয়ে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারী স্কুল কিম্বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে লিখিত ক্লাশ পরীক্ষা ও বাৎসরিক প্রমোশনের ব্যবস্থা প্রচলিত। এইসব পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হারও অত্যন্ত বেশী। বস্তুতঃ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ রচনাধর্মী লিখিত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অপচয় ঘটে। বিরাট হারে অকৃতকার্যতার ফলে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০টি শিশুই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক ফাইনাল বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পরীক্ষাও সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, বিশেষতঃ পাঁচশ্রেণী বিশিষ্ট স্কুলগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রান্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থাটিও সমর্থনযোগ্য নয়।

সুতরাং পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। এই স্তরে ছোট ছোট লিখিত প্রশ্নের সঙ্গে অবজেকটিভ টেষ্ট এবং বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষার মিশ্রন দরকার। তা ছাড়া শ্রেণী প্রমোশনের ক্ষেত্রে একটি বাৎসরিক পরীক্ষাকে প্রাধান্য না দিয়ে সারা বছরের কাজকে গণ্য করা উচিত। তদুপরি ফাইনাল পরীক্ষাও বাতিল করা দরকার। কোঠারী কমিশন আরও প্রস্তাব করেছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিশ্রিত পাঠের পরে একবার প্রমোশন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সামগ্রিক কাজের পরে আর একবার প্রমোশনের ব্যবস্থা হলে আরও ভাল।

আমরা এতক্ষণ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু পরীক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এক কথা নয়। পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুধু আহরিত জ্ঞান এবং পরোক্ষে বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব। কিন্তু মূল্যায়ন (Evaluation) কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক। দেহ মন ও বুদ্ধির সমবিকাশে সহায়তা করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সুস্থ আবেগ জীবন গড়ে তোলা, ব্যক্তিগত ও দলগত কর্মদক্ষতা, সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যপ্রীতি, সামাজিক আচরণ ও অভ্যাস, বাচন দক্ষতা, খেলাধূলোর অভ্যাস প্রভৃতি জীবনের সব দিকই প্রাথমিক শিক্ষাদর্শের অন্তর্গত। বিদ্যালয়ের পরিবেশে সকল দিকে শিশুর ক্রমবিকাশের পরিমাপই প্রকৃত মূল্যায়ন। এজন্য

জ্ঞানের পরিমাপের সঙ্গে অভীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং দেহ মন ও কর্মপ্রবনতার সকল দিকের ক্রমবিকাশ সম্বলিত ধারাবাহিক প্রগতি পত্রের ভিত্তিতেই প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। এই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা আমাদের দেশে অচিরে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক ও বৃত্তি শিক্ষার সম্বন্ধ

সামান্য লেখা পড়া ও গণিতের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষাতেই শিক্ষার সমাপ্তি —এই নীতি আজ অচল। শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার এবং সমসুযোগের গণতান্ত্রিক নীতি আজ অন্ততঃ তত্বগতভাবে সর্ববাদীসম্মত। ধারাবাহিক শিক্ষা জীবনের মধ্যে প্রাথমিক স্তরটি অন্যতম সোপান মাত্র। এই স্তরের শেষে শিশুদের বিভিন্ন দিকে যাওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ অবৈতনিক শিক্ষা কিম্বা অন্যান্য সুযোগের অভাবে এবং জীবিকার তাড়নায় এক অংশ হয়তো পড়াশুনা ক্ষান্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেন এমন হয় যে জীবনের মৌলিক দক্ষতা এবং নাগরিক জীবনের মৌল ভিত্তি রচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিশুদের আর এক অংশ হয়তো উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার বদলে স্বেচ্ছায় বৃত্তি শিক্ষার প্রস্তুতিতে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ কোঠারী কমিশন প্রাথমিক শিক্ষান্তে শতকরা ২০ ভাগ শিশুকেই স্বেচ্ছায় কিম্বা আবশ্যিকভাবে বৃত্তি শিক্ষার দিকে চালনার সুপারিশ করেছেন। সুতরাং এই বিচারে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষার জীবন্ত সংযোগ দরকার। তৃতীয়তঃ, একটি অংশ মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করবে। এদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নয়নটি যত সহজ ও মসৃণ হয় ততই ভাল। সুতরাং মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের মধ্যেও সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোঠারী কমিশন সুপারিশ করেছেন যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবিষয় হবে মূলতঃ প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলিই। সামান্য কয়েকটি বাড়তি বিষয় ছাড়া পূর্বতন বিষয়গুলিরই ব্যাপক ও গভীর পাঠই হবে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের কাজ। সুতরাং সকল দিকের বিবেচনাতেই বিচ্ছিন্নতার বদলে পরবর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। এই সূত্রেই আমাদের নির্দেশনা ব্যবস্থার কথা (guidance) আলোচনা করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে নির্দেশনা

নির্দেশনা সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারনা এই যে শিশুদের বিশেষ

সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রয়োজন— যেমন, পাঠ্যক্রম বাছাইয়ের জন্য শিক্ষাগত নির্দেশনা, বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বৃত্তি নির্দেশনা, কিম্বা প্রক্ষোভ সমস্যা অথবা সমাজ-সামঞ্জস্যের জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশনা। দ্বিতীয় প্রচলিত ধারনা এই যে শিক্ষাগত, বৃত্তিগত, সামাজিক, দৈহিক, নৈতিক প্রভৃতি সকল দিকে পূর্ণ বিকাশের জন্য ক্রমাগত শিক্ষা ধারার সঙ্গে নির্দেশনাও ধারাবাহিক হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নির্দেশনার কাজ চলে গৃহে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে সর্বত্র।

প্রথম মতবাদ অনুসারে নির্দেশনার কাজকে সমস্যাক্লিষ্ট শিশুদের জন্য একটি বিশেষ পরিপূরক কাজ হিসেবে বিচার করা হয়। এই চেতনার ফলে যান্ত্রিকভাবে নির্দেশকের (Counsellor) ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়। কিন্তু নির্দেশনার কাজটি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমগ্র শিক্ষা ধারার পরিপূরক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক, নির্দেশক, বিশেষজ্ঞ, পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীর যৌথ দায়িত্ব। সুতরাং শিক্ষা ও নির্দেশনা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই অর্থে নির্দেশনার কাজটি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সুসংহত মৌলিক দায়িত্ব এই কাজ একাধারে সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞসুলভ। তা ছাড়া নির্দেশনার প্রয়োজন সকলের ক্ষেত্রেই সমান। সর্বোপরি নির্দেশনার কাজ চলবে ধারাবাহিকভাবে, গতিশীল পদ্ধতিতে এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে অবলম্বন করে। বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে নির্দেশনা হবে ব্যক্তি শিশুর সমস্যা সমাধানের পরামর্শ রূপে, আর সাধারণ ক্ষেত্রে নির্দেশনা হবে ক্রমবিকাশের সহায়ক সার্বিক ধারা রূপে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে নির্দেশনার কাজটিও নিয়ন্ত্রিত হবে শিক্ষার আদর্শ দ্বারা।

বর্তমান যুগে নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে নানা কারণে যেমন, (ক) শিক্ষার্থীর জটিল প্রয়োজন মেটাতে গৃহ ও সমাজের অক্ষমতা, (খ) শ্রেণীপাঠের সাহায্যে শিশুর সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণের সীমাবদ্ধতা, (গ) উপযুক্ত আচরণ, মনোভাব, অভ্যাস, আত্মপ্রয়োগ এবং শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে শিশুকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা, (ঘ) বহুসংখ্যক শিশু নিয়ে গঠিত শ্রেণীকক্ষে সকল শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত নজর দিতে শিক্ষকের অসামর্থ্য প্রভৃতি।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক, উভয় দিক থেকেই নির্দেশনার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন হিসেবে বলা যায়, (ক) শিক্ষাগত ক্রমবৃদ্ধি, (খ) বৃত্তিগত নির্বাচন, (গ) সামাজিক সামঞ্জস্যের সহায়তা।

সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজন, (ক) উন্নত পারিবারিক জীবন, (খ) উন্নত নাগরিক জীবন, (গ) উন্নত অর্থনৈতিক জীবন এবং (ঘ) সমাজ-নির্দেশনা।

নির্দেশনার কাজকে তিনভাগে ভাগ করা চলে—শিক্ষাগত, বৃত্তিগত, ব্যষ্ঠি-সমষ্ঠির সমন্বয়গত।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাগত নির্দেশনার উদ্দেশ্য শিশুর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা আবিষ্কারে সহায়তা করা, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা, আত্মোন্নতিতে সাহায্য করা, পড়াশুনার ক্ষেত্রে শুভসূচনা ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে পুরোপুরি ফললাভে সাহায্য করা। বৃত্তিগত নির্দেশনার উদ্দেশ্য হবে মৌলিক দক্ষতা নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করা, সুস্থ অভ্যাস এবং মনোভাব গড়ে সহযোগিতার সুফল নিশ্চিত করা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দক্ষতা, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, অপরের সহযোগিতায় কাজের মনোভাব সৃষ্টিই হবে বিশেষ লক্ষ্য। এজন্য একদিকে ভাঙ্গাগড়ার কাজ এবং অপরদিকে সিনেমা, চার্ট প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পরিচিত করানো দরকার। সামাজিক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হবে দেহ মন ও সামাজিক আচরণে উন্নতির জন্য অভ্যাস ও চরিত্র গঠন।

সুনির্দেশনার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এবং সেই সম্পর্কিত তথ্য, বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্টের মধ্যে পড়াশুনা ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়, গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ, নির্দেশক হিসেবে শিক্ষকের পারদর্শিতা, সকল শিক্ষকের সহযোগিতা এবং আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একদিকে তথ্য সংগ্রহ এবং অপরদিকে নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই কাজ করবেন শিক্ষকরাই। ধারাবাহিক প্রগতি পত্রে (Cumulative Record Card) তাঁরা প্রতিটি শিশু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করবেন। এই তথ্য সংগ্রহ করবেন শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ থেকে, পরীক্ষার ফলাফল থেকে এবং সর্বোপরি সমাজসেবা, হাতের কাজ, স্পোর্টস্, বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনের কাজ, গান গল্প, নাটক প্রভৃতি হরেকরকম সহপাঠ্যক্রমমূলক কর্মকাণ্ড থেকে। এই সূত্রেই আমরা সহপাঠ্যক্রম-মূলক কাজের কথায় এসে পড়ি।

সহ পাঠ্যক্রমিক কাজ

অতীতে একসময় ধারনা ছিল "পড়ার সময় পড়া, আনন্দের সময় আনন্দ।" এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বৈতচেতনা থেকে। মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা হতো বলেই মনে করা হতো যে বুদ্ধির চর্চার সঙ্গে দেহচর্চার যোগ নেই এবং মস্তিষ্ক যখন কাজ করবে, তখন মনের দরজা বন্ধ রাখতে হবে। পুরানো ধারনায় শিক্ষা বলতে বোঝাতো বুদ্ধির চর্চা। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আর কিছুর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা চেতনায় 'শিক্ষা' কথাটির অর্থই পরিবর্তিত হয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশে, নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মসক্রিয়তার ধারায় দেহ মন ও বুদ্ধিগত সহজাত সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সমাজ পরিবেশে সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশ এবং আত্মোপলব্ধি লাভ করাই শিক্ষা। **সুতরাং শিক্ষা এখন আর কেবল শুষ্ক জ্ঞানার্জন কিম্বা বুদ্ধির শিক্ষা নয়, দেহ মন ও মস্তিষ্কের সুসম বিকাশই শিক্ষা।** এই নূতন চেতনার ফলে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে বলা হতে লাগলো **পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম** (extra curricular activities)। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা চেতনার আরও অগ্রগতির ফলে এই তত্ত্বই গৃহীত হয়েছে যে শিশুর সমগ্র অভিজ্ঞতাই তার পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত। এই অর্থে লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য ধরনের কাজকেও পাঠ্যক্রমের সহযোগীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বর্তমানে **সহপাঠ্যক্রমিক** (Co-curricular) **কথাটিই প্রচলিত**। বস্তুতঃ সাম্প্রতিককালে 'সহ' কথাটিকেও বাদ দেওয়ার ঝোঁক রয়েছে। সকল ধরনের অভিজ্ঞতা ও কাজকেই **পাঠ্যক্রমিক কাজ** (Curricular activities) বলে মনে করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রয়োজনীয়তা আজ স্বীকৃত। এর ফলে পড়াশুনার একঘেয়েমি কমে, নূতন উদ্যমে পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করা যায়, বিশ্রামের সুফল লাভ করা চলে। তা ছাড়া ঐ সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের এবং হাতে কলমে কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় আবার লেখাপড়ার কাজকে শক্তিশালী করে। একদিকে শিশু নানাধরনের কাজের মধ্য দিয়ে নিজের সম্ভাবনার সন্ধান পায়, অপরদিকে যৌথ কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের বিরাট শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। এই কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ সুগঠিত হয়, পেশী ও স্নায়ু সংগঠিত হয়, কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ে, জ্ঞানক্ষেত্র প্রসারিত হয়, সংগঠিত পরিবেশের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ ঘটে। অপরদিকে তেমনি আদর্শ, মনোভাব এবং অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা ঘটে, আত্মসংগঠন এবং জীবন-সামঞ্জস্য সহজতর হয়। বিদ্যালয় জীবনের এই পরম লাভ উত্তর জীবনকেও প্রভাবিত করে, বিশেষতঃ অবসরকালীন শিক্ষার পথ সুগম করে।

মনোবৈজ্ঞানিক বিচারে বলা চলে যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলি শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করে, দলবদ্ধ জীবন যাপনে সহায়তা করে, চিন্তা অনুভূতি এবং সহযোগিতাপূর্ণ কাজের সহায়তা করে। সৃজনশীল কাজ শিশুকে আনন্দ দেয়, নির্দোষ আনন্দ হয় অন্যান্য প্রমোদমূলক কাজ থেকেও। শিশুর সাংস্কৃতিক জীবনও পরিপুষ্ট হয়।

সামাজিক মূল্যের বিচারে বলা চলে যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলি যৌথ জীবন, সামাজিক আচরণ, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যৌথ কাজের ফলে পারস্পরিক সহায়তা এবং আস্থা, ধৈর্য, বন্ধুবাৎসল্য, বিবেচনাশক্তি, নেতৃত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়ে সমাজ-সংহতি নিশ্চিত করে এবং শিশুদেরকে সমাজচেতনাসম্পন্ন করে তোলে। শিশুর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। সর্বোপরি সৃজনশীল কর্মের ফলে সামাজিক ঐতিহ্যও ঐশ্বর্যশালী হয়।

শিশুর প্রক্ষোভ জীবনের ক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মূল্য অপরিসীম। প্রবৃত্তি প্রবণতা এবং প্রক্ষোভের অবদমনে সাহায্য করে প্রক্ষোভ জীবনকে সুপথগামী করে তোলা সম্ভব হয়। এই পথেই সুস্থ সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। আর সুস্থ সামাজিক সেন্টিমেণ্টই চরিত্রের ভিত্তি। বস্তুতঃ দৈহিক উন্নতি, বুদ্ধির বিকাশ, নৈতিক চেতনার উন্মেষকে সাহায্য করার পথে সহপাঠ্য-ক্রমিক কাজগুলি সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের কাজের মূল্য আজ সর্ববাদীসম্মত।

কিন্তু এই কাজগুলিও যেমন তেমন ভাবে সম্পাদন করলে চলেনা। এর জন্যও নীতিশুদ্ধ চেতনা, দূরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিশুদের পক্ষে করণীয় কাজগুলিতে বৈচিত্র্য থাকা চাই, শিশুর নিজস্ব আগ্রহ থাকা চাই। প্রতিটি কাজের পিছনে উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। শিশুর বয়স, অনুভূতি ও

চাহিদার সঙ্গে কাজগুলির সামঞ্জস্য প্রয়োজন, যেন কোন কিছুই তার উপরে চাপানো বলে মনে না হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা সব কিছু তৈরী করে দেবার বদলে কাজের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব শিশুদের উপর থাকলেই ভাল। তবে প্রতিনিয়ত শিক্ষকের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংযোগ প্রয়োজন। সর্বোপরি সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্যে শিশু যেন আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা খুঁজে পায়।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নানাধরনের হতে পারে। তবে দেহ, মন ও বুদ্ধির প্রতি সম গুরুত্ব দিয়েই কাজ নির্বাচন করা দরকার। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পক্ষে নানাধরনের খেলাধূলো, স্পোর্টস্ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেহ ও স্বাস্থ্য গঠনের কাজ সম্ভব। ছোট ছোট গল্প রচনা, আবৃত্তি, মনীষীদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে পোষণ করা চলে। শিশুদের 'hobby' কে উৎসাহ দিয়ে ইতিহাসের ছবি, ভূগোলের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ, বাগান তৈরীর মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পাঠের ব্যবস্থা, 'word making' খেলার মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। নাচ, গান, নাটক, ড্রইংয়ের মধ্য দিয়ে সৃজন প্রতিভার সহায়তা করা সম্ভব। তা ছাড়া শিক্ষা ভ্রমণ, চড়ুই ভাতি এবং বিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠন করা সম্ভব। দৈনিক সংবাদ পত্রের মূল সংবাদটি শিশুরা প্রার্থনা সভায় ঘোষণা করতে পারে কিম্বা মহাপুরুষের বাণী পড়ে দিতে পারে। সমষ্টি চেতনা এবং সমাজ সেবার মনোভাব সৃষ্টির জন্য স্কাউট গাইড সংগঠন গড়া যায় এবং ছোট খাট পল্লীসেবার কাজে শিশুদের নিযুক্ত করা যায়। সর্বোপরি স্কুলের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য (School Self Govt) শিশুদের নিযুক্ত করা যায়। মনে রাখতে হবে যে এই কাজগুলি সবই প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পক্ষে সম্ভব।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলি পরিকল্পনা করবার সময় মনে রাখতে হবে যেন (ক) এগুলি পাঠ্যক্রমিক কাজের অন্তরায় না হয়, (খ) শিক্ষকের উপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপে, কিম্বা তিনি কাজগুলি শিশুদের উপর চাপিয়ে না দেন, (গ) কোন কাজই যেন উদ্দেশ্যহীন না হয়। তা ছাড়া এই ধরনের কাজের বাড়াবাড়িও ভাল নয়। শিশুদের কাছে অতিরিক্ত দক্ষতা আশা করাও ঠিক নয়। তা ছাড়া শিশুদের স্বাধীনতা যেন কোন রকমেই বিনষ্ট না হয়। **বস্তুতঃ পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সমন্বয় প্রয়োজন।**

দৈনিক সময় নির্ঘণ্টের মধ্যে এজন্য সময় নির্দেশ করা চলে। শিশুদের বৈশিষ্ট্য এবং অগ্রগতির রেকর্ড রাখা চলতে পারে। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পুরস্কার কিম্বা নম্বর দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই উদ্যোগ, দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব থাকবে শিশুদের হাতেই শিক্ষক কেবল উৎসাহ, প্রেরনা এবং পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে থাকবেন। তাই বলে শিক্ষকের দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। সাফল্য নির্ভর করে তাঁর মনোভাব এবং কর্মকুশলতার উপর।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য খেলার মাঠ, খেলার সামগ্রী, অন্যান্য উপকরণ এবং অর্থের অভাব রয়েছে খুবই বেশী। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব আছে, সরকারী ও সামাজিক উৎসাহের অভাব আছে এবং শিক্ষকদের উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব আছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে একথা সত্য যে নানা অভাব সত্ত্বেও শিক্ষিক শিক্ষিকা সচেতনভাবে উদ্যোগ নিলে অর্থাভাব এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিছু কিছু কাজ হতে পারে।

এই সূত্রে আরও বলা প্রয়োজন যে এই কাজ কেবল সহপাঠ্যক্রমিকই নয়, পাঠ্যক্রমকে অবলম্বন করেও অনেক কাজের সুযোগ আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের সক্রিয়তাই বড় কথা। প্রোজেক্ট, ওয়ার্ধা প্রভৃতি নানা ধরনের কর্মভিত্তিক পদ্ধতি এই নীতিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রেণীপাঠ পদ্ধতির মধ্যেও শিশুদের অনেক পাঠ্যক্রমিক কাজের অবকাশ আছে। বস্তু সংগ্রহ ও বস্তু নিরীক্ষণ, ভূগোলের ডায়গ্রাম কিম্বা মানচিত্র অংকন, সমাজ বিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রাম পরিদর্শন কিম্বা বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমিক বিষয়বস্তুও সহজে আয়ত্ত হতে পারে। এদিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকার।

অপসঙ্গতির সমস্যা

প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা বয়সে অপেক্ষাকৃত বড়। তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং জীবনের জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনাও সেই তুলনায় বেশী। সুতরাং অপসঙ্গতি আবিষ্কার এবং

নিরাময়ের দায়িত্ব আরও বেশী জরুরী। এই সম্পর্কে আমরা আগেকার অধ্যায়ে (৬১ পৃষ্ঠায়) যে আলোচনা করেছি, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই আলোচনা প্রযোজ্য। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হলোনা।

আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষকের গুণাবলী

শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়, শিশু ও শিক্ষক—এইসব উপাদানের মধ্যে প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমের বোঝা এবং শিক্ষকের নির্দয় তাড়নাই বড হয়ে ছিল। আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম এবং বিদ্যালয় প্রভৃতি সব কিছুই শিশুকেন্দ্রিক। আর শিক্ষককে কেউ বলেছেন শিশু উদ্যানের মালী, কেউ বলেছেন পরিচালক/পরিচালিকা। কিন্তু এই নূতন নামকরণের ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব একটুও ছোট করে দেখা হয়নি, বরং অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে।

প্রাচীনপন্থী চিন্তায় শিশুকে জ্ঞান ও বিদ্যা দেওয়াই ছিল শিক্ষকের কাজ। সে ক্ষেত্রে শিশুর দেহ মন আবেগ অনুভূতির কোন মূল্যই শিক্ষকের কাছে ছিলনা। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা চেতনায় দেহ মন বুদ্ধির সমবিকাশ নিশ্চিত করা, এবং একদিকে শিশুর ব্যক্তিসত্তা, অপরদিকে সামাজিকতার বিকাশ ঘটানোই শিক্ষকের কাজ। সুতরাং শিশুর দেহ যন্ত্রের কার্যধারা, মন ও আবেগের বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর, ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি প্রভৃতি সব কিছুই শিক্ষকের জানা দরকার। শিশুর কাছে গ্রহনীয় করে পাঠ্য-বিষয় উপস্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকের দখল প্রয়োজন।

তাছাড়া বর্তমান চেতনায় **শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়**; তাঁর দায়িত্ব বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে যেখানেই শিশুর স্বার্থ, সেখানেই পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাবনা লক্ষ্য করে তাকে সেই ভাবে পরিচালনা করাই শিক্ষকের কাজ। শিশুদের প্রতি দরদ, ধৈর্য ও সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। জ্ঞানের বোঝা তিনি চাপিয়ে দেবেন না, কিন্তু শিশুদের আত্মশিক্ষায় তিনি হবেন সহায়ক। শিশুদের জীবনাদর্শকে তিনি প্রভাবিত করবেন। প্রতিটি সমস্যার মুখে তিনি হবেন শিশুদের পথ নির্দেশক। কিন্তু এই কাজ তিনি করবেন বিদ্যালয়ে ক্লাশে, মাঠে বাগানে শিশুদের বন্ধুরূপে। এ **জন্যই আধুনিক শিক্ষাচেতনায়**

শিক্ষককে বলা হয় বন্ধু, দার্শনিক, নির্দেশক (friend philosopher, guide)।

তাছাড়া শিক্ষা সর্বদাই একটি দ্বিমুখী ধারা। শিশু ও শিক্ষকের পারস্পরিক প্রভাবের মধ্য দিয়েই শিক্ষার কাজ চলে। শিশু স্বভাবতঃই অনুকরণশীল। অপরের চিন্তা ও অনুভূতি তার মধ্যে সম্প্রসারিত করাও সহজ। তাই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস ও আচরণ, আদর্শ ও মনোভাব শিশুর মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়। এই বিচারে শিক্ষকের এমন কতগুলি মৌলিক গুণ থাকা প্রয়োজন যার প্রভাবে শিশুর সুস্থ বিকাশ সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে শিক্ষক প্রথমতঃ একজন ব্যক্তিমানুষ, দ্বিতীয়তঃ একজন শিক্ষক। সুশিক্ষক হিসেবে তাঁর এমন কতগুলি ব্যক্তিগত গুণ থাকা দরকার যা তিনি জন্ম সূত্রে পেয়ে থাকেন। কিন্তু সহজাত গুণাবলীতেই চলেনা। শিক্ষকতার দক্ষতা না থাকলে ঐসব গুণও বৃথা হয়ে যায়। আবার শিক্ষকতার দক্ষতাও ব্যর্থ হয় যদি মানুষ হিসেবে কতগুলি মৌলিক গুণ না থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে যে শুধু জন্ম-সূত্রেই শিক্ষক হওয়া যায়না, আবার শুধু ট্রেনিংয়েই শিক্ষক তৈরী হয়না। জন্মগত গুণের সঙ্গে যখন শিক্ষণগত দক্ষতার যোগ হয়, তখনই সৃষ্টি হন প্রকৃত শিক্ষক।

উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিতে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় গুণের কথা বলতে পারি।—(১) প্রথমেই বলা প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিদীপ্তির কথা। ভাল স্বাস্থ্য এবং সুন্দর চেহারা এক কথা নয়। সুদর্শন চেহারা সম্পূর্ণই প্রকৃতিদত্ত। এ জিনিষ ছাড়াও ভাল শিক্ষক হওয়া সম্ভব। কিন্তু ভাল স্বাস্থ্য কিয়দংশে প্রকৃতিদত্ত এবং কিয়দংশে আত্মপ্রচেষ্টার ফল। তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি যদিও প্রকৃতিদত্ত, তার প্রয়োগ এবং বিচিত্র প্রসার নির্ভর করে আত্মপ্রচেষ্টার উপর। এই আত্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই যুক্তিশীলতা, বিবেকবোধ এবং বিচারশক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব, এবং এগুলি সুশিক্ষকের গুণ। (২) দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন কতগুলি আচরণগত গুণ যেমন, বিনম্র ভদ্রতা, শিশুদের প্রতি অপার ভালবাসা ও সহানুভূতি, শিশুদের সাহায্য করবার মনোভাব, ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং শিশুর প্রতি আস্থা। তাছাড়া ভাল শিক্ষক হবেন উদ্যোগী। তিনি সাধারণ ব্যর্থতায় হতাশ হবেন না, পলায়নপরও হবেন না। গভীর মানবতা বোধ, শিশুদরদ এবং সমাজচেতনা থাকলেই এ জিনিস সম্ভব। এই গুণগুলি আংশিক মাত্র জন্মগত,

কিন্তু বেশীর ভাগই আয়ত্ত করবার মত। (৩) তৃতীয়তঃ ভাল শিক্ষকের কতগুলি মৌলিক দক্ষতা প্রয়োজন যেমন, ভাষাগত দক্ষতা এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা। এগুলি বহুলাংশেই আয়ত্ত করার বিষয়। (৪) চতুর্থতঃ প্রয়োজন আনন্দস্ফূর্তি ও রসবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। শিশুদের প্রতি অশেষ ভালবাসা থাকলেই এ জিনিস সম্ভব। (৫) পঞ্চমতঃ প্রয়োজন পক্ষপাতহীনতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দায়িত্বশীলতা। সকল শিশুকে সমভাবে ভালবাসলে, নিজের পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা থাকলেই এ গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব। (৬) ষষ্ঠতঃ প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রগতিশীল চিন্তা। এগুলি শিক্ষকের জীবন দর্শনের ফল। (৭) এই জীবন দর্শনের প্রভাবেই আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং সুগঠিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়। আর প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকই সুঅভ্যাস এবং সদাচরণের অধিকারী হতে পারেন। বস্তুতঃ আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব সুশিক্ষকের আবশ্যিক গুণ।

উপরে আলোচিত ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও সুশিক্ষকের প্রয়োজন কতগুলি পেশাগত গুণ, যেগুলি মূলতঃ শিক্ষণলব্ধ। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হলো (১) কথা ও লেখায় ভাবপ্রকাশের দক্ষতা, মৌলিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দক্ষতা, কিছু হস্ত শিল্পের দক্ষতা। (২) পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট দখল, (৩) শিশুদের দেহ ও মনের ক্রমবিকাশ ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান। এজন্য শিশু মনোবিজ্ঞান, দলগত জীবনে শিশুর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির জ্ঞান প্রয়োজন। (৪) অপসঙ্গতির কারণ ও সমাধান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং আধুনিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর দখল। (৫) আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক জ্ঞান। এইসব কারণেই শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন এত বেশী।

উপরে আলোচিত গুণ ও দক্ষতার কথা সাধারণভাবে সকল স্তরের শিক্ষকের পক্ষেই প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন শিশুদের ক্রমবিকাশ ধারার প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখা এবং প্রতিটি শিশুকে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা। অসীম ধৈর্য এবং সহানুভূতি ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হলো শিক্ষকতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিশুদের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং পিতামাতার স্থান অধিকার করার আদর্শ। মাতৃস্নেহের মত ভালবাসার প্রয়োজন বলেই প্রগতিশীল দেশগুলিতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিকাদের অধিকার প্রায় একচেটিয়া হয়ে গেছে।

দেশে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতির কথা আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। ঐ পটভূমিতে অন্যান্য দেশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাতে পারি। (এই অংশটি পড়বার সময় প্রথম পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ডায়গ্রাম ও আলোচনার সাহায্য নেবে।)

ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে ৭ থেকে ১১ কিম্বা উর্দ্ধে ১২ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য শিক্ষা—যার উদ্দেশ্য হবে দেহের উন্নতি, মনের ক্রমবিকাশ, চরিত্র গঠন, আরও পড়াশুনার জন্য আকাঙ্খা জাগানো, সাংস্কৃতিক উন্নতি ইত্যাদি। তবে মূলতঃ গুরুত্ব দেওয়া হয় চরিত্র গঠন অর্থাৎ আত্মশৃঙ্খলাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাধরনতঃ বলা হয় জুনিয়ার স্কুল। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা সীমিত (সাধারনতঃ প্রতি ক্লাশে ৪০ জন)। প্রশস্ত স্কুল গৃহ এবং 'এ্যাসেম্বলি হল' ছাড়াও জিমনাসিয়াম এবং খেলার মাঠ সাধারনতঃ থাকে। **সাধারণ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ ৪ বছর এবং প্রান্তিক পরীক্ষান্তে মাধ্যমিক শিক্ষার সূচনা।** পাঠ্যক্রমে লেখা পড়া অঙ্ক, সমাজবিদ্যা কিম্বা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ, ছেলেদের ক্ষেত্রে শারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সঙ্গীত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে গৃহবিজ্ঞান এবং গৃহ শিল্পকে স্থান করে দেওয়া আছে। মাতৃভাষা এবং প্রকৃতি-পাঠের উপরে অবশ্য বেশী নজর দেওয়া হয়। পদ্ধতি হিসেবে সাধারণভাবে কর্মকেন্দ্রিকতাই স্বীকৃত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মন্ত্রীদপ্তর থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু পাঠ্যক্রম এবং সিলেবাস নয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুলের শিক্ষাগত এবং প্রশাসনগত দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক মণ্ডলীর এই স্বাধীনতা আছে বলেই বলা হয়ে থাকে যে **ইংলণ্ডের কোন দুইটি স্কুলই ঠিক একরকম নয়।** তবে সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হলো ইন্দ্রিয়শিক্ষা, আত্মশিক্ষা, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, খেলাভিত্তিক শিক্ষা, পড়া ও হাতের কাজের অনুবন্ধ, মাতৃভাষা পড়া লেখা ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রভৃতি। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রপরিচালিত

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। তাছাড়া বাধ্যতামূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা, টিফিন, পোশাক পরিচ্ছদের জন্য সাহায্য এবং প্রয়োজনবোধে যাতায়াত ব্যবস্থাও আছে। আর আছে ভ্রমণ এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুযোগ।

রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আছে ৮-১১ বছরের জন্য প্রাইভেট স্কুল এবং ১১-১৩ বছরের জন্য প্রেপ স্কুল। এগুলি সাধারণতঃ ভলাণ্টারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং বৈতনিক। এদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষার দরকার হয় না। তবে যে কোন ধরনের বিদ্যালয়ই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক। (প্রথম পর্বের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দেখ)।

আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নাগরিকতা, সামাজিকতা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনভাবে আত্মোন্নতি এবং দক্ষতা, সহযোগিতা, সৃজনশীলতা এবং আনন্দময় অভিজ্ঞতা। পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে লেখাপড়া গণিত, শারীর শিক্ষা, আমেরিকার ইতিহাস-ভূগোল তথা সমাজবিদ্যা, হাতের কাজ প্রভৃতি। বহুক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রম রচিত হয় অনুবন্ধ প্রণালীতে। বিদ্যালয়ের পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মানসিক ভারসাম্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পাঠপদ্ধতি মূলতঃ কর্মভিত্তিক। তাছাড়া সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যাপক সুযোগ আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ৬ বছর বয়সে এবং শিক্ষাকালের দৈর্ঘ বিভিন্ন রাজ্যে ৬ বছর কিম্বা ৮ বছর। বিদ্যালয়গুলি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রেড স্কুল নামে পরিচিত। আগে বিদ্যালয় সংগঠনে প্লেটুন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে গ্রেড প্রথাই বেশী প্রচলিত। অবশ্য পশ্চাৎপদ এবং পাহাড়ী অঞ্চলে এখনও একজন শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল আছে। আমেরিকার প্রাথমিক স্কুলগুলি দুইশ্রেণীর (ক) সরকারী (খ) বেসরকারী। বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ধর্মীয় সংগঠনের স্কুল আছে অনেক। রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। এখানে বিভিন্ন রকমের ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থাও প্রচলিত। কিন্তু যে কোন ধরণের বিদ্যালয়েই শিশুরা ভর্তি হোক, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। (প্রথম পর্বে ৫০ এবং ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ৬ বছর বয়সে এবং দৈর্ঘ ৫ বছর। এই সময়ের মধ্যে আবার কয়েকটি ভাগ আছে যেমন, ৬—৭ বছরে প্রস্তুতি পাঠ, ৭—৯ বছরে এলিমেন্টারী পাঠ, ৯—১১ বছরে ইণ্টারমিডিয়েট পাঠ। পাঠ্যক্রমে রয়েছে ফরাসী ভাষা লেখা ও পড়া, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বস্তুপাঠ, মৌলিক বিজ্ঞান, শিল্প, শারীর শিক্ষা, নাগরিকতা ও নৈতিক শিক্ষা। ফ্রান্সের পাঠ্যক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের চাপ এখনও আছে। পাঠপদ্ধতিতে চিরন্তনতার সঙ্গে সম্প্রতি আধুনিকতা মিশ্রিত হয়েছে। **প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।** (প্রথম পর্ব ৬৪ পৃষ্ঠা)।

রাশিয়াতে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ৭ বছরে এবং শিক্ষাকালের দৈর্ঘ ৪ বছর। পাঠ্যক্রমে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে আছে রুশ ভাষা (লেখা পড়া এবং প্রাথমিক ব্যাকরণ—লেখার উপর গুরুত্ব বেশী), অঙ্ক, শিল্প, সঙ্গীত, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি। চতুর্থ বছরে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতি সংযোজিত হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের খেলাধূলো এবং হাতের কাজের ব্যবস্থা আছে। **প্রাথমিক স্কুলগুলি সর্বজনীন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সমসুযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত।** স্বাস্থ্য, টিফিন, যাতায়াত এবং অন্যান্য ছাত্রকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্বও রাষ্ট্রীয়। বিদ্যালয়ের বাইরে ও ভিতরে ছাত্র-সংগঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (প্রথম পর্ব ৬৮ পৃষ্ঠা)।

পশ্চিম জার্মানীতে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সাধরনতঃ ৮ বছর দীর্ঘ (৬—১৪)। তবে এই সময়টিকে ৪+৪ কিম্বা ৫+৩ ভাগে ভাগ করে দেখা হয়। প্রথম পর্যায়ের স্কুলের পরিচিতি "বুনিয়াদি বিদ্যালয়" রূপে। শিক্ষনীয় বিষয় অন্যান্য দেশের মতোই। তবে শিক্ষাপদ্ধতিতে আধুনিকতা আছে। **প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন এবং রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক।** তবে বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগও আছে। **পূর্ব জার্মানীতে ৬—১৪ বছর পর্যন্ত একটানা অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।** স্কুলের নাম বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং **সব স্কুলই সমসুযোগের নীতিতে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়।** সাধারণ বিচারে পাঠ্যক্রম অন্যান্য প্রগতিশীল দেশেরই মত। (প্রথম পর্বের ৭১ ও ৭৪ পৃষ্ঠা)।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কথা জানতে গেলে এর বাধাগ্রস্থ যাত্রার

ইতিহাসটি জানা দরকার। সুতরাং প্রথমেই জানতে হবে ইংরেজ শাসনের আমলে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সর্বভারতীয় পটভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে প্রথম পর্বের ৭৭—৮১ পৃষ্ঠায়। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঐ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে প্রথম পর্বের ৮৮ পৃষ্ঠায়।

স্বাধীনতার যুগে সর্বভারতীয় পটভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করা হয়েছে প্রথম পর্বের ৮৩—৮৬ পৃষ্ঠায়।

স্বাধীনতার যুগে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে প্রথম পর্বের ৮৯—৯২ পৃষ্ঠায়। এই সবগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তা ছাড়া বর্তমান ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ছকটি আলোচিত হয়েছে প্রথম পর্বের ৩০—৩৩ পৃষ্ঠায়।

আমাদের দেশে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমউন্মেষ এবং ঐ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার কথা আলোচিত হয়েছে প্রথম পর্বের ৮১—৮৩ পৃষ্ঠায়। (পুনরাবৃত্তি না করে ইতিহাসের এই অংশগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই প্রথম পর্ব থেকে পড়ে নেবে)।

এখানে আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি বর্তমান অবস্থার দিকে।

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান উদ্দেশ্য

ইংরেজ শাসনের আমলে ঔপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতির দোসর হিসেবে বিদেশী সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রগতিশীল আদর্শ ছিলনা, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক শাসনে গনতান্ত্রিক সমাজবাদী আদর্শকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান, সুস্থ নাগরিকতার জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ, জ্ঞান ও আচরণ, উৎপাদন দক্ষতাসম্পন্ন যোগ্য মানুষ হওয়ার মূল ভিত্তি রচনা, সামাজিক সহযোগিতার শিক্ষা, আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়ে

শিশুর দেহ মন ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশকেই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্য পূরণের সহায়করূপে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নীতিও স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষায় সম-অধিকার এবং কমন স্কুল আদর্শও গ্রহণ করা হয়েছে, অন্ততঃ নীতিগতভাবে। সুতরাং আদর্শের দিক থেকে আমরা প্রগতিশীল দেশগুলি থেকে পিছিয়ে নেই।

বর্তমান পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মাতৃভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সমাজপাঠ, অঙ্কন কিম্বা অন্য ধরনের হাতের কাজ এবং শারীর শিক্ষা নিয়ে পাঠ্যক্রম গঠিত। অবশ্য সাধারণ ছকের মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্যে কিছু হেরফের আছে। বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য বেশী। কোন কোন রাজ্যে পাঠ্যক্রম থেকে ইংরেজীকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের স্কুলগুলিতে পাঠপদ্ধতি এখনও মূলতঃ চিরাচরিত। কর্ম-কেন্দ্রিক পাঠপদ্ধতি এখনও চালু হয়নি, প্রতিটি শিশুর প্রতি এখনও নজর দেওয়া সম্ভব হয় না, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ প্রায় সম্ভবই হয় না, বিদ্যালয়ে ক্রীড়াসুলভ আবহাওয়া খুবই কম। অনেক বিদ্যালয়ই শিশুদের কাছে আকর্ষনীয় এবং আনন্দদায়ক নয়। বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিতে কর্মকেন্দ্রিকতার নির্দেশ রয়েছে। সার্বিকভাবে বুনিয়াদি পদ্ধতি অনুসৃত হলে কিছুটা কর্মকেন্দ্রিকতা আসতো। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে বুনিয়াদি পদ্ধতিরই অনেক ছাটকাট করা হয়েছে। কর্মকেন্দ্রিকতার আদর্শ সেখানেও অনেকটা বিনষ্ট হয়েছে।

শিক্ষার আধুনিক উপকরণ অধিকাংশ স্কুলেই নেই। নেই ভাল আসবাব কিম্বা খেলার মাঠ ও সরঞ্জাম। ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক কম হওয়ায়, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাব থাকায় এবং যথেষ্ট সচেতনতার অভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কাজও তেমন সম্ভব হয় না। (এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে,—১২৩ পৃষ্ঠা)।

তা ছাড়া পরীক্ষার বোঝা থেকে আমরা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মুক্তি দিতে পারিনি, এমনকি আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতিও সর্বাংশে চালু করতে পারিনি। (এ বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে)। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরও সংস্কার প্রয়োজন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

স্কুল ব্যবস্থা

আমাদের দেশে সাধারনতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ৬ বছর বয়সে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের যেমন, অন্ধ্র, কেরল, নাগাভূমিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই (এখানে কিছু পাঁচ ক্লাশের স্কুলও আছে) ৪ বছরের; আসাম, বিহার, জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশে ৫ বছরের; গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে প্রথম ৭ বছরের শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষা বলে ধরা হয়।

পাঠ্যক্রম ও সুযোগ সুবিধার বিচারে স্কুল রয়েছে প্রধানতঃ দুই ধরনের স্কুল, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। ভাষা মাধ্যমের বিচারে আছে দুই ধরনের স্কুল মাতৃভাষার মাধ্যম এবং "ইংলিশ মিডিয়াম"। (অবশ্য মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল সংখ্যায় অনেক বেশী।) স্কুলগুলিকে আবার বৈতনিক এবং অবৈতনিক—এই দুই শ্রেণীতেও ভাগ করা চলে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক 'এক শিক্ষকের স্কুল' আছে।

মালিকানার ভিত্তিতে রয়েছে সরকারী প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি বিদ্যালয়, স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, দাতব্য বিদ্যালয়, এমনকি ব্যক্তিগত মালিকানায় লাভের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়ও আছে। (অনেক "ইংলিশ মিডিয়াম" স্কুলই এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

সর্বভারতীয় হিসেবে দেখা যায় ভারতে বর্তমানে ৪০৮৯৩০টি প্রাথমিক-বুনিয়াদি স্কুল আছে। এর মধ্যে ২৫০৮০টি স্কুল শুধু মেয়েদের। অবশিষ্ট অধিকাংশ স্কুলই সহশিক্ষামূলক। এ থেকে বোঝা যায় যে রক্ষণশীলতা এখনও রয়েছে প্রচুর। প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত শিশুদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে শতকরা ৭০.৮ জন। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে

বিদ্যালয়ে আছে শতকরা ৫৫ জন। সুতরাং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত ব্যবধান খুবই বেশী। ছাত্র সংখ্যার হিসেবে দেখা যায় ১৯৬০-৬১ সনে বিদ্যালয়ে পাঠরত ছেলে ছিল ১৭১৭০০০০টি এবং মেয়ে ৭৮২৬০০০টি (মোট ২৪৯৯-৬০০০টি)। আশা করা যায় ১৯৭৫-৭৬ সনে ছেলে হবে ৩৮০৬৬০০০টি (শতকরা ১০০ জন), মেয়ে হবে ৩৩৪৮৮০০ টি (শতকরা ৬৮·৬ জন), অর্থাৎ মোট ৭১৫৫০০০০টি (শতকরা ৮৯·৭ ভাগ)। সর্বভারতীয় মানে প্রতি একমাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত স্থানে অর্থাৎ ৩·১৪ বর্গ মাইল এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। কাগজ কলমের হিসেবে দেখা যায় সাধারনতঃ ৩০০ জন অধিবাসীর গ্রামেই গড়ে একটি করে স্কুল আছে।

সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের কিছু কিছু বিদ্যালয় ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। জনসংখ্যার প্রতি হাজারে (ছাত্রসংখ্যা নয়) প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কেরলে ১৪১, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজে ১০০, পশ্চিমবঙ্গে ৮২, রাজস্থানে (সর্বনিম্ন) ৫৫, এবং সর্বভারতীয় গড় ৮০। সরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও অন্যান্য স্কুলে বেতন দিয়ে পড়ে, এমন ছেলেমেয়েও কম নয়। শতকরা ৩·৯ ভাগ শিশু বেতন দেয়; গড়ে বাৎসরিক বেতন ১৬·৪০ টাকা এবং বেতন বাবদ মোট আদায় হয় বৎসরে ১৭১০৯০০০ টাকা। অবৈতনিক ছাত্রদেরও বই এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে হয়। অবশ্য পিতামাতার আর্থিক সামর্থ্য, বিদ্যালয়ের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি কারণে এই আনুষঙ্গিক ব্যয়ের তারতম্য আছে। সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ গড় অঙ্কটি আমরা উপস্থিত করছি—

	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
প্রথম শ্রেণীতে	১·১০ টাকা	৪০·৬০ টাকা
দ্বিতীয় „	১·১৪ „	২৯·৪০ „
তৃতীয় „	২·৮০ „	৩৬·৮৪ „
চতুর্থ „	৫·৩৬ „	৭৩·৩৫ „
পঞ্চম „	৬·৩১ „	৫০·৬০ „

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্যের চিত্রটি এই তথ্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির ত্রুটি ছাড়া এই আর্থিক কারণেও অনেক শিশুর পড়াশুনা বন্ধ হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয়, তেমন ১০০টি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে—

দ্বিতীয় শ্রেণীতে	৬১.২ টি ছেলে এবং	৫৬.৪ টি মেয়ে,
তৃতীয় "	৫১.২ " " "	৪৫.৮ " "
চতুর্থ "	৪৪.৩ " " "	৩৫.৫ " "

অর্থাৎ বহু ছেলেমেয়েই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবার আগে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এই অপচয়ের সমস্যাটি আমাদের দেশে বিরাট। এক্ষেত্রেও মেয়েদের মধ্যেই অপচয় বেশী।

তাছাড়া অনুত্তীর্ণতার ফলে শিক্ষাগত বন্ধ্যাত্বও বেশী।

প্রথম	শ্রেণীর	বাৎসরিক	পরীক্ষায়	অকৃতকার্য্য	হয় শতকরা	৪০.৩টি ছেলে,	৪৭.১টি মেয়ে
দ্বিতীয়	"	"	"	"	"	২৬.৬ " "	৩৩.১ " "
তৃতীয়	"	"	"	"	"	২২.৬ " "	২৬.৬ " "
চতুর্থ	"	"	"	"	"	২১.৭ " "	২৫.০ " "
পঞ্চম	"	"	"	"	"	১৬.৪ " "	১৯.৮ " "

বস্তুতঃ অকৃতকার্যতার ফলে প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র সংখ্যা সর্বাধিক, কারণ এই শ্রেণীতে ১/৩ থেকে ১/২ শিশুই পরীক্ষায় ফেল করে। এ ক্ষেত্রেও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

শ্রেণীতে পাঠরত শিশুদের বয়সের সমতা থাকলে শ্রেণীর পাঠ অনেক ফলপ্রসূ হয়, এবং দলগত কাজ ও মনের আদান প্রদানও ভাল হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়সে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা না থাকায় প্রথম শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশ লক্ষ্যনীয়। প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু শতকরা ১টি এবং ১১-১২ বছরের শিশু ১.১টি। অবশ্য মোটামুটি উপযুক্ত বয়সের শিশুর সংখ্যাই বেশী, যেমন ৫-৬ বছরের শিশু ১৮.৪ ভাগ, ৬-৭ বছরের শিশু ৩১.৭ ভাগ এবং ৭-৮ বছরের শিশু ২৫.৭ ভাগ। এই তারতম্যের জন্য একদিকে পিতামাতার অতিরিক্ত গাফিলতি এবং অপরদিকে অতিরিক্ত গরজই দায়ি। কিন্তু শিক্ষা-সূচনার আবশ্যিক বয়স সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে বয়সের সমতা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা

সর্বভারতীয় হিসেবে ১৯৬৬ সনে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন মোট ১০৫০০০০ জন (পুরুষ ৮৫০০০০ এবং মহিলা ২০০০০০, অর্থাৎ মহিলা মোট সংখ্যার ২৪ শতাংশ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় ম্যাট্রিকুলেশনের নীচে শতকরা ৪৯ জন, ম্যাট্রিকুলেট এবং স্নাতক-নিম্ন ৫০ জন এবং স্নাতক কিম্বা স্নাতকোত্তর ১ জন।

ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১৯৬৬ সনে ছিল ১৪২৪ এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন গড়ে ৭৩.৯ ভাগ। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য আছে। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলিতেই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বাধিক—মাদ্রাজে ৯৮.৭ ভাগ, কেরলে ৯৩ ভাগ এবং অন্ধ্রে ৯০ ভাগ। সর্বনিম্ন হার পশ্চিমবঙ্গে, ৩৮.৩ ভাগ মাত্র। বয়স ভেদেও শিক্ষণের তারতম্য আছে। যেমন—

২১—২৫ বছরের শিক্ষকদের মধ্যে		শিক্ষণহীন	৪০.৭ ভাগ
	শিক্ষিকাদের "	"	৩১.৭ "
২৬—৩০ "	শিক্ষকদের "	"	২৩.২ "
	শিক্ষিকাদের "	"	২৩.৮ "

সহজেই বোঝা যায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষক নিয়োগের সঙ্গে শিক্ষণ ব্যবস্থা সমতালে এগুতে পারেনি। নূতন যে সব যুবক যুবতী প্রাথমিক শিক্ষাকার্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা এখনও শিক্ষণের সুযোগ পাননি।

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতনহার সত্যই লজ্জাকর।

শতকরা ২.২ ভাগ পেয়ে থাকেন মাসিক ৬০টাকা কিম্বা তারও কম,
" ০.৫ " " " সর্বোচ্চ মাসিক ২০১—২২০টাকা।

এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরের বেতনই বেশী। যেমন—

২৯.৯ ভাগ পেয়ে থাকেন ৮১-১০০ টাকা
২৫.৪ " " " ১০১-১২০ "
২২.১ " " " ১২১-১৪০ "

১৯৬৬ সনের হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকের গড় বেতন মাথাপিছু বাৎসরিক ১০৪৬ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৮৭.১৬ টাকা মাত্র।

সহজেই অনুমান করা যায় যে এই পারিশ্রমিকে ভদ্রভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করা যায় না এবং আদর্শবান শিক্ষকও হওয়া যায় না। শিক্ষার মান যে ক্রমেই নেমে আসছে, এ বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কোঠারি কমিশন বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তাই বা কত? অস্নাতকদের জন্য ১৫০—২৫০ টাকা (এবং শতকরা ১৫ জন বিশেষ নির্বাচিত শিক্ষকের জন্য ২৫০—৩০০ টাকা); স্নাতকদের জন্য ২২০—৪০০ টাকা (বিশেষ হার ৪০০—৫০০)। **এই বেতনও হবে মহার্ঘভাতা সহ।** যদিও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে মহার্ঘভাতা সময়ে সময়ে পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তবুও একথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের বেতনক্রম একবার খুঁটি গেড়ে বসলে রাজপথে আন্দোলন ছাড়া আর তাকে নড়ানো যায় না। যদিও বিভিন্নরাজ্যে "ট্রিপল্ বেনিফিট" স্কীমের কথা বলা হয়েছে, তবুও সর্বত্র চালু হয়নি। শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তাও প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। কোঠারি কমিশনের সুপারিশ কিন্তু এখনও "সুপারিশ" মাত্র। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাটি অনুভব করা যায়।

পরিকল্পনার যুগে শিক্ষার প্রসার

তবুও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৪৬—৪৭ সনে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১০৪৯৬৬টি। ৬—১১ বছর বয়সের শিশুদের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ বিদ্যালয়ে যেতো; এদের মধ্যেও শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির আগেই পড়া ছেড়ে দিত।

আমাদের সংবিধানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার আছে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। কিন্তু সংখ্যাগত প্রসার হয়েছে, যেমন—

১৯৪৭ সনে প্রাথমিক+বুনিয়াদি স্কুল সংখ্যা—১৭২০০০,

১৯৫০—৫১ " " " " ২ লক্ষ,

১৯৬০—৬১ " " " " ৩৩০০০০

১৯৬৮ " " " " ৪০৮৯৩০

(অবশ্য এর মধ্যে এখনও বহুসংখ্যক "একশিক্ষক স্কুল" আছে)।

৬—১১ বছরের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ভুক্ত হয়েছে ১৯৫১ সনে ৪২'৬ ভাগ,

১৯৫৬ ,, ৫২'১ ,,

১৯৬১ ,, ৬২'৪ ,,

১৯৬৬ ,, ৭৬'৪ ,,

বর্তমানে—৮০ ভাগের বেশী।

এবং ১৯৭১ সনে সম্ভাব্য ৮২'২ ভাগ।

শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার ১৯৫১ সনে ৫৮'৮

,, ,, ১৯৫৬ ,, ৬১'২

,, ,, ১৯৬১ ,, ৬২'১

,, ,, ১৯৬৬ ,, ৭৩'৯

পরিকল্পনা খাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল—

প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬)=৮৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় ,, (১৯৫৬-৬১)=৯৫ ,, ,,

তৃতীয় ,, (১৯৬১-৬৬)=২০৯ ,, ,,

চতুর্থ ,, (১৯৬৯-৭৪) সম্ভাব্য=৩২২ কোটি টাকা।

বুনিয়াদি শিক্ষার অগ্রগতি

বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব এবং নীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। (প্রথম পর্বে ৭৯-৮১ পৃষ্ঠা দেখ)। বুনিয়াদি শিক্ষা চেতনার বিবর্তনও আগে আলোচিত হয়েছে। (প্রথম পর্বে ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)। বর্তমানে আমরা আলোচনা করছি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত নিম্ন-বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার।

সর্বভারতীয় হিসেবে ১৯৫০-৫১ সনে নিম্ন-বুনিয়াদি বিদ্যালয় ছিল ৩৩৩৪৯টি; ১৯৫৬-৫৭ সনে ৪২৯৭১টি; ১৯৬০-৬১ সনে ৬৫৮৯১টি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে দশ বছরের মধ্যে বহু সংখ্যক বুনিয়াদি স্কুল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নীচের হিসেব থেকেই বোঝা যাবে যে তুলনামূলকভাবে এই প্রসার অল্প।

১৯৫০-৫১ সনে ভারতে প্রাথমিক স্তরের মোট স্কুল সংখ্যা ২০৯৬৭১টি।

,, ,, ,, ,, ,, ৩৩০৩৯৯টি।

সুতরাং দশবছরে নূতন স্কুল হয়েছে মোট ১৩০৭২৮টি
কিন্তু এর মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০২১৮৬টি
এবং নিম্ন বুনিয়াদি " ২৮৫৪২টি।

সুতরাং **বুনিয়াদির তুলনায় সাধারণ স্কুল স্থাপিত হয়েছে প্রায় চারগুণ।** যখন বুনিয়াদি শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষার রূপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন এই পরিস্থিতি বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে।

বস্তুতঃ **এই ব্যর্থতার কারণও আছে।** বুনিয়াদি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ। পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনুবন্ধ তৈরী করা বেশ শক্ত। তাছাড়া অনুবন্ধের মধ্যে সকল পাঠ্য বিষয়কে সমভাবে গ্রহণ করাও যায় না। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ানোর জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষণ ব্যবস্থায় তেমন দক্ষতা নিয়ে শিক্ষকরা তৈরী হন না। প্রকৃত বুনিয়াদি পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকও তৈরী হয়নি। আবশ্যিকভাবে হিন্দীশিক্ষার উপর গুরুত্বকে সমস্তগুলি রাজ্যে সুনজরে দেখা হয় না। ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বর্জন করার নীতিও সমালোচিত হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার সমতার প্রশ্ন এবং বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের প্রশ্নও জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় অতি সামান্য। তাছাড়া বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগে হস্তশিল্পকে অবলম্বন করে সমস্ত শিক্ষা অগ্রসর হওয়ার কথাটিও সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননি। তাই শহরাঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটতে পারেনি। সম্প্রতিকালে অবশ্য পাঠ্যক্রমের সংস্কার হয়েছে এবং শিল্পকেন্দ্রিকতার বদলে কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু **এখনও বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থ নৈতিক জীবনধারার সঙ্গে এই কর্মকেন্দ্রিকতা সম্পৃক্ত হতে পারেনি।**

প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি ধাঁচের করা এবং সাধারণ প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ব্যবধান কমাবার কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ **বুনিয়াদি শিক্ষার প্রশ্নটি হয়েছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সমস্যা,** না একে রাখা যায়, না ত্যাগ করা যায়। যাই হোক, বর্তমানে আর এবিষয়ে বাড়াবাড়ি তেমন নেই। কোনরকমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোই এখন কর্তৃপক্ষের মূলমন্ত্র। কোঠারী কমিশন অবশ্য বলেছেন যে, কোন বিশেষ স্তর কিম্বা বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাকে

"বুনিয়াদি" নামাঙ্কিত করে সমস্যাকীর্ণ হওয়ার বদলে কর্মপরিচিতির মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষার মূলমন্ত্র "উৎপাদনী কর্মকেন্দ্রিকতাকে' সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাই যদি সম্ভব হয়, তবে আর পৃথকভাবে বুনিয়াদি ব্যবস্থার জন্য অস্থিরতা থাকবেনা।

অর্থ—প্রশাসন—নিয়ন্ত্রণ—ব্যবস্থাপনা

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আছে, কারণ আমাদের সংবিধানে সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। সম্প্রতি সমসুযোগের নীতি এবং প্রাথমিক স্তর থেকেই "কমন স্কুল" প্রথা প্রবর্তনের রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ডও আছে। তা ছাড়া পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানও আছে। পরিকল্পনাখাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় এবং রাজ্য সরকার-গুলির মধ্যে বণ্টন করে সাধারণ ও বিশেষ খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমতা দূর করবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও সমতা আনবার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। সংবিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য সরকারগুলির এক্তিয়ারে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এজন্য শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে পরিদর্শক মণ্ডলী আছেন। স্থানীয় সেস ও রাজস্ব খাতে বরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সংকুলান হয়। সুতরাং এইসব স্থানে প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের।

রাজ্য সমূহে ব্যবস্থাপনা, আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সরকারী শিক্ষা বিভাগই এই দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য রয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরিদর্শক-মণ্ডলী। কোন কোন রাজ্যে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডও আছে। সেস্ থেকে আয়, কোন কোন রাজ্যে অন্যধরনের শিক্ষা ট্যাক্স প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং রাজস্ব খাতে সাধারণ বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার চূড়ান্ত প্রশাসক ও নিয়ামক যদিও রাজ্য সরকার, তবুও সব রাজ্যেই প্রশাসন ব্যবস্থাটি কম-বেশী বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রের কার্যকারিতা সকল ক্ষেত্রে একরকম হয়নি। সাধারনতঃ জিলা, তহশিল ও শহর ভিত্তিতে কিম্বা সাম্প্রতিককালে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ভিত্তিতে প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংগঠিত। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন ব্যবস্থা, দায়িত্ব ও ক্ষমতার সীমা, আর্থিক সঙ্গতির উৎস, এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কারণ এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের আইনবিধিতে তারতম্য আছে। উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে প্রায় সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। সর্বজনীন আবশ্যিকতার আইন অবশ্য সর্বত্র সমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

ভবিষ্যতের চিন্তা

আমাদের সামনে যুগপৎ সমস্যা রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার এবং গুণগত উন্নতির। তা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। এই প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখেই কোঠারী কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে, (ক) প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হবে ছয় বছর বয়সে এবং চলবে একটানা ৭ কিম্বা ৮ বছর। (খ) পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্যের কথা মনে রেখে এই সময়টিকে ২ ভাগে ভাগ করা চলবে—৪ কিম্বা ৫ বছরের নিম্নপ্রাথমিক এবং ৩ কিম্বা ২ বছরের উচ্চপ্রাথমিক। নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাকে অবিলম্বে এবং উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈতনিক করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে থাকবে (ক) ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা, অথবা (খ) ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি স্তর সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য নিম্নরূপ।

নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দায়িত্বশীল এবং সার্থক নাগরিক-জীবনের ভিত্তিস্থাপন। বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বয়সের সকল ছেলেমেয়েকেই প্রচার এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক কার্যক্রমের সাহায্যে বিদ্যালয়ে আনতে হবে। শিশু জন্মের পরে বিদ্যালয়ে

ভর্তির সম্ভাব্য বছর হিসেব করে আগেই তালিকাভুক্ত করা চলতে পারে (Pre-Registration System)। প্রাথমিক স্তরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অপচয় এবং স্থিতিশীলতা রোধ করা। বর্তমানে যে সংখ্যক শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তার মাত্র ৫০ ভাগ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে এবং মাত্র ৩৮ ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে। অবশিষ্টাংশ শিশু মাঝপথে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষ করার পূর্বে কোন অপচয় না ঘটে এবং শতকরা ৮০ ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে।

প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের বোঝা হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়। নিম্ন-প্রাথমিক স্তরে ভাষা, প্রাথমিক গণিত এবং প্রকৃতিপাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে লিখন, পঠন, গণিত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-পাঠ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন যাপনের শিক্ষা। এই স্তরে কেবল মাতৃভাষায় দক্ষতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যাকে পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। সমাজবিদ্যাকে পৃথক পৃথক পাঠ্য হিসাবে উপস্থাপন না করে সমাজপাঠ-রূপে সমন্বিত ভঙ্গিতে উপস্থিত করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত খেলাধূলা এবং মুক্তাঙ্গন ব্যায়ামই হবে শারীরশিক্ষার পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র একটি ভাষাই শিখতে হবে। সেটি হবে মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা। তবে যদি মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা পৃথক হয়, তবে শ্রেণীতে ১০টি এবং বিদ্যালয়ে ৪০টি ভিন্নভাষী শিশু থাকলেই তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ রকম ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী থেকে কোন শিশু ঐচ্ছিকভাবে আঞ্চলিকভাষাও শিখতে পারবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অল্প বয়সের সব শিশুই সমভাবে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং নিম্নপ্রাথমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণীর জন্যই নির্দিষ্ট পূর্ব-নির্ধারিত মান (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) না রাখবার কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি শ্রেণীর শেষে বাৎসরিক প্রমোশন পরীক্ষার পরিবর্তে ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি 'Cycle' হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘতর প্রস্তুতির শেষে একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। তেমনি প্রয়োজনবোধে ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীকেও একটি চক্রহিসেবে

ধরা যেতে পারে। **পরীক্ষা সম্পর্কে এই নূতন সুপারিশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া সকল পরীক্ষাই হবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা।**

নিম্নপ্রাথমিক স্তরের শিশুকেও সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে **সমাজ-সেবার কার্যক্রম** প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সমাজবদ্ধ জীবন, শ্রেণীকক্ষ ও আঙ্গিনার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবিধান, বিদ্যালয় গৃহে চুণকাম বা রং লাগানো প্রভৃতি নানা ধরনের কাজের সাথে এবং গ্রাম-সমাজের সঙ্গে পরিচয়, সমষ্টি-উন্নয়নপ্রকল্পে অংশ গ্রহণ, অক্ষম বৃদ্ধ এবং শিশুর সাহায্য প্রভৃতি নানা ধরনের কাজেই শিশুরা উৎসাহ পেতে পারে।

সর্বোপরি **এই স্তরেও কর্মপরিচিতির** (Work Experience) **উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।** কাগজের কাজ, মাটির কাজ, সুতোকাটা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজকেই পাঠ্যক্রমের অংশ বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। এই প্রসঙ্গেই কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার মৌল পরিচয় হলো : (ক) উৎপাদনী কার্যক্রম, (খ) পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সৃজনশীল কাজ এবং পরিবেশের সমন্বয়সাধন, এবং (গ) বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ-স্থাপন। "Work Experience"-এর মাধ্যমে এই চরিত্র সমস্ত স্তরের শিক্ষাতেই পরিব্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। **সুতরাং কোন বিশেষ স্তরের কিংবা কোন বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়কে আর বুনিয়াদি শিক্ষা তথা বুনিয়াদি বিদ্যালয় বলে অভিহিত করার প্রয়োজন নাই।**

উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবিষয় হবে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও গভীর। এই স্তরে শিক্ষাদানের সুনির্দিষ্টতা আসবে এবং প্রণালীসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজও হবে বহুলাংশে নিয়মিত। পাঠ্যক্রমে থাকবে **মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা** এবং **রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী কিংবা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা (ইংরেজী)।** তৃতীয় একটি ভাষাকে ঐচ্ছিকভাবে নেওয়া চলবে। অঙ্ক এবং বীজগণিতের সমন্বয়ে হবে গণিতের পাঠ। **বিজ্ঞানের পাঠ হবে আরও সুনির্দিষ্ট।** পঞ্চম শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ বিজ্ঞান, ভূমিবিদ্যা এবং প্রাণি-বিজ্ঞান; ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং প্রাণিবিজ্ঞান; সপ্তম

শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান। **বিজ্ঞান পাঠকে পৃথক পৃথক বিষয়ের পাঠ-হিসাবেই দেখতে হবে।** তেমনি মিশ্রিত সমাজবিদ্যার পরিবর্তে **ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান** প্রভৃতিও হবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত। এই স্তরে মানসিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এ সবের সঙ্গে থাকবে সাধারণ কোন শিল্প ও কলাশিক্ষা।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরে **সমাজসেবার জন্য** থাকবে বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ, এবং জনস্বাস্থ্য এবং সমষ্টি উন্নয়নমূলক কাজ। **কর্মপরিচিতির জন্য** থাকবে বাঁশ ও বেতের কাজ, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প, তাঁতের কাজ, বাগানের কাজ কিংবা খামারের কাজ। **অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্নত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।** পাঠ্যবস্তুর গভীরতর অধ্যয়ন কিংবা অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে যারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করতে আর্থিক কিংবা অন্য কোন কারণে সক্ষম হবে না, তাদের জন্য থাকবে **বিকল্প আংশিক সময়ের বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা।** ছাত্রদের প্রবণতা অনুসারেই বৃত্তিশিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবে। প্রথমাবস্থায় বৃত্তিশিক্ষায় যোগদান হবে ঐচ্ছিক। তবে লক্ষ্য থাকবে ১৯৭৫-৭৬ সনে শতকরা ১০ জন এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে শতকরা ২০ জনকে আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরেও **পরীক্ষা হবে আভ্যন্তরীণ।** তবে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে থাকবে মৌখিক পরীক্ষা এবং Cumulative Record card-এর ব্যবস্থা। কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না, তবে শিক্ষার মান-সমীক্ষার জন্য রাজ্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ উন্নত ধরনের কোন পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন। **জেলাভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ চলতে পারে।** তবে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট এবং Cumulative Card দেবেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃত্তি দানের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যেও **বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া চলতে পারে।**

নিম্নপ্রাথমিকের তুলনায় উচ্চপ্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় গড়বার সমস্যা গভীর। সর্বভারতীয় হিসেবে প্রতি তিন শত অধিবাসীর জন্যই গড়ে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রতি ৫টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আছে মাত্র একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়। সুতরাং উচ্চপ্রাথমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে এই

স্তরে আরও অনেক বিদ্যালয় যোগান দিতে হবে। তাই নির্দিষ্ট স্তরের শতকরা কত শিশুকে কোন সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে আনতে হবে তার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে নিম্নানুরূপ ভাবে:

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
নিম্ন-প্রাথমিক(I-IV)	৭৬·৪%	৯২·০%	১০০%	....	....
উচ্চপ্রাথমিক (V-VII)	২৯·৮%	৫০·৭%	৬৯·২%	৮২·৩%	৯০·০%

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম এবং পাঠপদ্ধতি সম্পর্কে সর্বভারতীয় পটভূমিতে যে আলোচনা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা থেকে বিশেষ তারতম্য নেই। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার যে ভাষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে। শহরাঞ্চলে সরকারী সাহায্যহীন অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ইংরেজীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনেকগুলিই ইংরেজীর মাধ্যমে পরিচালিত। তাছাড়া সাধারণ স্কুলেও তৃতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজী পড়ানো হয়ে থাকে। কোন কোন স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী প্রচলিত। প্রাথমিক স্তরের ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি—প্রায় সব কয়টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকও রাষ্ট্রায়ত্ত।

স্কুলের শ্রেণীবিভাগ

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে নানা ধরনের। শহরাঞ্চলে আছে ৮ ধরনের স্কুল যেমন, (ক) মিউনিসিপ্যাল ফ্রি-প্রাইমারী, (খ) বিস স্কীমের বিদ্যালয়। (এগুলি বেসরকারী সহায়তার ভিত্তিতে অনগ্রসর অঞ্চল কিম্বা শিল্পাঞ্চলে পরিচালিত)। কুলটি, বার্ণপুর এবং জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চলে এখনও এই ধরনের স্কুল আছে। পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি। (গ) সরকারী স্পনসর্ড ফ্রি-প্রাইমারী। এগুলি প্রথমে বাস্তুহারা বিভাগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন, যদিও প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান হয় বাস্তুহারা বিভাগ থেকেই। (ঘ) নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই মত, যদিও ড্রইং সুতো কাটা, মাটির কাজ প্রভৃতির সুযোগ কিছু কিছু আছে। (ঙ) সহশিক্ষামূলক

বৈতনিক প্রাইমারী কিম্বা কে.জি.। সরকার থেকে এরা ঘাটতি পূরণ বাবদ অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। (চ) সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যক্তিগত কিম্বা প্রতিষ্ঠানগত প্রাইমারী কিম্বা কে.জি.। এরা সরকারী সাহায্যও গ্রহণ করেনা, সরকারী অনুমোদনও চায় না। (ছ) উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ। এখানে বেতনের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে কোনটি সাহায্যপ্রাপ্ত, কোনটি সাহায্যহীন। (জ) উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপরে বর্ণিত শহরাঞ্চলের ৮ ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে **প্রথম চার ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক, অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈতনিক**। গ্রামাঞ্চলে স্কুল ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আরও বেশী। **গ্রামে আছে ১২ ধরনের বিদ্যালয়, যেমন**—(ক) জিলা স্কুলবোর্ড পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক, (খ) ১৯৫৪-৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ক্যাডার স্কুল, (গ) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্নবুনিয়াদি। এই স্কুলের সব শিক্ষককেই বুনিয়াদি শিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। (ঘ) আংশিক বুনিয়াদি। এই সব স্কুলে শিক্ষকদের একটি অংশ বুনিয়াদি শিক্ষণপ্রাপ্ত হলেই চলে। (ঙ) উন্নত প্রাইমারী (improved primary)। এ ক্ষেত্রে কেবল প্রধান শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত হলেই চলে। (চ) বিস্ স্কীমের স্কুল। অনগ্রসর অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত। (ছ) স্থানীয় উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় সরকারী স্পনসর্ড স্কুল, পরিচালনা জেলা স্কুলবোর্ডের। (জ) কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত চার শ্রেণীর জন্য "দুই শিক্ষকের স্কুল", পরিচালনা জেলা স্কুল বোর্ডের, (ঝ) ১৯৫৭ সন থেকে পরিকল্পনার যুগে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত চার ক্লাশের "এক শিক্ষক বিশিষ্ট" স্কুল, (ঞ) সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী ট্রাষ্ট স্কুল, (ট) মাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ, এবং (ঠ) সম্পূর্ণ বেসরকারী মুনাফা শিকারী প্রাথমিক স্কুল।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার কথা। পুরুলিয়া জেলা এতদিন পর্যন্ত আইনের বাইরে ছিল, সম্প্রতি এখানেও অবৈতনিক শিক্ষার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। **কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলের ৬-১১ বছরের শতকরা ৬০ জন শিশু অবৈতনিক শিক্ষা**

ব্যবস্থার বাইরে। এই রাজ্যের গ্রাম সংখ্যা ৩৮৪৭১; এর মধ্যে ৩২০০০টি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল আছে। অর্থাৎ ৬০০০ গ্রাম এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্জিত।

শহরাঞ্চলের অবস্থা বোধ হয় আরও খারাপ। ১৯৬৩ সনের আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অধিকার এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়, এবং এ জন্য শতকরা ২ ভাগ সেস্ বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু খড়দহের মত স্বল্প সংখ্যক মিউনিসিপাল অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। **এই রাজ্যে ৮৮টি মিউনিসিপালিটির মধ্যে মাত্র ১৭টিতে অবৈতনিক শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।** বাস্তব সাফল্য অবশ্য আরও কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে আসানসোলের কথা।

আসানসোল শহরে ১৯৬৩ সনে মিউনিসিপাল স্কুল ছিল ৪টি এবং বেসরকারী ৩৩টি। আইন পাশ হওয়ার পরে এগুলির মধ্যে মাত্র ১৬টির দায়িত্ব মিউনিসিপালিটি গ্রহণ করেছে। সুতরাং এখনও আসানসোলের ৩৭টি স্কুলের মধ্যে মিউনিসিপাল স্কুল হলো মাত্র ২০টি। তেমনি **বর্দ্ধমান শহরে** ৪০টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১২টি স্কুল মিউনিসিপালিটির। **বোলপুর শহরকে** এতদিন প্রচার করা হয়েছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্ররূপে। সেখানে মিউনিসিপাল স্কুল ছিল ৮টি। বাড়ী তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ঐ মিউনিসিপালিটি স্কুলগুলির দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা প্রায় কমবেশী এইরকম।

এবার বলছি খাস কলকাতার কথা। শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান **এই মহানগরীর ৬—১১ বছরের শিশুদের মধ্যে ৭৩ ভাগের জন্য "নামকেওয়াস্তে" স্কুলব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে ঐ বয়সের ১২৫০০০ শিশু স্কুলে যাওয়ার কোন সুযোগই পায়না।** কর্পোরেশনের স্কুল আছে মোট ২৫৪টি। অন্যান্য ধরনের স্কুল আছে ১০০০। এর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক হলো সরকারী ফ্রি-প্রাইমারী—বাস্তহারা অধ্যুষিত অঞ্চলে। কিছু আছে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। অনেকগুলি হলো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিভাগ। এগুলি বৈতনিক (বেতনের হার দুই থেকে সাত টাকা)। আর ব্যক্তিগত কিম্বা প্রতিষ্ঠানগত মালিকানায় আছে অনেক স্কুল। অনেক

"ইংলিশ-মিডিয়াম" স্কুল এই শ্রেণীর। এরা সরকারী সাহায্যের তোয়াক্কা রাখে না এবং নিয়ন্ত্রণও মানে না। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় অনমুমোদিত স্কুল আছে কমপক্ষে ২০০টি। এই হিসাবের বাইরে অলিগলি বস্তিতেও আছে কিছু "স্কুল" নামীয় কেন্দ্র। হিন্দী ভাষাভাষি অনেক দরিদ্র শিশুর শিক্ষাসাধনা এইসব "স্কুলেই" চলে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি

অবশ্য স্বাধীনতার যুগে আশানুরূপ না হলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাইমারী এবং বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার তথ্য থেকেই এ জিনিস পরিষ্কার হবে।—

	স্কুল সংখ্যা	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা
১৯৪৭—৪৮ সন	১৩৯৫০	১০৪৪১১১	৩৫৪৩০
১৯৫৫—৫৬	২৩০৮১	২৭৯০৩৭	৬৯১৭৪
১৯৬০—৬১	২৭৯৭২	২৬৩৪৯৮৯	৮৩৭৩২
১৯৬৮—৬৯	৩৪০০০	৪২০০০০০	১১২০০০

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের যোগ্য শিশু সংখ্যা ৫২ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ৪২ লক্ষ বর্তমানে শিক্ষার (যে কোন ধরনেরই হোক) সুযোগ পাচ্ছে। বাকি ১০ লক্ষ সম্পূর্ণই শিক্ষা-বঞ্চিত। যারা সুযোগ পাচ্ছে—তাদের মধ্যেও ৩২ লক্ষ শিশু বিনা বেতনে পড়তে পায়, বাকি ১০ লক্ষকে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য স্কুলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সর্বভারতীয় গড় হিসেবে ভারতবর্ষে প্রতি ১ মাইল ব্যাসার্দ্ধ অঞ্চলে, অর্থাৎ ৩·১৪ বর্গমাইল এলাকায় একটি করে প্রাথমিক স্কুল আছে। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৪০০০ বর্গমাইল এবং এখানে স্কুল সংখ্যাও ৩৪ হাজার। সুতরাং গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১টি স্কুল আছে। এই হিসেবটি সর্বভারতীয় গড়ের তিনগুণ। কিন্তু (১) এখনও এই রাজ্যে ছেলেদের ৯৩% এবং মেয়েদের ৭০% স্কুলের সুযোগ পেয়েছে, (২) এখনও বহু অঞ্চলে (অন্ততঃ ৬০০০ গ্রামে) কোন স্কুল নেই। (৩) ৩৪ হাজার স্কুলের মধ্যে ৩০ হাজারই চার ক্লাশের স্কুল (৪) এর মধ্যে অনেক আছে এক কিম্বা দুই শিক্ষকের স্কুল, (৫) অন্যসকল রাজ্যে অবৈতনিক

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে হয়নি (৬) চতুর্থ অর্থ কমিশনের কাছে আবেদন পত্রে ১৯৬১ সনেই তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করেছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান থেকে এই রাজ্য নেমে গিয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে স্থানটি আরও নেমে গেছে। (৭) এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয় ঘটে ৩৪.৮% (৮) পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার মাদ্রাজ, কেরল, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে কম। বুনিয়াদি শিক্ষাও এই রাজ্যে আশানুরূপ প্রসারিত হয়নি। (এ বিষয়ে প্রথম পর্বের ৮৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা দেখ)। নীচের তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকেই একথা পরিষ্কার হবে।

১৯৫৫—৫৬ থেকে ১৯৬০—৬১ সনের মধ্যে স্কুল প্রভৃতি বেড়েছে :—

	স্কুল	ছাত্র	শিক্ষক
বুনিয়াদি =	৯৯৪	৯৯৬০৯	৩৬৭৬
সাধারণ প্রাইমারী =	৩৮৯৩	৩৫৬৩৪০	১০৮৮২

উপরোক্ত তথ্য থেকেই প্রমানিত হয় যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবদিকেই বুনিয়াদি শিক্ষার চেয়ে সাধারণ প্রাইমারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে "দায়িত্ব পূরণের তাগিদে" আমরা যেমন তেমন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছি। গ্রাম ও সহরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা থেকে (আগে আলোচনা করা হয়েছে) আমরা প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে পারি। (প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে প্রথম পর্বে ৮৮—৯২ পৃষ্ঠায়)।

ভবিষ্যতের সমস্যা ও পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির যোগ্য শিশুর সংখ্যা প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে গড়ে ১৫০০০০। এখন যে ১০ লক্ষ শিশু শিক্ষায় বঞ্চিত, তাদেরকে স্কুলে আনবার জন্য প্রয়োজন আরও ২ হাজার স্কুল এবং এ জন্য প্রয়োজন আরও ২৫ হাজার শিক্ষক। তা ছাড়া প্রতি বছরে অতিরিক্ত শিশুর সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা কালে আনুমানিক আরও ১৮ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুল চাই। তাহলে ৬—১১ বছরের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যাবে। খসড়া পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যই স্থির করা হয়েছে। (২) বর্তমানে কেবল ৩২ লক্ষ শিশু অবৈতনিক শিক্ষা পায়। পরিকল্পনার

খসড়ায় ৪২ লক্ষের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। (৩) চার-ক্লাশ স্কুলের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশকে পাঁচ ক্লাশে উন্নীত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। (৪) অপচয় হার কমানোর কথা বলা হয়েছে। (৫) শিক্ষার উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থাকে উন্নত করা হবে। (৬) শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার এবং শিক্ষকদের বেতনক্রম আরও সংশোধনের আশা পোষণ করা হয়েছে।

খসড়া পরিকল্পনায় ১৯৬৯—১৯৭২ সনে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা, এবং এই টাকার ৪৫ ভাগই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের আশা পোষণ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ৪৫ কোটির মধ্যে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসের জন্য, ৩ কোটি টাকা স্কুল বাড়ীর জন্য, ৩ কোটি টাকা শিক্ষক শিক্ষণের জন্য এবং ১২ কোটি টাকা বই ও উপকরণের জন্য। পরিকল্পনা খাতে এই বরাদ্দ ছাড়াও সাধারণ রাজস্ব খাতে আরও ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। বস্তুতঃ উপরে আলোচিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে পারলে ভবিষ্যতে সুফল আশা করা যায়। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য ১৯৭০ সনের মধ্যেই সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার (১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম, পুস্তক, স্কুল গৃহ, সরঞ্জাম, শিক্ষক, প্রশাসন এবং সর্বোপরি অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতির সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বমূলক বক্তব্য খুব দোষাবহ নয়। সর্বশেষে কোঠারী কমিশন বলেছেন এই স্তরের শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্য হবে দায়িত্বশীল এবং সার্থক নাগরিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন। পাঠ্যক্রমে গ্রহনীয় বিষয় সম্বন্ধেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য নেই। কোঠারী কমিশন সুপারিশ করেছেন যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে লেখা, পড়া অঙ্ক, প্রকৃতিপাঠ ও সমাজ (পরিবেশ) পাঠ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন যাপনের শিক্ষা। এজন্য থাকবে খেলাধূলা এবং মুক্তাঙ্গনে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত। মাতৃভাষায় দক্ষতায়

প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ভাবে মাত্র মাতৃভাষাই শিখতে হবে।

সমাজচেতনা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যক্রমের অবশ্য অঙ্গ হিসেবে থাকবে **সমাজ-সেবার কাজ** (যতটুকু শিশুদের পক্ষে সম্ভব)। তা ছাড়া নানাধরনের হাতের কাজের মধ্য দিয়ে **কর্মপরিচিতিও** হবে পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমস্যা ও সমাধান

কিন্তু আমাদের বিঘোষিত উদ্দেশ্য যতখানি তত্ত্বাশ্রয়ী ততখানি বাস্তবধর্মী নয়। **উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য যে ধরনের পাঠ্যক্রম প্রয়োজন তাও আমাদের নেই**। প্রথমতঃ ছোট শিশুদের তুলনায় **পাঠ্যক্রম ওজনে ভারী**। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে শিশুদের ৮ থেকে ১২ খানা বই পড়তে হয়। পাঠ্যবইগুলি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে দেখা **শুষ্ক তথ্যবস্তুতে ভারাক্রান্ত**। (ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বইগুলির দিকে তাকালেই একথা বোঝা যাবে)। পাঠ্যক্রমে **অনুবন্ধের প্রয়োগও অত্যন্ত অল্প**। বস্তুতঃ আমাদের পাঠ্যক্রম **বাচনধর্মী** এবং **নিষ্ক্রিয়**; শিশুদের **প্রয়োজন এবং আগ্রহভিত্তিক নয়**; শিশুদের কর্মমুখরতার সুযোগ সীমাবদ্ধ, **আত্ম শিক্ষার সুযোগ আদৌ নেই**; প্রকৃত শারীর শিক্ষা অবহেলিত, ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সুযোগ সীমিত; সহযোগিতামূলক কাজের সুযোগ নেই; মনের শিক্ষা ও সৌন্দর্যপ্রীতি জাগানোর উপায় নেই; এই পাঠ্যক্রমে **নমনীয়তারও অভাব**। এক কথায় এই পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক এবং জীবনকেন্দ্রিক নয়। সুতরাং এই সমস্যাটি সামাধানের জন্য আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক পরিবেশন সমস্যার কথাও না বলে পারা যায়না। রাষ্ট্রায়ত্ত বইগুলিতে এমন সব ভাষাগত কারিগরি আছে, যা শিশুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অনেক সময় বিষয় বস্তুতেও ভুল দেখ যায়। শিশুপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত নীতির বিরুদ্ধে এই বইগুলির কাগজ খারাপ, ছাপা ও সজ্জা আকর্ষনীয় নয়, ছবি ম্যাপ প্রভৃতিও শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করেনা। সর্বোপরি পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থাটি লজ্জাজনক। বছর সুরুর পরেও তিনমাস পর্যন্ত বই মেলেনা, শিক্ষকরা অযথা হয়রান হন। অথচ রহস্যজনক ভাবে সরকারী পুস্তকের ঢালাও চোরাবাজার চলে। সুতরাং এই সমস্ত দিকে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

পাঠ্যক্রম সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাধান প্রয়োজন ভাষা সমস্যার। বিভিন্ন স্কুল নিজ নিজ ইচ্ছেমত ভাষামাধ্যম নির্ধারণ করছে, শিক্ষনীয় ভাষার তালিকা প্রনয়ন করছে এবং কোন ক্লাশ থেকে কোনটি আরম্ভ করা হবে, তাও স্থির করছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমগ্র রাজ্যে একটি সাধারণ নীতি অনুস্থত হওয়া দরকার, নতুবা শিশুদের মধ্যে ভবিষ্যতে শিক্ষাগত এবং সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে এবং "কমন স্কুল" আদর্শ ই ব্যর্থ হবে।

পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রশ্নটি জড়িত। সহপাঠ্য-ক্রমিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা, প্রকারভেদ এবং পরিকল্পনার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক "ভাগ্যবান" স্কুল ছাড়া খেলা-ধূলো আনন্দ অনুষ্ঠানের কোন বন্দোবস্তই সাধারণ প্রাইমারী স্কুলে নেই। এই কার্যক্রম অনতিবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত এবং এজন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে শিক্ষক সমাজ সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যসভা, আবৃত্তি, দেয়ালপত্র, 'হবি ক্লাব', 'হাউস সিষ্টেম', গ্রামসেবা, সাধারণ খেলাধূলো, স্থানীয় ভ্রমণ, চড়ূইভাতি, বিদ্যালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান এবং ঐ সূত্রে অংকন ও অন্যান্য হাতের কাজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে পারেন। এই কাজগুলি খুব ব্যয় সাপেক্ষও নয়। সাধারণ ব্যয় সংকুলানের জন্য অভিভাবক এবং শিক্ষাদরদী ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করাও চলতে পারে।

শিক্ষার আদর্শ ও পাঠ্যক্রমে ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী পরিনতি রূপে রয়েছে পাঠপদ্ধতির ত্রুটি। প্রাইমারী স্কুলের পড়া এখনও মুখস্থ-প্রধান। অঙ্ক, হস্তাক্ষর এবং বানান ও উচ্চারণভঙ্গির অনুশীলনও (Drilling) নেই। প্রগতিশীল কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং খেলার আবহাওয়ায় পড়বার আদর্শ আমাদের স্কুলগুলি থেকে নির্বাসিত। সুতরাং শৃঙ্খলা ও পড়াশুনার জন্য শিক্ষকের সহায়ক হিসেবে এখনও বেত্রদণ্ডের ভূমিকা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশগত সৌন্দর্য নেই, এবং পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শিশুদের কাছে আকর্ষনীয় অন্যান্য বইয়ের কোন ছোটখাট লাইব্রেরীর কথা ভাবা আমাদের সাধারণ প্রাইমারী স্কুলগুলির পক্ষে বিলাসিতা বিশেষ। এই অবস্থারও আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

সাধারণ প্রাইমারী এবং বুনিয়াদি স্কুলের মধ্যে ব্যবধান এখনই দূর করা উচিত। তত্ত্বগতভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল (১) স্বাস্থ্যকর সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভ্যাস

ও দক্ষতা, (২) তত্ত্বে ও ব্যবহারে নাগরিক শিক্ষা, (৩) খাদ্য বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা (৪) এই উদ্দেশ্যে একটি মৌলিক হস্তশিল্প, মাতৃভাষা, আবশ্যিক হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, পৌরচেতনা ও সমাজপাঠের সমন্বয়ে অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠ্যক্রম। (৫) বিজ্ঞান ও গণিতের উপর বিশেষ গুরুত্ব।

কিন্তু বাস্তবে যে আমরা **প্রকৃত বুনিয়াদি শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছি** একথা অকপটে স্বীকার করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে **একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, এবং পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।**

শিশু স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, কারণ শিশুর দৈহিক ক্রমবৃদ্ধি নিশ্চিত করা প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু কলকাতা শহরে সমীক্ষালব্ধ পরিসংখ্যানে প্রমানিত হয়েছে যে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীর প্রায় অর্ধাংশই অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা এবং অন্যান্য রোগে ভোগে, শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় মেরুদণ্ডের বক্রতা, টনসিল ও অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের ব্যাধি, দাঁতের অসুখ, কানপাকা, দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তির ক্ষীনতা, রক্তশূন্যতা, হৃদরোগ প্রভৃতি। এগুলির অধিকাংশই ঘটে উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে। তা ছাড়া শিশুরা কাঁসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চর্মরোগ প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগেও ভোগে। পেটের অসুখ একটি সাধারণ ব্যাধি। সর্বোপরি প্রতিষেধক না লওয়ায় জলবসন্তও হয় হামেশা। এই সব রোগব্যাধির ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যহানিই শুধু ঘটেনা, বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির ফলে পড়াশুনাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—(১) স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অভ্যাস গঠন, (২) উপযুক্ত ব্যায়াম এবং আনন্দদায়ক শরীর চর্চা (ব্যক্তিগত এবং দলগত), (৩) পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় পরিবেশ, (৪) আলোবাতাস পূর্ণ ঘর, পায়খানা, বাথরুম, পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ (৫) নিয়মিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা, (৬) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতামাতাকে অবহিত করা, চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা, (৭) এ জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং সার্বিক স্কুল হেল্থ্ সার্ভিস এবং স্কুল ক্লিনিক, (৮) স্কুলে খাদ্য কিম্বা পুষ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যবস্থা।

অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে দীর্ঘকাল যাবত বিদ্যালয়ে শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে আইন আছে, চিকিৎসা এবং প্রয়োজন বোধে ওষুধ ও পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এবং বাধ্যতামূলক স্কুল খাদ্য কিম্বা টিফিনের নিয়ম আছে। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে **স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের শিশুরা ভাগ্যের হাতেই সমর্পিত।** চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা দূরের কথা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও নেই, এমনকি শরীর চর্চা এবং খেলাধূলোর সুযোগই নেই, দরিদ্র পিতামাতাও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। খাদ্য ও টিফিন ব্যবস্থাও তথৈবচ। যারা সক্ষম, তেমন বাড়ীর শিশুরা টিফিন নিয়ে যায়। কোন কোন উৎসাহী স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের চাঁদার ভিত্তিতে কিঞ্চিৎ টিফিন সরবরাহ করে থাকেন (পরিমাণ ও খাদ্যপ্রাণের প্রশ্ন না তোলাই ভাল), আর কোন কোন সময় রেডক্রশ, "কেয়ার" প্রভৃতি সংস্থার খয়রাতি সাহায্যের ভিত্তিতে দুধ কিম্বা টিফিন বিতরণ করা হয়ে থাকে। (এই খাদ্য প্রস্তুত করা এবং হিসেব দাখিল করার ব্যাপারটিও শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত বোঝা)। সুতরাং এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য **সরকারী ও বেসরকারী গণপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সুপরিকল্পিত ও সর্বাত্মক প্রয়াস দরকার। বিশেষ করে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে আইন প্রণয়ন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য।**

শিশু সমীক্ষা ও অভীক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের নেই। কোন্ শিশুর সীমিত সম্ভাবনা এবং কোন্ শিশু উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এই কথা জানা না থাকলে যথার্থ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। **অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশুদের সাহায্য করবার কোন সংগঠিত ব্যবস্থাও আমাদের নেই।** এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন **শিশু নির্দেশনা ব্যবস্থা** (Child guidance)।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যার সম্মিলিত ফলশ্রুতি হলো **প্রাথমিক স্তরে অনুত্তীর্ণতা এবং অপচয়ের সমস্যা।** অপচয়ের সমস্যাটি দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে একটি সর্বাত্মক সমস্যা। E.C.A.F.E'র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ যে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের ১৬ কোটি প্রাথমিক স্তরের শিশুর মধ্যে ৭ কোটিই স্কুলে লেখাপড়া করে না। যারা স্কুলে ভর্তি হয় তাদের মধ্যেও হতাশা, অশ্রদ্ধা ও ব্যর্থতার ফলে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু মাঝপথেই স্কুল ছেড়ে দেয়। এইভাবে ক্ষতি হয় বৎসরে প্রায় ১০ কোটি ডলার।

ঐ রিপোর্টেই **অপচয়ের কারণ** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (ক) জীবন-

যাত্রায় তাগিদে শিশুশ্রম, (খ) ভারী এবং অনমনীয় পাঠ্যক্রম, (গ) উপযুক্ত মানের এবং আকর্ষনীয় শিক্ষাপদ্ধতির অভাব, (ঘ) শিক্ষার উপকরণ এবং শ্রেণীকক্ষের সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব, এবং (ঙ) অপুষ্টি ও অন্যান্য সামাজিক কারণ।

অনুত্তীর্ণতার প্রশ্নটি অপচয়ের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। (ক) আমাদের বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষনীয় নয়, (খ) উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক প্রণালী পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই, (৩) বিদ্যালয়ের সাধারণ সরঞ্জামেরও অভাব রয়েছে (৪) পাঠ্যক্রম আকর্ষনীয় নয়, (৫) ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়া হয় না, (বিশেষতঃ এক শিক্ষকের স্কুলে), (৬) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম নেই, (৭) অপুষ্টি ও রোগের ফলে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার অত্যাধিক। অর্থাৎ শিক্ষায় স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং শিক্ষার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাবে শিশু কোন প্রেরণা পায় না। তার সঙ্গে ক্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে শিশুরা পরীক্ষায় অকৃৎকার্য হয়, এবং একাধিকবার ফেল করে হয়তো পড়াশুনা ছেড়েই দেয়।

এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য প্রয়োজন (ক) সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা এবং বিনামূল্যে বই ও সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা, (খ) শিশুশ্রম বিরোধী আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ, (গ) পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতির সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষোপকরণ সরবরাহ (ঘ) ব্যক্তিগত দৃষ্টি (ঙ) স্বাস্থ্যের প্রতি নজর, (চ) আকর্ষনীয় বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি (ছ) পরীক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার (এ সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি), (জ) শিক্ষকদের আদর্শপরায়ণতা এবং ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, (ঝ) খেলাধূলোর এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, (ঞ) পিতামাতার মধ্যে শিক্ষাচেতনা সঞ্চারের জন্য প্রচার।

শিক্ষক সমস্যা

এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ শিক্ষাগত এবং স্কুলের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করবো এমন একটি বড় সমস্যা যা অংশতঃ স্কুলের ভিতরের এবং অংশতঃ বাইরের সমস্যা। শিক্ষক সমস্যাটি এমনি একটি সমস্যা।

শিক্ষক সমস্যাটি বহুমুখী—যেমন (ক) শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য গুণাবলীর সমস্যা, (খ) শিক্ষক সংগ্রহ ও নিয়োগ, (গ) শিক্ষণের সাহায্যে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, (ঘ) বেতন ও অন্যান্য সুযোগ, (ঙ) শিক্ষক ছাত্রের হার (Teacher-pupil ratio) এবং (চ) শিক্ষকের হাতে উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ সরবরাহের সমস্যা।

প্রাথমিক স্তরের সার্থক শিক্ষক হওয়ার জন্য যে যে গুণ দরকার সেগুলি আমরা আগেই আলোচনা করেছি (১২৭ পৃষ্ঠায় দেখ)। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষার যে বেদনাদায়ক পরিবেশ, শিক্ষকের যে সামান্য বেতন এবং সামাজিক সম্ভ্রম, সেই অবস্থায় আশানুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়াই দুষ্কর। তাই বলে শিক্ষক দুষ্প্রাপ্য নন, কারণ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা আমাদের দেশে প্রবল। তাই ক্রমেই অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা গ্রহণ করছেন। তবে সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদর্শবান শিক্ষক পাওয়া ভার। তাছাড়া ব্যক্তিগত অপূর্ণতার ফলে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাও ক্ষতিকারক। সর্বোপরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত বিচার ছাড়া রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক এবং গোষ্ঠিগত প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বেসরকারী বিদ্যালয়ের চেষ্টা থাকে শিক্ষককে কত কম বেতনে নিযুক্ত করা যায়, কারণ সেক্ষেত্রে সরকারী বেতনক্রমের কোন মূল্যই নেই। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব নিয়োগ সংস্থা আছে এবং কমবেশী বেতনক্রম নির্ধারিত আছে। সরকারী বিদ্যালয়ে বেতনক্রম চালু, কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা স্কুলবোর্ডগুলির অধিকার ছিল। এই ক্ষেত্রে নানা ধরণের পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। শিক্ষকের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ শিক্ষকদের তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হয়—"ক" শ্রেণীতে আছেন ম্যাট্রিকুলেট এবং ট্রেইণ্ড ও ম্যাট্রিক ঊর্দ্ধ, "খ' শ্রেণীর অর্থ ম্যাট্রিকুলেট কিম্বা ট্রেইণ্ড, "গ" শ্রেণীতে আছেন ননম্যাট্রিক ও আনট্রেইণ্ড। (যদি ১৯৪৯ সনের আগে কাজে যোগ দিয়ে থাকেন, কারণ যারা ঐ সময়ের পরে যোগ দিয়েছেন তারা অনেক সুযোগ সুবিধে থেকেই বঞ্চিত)। কিন্তু বর্তমানে অনেক স্নাতকও প্রাথমিক শিক্ষকতা গ্রহণ করছেন।

এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি ক্রমাগত বাড়িয়ে নেওয়াই কাম্য। কিন্তু কর্ম্মরতদের যোগ্যতাবৃদ্ধির

সুযোগ দেওয়া দরকার, এবং প্রাপ্য সুবিধেগুলি থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাছাড়া "স্কুল মাদার" এবং ক্রাফ্‌ট্‌ শিক্ষকদের সম্পর্কেও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত আশু প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ সমস্যাটি বেশ জটিল। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণের হার অতি নীচে (১৯৬৬ সনেও ছিল মাত্র ৩৮·৩ ভাগ)। এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য জুলাই ও নভেম্বর মাস থেকে দুইটি সেশন (Session) প্রচলিত। প্রতি সেশনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ শিক্ষণকাল ক্যালেণ্ডারের হিসেবে একবছর। নির্বাচিত শিক্ষকদের গ্রহণ করা হয়। কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য এ্যালাউন্স ব্যবস্থাও প্রচলিত। কিন্তু জুলাই সেশনে কলেজের সংখ্যা শুধু পুরুষদের ৯টি, শুধু মহিলাদের ১টি এবং সহশিক্ষা-মূলক ৫টি ; নভেম্বর সেশনে কলেজের সংখ্যা পুরুষদের ৮টি, মহিলাদের ১টি সহশিক্ষামূলক ১৭টি। সুতরাং কলেজ ৪১টি। সম্প্রতি ৪টি নূতন কলেজ খুলবার সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু স্থাপিত হয়েছে একটি। তা ছাড়া এই রাজ্যে যে কয়টি সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ ছিল সেগুলিকে সম্প্রতি জুনিয়র বেসিক কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে। বেলতলা, সরিষা প্রভৃতি স্থানের কলেজগুলি এই শ্রেণীর। এইভাবেও কলেজের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গড়ে প্রতিবছর আনুমানিক মাত্র সাড়ে চার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং পাচ্ছেন। পুরাতন বহু কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন শিক্ষণহীন। তাছাড়া প্রতি বছর নূতন স্কুল খুলতে হবে, শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বর্তমানের অবস্থার বিচারে সকল শিক্ষকের শিক্ষণের আশা সুদূরের ব্যাপার। সুতরাং আরও অনেক ট্রেনিং কলেজ দরকার।

বর্তমানে প্রচলিত এক বৎসরের ট্রেনিং কালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়তে হয় ভাষা ও সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্কুল সংগঠন ও প্রশাসন এবং স্কুলপাঠ্য বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি। এর জন্য রয়েছে সাত শত নম্বর। তাছাড়া ক্লাশে পড়ানো, শারীর শিক্ষা, সুতোকাটা, বাগান করা, হাতের কাজ, শিশু অভীক্ষা, শিল্পকলা, সামাজিক কাজ, সঙ্গীত-নাটক, শিশুসাহিত্য রচনা প্রভৃতি প্রয়োগমূলক শিক্ষণের জন্য ১১০০ নম্বর। স্বভাবতঃই স্বল্প সময়ের জন্য এই পাঠ্যক্রম অত্যন্ত ভারী। তাছাড়া ব্যবহারিক যে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, স্কুল পরিবেশে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে

সেই শিক্ষা প্রয়োগ করার সম্ভাবনা ও সুযোগও সীমিত। **সুতরাং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষণ ব্যবস্থা অসাফল্যেও পূর্ণ। এই ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার প্রয়োজন।**

শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে বেশী বলবার প্রয়োজনই নেই। প্রথমতঃ বেতনহারের মধ্যে নানাধরণের অসঙ্গতি, অসমতা এবং শ্রেণীবিভাগ আছে। বেসরকারী, মিউনিসিপাল এবং সরকারী কিম্বা সাহায্যহীন বিত্থালয়ের ক্ষেত্রে বেতনহারের বৈষম্যতো আছেই, সরকারী বেতন হারের মধ্যেও নানা ধরণের স্তরবিভাগ রয়েছে। **সর্বোচ্চস্তরের বেতনও সমযোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের বেতনের তুল্য নয়।** এই বৎসরও বিভিন্ন শিক্ষক সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে (ক) সরকারী কর্মচারীদের হারে মহার্ঘভাতা, (খ) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেতন, (গ) গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নতুন বেতনহার' (ঘ) পৌরবিত্থালয়ের শিক্ষকদের সরকারী হারে বেতন, (ঙ) অস্বীকৃত বিত্থালয়গুলিকে সরকারী স্বীকৃতিদান এবং সরকারী বেতনক্রম প্রবর্তন প্রভৃতি। স্বল্পবেতনের এই শিক্ষকদেরকে আবার দূর-দূরান্তে বদলিও করা হয়। প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষায় শিক্ষকরা প্রায় কেহই পরীক্ষক নিযুক্ত হননা। স্বল্প আয়সম্পন্ন শিক্ষকদেরকে নানা বিকল্প পন্থায় আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। **তাই সামাজিক সম্ভ্রমের মানদণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থান অনেক নীচুতে,** কারণ বর্তমানের বণিকি সভ্যতায় অর্থ ই সামাজিক সম্ভ্রমের নিয়ামক।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান বেশ নীচু। এজন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্য-পুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষণের অসাফল্য যেমন দায়ী, তার সঙ্গে অন্যান্য কারণও কম দায়ী নয়। এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হলো **শিক্ষাসহায়ক উপকরণের অভাব।** অন্যান্য দেশে নানা ধরণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপকরণ ব্যবহৃত হয়। সেগুলির কথা বাদ দিয়েও সাধারণ চক, বোর্ড, ডাষ্টার, ম্যাপ, চার্ট কিম্বা শিশুদের কাছে প্রদর্শন যোগ্য বস্তুর নিতান্তই অভাব। এজন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাটি প্রায় শূন্যের কোঠায়। **সুতরাং এক্ষেত্রেও আমূল সংস্কার দরকার।**

সদিচ্ছা প্রণোদিত শিক্ষক ভাল পড়াতে চাইলেও পারেন না। উপকরণের অভাব ছাড়াও প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার চাপে তিনি ব্যতিব্যস্ত। **ব্যক্তিগত দেওয়া প্রায় অসম্ভব।** একজন কিম্বা দু'জন শিক্ষককে যেখানে চারটি

ক্লাশ পড়াতে হয়, সেখানে এই সমস্যার গভীরতা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ স্কুলেও শিক্ষক সংখ্যা ৪ কিম্বা ৫ জন। কলকাতা শহরে তিন শতাধিক ছাত্রের স্কুলে শিক্ষক থাকেন ৬।৭ জন। শিক্ষক-ছাত্রের হার একজনে প্রায় পঞ্চাশ জন। সুতরাং ব্যক্তিগত নজরের প্রশ্ন প্রায় অবান্তর। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ঘটলে অবস্থাটি চরমে পৌঁছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে স্কুল আছে ৩৪০০০ এবং শিক্ষক ১১২০০০। সুতরাং স্কুলপ্রতি গড়ে শিক্ষক ৩.৩ জন। প্রচলিত অবস্থাতেও আরও অনেক শিক্ষক প্রয়োজন।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলির সুমীমাংসা হলে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক সমস্যার কিছু সমাধান সম্ভব।

জমি—বাড়ী—আসবাবের সমস্যা

শিক্ষক সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন আমরা পিছিয়ে আছি, তেমনি পিছিয়ে আছি স্কুলের বাড়ী জমি ও আসবাবের ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচলিত ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কাছাকাছিও আমরা আছি কিনা, এ প্রশ্নও অবান্তর। গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্কুলঘর, শিক্ষিকাদের বাসস্থান, স্কুলমাঠ ও বাগানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির সম্পর্কে আইনগত বিধান আছে। স্কুল বাড়ীর প্ল্যানও সরকারী ব্যবস্থায় আছে। এজন্য ব্যয় হয় আগেকার হিসেবে আনুমানিক প্রায় ২৪ হাজার টাকা। স্বভাবতঃই অনুমান করা যায় যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য এই পরিমাণ প্রারম্ভিক ব্যয় করার ক্ষমতা সরকারী অর্থভাণ্ডারের নেই। তাই এই ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যম কমে গিয়েছে। তাছাড়া নির্ধারিত পরিমাণ জমি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দান হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি প্ল্যানমাফিক ঘর তৈরী করলে সেই ঘরে ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্রসংখ্যার স্থান সংকুলান অসম্ভব। ছাত্রপিছু দশ বর্গফুট জায়গার যে বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম আছে, এবং আলো বাতাস, পানীয় জল, খেলার মাঠ ও পায়খানা প্রভৃতির যে আদর্শ মান, সেই অনুসারে পরিচালিত বিদ্যালয় আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে।

বুনিয়াদির পরিবর্তে সাধারণ যে প্রাথমিক স্কুলগুলি গড়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রেও জমি ও বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগ দাবি করা হয়। মেটে ঘর, বাঁশের বেড়া, টিন অথবা টালির ছাউনি, ভাঙা পার্টিশনের বেড়া, গরু ছাগলের রাত্রি

যাপনের সুবিধার্থে দরজাহীন গৃহ—এই হলো অধিকাংশ স্কুল বাড়ীর অবস্থা। শহরাঞ্চলে অবস্থা আরও বেদনাদায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙা, অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর ঘরে বহুসংখ্যক শিশুকে গাদাগাদি করে বসিয়ে ফ্রি প্রাইমারী স্কুলগুলি পরিচালিত হয়।

গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে আসবাবপত্র সরবরাহ করেন জেলা স্কুলবোর্ড। ত্রিভঙ্গ আকারের দুমড়ানো অমসৃণ খারাপ কাঠের তৈরী দুটি আলমারী এবং দু'একখানা চেয়ার বেঞ্চিতে বিদ্যালয় সাজানো। খেলবার কোন সরঞ্জাম নেই। শিক্ষকদের বসবার সুবন্দোবস্ত নেই। কেরানীর কাজ সবই করতে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। দপ্তরি, আয়ার জন্য কোন বরাদ্দ নেই। শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যয়ের কোন অর্থবরাদ্দ নেই। শিশুদের পুরস্কার বিতরণের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করতে হয়। আনুষঙ্গিক সবরকমের ব্যয়ের জন্য "কণ্টিজেন্সি" বাবদ দেওয়া হয় গড়ে সর্বোচ্চ পনের টাকা। এই অবস্থায় উন্নতমানের পড়াশুনা যে হবে না, একথা সহজেই বোধগম্য।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বেসরকারী উদ্যোগ আহ্বান করা চলতে পারে, কিন্তু মূল দায়িত্ব সরকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য জমিবাড়ী আসবাব এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সুনির্দ্ধারিত নীতি এবং সেই নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন। এজন্য যে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন, তা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শিক্ষা প্রসারের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে যে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় বঞ্চিত, তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এজন্য অনতি-বিলম্বেই চাই কয়েক হাজার স্কুল এবং পঁচিশ হাজারেরও বেশী শিক্ষক। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও সমস্যা আছে। যেমন, (ক) একজন কিম্বা দু'জন শিক্ষকের অযোগ্য স্কুলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ স্কুলে রূপান্তরের সমস্যা, (খ) অনেক স্কুলে দুই সিফট্ চালু আছে; এবং তার ফলে কোন সিফটেই উপযুক্ত পঠণপাঠন সম্ভব হয় না। এই সমস্যারও প্রতিবিধান প্রয়োজন। (গ) নূতন স্কুল খুলবার সময় আঞ্চলিক প্রয়োজনের সমীক্ষা প্রয়োজন, কারণ এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিপত্তি রক্ষার খাতিরে কিম্বা রাজনৈতিক স্বার্থে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে অর্থের অপচয়

করা হয়েছে। (ঘ) সর্বোপরি বিদ্যালয়গুলির সাথে স্থানীয় জীবনের সম্পৃক্ততা দরকার।

বস্তুতঃ এইসব সমস্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র স্কুলসংখ্যা বাড়ালেই আশানুরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যালয় সংগঠনের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে যে নানা ধরণের প্রকারভেদ আছে, এবং শহর ও গ্রামের মধ্যেও পার্থক্য আছে, একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। স্কুল ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করলে আমরা পাই (ক) চার কিম্বা পাঁচ ক্লাশের স্কুল, (খ) ২।১ কিম্বা বহুশিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল, (গ) বুনিয়াদি কিম্বা সাধারণ প্রাইমারী স্কুল, (ঘ) মালিকানার ভিত্তিতে—সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের স্কুল, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্কুল, এবং (ঙ) ইংরেজী কিম্বা বাংলা কিম্বা হিন্দী মাধ্যমের স্কুল প্রভৃতি।

আমরা যদি সর্বজনীন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে চাই, তবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠনে **অনতিবিলম্বে সমতা আনা প্রয়োজন**। আমরা শিক্ষায় সমানাধিকার নীতি গ্রহণ করেছি এবং প্রাথমিক স্তরে 'কমনস্কুল' আদর্শ নিয়েছি। কিন্তু পূর্বোক্ত অসমতা থাকলে এবং ঢালাও বেসরকারী কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে উপরোক্ত আদর্শ রূপায়িত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং একটি সার্বিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। **নিয়মবিধি সকল স্কুলেই সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।** সর্বোপরি, যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রচলিত না হচ্ছে, ততদিন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকাভুক্তি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কয়েকটি বিশেষ দিক আছে, যেমন— (ক) রাজ্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্র, (খ) স্থানীয় প্রশাসন, (গ) পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) স্কুল ব্যবস্থাপনা। এইসব সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই সমস্যাগুলি বুঝতে পারা যাবে।

রাজ্যস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব রাজ্য সরকারের। সরকারী তরফে শিক্ষামন্ত্রীই এজন্য দায়ী। প্রত্যক্ষ প্রশাসনকর্তা রূপে আছে

ডি,পি, আইয়ের অধীনে **রাজ্য শিক্ষা দপ্তর**। এই দপ্তরে আছেন প্রাথমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সহঅধিকর্তা, মুখ্য পরিদর্শক ইত্যাদি। প্রতি জেলায় আছেন জেলা পরিদর্শক এবং সহকারী জেলা পরিদর্শক। নিম্নস্তরে আছেন সাব-ইন্সপেক্টর। (সম্প্রতি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর নামে আর একটি স্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে)।

প্রাথমিক শিক্ষায় রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকলেও প্রশাসন ব্যবস্থাটি বিকেন্দ্রীকৃত। ধাপে ধাপে কয়েকটি আইনের সাহায্যে এই বিকেন্দ্রীকরন করা হয়েছে, যেমন ১৯১০ সনের প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ সনের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৫১ সনের মিউনিসিপাল আইন, ১৯৬৩ সনের শহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রভৃতি। (এ সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য প্রথম পর্বের ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

এইসব আইনের ফলশ্রুতি হলো—(ক) কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব কিয়দংশে কর্পোরেশনের, কিয়দংশে সরকারের ; (খ) মফঃস্বল সহরে দায়িত্ব মিউনিসিপালিটিগুলির (এবং কিয়দংশে সরকারের) ; (গ) গ্রামাঞ্চলে দায়িত্ব জেলা স্কুল বোর্ডের।

কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব কর্পোরেশন শিক্ষাদপ্তরের। এজন্য শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরিদর্শক আছেন এবং শিক্ষক শিক্ষণের জন্য কলেজ আছে। কর্পোরেশনই বেতনক্রম স্থির করে এবং শিক্ষক নিয়োগ করে। কর্পোরেশন বাজেটেই ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়।

মফঃস্বল মিউনিসিপালিটির অধীন স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, বেতনহার নির্ধারণ, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির **অধিকার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের**। এজন্য বাজেটে অর্থবরাদ্দ করা হয়। ১৯৬৩ সনের আইনে শিক্ষাসেস্ ধার্য করবার কথা বলা হয়েছে এবং তদুপরি সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় স্তরে প্রশাসনের দুইটি দিক—(১) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অর্থ-সাহায্য, শিক্ষক নিযোগ ও বদলি, সাধারণ প্রশাসন প্রভৃতি রয়েছে **জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে**। ১৯৩০ সনের আইন বলে গঠিত এইসব বোর্ডে পদাধিকার বলে সরকারী কিম্বা সরকার মনোনীত সভ্যের সংখ্যাধিক্য, শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব নামে মাত্র। সুতরাং বহু ক্ষেত্রেই বোর্ডগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বর্গভূমি।

বহু বোর্ডের অকর্মণ্যতা এবং দুর্নীতি সর্বজনস্বীকৃত। সুখের বিষয় সম্প্রতি বোর্ডগুলি বিলোপ করে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব জেলা স্কুল পরিদর্শকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উন্নততর স্থানীয় প্রশাসন সংস্থা আশা করা যায়। (২) **স্থানীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় বাহু হলেন পরিদর্শকমণ্ডলী।** কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা অমার্জনীয়। ব্লকভিত্তিতে এক একজন পরিদর্শকের অধীনে আছে ১০০ থেকে ১৫০ স্কুল। শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষকদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, শত সদিচ্ছা থাকলেও বছরে একবারও একটি স্কুল পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। তদুপরি অফিসের রিপোর্ট, ফর্ম এবং রিটার্ণ দাখিলের চাপে পরিদর্শক জর্জরিত। আর আছে পুস্তক বিক্রয় এবং দুধ বিতরণের হিসেব প্রভৃতির নানান ঝঞ্ঝাট। পরিদর্শন ব্যবস্থার আসল পরিচয় এ থেকেই পরিষ্কার।

তবুও এই পরিদর্শক মণ্ডলীর মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা বিভাগ নির্ধারণ করে শিক্ষানীতি, পরিকল্পনা, পাঠ্যক্রম, বেতনক্রম, শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক। জেলা পরিদর্শক সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন, শিক্ষকদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বেসরকারী বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। শহরের বিদ্যালয়ে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। গ্রামাঞ্চলের জন্য আইনসম্মত গঠনবিধি অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি নেই, তবে উপদেষ্টা কমিটি প্রায়শঃই গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং **জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার অতি সীমিত।**

প্রশাসনগত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—(ক) সমগ্র রাজ্যে প্রশাসন নীতি ও সংগঠনের সমতা। এজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক (গ্রাম ও শহরে সমভাবে প্রযোজ্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন। (খ) একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ। এর হাতে কার্যকরী ক্ষমতা থাকা দরকার। (গ) জেলা কিম্বা অঞ্চল ভিত্তিতে নূতন গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড, (ঘ) আরও অনেক পরিদর্শকের সাহায্যে ফলপ্রসূ পরিদর্শন ব্যবস্থা, (ঙ) স্থানীয় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আইনসম্মতভাবে গঠিত গণতান্ত্রিক স্কুল কমিটি, (চ) অভিভাবক কমিটি, কিম্বা শিক্ষক-অভিভাবকের যুগ্ম কমিটি, (ছ) প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-

শিক্ষিকাদের নিয়ে গঠিত আইনসম্মত শিক্ষক কাউন্সিল। এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে প্রশাসন সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব।

অর্থ সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থাগমের উৎসগুলি হলো—(ক) পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য, (খ) পরিকল্পনাখাতে রাজ্য বরাদ্দ, (গ) রাজস্বখাতে রাজ্য বরাদ্দ, (ঘ) স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-বরাদ্দ, (ঙ) শিক্ষা সেস্ বাবদ আদায়, (চ) বেসরকারী জনপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য এবং (ছ) ব্যক্তিগত কিম্বা প্রতিষ্ঠানগত অর্থ বিনিয়োগ।

সরকারী অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতিটি নিম্নরূপ—(ক) জি, এস, এফ পি, স্কুলগুলির (Govt Sponsored Free Primary) জন্য ব্যয় সংকুলান হয় উদ্বাস্তু খাতে, কারণ এই স্কুলগুলি বাস্তুহারা-স্কীমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুলগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন ট্রেজারী ও পোষ্ট অফিস মারফত জিলা পরিদর্শক সরাসরি পাঠিয়ে দেন। (খ) জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ঐ কর্তৃপক্ষ সরাসরি পাঠিয়ে দেন। এই জন্য জেলা স্কুল বোর্ডগুলি সরকারী বরাদ্দ অর্থ পেয়ে থাকে। (গ) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ছাত্রদের শতকরা ৭৫ জনের কাছ থেকে বেতন আদায় করা হয় (বাকি ২৫ ভাগ ফ্রি-ষ্টুডেণ্টস্)। এদের বেলায় ঘাটতি পূরণ করেন সরকার (Deficit grant)। (ঘ) স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি তাদের স্কুলের ব্যয় বহন করে। (ঙ) জনপ্রতিষ্ঠানগুলি জমি, বাড়ী ও অন্যান্য বাবদ ব্যয় করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য যোগ্যতানুসারে তিন ধরনের বেতনক্রম প্রচলিত। সর্বনিম্ন প্রারম্ভিক বেতন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ সীমা ১৮০ টাকা। এছাড়া মহার্ঘভাতা বর্তমানে ৩৮ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ ভাতা ৫ টাকা। এই বেতনক্রম যে অযৌক্তিক একথা আমরা আগেই বলেছি।

শিক্ষকদের বেতন ছাড়াও বিদ্যালয়ের যে আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে একথা বাস্তবক্ষেত্রে স্বীকার করাই হয় না। প্রতি মাসে স্কুলপ্রতি অতিরিক্ত বরাদ্দ সর্বোচ্চ ১৫ টাকা, (খেলাধূলো, জলের ব্যবস্থা, মেরামতি কাজ প্রভৃতির জন্ম ৮ টাকা, খাতাপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ বাবদ ৬॥ টাকা এবং বাধ্যতামূলকভাবে

সরকারী পত্রিকার মূল্য বাবদ আট আনা)। স্বভাবতঃই এই অবস্থায় উপকরণহীন পড়া যেমন নিম্নমানের হতে বাধ্য, তেমনি সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজও না হতে বাধ্য।

আগেই বলা হয়েছে যে যারা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের মধ্যেও ১০ লক্ষ শিশুকে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। এদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রয়োজন। আর যারা আজও লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের জন্য অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষামানের দিকে আপাততঃ না তাকালেও নিছক সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও (আপাততঃ চতুর্থ শ্রেণী, কারণ কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৮ বছরের প্রাথমিক হলে তো কথাই নেই!) অঢেল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু রাজস্ব খাতে আমাদের রাজ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয় মোট বাজেটের ১৯ ভাগ মাত্র। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ভাগ উৎসাহজনক নয়। তা ছাড়া এই বরাদ্দও শিক্ষক বেতন ছাড়া ঘরবাড়ী, প্রশাসন ব্যয় প্রভৃতি সব মিলিয়ে।

এই পটভূমিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে পরিকল্পনা খাতে ৪৫ কোটি এবং রাজস্ব খাতে ১৮ কোটি টাকা। অপব্যয় এবং চুরি না হলেও এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। সুতরাং অন্যান্য দেশের মত বিভিন্নভাবে ট্যাক্সসূত্রে সংগৃহীত অর্থের সংগতি বাড়ানো দরকার। শহরাঞ্চলে সেস্, গ্রামাঞ্চলে 'সেস্'এর হার বৃদ্ধি, আয়ের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষা কর, শহরাঞ্চলে অকট্রয়ের একাংশ, সমগ্র রাজ্যের বিক্রয় কর কিম্বা প্রমোদকর কিম্বা আবগারী করের একাংশ শিক্ষার জন্য ধার্য করা চলতে পারে। তদুপরি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ ট্যাক্স বসানো চলে (কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে তারা দায়িত্ব পালন করছেন না)।

আয়ের সূত্র প্রসারিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্র সংগঠিত করে এবং অপচয় রোধ করে অর্থ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার ধীরগতি প্রসার এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তরায়গুলি আমরা আগেই আলোচনা করেছি (প্রথম পর্বের ৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত কারণের সমন্বয়ে আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—(১) সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, (২) সামগ্রিকভাবে ভাল পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ। (৩) আবশ্যিক শিক্ষার আইন প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম বিরোধী আইন গ্রহণ, ও প্রয়োগ (৪) বুনিয়াদি ও সাধারণ বিদ্যালয়ের সমতা বিধান, (৫) সমসুযোগ-নীতির বাস্তব প্রয়োগ, (৬) উন্নত পাঠ্যক্রম ও পাঠদান, (৭) শিক্ষকদের অধিকতর বেতন এবং শিক্ষণ সুযোগ (৮) উন্নত প্রশাসন, (৯) প্রভূত অর্থ, (১০) পিতামাতার সচেতনতা এবং তার জন্য নিরলস প্রয়াস।

শেষোক্ত বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। পিতামাতার শিক্ষাচেতনার উপর প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার আনুমানিক ৩৫ শতাংশ। অশিক্ষিত পিতামাতাকে শিক্ষার আলোক দেখাতে পারলে এবং শিক্ষার ফলপ্রসূতা তাঁরা অনুধাবন করলে প্রাথমিক শিক্ষায় গতিশীলতা এবং প্রসারতা আসবে। এজন্য একদিকে যেমন সমাজশিক্ষা বিভাগের আরও কর্মতৎপরতা প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রয়োজন সভাসমিতি, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি গণ-সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রচার।

সহর ও গ্রামের বিশেষ সুবিধা-অসুবিধা

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধের মধ্যে আছে—(ক) ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে সকল শিশুর বাড়ী থেকে অল্প দূরত্বে স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ, (খ) ঘনবসতির জন্যই দ্রুত স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত সর্বজনীনতার সম্ভাবনা, (গ) শিক্ষক সংগ্রহের সুবিধা, (ঘ) উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ (ঙ) সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুযোগ, (চ) চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাভের সম্ভাবনা। (ছ) পাকা বাড়ী, অন্যান্য শিশুকল্যাণ ব্যবস্থাও শহরে সহজলভ্য (জ) পিতামাতার সচেতনতাও শহরে অনেক বেশী।

অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে সুবিধের মধ্যে—(ক) খেলার মাঠ, বাগান, শান্ত পরিবেশের সুযোগ। (খ) অপেক্ষাকৃত সহজ সরল গ্রামীণ জীবন, (গ) স্বাভাবিক পরিবেশে বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি পাঠের সুযোগ (ঘ) শিশু স্বাস্থ্যের জন্য

স্বাভাবিক পরিবেশ এবং (ঙ) জীবনে নূতন গতির জন্য গ্রামীণ মানুষের সাম্প্রতিক আকুতি।

শহরাঞ্চলে অসুবিধের মধ্যে রয়েছে—(ক) আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে স্কুল বাড়ী (যদিও পাকা), (খ) ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র নাগরিক জীবনে মানসিক জটিলতা। (গ) খেলার মাঠ, বাগান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দুষ্প্রাপ্যতা, (ঘ) ধনী-দরিদ্রের শিক্ষা সুযোগের মধ্যে প্রকট অসাম্য, (ঙ) শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যহীনতা, এবং (চ) ভগ্ন পারিবারিক জীবন। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে অসুবিধের মধ্যে আছে—(ক) যানবাহন সমস্যা, (খ) বর্ষাকালের প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, (গ) অভিভাবকের দারিদ্র—যে দারিদ্রের ছাপ থাকে বিদ্যালয় গৃহে, উপকরণে, আসবাবে। (ঘ) চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ পাওয়ার অসুবিধে; (ঙ) উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের সমস্যা, (চ) গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার আধিক্য প্রভৃতি।

কলকাতার মত শহরে কোথায় যে লুকিয়ে আছে প্রাথমিক স্কুল, একথা কেউ খুঁজে দেখেনা। কিন্তু গ্রামের স্কুল কারও দৃষ্টি এড়ায় না, ভাঙ্গাচোরা সেই স্কুলের বাড়ী যেমনই হোক না কেন! গ্রামাঞ্চলের শিক্ষক আজও অপেক্ষাকৃত বেশী সম্মান পেয়ে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের জন্য জমি দান করবার লোক এখনও নিঃশেষিত হননি।

সুবিধে-অসুবিধের যে তালিকা আমরা দিয়েছি তার মধ্যেই রয়ে গেছে সমস্যার কথা। তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত সমস্যার মধ্যেই রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত। যদি সমস্যাগুলি সমাধানের পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি, তবে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন আদৌ কষ্টকর নয়।

আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা

আমরা যেন প্রতিনিয়ত উৎসাহ বোধ করি, সেই উদ্দেশ্যে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে থাকা দরকার। (ক) আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে দেহ মন বুদ্ধির সুসম বিকাশ, যেন উচ্চশিক্ষার ভিত্তি তৈরী হয় কিম্বা সুদক্ষ ও সক্ষম নাগরিক জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। (খ) পাঠ্যক্রম হবে মৌলিক জ্ঞান এবং শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক এবং গতিশীল। (গ)

পাঠ্যক্রম রচিত হবে সাধ্যমত অনুবন্ধ প্রণালীতে। (ঘ) ঐ সঙ্গে থাকবে অজস্র সহপাঠ্যক্রমিক কাজ। (ঙ) শিক্ষাপদ্ধতি হবে মনঃস্তত্ত্ব সম্মত এবং শিশুকেন্দ্রিক। কাজের মাধ্যমে শিক্ষাই হবে মূলমন্ত্র এবং ক্রীড়ার মনোভাব থাকবে বিদ্যালয়ে পরিব্যাপ্ত। শিক্ষাধারা হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু শিশুদের জীবনযাত্রা হবে সামগ্রিক। (চ) বিদ্যালয়টি হবে সহযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক ক্ষুদ্র সমাজ। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহ এবং বৃহত্তর সমাজের থাকবে আত্মিক সম্পর্ক। সমাজসেবা এবং কর্মপরিচিতির পথে শিশুদের পরিচয় ঘটবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে। (ছ) পরীক্ষা ব্যবস্থা হবেনা অত্যাচারমূলক। শিশুর আবেগ জীবন এবং অপসঙ্গতির প্রতি থাকবে সজাগ দৃষ্টি। নির্দেশনার সুব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষক হবেন পরম বন্ধু ও নির্দেশক। (জ) প্রাথমিক শিক্ষা হবে সমসুযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক। (ঝ) শিক্ষা প্রশাসন হবে গণতান্ত্রিক। (ঞ) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও অর্থসংস্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত, এবং শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠিত হবেন অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের শীর্ষে।

প্রশ্নাবলী

১। বাল্যজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর, (ভারতে এবং অন্যান্য দেশে)।

(Discuss the characteristics of childhood/boyhood and the aims of Primary Education (in India and in other countries.)

(১০১, ১০৩-৪ পৃষ্ঠা)

২। প্রাথমিক শিক্ষাচেতনার বিবর্তন আলোচনা কর।

(Trace the development of the concept of Primary Education.) (১০২ পৃষ্ঠা)

৩। "শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার" অর্থ, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য আলোচনা কর।

(Discuss the meaning, nature and significance of Child-Centric Education,) (১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা)

৪। প্রাথমিক স্কুল সংগঠন এবং অন্যান্য শিক্ষাস্তর ও বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক আলোচনা কর। তুমি কি প্রাথমিক শিক্ষান্তে বহিঃপরীক্ষা সমর্থন কর?

(Make a study of Primary School organisation and its

relation with other stages of education and vocational education. Do you support an external terminal examination ?) (১০৭-৯পৃষ্ঠা)

৫। প্রাথমিক শিক্ষার যোগ্য পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে তোমার অভিমত প্রকাশ কর (এই সূত্রে অন্যান্য দেশে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের উল্লেখ কর)। "কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম" কথাটির মর্মার্থ কি ? এই সূত্রে বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ কর।

(Give your views on the proper curriculum for Primary education with reference to curricula in other countries. Discuss the significance of the term "activity curriculum," and in this respect, make an analysis of the Basic curriculum,)

(১০৯-১১২ পৃষ্ঠা)

৬। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রমের ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ কর। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইংরেজীর স্থান কি ?

(Discuss the defects in our present curriculum for Primary Education. What is the place of English at the primary stage ?) (১১৩-১১৫পৃষ্ঠা)

৭। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি, সক্রিয়তার মূল্য এবং খেলার ছলে শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ।

(Write a short essay on the methods of Primary education, the importance of activity and Play spirit.) (১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা)

৮ ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার উল্লেখ করে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss, with reference to the practices in India and in the other countries, the necessity and methods of examination and evaluation at the primary stage.) (১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা)

৯। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশু নির্দেশনার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, নীতি ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the needs, aims, principles and methods of child-guidance at the primary school stage.) (১২০-১২২পৃষ্ঠা)

১০। সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রয়োজন, তাৎপর্য এবং প্রকারভেদ আলোচনা কর। এ বিষয়ে আমাদের স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

(Discuss the necessity, values and types of co-curricular

activities. What is the position in this respect prevailing in our schools ?) (১২৩-১২৬ পৃষ্ঠা)

১১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপসঙ্গতির সমস্যা এবং সমাধান আলোচনা কর।

(Discuss the problem of maladjustment in primary schools and the remedial measures.) (৬৯ পৃষ্ঠা)

১২। আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষকের গুণাবলী আলোচনা কর। কেন তাঁকে বন্ধু, নেতা ও নির্দেশক রূপে আখ্যা দেওয়া হয় ?

(Discuss the qualities of an ideal primary school teacher. Why is he called a Friend-Philosopher-Guide ?) (১২৭-১২৯ পৃষ্ঠা)

১৩। অন্যান্য দেশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দাও এবং ভারতের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা কর।

(Give an account of Primary education in other countries and compare, with them, the present system of Primary Education in India.) (১৩০-১৩৪ পৃষ্ঠা)

১৪। আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি আলোচনা কর এবং ত্রুটি নির্দেশ কর।

(Discuss the present curriculum and methods of our Primary education and point out the defects.) (১৩৪ পৃষ্ঠা)

১৫। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

(Discuss the Primary school system and the different types of schools in India.) (১৩৫ পৃষ্ঠা)

১৬। পরিকল্পনাকালে ছাত্রভর্তি এবং শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য এবং সাফল্য ব্যাখ্যা কর, এবং ধীরগতি প্রসারের কারণ আলোচনা কর।

(Give an account of our targets of student-enrolment and teacher training, and the actual achievements under the plans. Explain the causes of slow progress.) (১৩৫-১৪২ পৃষ্ঠা)

১৭। প্রাথমিক শিক্ষার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থসংস্থানের সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the problems of administration, management,

control and finance in the field of Primary education in present India.) (১৪২ পৃষ্ঠা)

১৮। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(Write a short note on our future plans of Primary Education.) (১৪৩-১৪৭ পৃষ্ঠা)

১৯। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

(What are the different types of Primary School in West Bengal ?) (১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা)

২০। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

(Discuss the achievements and failures of West Bengal in respect of the provision and expansion of Primary Education) (১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা)

২১। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের অগ্রগতি ও শিক্ষক সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss the progress and problems of Primary teachers and their Training in West Bengal). (১৫৭-১৬১পৃষ্ঠা)

২২। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন কর এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর।

(Make a total estimate of Primary education in West Bengal and attempt a comparative study of the advantages and disadvantages of urban and rural areas.) (১৪৮-১৫২পৃষ্ঠা)

২৩। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার (ক) উদ্দেশ্য, (খ) পাঠ্যক্রম, (গ) শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্যাগুলি আলোচনা কর। ঐ সূত্রে সাধারণ প্রাইমারী এবং নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর।

(Discuss the problems of Primary education in West Bengal in respect of (a) aims, (b) Curriculum, (c) Methods and make a comparison between the Primary school and the Junior Basic School). (১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা)

২৪। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (ক) শিশুদের স্বাস্থ্য, (খ) পরীক্ষা ব্যবস্থা, (গ) অপচয় ও অনুত্তীর্ণতার সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss the problems of Primary education in West Bengal in respect of (a) Children's health, (b) System of Examination, (c) Stagnation and Wastage). (১৫৫-১৫৭পৃষ্ঠা)

২৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (ক) জমি, বাড়ী, আসবাব সমস্যা, (খ) বিদ্যালয় সংগঠন সমস্যা, (গ) প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, এবং (ঘ) অর্থ সমস্যার উপর প্রবন্ধ রচনা কর।

(Write an essay on the following problems related to Primary education in West Bengal—(a) Land, building, equipments, (b) school organisation (c) administration and control, (d) Finance.) (১৬১-১৬৯ পৃষ্ঠা)

২৬। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ঐ ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান আলোচনা কর।

(Discuss the future plans of Primary education in West Bengal, the related problems and their solution). (১৫১পৃষ্ঠা)

২৭। একটি আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে তোমার ধারনা উপস্থিত কর।

(Give your idea of an ideal Primary Education system which we should aim at.) (১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

'গ' বিভাগ

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছেলেমেয়েরা উত্তীর্ণ হয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে। "মাধ্যমিক" শব্দটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই অর্থ যে এই স্তরটি শিক্ষা জীবনের মধ্যম স্তর। অতীতে এমন ছিল যে প্রাথমিক স্তরের উর্ধে শিক্ষার জীবনকে আর স্তরভেদ করা হতো না; অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা তখন ছিল গায়ে গায়ে মেশানো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা চেতনায় বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। তাই শিক্ষাজীবনকে পরস্পর সংযুক্ত মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করে মধ্যস্তরকেই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর বলা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা কাহাকে বলে

'মাধ্যমিক' কথাটি থেকে আরও বোঝা যায় যে পরবর্তী একটি উচ্চ শিক্ষার স্তরকেও ভাবার্থে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাধ্যমিক স্তরের পরে শিক্ষার্থীদের মাত্র একটি অংশ উচ্চশিক্ষার স্তরে প্রবেশ করে; অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রী কারিগরি কিম্বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশ করে কিম্বা কর্মক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করে। এদের পক্ষে বিদ্যালয়গত শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে এখানেই। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা হবে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যাকে পুঁজি করে জীবন সংগ্রামে অবতরণ করা যায়, উৎপাদনী দক্ষতা আয়ত্ত করা যায় এবং উচ্চশিক্ষায়ও প্রবেশ করা যায়। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা বহুমুখী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে, এটাই আধুনিক শিক্ষা চেতনার বৈশিষ্ট্য।

পুরানো দিনের চিন্তা অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্ধ শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত গরীবের জন্য ছিল কেবল দাতব্য প্রাথমিক শিক্ষা, এবং মাধ্যমিক শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার ছিল ধনী, অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের। মেয়েদের অধিকারও ছিল নগণ্য। তাই উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি, 'ভদ্রলোকের

শিক্ষা' এবং আদব কায়দার শিক্ষাই ছিল বড় কথা। পাঠ্যক্রম তাই ছিল যুক্তিবাদী পুঁথিগত বিদ্যায় ভরা। প্রজ্ঞার প্রতি এই দরদের ফলেই মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য ছিল অল্প। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষা চেতনার বর্তমান যুগে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও জীবনের শিক্ষারূপেই কল্পনা করা হয়ে থাকে।

সর্বোপরি শিক্ষার প্রকৃতি নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমের উপর। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করে (বিভিন্ন দেশের আইনভেদে) ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। দেহ মনের প্রকৃতি বিচারে এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে সুরু হয় কৈশোরকাল। আগে মনে করা হতো যে কৈশোর জীবন চলে ১৫।১৬ বছর বয়স পর্যন্ত। তাই ১১।১২ বছর থেকে ১৫।১৬ বছর বয়সের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে মনে করা হতো। কিন্তু প্রযুক্তিমূলক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসারতার ফলে এখন মনে করা হয় যে ১৭।১৮ বছর পর্যন্তই চলে কৈশোরকাল। তাই ৪ কিম্বা ৫ বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পরে ৮ কিম্বা ৭ বছর ব্যাপী দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাকেই এখন মাধ্যমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে বাল্য জীবনের পরে, অর্থাৎ ১১।১২ বছর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্কতার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭।১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর জীবনের শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষা। এই সময়টিকে প্রাপ্তযৌবন, প্রাকযৌবন কিম্বা বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি নানাভাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনাকে সাবলীল করার স্বার্থে আমরা কৈশোর শব্দটিই ব্যবহার করবো। কৈশোরকালীন শিক্ষার প্রকৃতি বুঝতে হলে কৈশোরের প্রকৃতিটিও আমাদের প্রথম বোঝা দরকার।

কৈশোরের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

বাল্যজীবন উত্তীর্ণ হলে প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই দেহযন্ত্রের মধ্যে স্নায়ু ও পেশীর এমন কর্মচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং কয়েকটি সুপ্ত কিম্বা অর্ধসুপ্ত গ্ল্যাণ্ড এমনভাবে কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে যে দেহ ও মনের বিশেষ পরিবর্তনের মধ্যে জীবনের এক নূতন স্তরে পদার্পণের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কতগুলি গ্রন্থির কার্যকারিতার ফলে দেহের হাড় শক্ত ও মোটা হয়, দেহে মাংস বৃদ্ধি পায়। পেশীগুলি শক্ত হয়ে ওঠে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক কর্মক্ষম হয়, কণ্ঠস্বরে

পরিবর্তন আসে, দেহের ঊর্ধাঙ্গ দীর্ঘ এবং প্রসারিত হয়, মাংসপেশী সংযোজনের ফলে হাত পায়ের শক্তি বাড়ে, বক্ষ প্রসারিত হয় এবং সর্বোপরি প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি এবং মননশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দেহের এই হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিন্ন যৌবন কিশোরের চলাফেরা হয়ে ওঠে বেসামাল। কিশোরের কাছে অব্যাখ্যাত এই পরিবর্তনের ফলে সে কখনো হয় লাজুক, কখনো ভাবুক এবং কখনো বা অতিরিক্ত আত্মসচেতন।

দেহ যন্ত্রের মধ্যে ঘটে আরও নানাধরণের পরিবর্তন। শরীরের শক্তি যেমন বাড়ে, তেমন বাড়ে ফুসফুসের এবং হৃদপিণ্ডের ক্ষমতা। এরই ফলে ধমনী ও শিরায় রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার উপর পড়ে অতিরিক্ত চাপ। তাই দেহের জন্য পুষ্টিকর এবং প্রচুর খাদ্য দরকার হয়। এই খাদ্য হজম করবার জন্য পরিপাকযন্ত্রও নিজে থেকেই বেশী কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, চোয়াল হয়ে ওঠে দৃঢ় ও প্রশস্ত। সর্বোপরি মস্তিষ্কের ক্ষমতাও যেমন বাড়ে, মস্তিষ্কের উপর চাপও তেমনি বাড়ে।

বুদ্ধিবৃত্তির দিকে কৈশোরকালের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। একদিকে যেমন মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ে, অপরদিকে তেমনি চিন্তাশীলতা বিচারশীলতা, যুক্তিশীলতা বাড়ে। একদিকে বাস্তবপ্রিয়তা, অপরদিকে সৌন্দর্যপিয়াসী কল্পনা প্রবনতা দেখা যায়। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণের ফলে ব্যক্তিপূজার (hero worship) মনোভাব দেখা দেয়। জীবনের নানা প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়ে দার্শনিকতার আবরণে নিজেকে আবৃত করা, ধর্মভাবের মধ্যে পলায়ণপর হওয়া, সত্য ও সুন্দরের ধ্যান করা, কিম্বা নীতিসম্মত জীবন যাপন করার মনোভাব দেখা দেয়। এরই ফলে অনেক কিশোর সাধুত্ব লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে।

প্রক্ষোভ জীবনের ক্ষেত্রে কৈশোরের গুরুত্ব সর্বাধিক। দেহ-মনে হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে কখনো ইতিবাচক অহংভাব, কখনো বা নেতিবাচক অহংভাব দেখা দেয় (positive self-feeling, negative self-feeling)। কখনো দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা, আবার কখনো তীব্র হতাশা। অন্তর্মুখী কিম্বা মনগুমড়ো হওয়া, অথবা চিন্তামগ্নতা দেখা দেয় এলোমেলোভাবে। অহংবোধ এবং দিবাস্বপ্নের ফলে অনেক কিছু সম্বন্ধেই প্রকাশ পায় অসন্তোষ। তাই প্রায়শঃই দেখা দেয় কল্পনা বিলাসিতা, মানসিক সংঘাত এবং প্রক্ষোভ-বিপর্যয়। এরই ফলে প্রকাশ পায় নানা ধরণের অসংলগ্ন আচরণ।

এই বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমগতিতে যৌন চেতনার বিকাশ। দেহের মধ্যে যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়, তার প্রভাব পড়ে যৌনাঙ্গে। তাছাড়া ছেলে ও মেয়ের বিশেষ বিশেষ দেহ গঠন এবং অন্যান্য যৌনলক্ষণ প্রকাশ পায়। কিশোর কিশোরীর কাছে এ এক পরম বিস্ময়, কারণ যৌন চেতনা জাগে, কিন্তু এই অনুভূতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তারা খুঁজে পায় না। তাই বয়স্কদের কাছ থেকে সবকিছুই লুকোবার মনোভাব দেখা দেয়। প্রথমাবস্থায় যৌন চেতনার প্রকাশ ঘটে আত্মপ্রেমের মধ্যে। নিজের দেহে নূতন যে জোয়ার আসে, যে নূতন দেহসৌষ্ঠব সৃষ্টি হয়, তাকে নিয়ে কিশোর থাকে মশগুল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আত্মপ্রেমের বদলে অপরকে ভালবাসার কামনা জাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুটি স্তর। প্রথম পর্বে দেখা দেয় সম-যৌন-প্রীতি। ছেলে ও ছেলে এবং মেয়ে ও মেয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে দেখা দেয় বি-সম যৌন প্রীতি। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, পরিণামে যৌন আকাঙ্খা রূপ পেতে থাকে এবং যৌনজীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে এইসব পরিবর্তন ছাড়াও **কৈশোরকালে সামাজিক জীবনেও আসে নূতন অনুভূতি।** যুথচেতনা তথা দলচেতনা এসময়ে বাড়ে, সমাজসেবা এবং সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে সুস্থ যৌথজীবন পালনের সুযোগ ঘটে। পরোপকার ধর্ম এবং সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিশোর এজন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা।

জীবনের বিভিন্ন দিকে এই আমূল পরিবর্তনের ফলেই বয়ঃসন্ধিক্ষণকে **আশীর্বাদ এবং বিপদ সংকেত—উভয়ভাবেই দেখা হয়েছে। ষ্ট্যানলি হল এই সময়টিকে আখ্যা দিয়েছেন 'storm and stress' রূপে।** উপযুক্ত পরিচালনা না হলে এই ঝড়ের দাপটে জীবন-তরীই যাবে উল্টে। বস্তুতঃ দেহের জন্য প্রচুর খাদ্য, চিন্তার জন্য প্রসারিত ক্ষেত্র, উপযুক্ত যৌনশিক্ষা, আবেগের ভারসাম্য, সামাজিক ও মানবিক আদর্শের অভাব ঘটলেই হবে বিপদ, কারণ সেই ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত কিশোর নানা অপসঙ্গতিতে আক্রান্ত হবে এবং পরিণামে হয়ে উঠবে অপরাধপ্রবণ। অথচ দেহ মন ও চিন্তার উপযুক্ত পরিপুষ্টি হলে সার্থক জীবনের ভিত্তি এখানেই রচিত হয়। তাই **বয়ঃসন্ধিক্ষণকে 'sunshine and shower' বলেও আখ্যা দেওয়া**

হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত হ্যাডো কমিটি মন্তব্য করেছেন যে জীবন প্রবাহের এইক্ষণে ঠিকমত হাওয়ায় পাল তুলে দিতে পারলে জীবনতরী তরতর করে এগিয়ে যাবে আকাঙ্খিত তটভূমির দিকে।

কৈশোরের প্রয়োজন

কৈশোর কালের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপরের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই সময়ে **দেহ মন বুদ্ধির যথেষ্ট পরিপুষ্টি এবং যত্ন প্রয়োজন**। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য দেহের প্রয়োজন মেটাতে হবে। এ জন্য একদিকে প্রয়োজন শরীর চর্চা, জিমনাষ্টিক, প্রচুর খেলাধূলো, ড্রিল ও কুচকাওয়াজ; এবং অপরদিকে প্রয়োজন যথেষ্ট খাদ্য ও পুষ্টি। দেহ যখন বেড়ে উঠতে চায়, তখন খাদ্য এবং খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলেই দৈহিক খর্বতা, ব্যাধি এবং মানসিক অস্বাস্থ্য সৃষ্টি হতে পারে।

কিশোরের মনের জগতে প্রক্ষোভের যে নানা ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে, তার সুস্থ ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন নির্দোষ আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নাট্যাভিনয়, শিল্পকলা ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করবার সুযোগ। আনন্দদায়ক সৃষ্টিশীল কাজে নিমগ্ন হলে প্রক্ষোভের সুস্থ অবদমন সম্ভব। তাছাড়া যৌন চেতনাকে সুপথে পরিচালনার জন্য এ সম্পর্কে কিছু তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সৃষ্টিশীল কাজে নিমগ্ন করিয়ে যৌন-চেতনাকে সুপথে পরিচালনা করা দরকার।

মননশীলতার জগতে চলে নানা ভাঙ্গাগড়া। নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি নিয়ে বেড়ে উঠতে চায় বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর। স্বকীয় চিন্তাশক্তিই অনেক সময় প্রচলিত ধ্যান ধারনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অকপটে আত্মসমর্পণ করে সবকিছু গ্রহণ করবার মানসিকতা তখন থাকেনা। আধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, ভালমন্দের বিচার, বিজ্ঞান চেতনা এই বয়সের বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিচিত জগতের বাইরেও বিশাল পৃথিবীর মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তোলে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তাকে প্রতিনিয়ত তাড়না করে। **তাই মননশীলতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং বুদ্ধিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত তত্ত্বক্ষেত্রও তার প্রয়োজন।**

আজকের কিশোর অদূর ভবিষ্যতেই পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিনত হবে। আত্মনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসেবে তার প্রয়োজন হবে উৎপাদনী দক্ষতা এবং সামাজিক দক্ষতা। সুতরাং কৈশোর জীবনেই প্রয়োজন সাধারণভাবে বৃত্তিপরিচিতি এবং সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন বৃত্তিগত দক্ষতার সূচনা। অপরদিকে সামাজিক মানুষ হিসেবে সার্থক যৌথ জীবন-যাপনের জন্য তাকে আয়ত্ত করতে হবে সামাজিক মূল্যবোধ, সহযোগিতা ও সমষ্টি জীবনের চেতনা; সামাজিক নীতিজ্ঞান, ব্যক্তিগত জীবনে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সদভ্যাস, এবং সর্বোপরি আত্মসম্ভ্রম। সামাজিক মানুষ হিসেবে আত্মত্যাগ এবং সমাজ সেবার আদর্শও আয়ত্ত করা চাই।

শাসন, শৃঙ্খলা কিম্বা নিপীড়নের সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারেনা। স্পর্শকাতর এবং অনুভূতি প্রবণ কৈশোরে প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত মনোযোগ এবং দরদ। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সহানুভূতি। বাড়ীতে বাবা মা যেমন দায়িত্ব পালন করবেন, তেমনি দায়িত্ব পালন করা দরকার বৃহত্তর সমাজের সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংগঠনগুলির। অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থা তথা স্কুলের দায়িত্বই সর্বাধিক। উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দেহের উপযুক্ত রসদ যুগিয়ে কৈশোর জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও ফলপ্রসূ করবার চেষ্টাই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রয়াসের মর্মকথা।

ব্যক্তি বৈষম্য

শৈশব কিম্বা বাল্যে সহজাত প্রবনতা ও সম্ভাবনাগুলি যেমন অপরিণত এবং অসংগঠিত থাকে, কিম্বা শিশুর অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ থাকে সীমাবদ্ধ, কৈশোরকালে তেমন নয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক গতিতেই প্রবনতা ও প্রবৃত্তি কিম্বা সম্ভাবনা ও ক্ষমতাগুলি সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং প্রতি কিশোরের স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রতিটি কিশোরের ব্যক্তিসত্তা বিশেষ রূপ ধারন করায় ব্যক্তি বৈষম্য খুবই বড় হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পার্থক্য তখন বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে।

শরীরের দিকে গঠন, গায়ের রং, আকার, উচ্চতা, ওজন, চেহারা প্রভৃতি সব কিছুতেই পরস্পরের পার্থক্য ধরা যায়। দেহের অভ্যন্তরে স্নায়ু পেশী ও গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক পার্থক্য পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

সহজাত প্রবনতা এবং প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দেয়। আবেগের উৎস, আবেগের গভীরতা, অনুভূতির প্রখরতা প্রভৃতিও ব্যক্তিবৈষম্য সৃষ্টি করে।

ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য ঘটে, মনের নির্বাচন ক্ষমতা হয়ে ওঠে বিভিন্ন-মুখী। দৈহিক কর্মপ্রবনতা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা ও যুক্তিশীলতা, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতা, শিক্ষা গ্রহণ করবার ক্ষমতা—প্রভৃতি সকল দিকেই কিশোর কিশোরীর মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হয়। এই তারতম্য ঘটে অন্তর্নিহিত সহজাত সম্ভাবনাগুলির বিচিত্রগতি বিকাশের ফলে।

স্বভাতজাত বৈষম্য ছাড়া অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের বিভিন্নমুখী প্রভাবের ফলে প্রতিটি কিশোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, রুচি, ক্ষমতা, আদর্শ ও সেন্টিমেণ্ট, বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ, ব্যক্তিত্বসংগঠন ও চরিত্র প্রভৃতি আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রকাশ পায়।

এই ধরনের ব্যক্তি বৈষম্যের কারণ অনেক। বংশধারার প্রভাব, বয়ঃবৃদ্ধি, যৌন পার্থক্য, কিম্বা বিশেষ সমাজ, ধর্ম, বৃত্তি ও পেশা, রীতিনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং আদর্শগত কারণে ব্যক্তি বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল কিম্বা বুদ্ধিতে ব্যাহত কিশোরের শিক্ষা ভিন্ন হতে বাধ্য। প্রক্ষোভ প্রবণতা ও ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সম্ভাবনা ও প্রবণতার ভিত্তিতে নির্দেশনা ও পরিচালনার দরকার হয়। বস্তুতঃ ব্যক্তি বৈষম্য যে স্তরে প্রকট, শিক্ষার সেই স্তরে সকলের জন্য একই ধরণের ঢালাও শিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে পারেনা।

সুখের বিষয় ব্যক্তি বৈষম্য পরিমাপ করবার ব্যবস্থাও আবিষ্কার করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। যান্ত্রিক কর্মক্ষমতার অভীক্ষা, সঙ্গীত কিম্বা কলায় পারদর্শিতার অভীক্ষা, বুদ্ধির অভীক্ষা কিম্বা ব্যক্তিত্ব সংগঠন সম্পর্কিত অভীক্ষা প্রভৃতি নানা ধরণের পরীক্ষা ও অভীক্ষা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি বৈষম্যকে স্বীকার করেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব। অপরদিকে সামাজিক পটভূমি এবং প্রয়োজনকেও স্বীকার করতে

হবে। সুতরাং সামাজিকরণের পটভূমিতে ব্যক্তি-বৈষম্য অনুসারে শিক্ষার চেতনা নিয়েই মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-চেতনার বিবর্তন—বিদেশে

মাধ্যমিক শিক্ষাকে আমরা এখন বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা বলে থাকি। এই স্তরে ব্যক্তি বৈষম্য স্বীকারের কথা বলি। পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের শিক্ষা বলেও একে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু এই চেতনার পিছনে একটি দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। বিদেশে চিন্তাধারার বিবর্তন আমাদেরকেও প্রভাবিত করেছে।

ইউরোপে মধ্য যুগ থেকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল, তবে সেই শিক্ষা ছিল স্বল্পসংখ্যক অভিজাত সন্তানের জন্য। বাইবেলের ভাষা ল্যাটিন। সুতরাং ল্যাটিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল ভদ্রসন্তানের অন্যতম পরিচয়। ল্যাটিনের সঙ্গে চর্চা হতো গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যেরও। স্কুলগুলিকে বলা হতো ল্যাটিন (গ্রামার) স্কুল। পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এগুলির ছিল যোগাযোগ। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধূলো, আমোদ প্রমোদেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অভিজাত সন্তানরা এই শিক্ষা পেয়ে স্বভাবতঃই হতো উন্নাসিক। মেয়েদেরও এই শিক্ষায় কোন অধিকার ছিলনা।

প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়ে গঠিত মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষাধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুল, পাবলিক স্কুল; ফ্রান্সের, জার্মানীর এবং রাশিয়ার ল্যাটিন স্কুল; ঔপনিবেশিক যুগে এই ঐতিহ্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকাতেও গিয়েছিল। স্কুলগুলির উপর রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা, বেসরকারী স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপেই স্কুল পরিচালিত হতো। তবে ধর্মসংগঠনগুলির কর্তৃত্ব ছিল যথেষ্ট।

নবজাগরণের পর থেকে যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হতে থাকে, তার প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে চেতনা সঞ্চারিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রারম্ভ থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ গতিশীল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার চেতনা ডানা বাঁধতে থাকে। ইংলণ্ডে সৃষ্টি হয় নন-কনফর্মিষ্টদের এ্যাকাডেমি।

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে স্থান পায় মাতৃভাষা, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি। আমেরিকায় গড়ে ওঠে এ্যাকাডেমি এবং ক্রমে ক্রমে "হাইস্কুল"। ফরাসী বিপ্লবকালে বিপ্লবীরাও প্রগতিশীল মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি করেছিল। নেপোলিয়ন অবশ্য গড়ে তুললেন উচ্চবিত্ত ভদ্র সন্তানের শিক্ষার জন্য "লাইসী"। এইসব ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষা ও দর্শনের সঙ্গে আধুনিক মাতৃভাষা, গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমন্বয় করে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তার ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন আসে। শিল্পবাণিজ্য প্রসারের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সাহায্যে শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের প্রশ্ন ওঠে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও বস্তুধর্মী, গতিশীল, জীবন-কেন্দ্রিক এবং বৃত্তিমুখী করবার দাবি ওঠে। শিল্পমালিকরাও কলকারখানার মধ্যম স্তরের কর্মচারীদের দক্ষতার জন্য ব্যাপকতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব সমর্থন করেন। (উচ্চস্তরের দক্ষতা সৃষ্টি করবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের)। তাই গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়, যেমন জার্মানীতে ক্ল্যাশিকাল জিমনাসিয়াম, রিয়াল জিমনাসিয়াম এবং প্র্যাকটিকাল জিমনাসিয়াম সৃষ্টি হয়। এগুলি সবই মাধ্যমিক স্কুল। তা ছাড়া বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছাত্রদের জন্য বিশেষ ধরনের—টেকনিকাল, কমার্শিয়াল স্কুলও গড়ে ওঠে। এই দিকটি বেশী বিকশিত হয় আমেরিকাতে। ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং ফ্রান্সও একেবারে পিছিয়ে থাকেনা।

ইতিমধ্যে আর একটি রাজনৈতিক—সামাজিক আন্দোলন মাধ্যমিক শিক্ষাচেতনাকে আরও প্রভাবিত করে। সেটি হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় সর্বজনীন অধিকারের দাবি ওঠে। সুতরাং যে মাধ্যমিক শিক্ষা একদা ছিল কেবল অভিজাতদের প্রাপ্য, ক্রমে ক্রমে তা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, এমন কি শ্রমিক-কৃষকের প্রাপ্য বলে পরিগণিত হলো। মেয়েরাও এই শিক্ষার অধিকার অর্জন করলো।

তা ছাড়া জীববিদ্যা, শারীর বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতিও মাধ্যমিক শিক্ষাচেতনাকে প্রভাবিত করে। সকল ছেলেমেয়ের সমগ্র কৈশোর জীবনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত বলে গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রের

প্রত্যক্ষ দায়িত্বও স্বীকৃত হয়। (অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগকে অস্বীকার করা হয় না)। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি জয়যুক্ত হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হয়। জার্মানীতে ও ফ্রান্সে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় দ্রুত প্রসার ঘটে। ইংলণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে "সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার" দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে এবং হ্যাডো কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষাকে বয়ঃসন্ধির শিক্ষা বলে অভিহিত করেন। বর্তমানে আমেরিকায় ১৮ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণভাবে স্বীকৃত। ইংলণ্ডে তিন ধরনের বিদ্যালয়ে ৪ থেকে ৭ বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা (১১—১৫, ১১—১৮) প্রচলিত। ফ্রান্সে প্রচলিত আছে ১১—১৭ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা। রাশিয়াতে আছে ৪ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক এবং আরও ৩ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (১৭ বছর বয়স পর্যন্ত)। পশ্চিম জার্মানীতে প্রচলিত আছে ৯—১৮ বছর পর্যন্ত এবং পূর্ব জার্মানীতে ১৪—১৮ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা। সুতরাং আমরা দেখছি যে **প্রায় সব প্রগতিশীল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার পরে ১৭।১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র কৈশোর জীবন-ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কোথাও বৈতনিক, কোথাও বা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক।**

মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ফলে এবং সমগ্র কৈশোরের শিক্ষা বলে গ্রহণ করবার ফলে **শিক্ষাচেতনা এবং পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাতে আরও পরিবর্তন আসে**। সর্বজনীনতার যুগে স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র সকলেই মাধ্যমিক শিক্ষা পেতে পারে। কিন্তু তাদের সকলেই আর উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হবে না। অধিকাংশই হয় বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবে কিম্বা মাধ্যমিক শিক্ষার পরেই সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা হবে এমন শিক্ষা যাকে অবলম্বন করে (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক শিক্ষায় প্রবেশ করা চলে, (খ) ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি উচ্চতর পেশা ও কারিগরি শিক্ষায় যাওয়া চলে, (গ) বৃত্তিগত শিক্ষায় এবং প্রশিক্ষণে প্রবেশ করে উৎপাদনী দক্ষতা বৃদ্ধি করা চলে, এবং (ঘ) সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করে জাতীয় অর্থনীতির মধ্যস্তর অধিকার করা চলে। শেষোক্ত দলই সংখ্যায় ভারি। যেহেতু তাদের পক্ষে এখানেই পড়াশুনার সমাপ্তি, সেহেতু এই স্তরকে প্রান্তিক

শিক্ষা রূপে (terminal) মনে করে সাধারণ জ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ তথা নাগরিক তৈরীর শিক্ষারূপেই একে দেখা হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব এবং প্রবেশ পথ রূপেও একে বিচার করা হচ্ছে।

সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষাকে এখন আর শুধু তত্ত্বমূলক পুঁথিগত শিক্ষারূপে মনে করা হয় না। প্রয়োগবিদ্যা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেও একে বিচার করা হয়। তা ছাড়া কৈশোরকালে ব্যক্তি বৈষম্য দানা বাঁধার ফলে ব্যক্তিগত পূর্ণতা এবং ব্যক্তিসত্তার সহায়ক রূপে, অপরদিকে সামাজিক দক্ষতার সহায়ক রূপেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করা হয়। তাই এক'দকে সমাজ বন্ধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা এবং অন্যদিকে ব্যক্তি-বৈষম্যের জন্য বহুমুখী শিক্ষার সমন্বয়েই মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি কৈশোর জীবনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দেহের শিক্ষা এবং মনের শিক্ষা অর্থাৎ প্রক্ষোভ জীবনের শুভ নির্দেশ রূপেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করা হয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক সর্বজনীনতার চেতনা আরও একটি দিকে ফলশ্রুতি দিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত বিকলাঙ্গ এবং পশ্চাৎপদদের বিশেষ শিক্ষাকেও আজ সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি কৈশোর জীবনে পুঁথিগত তাত্ত্বিক শিক্ষা ছাড়াও বৃত্তি শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, নান্দনিক (চারুকলা) শিক্ষাকেও মাধ্যমিক শিক্ষা রূপে মনে করা হয়। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা (Vocationalisation), উৎপাদনমুখী করা (Productive), কর্মপরিচিতির মাধ্যমে (Work experience) কর্মমুখীন করা, এবং সমাজ সেবার মাধ্যমে সমাজমুখী করবার প্রেরণাই সর্বাধুনিক চেতনার অভিব্যক্তি।

উপরের আলোচনার সারাংশ থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্দীতে এই চেতনা অতি দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার বিবর্তন—এদেশে

এই পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের দেশেও, যদিও আমাদের প্রচলিত মাধ্যমিক

শিক্ষার ইতিহাস মাত্র দেড়'শ বছরের। বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাটি বিদেশাগত। এদেশের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো এবং মধ্যম স্তরের আমলা তৈরীর জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল। সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশই তখন মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতো। এই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল উচ্চশিক্ষার দিকে। তাই **মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার প্রবেশ পথ রূপে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাকে পবেশ দ্বার রূপে মনে করা হতো**। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষাও ছিল পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে। সমাজের এক বাছাই অংশ এই শিক্ষা পেতো বলেই এক্ষেত্রে **মস্তিষ্কের কদর ছিল বেশী**। **সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একমুখী, পুঁথিগত মানবিক বিদ্যায় ভারাক্রান্ত, পরীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা**।

কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই একমুখীন মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা আসে। হাণ্টার কমিশন বাণিজ্য ও কারিগরি বিদ্যাকে অবলম্বন করে সমমর্যাদা সম্পন্ন 'খ' ও 'গ' শাখায় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তদানীন্তন অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এবং শিল্পে বাণিজ্যে অনগ্রসরতার ফলে এই সুপারিশও খুব ফলপ্রসূ হয় না।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগেই প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়। সেই সময় থেকে দ্রুতগতিতে আমাদের চেতনা বিবর্তিত হয়েছে। স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) সুপারিশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত দীর্ঘতর সময়ব্যাপী বিভিন্নমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা। তারপরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হতে থাকে। সপ্রু কমিটিও (১৯৩৪ সনে) দীর্ঘতর সময়ের জন্য বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেন। এ্যাবট-উড কমিটি (১৯৩৭ সনে) তত্ত্বগত মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিগত শিক্ষার সমন্বয় এবং মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তাব করেন। পরিশেষে সার্জেন্ট কমিটিও (১৯৪৪ সনে) সামগ্রিক দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের কথা বলেন।

স্বাধীনতা লাভ করায় সমগ্র পটভূমিই গেল বদলে। উন্নতিকামী স্বাধীন দেশের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে তৎকালে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা যে আদৌ সম্পৃক্ত নয়—এই কথা উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশন) মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতম স্থান বলে চিহ্নিত করেন। **এই পটভূমিতেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার কমিশন ১৯৫২-৫৩) নূতন ধরণের সুপারিশ করেন।**

ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে অনেক। সমাজের নিম্নবিত্ত অংশও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে একদিকে সমাজসংহতি রচনা করা, অপরদিকে বিভিন্নমুখী শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বৈষম্যকে স্বীকার করবার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

মুদালিয়ার কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা, যুব সমাজের চরিত্রগঠন, উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টি করা, সামাজিক মানুষ তৈরী করা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যম স্তরের নেতৃত্ব গড়ে তোলা। সমগ্র প্রাকযৌবন-কালকে এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিশনের মতে **মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। এই শিক্ষার থাকবে দুটি লক্ষ্য—** (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছুদের জন্য তত্ত্বগত প্রস্তুতি, এবং (খ) কর্মজীবনে প্রবেশেচ্ছুদের জন্য বৃত্তিগত প্রস্তুতি। এই অনুসারেই পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে পঠিতব্য "কোর" বিষয় এবং প্রত্যেকের পছন্দ ও প্রবণতা অনুসারে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন বিষয় নিয়ে গঠিত সাতটি প্রবাহে বিভক্ত ঐচ্ছিক পাঠের প্রস্তাব। এই সুপারিশকে অবলম্বন করেই আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া বাণিজ্য এবং বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের ধারনা বদলেছে। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বিদ্যার পাশাপাশি রয়েছে বৃত্তি শিক্ষার ট্রেডস্কুল এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। এই স্কুলগুলি নিম্ন মাধ্যমিকের সমপর্যায়ভুক্ত এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়সটি বৃত্তিশিক্ষা স্কুলেও যাপন করা যায়। আবার উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে আছে টেকনিক্যাল স্কুল। বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল টেনিং ইনস্টিটিউটে মেকানিক, ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিসিয়ান রূপে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বিত শিক্ষাই এইসব বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য।

মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা

ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে। ঐসঙ্গে চেতনার বিবর্তনও হচ্ছে দ্রুতগতি। তাই মুদালিয়র সুপারিশ কার্যকরী হতে না হতেই এই ব্যবস্থার ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং **মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে নূতনতর সুপারিশ করেন কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)।** এই সুপারিশের মূল কথা হলো (১) নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত সুসংহত (integrated) স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করতে হবে, যেন বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুবিধে হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করা না হয়, এবং যেন প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর উন্নয়নটি সহজ হয়। (২) শিক্ষায় সমসুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও সর্বজনীন করবার ব্যবস্থা করা দরকার (অবশ্য পর্যায়ক্রমে আবশ্যিক ও অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে)। (৩) কৈশোরকালের সমস্ত ধরণের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা হিসেবে বিচার করতে হবে। সুতরাং এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কারিগরি কিম্বা বৃত্তিগত যে কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষা গ্রহণ করুক, সবগুলিকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। (৪) তাছাড়া একমুখী তাত্ত্বিক শিক্ষার বদলে ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। বস্তুতঃ বৃত্তিভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষার কথা (Vocationalisation of Secondary Education) কমিশন বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। (৫) সমগ্র প্রাকযৌবন কালকেই মাধ্যমিক শিক্ষাকাল করবার অভিমতও কমিশন দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা, অর্থাৎ ১৪-১৮ বছর বয়সকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত করবার কথা বলা হয়েছে। (৬) কৈশোর কাল পূর্ণাঙ্গ বিশেষীকরণের সময় নয় বলে কমিশন ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত অবিভাজ্য সাধারণ পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব করেছেন। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ প্রান্তে ব্যক্তি বৈষম্যকে মূল্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা উচিত বলে কমিশন মনে করেছেন। (৭) ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পাঠ্যক্রমজনিত পার্থক্যের বিরুদ্ধেও কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (৮) পূর্ণাঙ্গ বিশেষীকরণ কিম্বা পাঠ্য বিভাজনের বিরুদ্ধে অভিমত জানিয়েও কমিশন বলেছেন সমস্ত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মমুখীনতা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই কর্মপরিচিতির (Work Experience) প্রস্তাব করা হয়েছে

(৯) শিক্ষার সঙ্গে সমাজ জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর কমিশন গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজসেবার মধ্য দিয়েই এটি সম্ভব। তাই জাতীয় সেবা তথা সমাজসেবাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার কথা বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনার সার সংক্ষেপ করে আমরা বলতে পারি যে আমাদের দেশেও মাধ্যমিক শিক্ষাচেতনা বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছে। গত শতাব্দী থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ছিল একমুখী, তত্ত্বভারাক্রান্ত, মানবিক বিদ্যায় ভারী, সমাজের ক্ষুদ্র অংশের জন্য "লিবারেল" মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ের ফলশ্রুতি হয়েছে মুদালিয়ার কমিটি রিপোর্ট। পরিশেষে সমসুযোগের ভিত্তিতে বৃত্তিকরণ এবং উৎপাদনমুখীনতার দৃষ্টিতে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা রূপ পায়। কোঠারি কমিশন এই পর্যায়ের প্রতিনিধি।

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান

আমরা আগেই বলেছি যে "মাধ্যমিক" কথাটির মধ্যেই রয়েছে এমন ভাবার্থ যে স্তরভেদে কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত রূপে গ্রথিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এটি মধ্যম স্তর। স্বভাবতঃই এর যোগাযোগ দুইদিকে—নীচে এবং উপরে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে। **একটি তেতলা বাড়ীর দ্বিতল হলো মধ্যশিক্ষা।** একতলা থেকে ৪।৫টি সিঁড়ি (প্রাথমিক শিক্ষা) অতিক্রম করে শিশুরা উঠবে দোতলায়। এই স্তরে উঠবার অধিকার সকলেরই থাকবে এবং উত্তরণটি হবে সহজ সরল ও বাধাহীন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

দোতলা থেকে শিক্ষার্থীরা উঠবে তেতলায়। কিন্তু তেতলায় আছে অনেকগুলি কামরা—সাধারণ উচ্চশিক্ষার, পেশাগত উচ্চশিক্ষার, কারিগরি ও বৃত্তিগত উচ্চশিক্ষার এবং কর্মজীবনের। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে হবে এইসব কামরায় ঢুকবার প্রস্তুতি। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্নমুখী উচ্চতর শিক্ষারও রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ, একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য

অংশরূপে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করাই প্রগতিশীল দেশগুলিতে সাম্প্রতিক ঝোঁক।

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বিভিন্নমুখী পথ

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে প্রাকযৌবন ছেলেমেয়েরা যৌবনের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দিকে যেতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটির কথা আমরা এখানে উদাহরণরূপে উল্লেখ করতে পারি।

(ক) এই স্তরের শেষে সাধারণ মানবিক বিদ্যা কিম্বা বিজ্ঞান কিম্বা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করা চলে স্নাতক স্তরের কলেজে এবং সেখান থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষাস্তরে।

(খ) বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞাণ, প্রভৃতি পেশাগত উচ্চশিক্ষার দিকে যাওয়া চলে।

(গ) শিক্ষকতার পেশার জন্য শিক্ষক শিক্ষণে যাওয়া সম্ভব।

(ঘ) সঙ্গীত, চারুকলা প্রভৃতি নানাধরণের নান্দনিক শিক্ষাও সম্ভব।

(ঙ) বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন দৈর্ঘের বাণিজ্যিক ও অর্থকরী শিক্ষার দিকে যাওয়া সম্ভব।

(চ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য নানা ধরণের টেকনিক্যাল স্কুল, পলিটেকনিক, (কিম্বা রাশিয়ার টেকনিকামীর মত) প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা চলে।

(ছ) চাকুরী, ব্যবসায় কিম্বা কলকারখানায় প্রসারিত কর্মজীবনে প্রবেশ করা সম্ভব।

(জ) কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশ করেও আংশিক সময়ের জন্য সাধারণ শিক্ষা কিম্বা বৃত্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া চলে। তা ছাড়া সান্ধ্যকলেজ প্রভৃতির মাধ্যমে উচ্চতর সাধারণ কিম্বা কারিগরি শিক্ষাও লাভ করা সম্ভব।

(ঝ) নানাধরণের করেসপণ্ডেন্স্ কোর্সের সাহায্য নেওয়াও সম্ভব।

(ঞ) মেয়েদের পক্ষে উপরে বর্ণিত পথগুলি ছাড়াও নানাধরণের হস্তশিল্প এবং চারুবিদ্যার পথ উন্মুক্ত থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য

উত্তর জীবনে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা এবং কর্মজীবনে বিভিন্ন ধারার জন্য

প্রস্তুতি চলে মাধ্যমিক স্তরে। তাছাড়া ব্যক্তি বৈষম্যের জন্যও বিভিন্নতা দরকার হয়। **তাই মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই নানাধরণের শিক্ষা-বৈচিত্র্য রয়েছে।** বিদেশের উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে **ইংলণ্ডের** গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, মডার্ণ স্কুলে রয়েছে বিভিন্নধর্মী পাঠ্যক্রম। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ পাঠ্যক্রম অবলম্বন করে নানা ধরণের কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষালয়ও আছে। **আমেরিকার** কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের মধ্যেই আছে পাঠ্যবৈচিত্র্য। তা ছাড়া রয়েছে পৃথকভাবে কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান, কারিগরি ইত্যাদি বিশেষ শিক্ষার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষ স্কুল। **ফ্রান্সে** লাইসী রয়েছে ক্ল্যাশিকাল, মডার্ণ, টেকনিকাল। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম বিভিন্ন। তাছাড়া স্বল্পমেয়াদী সাধারণ শিক্ষা এবং আলাদাভাবে বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে। **রাশিয়াতে** আছে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মাধ্যমিক স্কুল, টেকনিকামি ও অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সান্ধ্যকালীন আংশিক সময়ের স্কুল কিম্বা শ্রমিক এবং গ্রামীণ যুবকের স্কুল। **পশ্চিম জার্মানীতে** জিমনাসিয়াম আছে তিন ধরণের (তিনটির পাঠ্যক্রমে বিভিন্নতা আছে), স্বল্পমেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আছে মিটেল স্কুল, কন্টিনিউয়েশন শিক্ষার জন্য আছে বেরুফ-স্কুল, বেরুফ-ফ্যাক-স্কুল এবং ফ্যাক-স্কুল প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষালয়। **পূর্ব জার্মানীতে** সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাই দুইভাগে বিভক্ত—এ্যাকাডেমিক ব্রাঞ্চ এবং প্রাকটিকাল ব্রাঞ্চ। তা ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর মত তিন ধরণের জিমনাসিয়াম, মিটেলস্কুল এবং কন্টিনিউয়েশন স্কুল এখানেও আছে।

ভারতবর্ষে অল্প কয়েক বছর আগেও মাধ্যমিক শিক্ষায় তেমন কোন বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বহুমুখী এবং বিভিন্নধর্মী মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়েছে। এখানেও সমাজ এবং ব্যক্তির চাহিদাকে সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে। তাই বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষায় ৭টি **প্রবাহকে অবলম্বণ করে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।** তা ছাড়া রয়েছে জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল, ট্রেড স্কুল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন এবং নানা ধরণের বাণিজ্যিক ও "বিশেষ" শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নীতিগতভাবে এইসবগুলিই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত, যদিও চিরাচরিত ধারণার প্রভাবে আমরা অনেক সময়েই দশ কিম্বা এগার ক্লাশের স্কুলে সাধারণ শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে মনে করে থাকি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস

পাঠ্যক্রমগত বৈচিত্র্য ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে **আভ্যন্তরীণ সংগঠনগত বৈচিত্র্যও আছে।** যদিও ১১।.২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা ৬।৭ বছরকেই প্রাকযৌবন কালরূপে ধরা হয়, তবুও এর মধ্যে প্রথমার্দ্ধ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্যগুলি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সময়ে যে শিক্ষার্থীর যে সম্ভাবনা ফুটে ওঠে, তাকে পরবর্তী অধ্যায়ে সেই অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হয়। **তাই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম তিন কিম্বা চার বছরকে এবং শেষ চার কিম্বা তিন বছরকে পৃথক গুরুত্ব দিয়ে স্তরবিন্যাস করা হয়ে থাকে।** কোন কোন দেশে শেষ দু'বছরকে (১৭-১৮) ভিন্নতর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটে এবং পূর্ণ যৌবনের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা যেমন বাড়ে, তার চেতনা, দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও তেমনি বাড়ে।

উপরের আলোচনাটিকে পরিচ্ছন্ন করবার জন্য আমরা কিছু উদাহরণ উপস্থিত করছি। **ইংলণ্ডে** সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আর স্তরবিন্যাস নেই; বিভিন্ন ধরনের (তিন রকম স্কুলে) স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষাটি চলে একটানা। কিন্তু ভলাণ্টারি স্কুল, বিশেষতঃ পাবলিক স্কুলে ১২—১৩ বছরের সময়টিকে প্রেপ-স্কুল স্তর রূপে গণ্য করা হয়। **আমেরিকায়** জুনিয়র স্কুল—সিনিয়র স্কুল রূপে মাধ্যমিক শিক্ষায় দুইটি পর্যায় বিন্যাসের দিকে ঝোঁক ক্রমবর্দ্ধমান। তা ছাড়া স্কুলশিক্ষার শেষ প্রান্তে জুনিয়র কলেজ স্তরকেও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। **ফ্রান্সে** ১১—১৩ বছরকে ধরা হয় "অবজারভেশন সাইকেল" রূপে। এই নিরীক্ষণ পর্যায়ের পরে সাধারণ শিক্ষায় গমনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্ল্যাশিকাল-মডার্ণ ভাগে ভাগ করে দুই বছর পড়ানো হয়। এর পরে হয় বিভিন্ন ধর্মী পাঠ্যক্রমের জন্য চূড়ান্ত বাছাই। সাধারণ শিক্ষার জন্য এই বাছাই ছাড়া তিন বছরের স্বল্পমেয়াদী সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। **রাশিয়াতে** ১০—১৪ বছর পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক এবং ১৪—১৭ পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক, এবং ১৪—১৯ পর্যন্ত টেকনিকামির শিক্ষা। **পশ্চিম জার্মানীতে** ৯—১৫ বছর মিটেল স্কুল (মিড্‌ল্), ১৩—১৮ পর্যন্ত Aufbauschulen এবং ১৪—১৮ পর্যন্ত নানাধরনের

বৃত্তি শিক্ষালয় রয়েছে। পূর্ব জার্মানীতেও ১৩—১৪ বছর দুটিকে নিরীক্ষণ স্তর রূপে গণ্য করা হয়। সেখানেও আছে মিটেল স্কুল।

ভারতেও পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্তর রূপে বিবেচিত। এই স্তরের স্কুলগুলিই জুনিয়র হাই স্কুল, এম, ই স্কুল কিম্বা সিনিয়র বেসিক স্কুল। এর উপরে আছে মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক স্তর, নবম ও দশম শ্রেণী হবে নিম্নমাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী হবে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। প্রতিটি স্তরেই সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি থাকবে বৃত্তি-শিক্ষালয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ

সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত বিভিন্ন পথ, মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখীনতা এবং আভ্যন্তরীণ পর্যায়-বিন্যাস আমরা আলোচনা করেছি। একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নানাধরণের স্কুল সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুলের রকমভেদ হয়েছে নানা কারণে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকৃতির স্কুল সৃষ্টি হয়েছে। আবার মাধ্যমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘের হিসেবেও বিভিন্ন ধরণের স্কুল হয়েছে। সর্বোপরি মালিকানার ভিত্তিতেও স্কুলের প্রকারভেদ ঘটেছে।

ইংলণ্ডে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার প্রকৃতির ভিত্তিতে স্কুল আছে প্রধানতঃ তিন রকমের—গ্রামার, টেকনিকাল হাই এবং মডার্ণ। এদের ক্ষেত্রে শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। সম্প্রতি গড়ে উঠছে আরও দুই ধরনের স্কুল—বাইলেটারাল এবং কম্প্রিহেনসিভ। মালিকানার ভিত্তিতে ভাগ করলে ইংলণ্ডে পাওয়া যায় দুই ধরণের স্কুল—সরকারী (অর্থাৎ এল, ই, এর স্কুল) এবং ভলাণ্টারি (বেসরকারী)। ভলাণ্টারি স্কুলগুলির মধ্যেও আছে প্রকারভেদ, যেমন— ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, এইডেড্ এবং স্পেশাল এগ্রিমেণ্ট। সেখানকার বিখ্যাত পাবলিক স্কুলগুলিকেই পৃথক একটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। আমেরিকায় সর্বাধিক সংখ্যায় আছে কম্প্রিহেনসিভ স্কুল। আর আছে কৃষি, বাণিজ্য, গৃহ-বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতির বিশেষ স্কুল। এগুলি পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রকারভেদ। আবার এগুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আছে মালিকানার ভিত্তিতে প্রকারভেদ—সরকারী

(পাবলিক) এবং বেসরকারী (প্রাইভেট)। ফ্রান্সে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী লাইসী আছে তিন ধরণের (ইংলণ্ডের সমতুল্য একাডেমিক, টেকনিকাল, মডার্ণ), আর আছে আলাদা টেকনিকাল স্কুল। সেখানে বেসরকারী উদ্যম বে-আইনী নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যমই ক্রমবর্ধমান। তবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের অনেক স্কুল আছে। উভয় জার্মানীতেই পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা অনুসারে জিমনাসিয়াম আছে তিন ধরণের—ক্ল্যাসিকাল, সেমিক্ল্যাসিকাল, ওবের রিয়াল। এছাড়া আছে মিটেল স্কুল, Aufbauschulen, Frauen Schule, Economic High School প্রভৃতি। কিন্তু পূর্ব জার্মানীতে মালিকানার ভিত্তিতে প্রকারভেদ নেই, কারণ সেখানে সবগুলিই রাষ্ট্রীয় স্কুল। রাশিয়াতেও মালিকানার ভিত্তিতে প্রকারভেদ নেই। তবে অন্যভাবে আছে ৭ বছরের ও ১০ বছরের স্কুল, সান্ধ্যস্কুল, শ্রমিক-কৃষকের স্কুল, টেকনিকামি প্রভৃতি।

ভারতের মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে অনেক ধরণে প্রকারভেদ করা সম্ভব—যেমন (ক) ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, সহশিক্ষামূলক স্কুল, (খ) প্রাতঃকালীন স্কুল, দিবা স্কুল, সান্ধ্যস্কুল, আবাসিক স্কুল, (গ) মালিকানার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের এবং বেসরকারী। বেসরকারী স্কুলগুলির মধ্যে শ্রেণীভেদ করলে পাওয়া যায় সাহায্যপ্রাপ্ত, সাহায্যহীন। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মধ্যেও আবার রয়েছে ডেফিসিট গ্র্যাণ্ট অথবা লাম্প গ্র্যাণ্ট। সাহায্যহীন স্কুলগুলির মধ্যে অনেক আছে ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া ভারতের "পাবলিক স্কুলগুলিও" ইংলণ্ডের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। (ঘ) শিক্ষার ভাষা মাধ্যমের তারতম্য অনুসারে রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং মাতৃভাষার স্কুল (বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমিয়া, নেপালী প্রভৃতি)। (ঙ) পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রয়েছে বেসিক-ননবেসিক। (চ) সাধারণভাবে পাঠ্যক্রমের এবং বয়ঃক্রমের স্তরভেদ অনুসারে আছে জুনিয়র, সেকেণ্ডারি, হাইয়ার সেকেণ্ডারি (একপ্রবাহ, দ্বিপ্রবাহ, ত্রিপ্রবাহ প্রভৃতি)।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (Aims)

মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিবর্তন আমরা আগেই আলোচনা করেছি। একথা সহজেই বোঝা যায় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের

পটভূমিতে শিক্ষা চেতনা বিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষার লক্ষ্যও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কলেজীয় শিক্ষাস্তরে প্রবেশাধিকার লাভ। তখন শুধুমাত্র আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের তথাকথিত মেধাবী ছাত্ররাই এই শিক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত ছিল। শতকরা দশটি শিশুও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে চেতনার পরিবর্তন ঘটে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের ফলে প্রশ্ন ওঠে যে এই শিক্ষার লক্ষ্য কি ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতি (Preparation for life) কিম্বা সাধারণভাবে নাগরিকের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং বৃত্তিদক্ষতার প্রশ্নটিও লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে। তাই উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে লেখা ও ভাষার দক্ষতা, যুক্তিশীলতা এবং মননশীলতার উপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে বিশেষীকরণের (Specialisation) লক্ষ্যকে।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্রে বর্তমানে কিছুটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ একথা স্বীকৃত যে সাধারণ সাংস্কৃতিক শিক্ষা, কর্মজীবনের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা, প্রাক-পেশাগত শিক্ষা, এবং জীবন সামঞ্জস্যের শিক্ষাই হবে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হবে (ক) স্বাস্থ্য, (খ) মৌলিক দক্ষতা, (গ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনের দক্ষতা, (ঘ) গণতান্ত্রিক নাগরিকতা, (ঙ) বৃত্তিগত প্রস্তুতি, (চ) বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার, (ছ) সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রক্ষোভের ভারসাম্য, (জ) সার্থক অবসর যাপনের শিক্ষা এবং (ঝ) চরিত্র গঠন। অবশ্য এই ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্ন দেশে কোন কোন লক্ষ্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন—ইংলণ্ডে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র, আমেরিকায় নাগরিকতা এবং বৃত্তিদক্ষতা, রাশিয়ায় উৎপাদনী সামাজিকতা।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে লক্ষ্য ছিল অতি সংকীর্ণ, কারণ তখন সাধারণভাবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী তৈরী করা। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারলাভ। স্বাধীনতার উত্তরকালে মুদালিয়র কমিশন লক্ষ্য রূপে স্থির করেন—(ক) প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের গনতান্ত্রিক নাগরিক

তৈরী, (খ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি, (গ) যুব-সমাজের চরিত্র গঠন, (ঘ) উৎপাদনী এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি, (ঙ) মধ্যম স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ। অবশ্য উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করা হয়নি।

সর্বশেষে কোঠারি কমিশন বলেছেন যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরীই হবে মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ, যেন এই শিক্ষার প্রভাবে, কর্মপরিচিতি ও সমাজ সেবার অভিজ্ঞতা পুষ্ট এবং বিজ্ঞান, গণিত ও মানবিক বিদ্যায় পারদর্শি যুব-সমাজ জাতীয় উন্নতি এবং সংহতি নিশ্চিত করতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় পাঠ্যক্রমে, কারণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে তত্ত্বজ্ঞান, প্রয়োগবিদ্যা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মকাণ্ড প্রয়োজন সে সবের সমন্বয়েই পাঠ্যক্রম রচিত হয়। সুতরাং পাঠ্যক্রম তৈরীর সময় কয়েকটি মৌলিক বিবেচ্য হলো শিক্ষার স্তর, শিক্ষার্থীর বয়স, দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাকালের দৈর্ঘ, উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্য সহায়ক শিক্ষোপকরণ এবং পরিবেশ, এমন কি পাঠ্যক্রমকে কার্যকর করবার জন্য শিক্ষকের দক্ষতা প্রভৃতি। পাঠ্যক্রম তৈরীর ক্ষেত্রে আরও বিচার করার দরকার সমাজের চাহিদা এবং ব্যক্তির প্রয়োজন, এবং এই দুটি দাবির মধ্যে সম্ভাব্য সামঞ্জস্য। এই সূত্রেই মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তি বৈষম্য যেমন সত্য, পরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদাও তেমনি সত্য। সুতরাং পাঠ্যক্রম হওয়া চাই নমনীয় এবং পরিবর্তনীয়। তৃতীয়তঃ মনে রাখতে হবে যেন পাঠ্যক্রমটি শুধু পুঁথিগত তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ না হয়। ঐ সঙ্গে প্রয়োগ এবং কর্মচাঞ্চল্যের সুযোগ প্রয়োজন। তা ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দলগত প্রচেষ্টার সুযোগও দরকার।

পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধেও অনেক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে। কোন কোন পাঠ্যবিষয় গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়টি নির্ধারিত হবে জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ দিয়ে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক মূল্য বিচার করতে হবে। পরিশেষে বিচার করতে হবে শিক্ষার্থীর মনোজগতের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পর্ক।

উপরের আলোচনার পটভূমিতে আমরা এখন পাঠ্যক্রম

নীতিগুলি স্থির করতে পারি। (১) শিশুর নিজস্ব প্রয়োজন এবং তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য, অর্থাৎ যুগপৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির চাহিদা পূরণ, (২) ব্যক্তির প্রয়োজন বিচারে ব্যক্তিবৈষম্যের মূল্য, দৈহিক-মানসিক বৌদ্ধিক চাহিদা পূরণ এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমপ্রসারমান পাঠ্য-তালিকা। (৩) সামাজিক প্রয়োজন বিচারে সমাজের ঐতিহ্য সংরক্ষণ (Conservation of heritage), বর্তমান জীবনের চাহিদা মেটানোর মত উপযোগিতাসম্পন্ন (utility-value) শিক্ষাদান, এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ দরকার।

পাঠ্যক্রম সংগঠনের এই নীতি অনুসারে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে কতগুলি তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশ ঘটবে না; জীবন পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতা, অভ্যাস এবং গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রতিফলিত হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে বহুমুখী উন্মেষণের সুযোগ থাকবে, অপরদিকে সমাজের প্রয়োজন, সামাজিক চেতনা এবং সামাজিক দক্ষতার ক্রমবিকাশও প্রয়োজন। প্রয়োজন রয়েছে নাগরিক শিক্ষার। প্রয়োজন আছে সৃজনশীল গঠনমূলক কাজের, সহযোগিতামূলক স্কুল জীবনের এবং বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে স্কুল জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের। সর্বশেষে উল্লেখ্য হলো পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনতা। **কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখীনতার অর্থ চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞতা নয়। সাধারণ শিক্ষাই হবে মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর গড়া হবে বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষার সূচনা।** বিভিন্নমুখী শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের বাছাই এবং পরিচালনার জন্য "শিক্ষাগত পরামর্শ এবং নির্দেশনা ব্যবস্থাও" (Educational Guidance and Counselling service) পাঠ্যক্রম তৈরীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

পাঠ্যক্রম তৈরীর নীতি সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিতে আমরা সহজেই বলতে পারি যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশ্বের খুব অল্প সংখ্যক দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম ছিল। সংকীর্ণ আদর্শে, মানবিক বিদ্যার তত্ত্বভারাক্রান্ত বিষয় বস্তুতে, পরীক্ষার বোঝায় এবং কর্মচাঞ্চল্যের অভাবে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম প্রকৃত গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য পূরণ করেনি।

সাম্প্রতিককালে প্রচলিত বিভিন্নদেশের পাঠ্যক্রমেও অসংখ্য ত্রুটি,

রক্ষণশীলতা, গোঁজামিল এবং শ্রেণীবৈষম্যের অভিব্যক্তি রয়েছে। তবুও ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় প্রচেষ্টা এবং পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া চলে।

ইংলণ্ডে তিনটি দলে বিভক্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য তিনধরনের পাঠ্যক্রম রয়েছে এবং তিনটি ক্ষেত্রেই পাঠ্যবস্তুর প্রকৃতি, পরিধি এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন। **আমেরিকায়** রয়েছে সকলের আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে ভাষা ও সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞাণ ও গণিত, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির সমন্বয়ে Constants. তাছাড়া বিজ্ঞান, মানবিকবিদ্যা, গৃহবিজ্ঞান, চারুকলা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি নানা ধরণের বিষয়ের এক দীর্ঘ তালিকা থেকে **ঐচ্ছিক বিষয় বাছাই করবার অধিকার রয়েছে ছেলেমেয়েদের।** **ফ্রান্সে** তিন ধরণের লাইসীতে পাঠ্যক্রম তিনরকম—ক্ল্যাশিকাল গ্রীক, ক্ল্যাশিকাল ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ-মডার্ণ। স্কুল শিক্ষার শেষ স্তরে রয়েছে দর্শন, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, গণিত, কারিগরি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখায় বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা। তেমনি **পশ্চিম জার্মানীতেও** রয়েছে তিন ধরণের জিমনাসিয়াম—ফ্রান্সের 'লাইসীর' মত। **রাশিয়ায়** নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে রয়েছে রুশ ও আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, শাসনতন্ত্র, ভূগোল, জীববিদ্যা, পদার্থ ও রসায়ণ বিদ্যা, বিদেশী ভাষা, ড্রইং ও গান, শারীর শিক্ষা এবং উৎপাদনী শিল্প। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে রাশিয়ায় রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি ইত্যাদি এবং উৎপাদনী-শ্রম।

এবার আমাদের পাঠ্যক্রমের কথা বলছি। প্রথমে পুরানো দিনের কথা বলা যাক। **১৯৫৫ সন পর্যন্ত প্রচলিত** পাঠ্যক্রমের সমালোচনায় আমরা সকলেই ছিলাম পঞ্চমুখ। এবিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল যে তদানীন্তন পাঠ্যক্রম ছিল সংকীর্ণ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, পুঁথিগত মানবিক বিদ্যার তত্ত্বভারাক্রান্ত, পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একমুখো অনমনীয় পাঠ্যক্রম। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর স্বাধীনতা তখনও সামান্য ছিল। তাই "অতিরিক্ত বিষয়" (additional) নির্বাচন করা চলতো, কিন্তু নির্বাচনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ, কারণ সমগ্র পাঠ্যক্রমটি বহুমুখীনতার দৃষ্টিতে তৈরী ছিলনা।

মুদালিয়র কমিশন স্বাধীনতার উত্তরকালের পরিপ্রেক্ষিতে বহুমুখীনতার

নীতিতে, "Core-Periphery" ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশের সামান্য হেরফের করে আমাদের দেশে জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে একাধিক ভাষা (হিন্দীসহ) গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য (মেয়েদের গৃহ বিজ্ঞান), ইতিহাস, ভূগোল. শারীর শিক্ষা এবং হস্তশিল্প। ভাষার ক্ষেত্রে সকল রাজ্যেই রয়েছে মাতৃভাষা (শিক্ষার মূল বাহন) এবং হিন্দী. সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত ভাষা। মনে রাখা দরকার যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের অপরিণত ছাত্রদেরকে বিষয় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় না, এবং বহুমুখীনতাও এই স্তরে প্রয়োগ করা হয় না। সকলের জন্য এক পাঠ্যক্রমই এই স্তরের রীতি।

কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই রয়েছে বিষয় নির্বাচনের সুবিধে, কারণ সেখানে বহুমুখীনতার নীতি প্রবর্তিত। মাতৃভাষা, ইংরেজী, কোরগণিত, সাধারণ-বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ও হস্তশিল্পের সমন্বয়ে গঠিত সকলের জন্য আবশ্যিক কোর পাঠ্যক্রম, আর রয়েছে সাতটি প্রবাহে প্রতিটির অন্তর্গত ৬।৭টি বিষয়। এগুলি সমগোত্রীয়, সুতরাং অনুবদ্ধ রচনা করা সম্ভব। প্রত্যেকটি ছাত্রকে যে কোন ঐচ্ছিক প্রবাহ থেকে তিনটি বিষয় বেছে নিতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশেষ পাঠের সমন্বয়, ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছে। যে সব রাজ্যে এখনও দশশ্রেণীর স্কুল আছে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম/দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম/দশম শ্রেণীর পাঠ্য যেন পরস্পরের সমতুল্য হয় এবং প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ বছরের পাঠ্যক্রম যেন উচ্চতর মাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ও পাঠের সমতুল্য হয়।

বর্তমান পাঠ্যক্রমের সাধারণ রূপরেখা এবং বহুমুখীনতার সুযোগ আগেকার থেকে অনেক অগ্রগতির লক্ষণ। কিন্তু এই পাঠ্যক্রমেও অন্তর্নিহিত ত্রুটির অন্ত নেই। বর্তমান পাঠ্যক্রমও বিশেষজ্ঞদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই তত্ত্বজ্ঞানের বোঝায় ভারী। তাছাড়া অনুবন্ধের যথোপযুক্ত ব্যবহারের বদলে প্রতিটি বিষয় স্বমহিমায় বিরাজিত। এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা নিজ নিজ "সাবজেক্ট"-এর গরিমায় আত্মতুষ্ট। তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ের যে কথা মুদালিয়র কমিশন জোর করে বলেছিলেন, সেই সমন্বয়ের কোন চিহ্ন নেই বর্তমান পাঠ্যক্রমে। সহপাঠ্যক্রমিক কাজকেও

যে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তাও বাস্তবায়িত হয়নি। ছাত্রদের স্বাধীনতাও সীমায়িত, কারণ সীমাবদ্ধ প্রবাহের মধ্য থেকেই বিষয় নির্বাচন করতে হয় এবং একটি প্রবাহের বাইরে আর যাওয়ার উপায় নেই। সর্বোপরি ১৪ বছর বয়সে যেভাবে ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে, তা নিতান্তই অসম্ভব। এত অল্প বয়সেই বিশেষীকরণের সূচনাকে অনেক শিক্ষাবিদ ভাল নজরে দেখেন নি।

শিক্ষাগত নির্দেশনার প্রশ্নটি বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়াই স্বাভাবিক। মুদালিয়র কমিশনও গাইডেন্স ব্যবস্থাকে আবশ্যিক মনে করে বিস্তারিত সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সে-সব কোন কাজেই আসেনি। কলকাতায় গাইডেন্স ব্যুরোতে যে কাজ হয়, বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। "ক্যারিয়ার মাষ্টার" ট্রেনিং কোর্স যেটি কলকাতায় হচ্ছে, তারও বাস্তব মূল্য সন্দেহাতীত নয়। বস্তুতঃ আমরা একটি কথাই বলতে পারি যে বর্তমান পাঠ্যক্রমকে ফলপ্রসূ করবার জন্য যে সংগঠিত নির্দেশনা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের নেই।

আমাদের বর্তমান সপ্ত-প্রবাহ পাঠ্যক্রমে ছাত্র বাছাইয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে (ক) সাধারণ বুদ্ধির পরিমাপ, (খ) দেহ যন্ত্রের কুশলতার পরিমাপ, (গ) বিশেষাত্মক দক্ষতা, (ঘ) বিশেষ আগ্রহ এবং মনোভাব, (ঙ) পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, (চ) শিক্ষার্থীর দুর্বলতা এবং শক্তির অনুসন্ধান, (ছ) অপসঙ্গতি কিম্বা মানসিক খর্বতার পরিমাপ প্রভৃতি অপরিহার্য। এই কাজ সম্ভব কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানী, প্রশিক্ষিত অভীক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং অভিভাবকের যৌথ দায়িত্বে। কিন্তু এগুলির কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। অষ্টম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হয়ে থাকে। (অথচ শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে একটি পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা অন্যায়)। সর্বোপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার নম্বর কিম্বা শিক্ষকের অভিমতের উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র-ছাত্রীর "আবদার" এবং অভিভাবকের "দাবি"। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে অবৈজ্ঞানিক নির্বাচনের ফলে বহু ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরাই হয়েছে ভুলের বলি। যাই হোক, এই মন্তব্য আমরা অবশ্যই

করতে পারি যে অন্তর্নিহিত ত্রুটি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ফলশ্রুতিও অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে।

কোঠারি কমিশন আবার সমস্ত প্রশ্নটিই নূতনভাবে বিচার করেছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির স্তর নয়, বরং দৃঢ় ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষার সময়। তবে, মননশীল শিক্ষার ক্ষেত্রে যাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিম্বা বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে যাদের ঝোঁক রয়েছে, তাদের জন্য সাধারণ স্কুলের সমান্তরাল ভাবে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, টেকনিকাল স্কুল প্রভৃতি থাকবে এবং এক্ষেত্রে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। কিন্তু সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলে কোন প্রবাহ ব্যবস্থা থাকবে না।

কমিশনের রিপোর্টে সাত কিম্বা আট বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তার উর্ধে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হবে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়। এই পর্যায়ের সাধারণ পাঠ্যক্রমে থাকবে তিনটি ভাষা (পরে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে), বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা ও ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান (প্রত্যেকটি আলাদাভাবে, সমাজ-বিদ্যার মধ্যে মিশ্রিত আকারে নয়), শারীর শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, বাধ্যতামূলক-ভাবে কর্ম পরিচিতি (কাঠ, ধাতু, চামড়া, কার্পেট, পুতুল তৈরী, দর্জি, ছাপা, তাঁতবোনা, বই বাঁধাই, সাবান তৈরীর কাজ কিম্বা কৃষি ও পশুপালনের কাজ—এজন্যে দরকার হবে স্কুলের ওয়ার্কসপ এবং পশুপালন ও কৃষি খামারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক), এবং বাধ্যতামূলকভাবে সমাজ সেবার কাজ। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে কোন বহুমুখীনতা থাকবে না; নির্বাচনের সুযোগ থাকবে না; সমগ্র পাঠ্যক্রমটি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই হবে আবশ্যিক। এই স্তরের শেষে একটি প্রান্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং তদূর্ধ্বস্তরে সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দেওয়া হবে (ঐচ্ছিক কিম্বা আবশ্যিকভাবে)।

স্কুল জীবনের একাদশ ও দ্বাদশ বৎসর নিয়ে গঠিত হবে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়। বর্তমানে টেকনিকাল, বাণিজ্য, চারুকলা, গৃহবিজ্ঞান এবং কৃষি প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে পলিটেকনিক শিক্ষার বিষয়বস্তুরূপে সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সমান্তরাল এবং সমমূল্যসম্পন্নরূপে বিচার

করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিশন সুপারিশ করেছেন যেন ক্রমে ক্রমে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছেলেমেয়েকেই নানা ধরণের কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষালয়ে এক থেকে তিন বছরের পড়া ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়। তা ছাড়া নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও আংশিক সময়ের কোর্স এবং করেসপণ্ডেন্স কোর্সের সাহায্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

অবশিষ্ট যারা সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকবে তাদের জন্য **প্রবাহ ব্যবস্থা বাতিল করা হবে**, কারণ এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য থাকবে সাধারণ শিক্ষার প্রসার এবং দৃঢ়করণ। তবে চূড়ান্ত বিশেষীকরণ না হলেও বিষয় নির্বাচনের কিছু স্বাধীনতা ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হবে (প্রবাহ ব্যবস্থার সংকীর্ণ নির্বাচনের বদলে নির্বাচন ক্ষেত্রটি হবে অনেক প্রসারিত)। মাতৃভাষা এবং অন্য একটি ভাষা হবে সকলের জন্য অবশ্য পাঠ্য। তা ছাড়া মানবিক বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্তর্গত অনেকগুলি বিষয় থেকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যে কোন তিনটি বেছে নেবে। কেবল বিজ্ঞান কিম্বা কেবল মানবিক বিষয়ই নিতে হবে এমন নয়, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ও সম্ভব হবে। বাছাই করবার স্বাধীনতা থাকবে বলেই এই স্তরে বিজ্ঞান কিম্বা গণিত আবশ্যিক হবে না। তবে এই দুটি বিষয়ের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। **মেয়েদের জন্যও কোন আলাদা পাঠ্যক্রম থাকবে না**। এই স্তরের পাঠ্যক্রমেও **কর্মপরিচিতি এবং সমাজ-সেবার কাজ হবে আবশ্যিক**। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকেই, বিশেষতঃ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে **সাধারণ** (ordinary) এবং **অগ্রগামী** (advanced) স্তরে পাঠ্যক্রমকে ভাগ করা এবং পরীক্ষা নেওয়া চলবে। কমিশন সুপারিশ করেছেন যে শিক্ষাকালের $\frac{1}{8}$ সময় ভাষা শিক্ষার জন্য, $\frac{1}{8}$ শারীর শিক্ষা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজের জন্য এবং $\frac{1}{2}$ সময় ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য ব্যয় করা উচিত। রাজ্য শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনায় একটি প্রান্তিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির কথাও রিপোর্টে বলা হয়েছে।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে ইংরেজ আমলের পাঠ্যক্রম থেকে মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম অগ্রগতির পরিচয়। কিন্তু সেই পাঠ্যক্রমেও নানারকম ত্রুটি রয়েছে। কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম

প্রভাবিত হয়েছে সাম্প্রতিক বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষাচেতনা দ্বারা। ঠিকমত প্রয়োগ করা হলে এক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে কাগজে কলমে ভাল পাঠ্যক্রম হলেই চলেনা। শিক্ষার উপকরণ, সুযোগ, পদ্ধতি এবং শিক্ষকের উপরই ফলশ্রুতি নির্ভর করে।

মাধ্যমিক স্তরে ভাষা সমস্যা

আমাদের ভাষা সমস্যার ইতিকথা এবং সাধারণ সমাধানের কথা প্রথম পর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা শুধু মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নটি সংক্ষেপে বলছি।

প্রাথমিক স্তরের মত **মাধ্যমিক স্তরেও ভাষা সমস্যা** মূলতঃ দুটি—**শিক্ষার মাধ্যম এবং শিক্ষনীয় ভাষা**। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ এবং দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আগেই একথা স্বীকৃত হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। (অবশ্য ইংরেজ চলে যাওয়ার পরে ইংরেজীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে আগেকার তুলনায় বেশী। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাকুরীর বাজার, সামাজিক আভিজাত্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আমরা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর স্বার্থ নিয়েই এখানে আলোচনা করবো।)

ভাষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো শিক্ষনীয় ভাষার সংখ্যা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন। **মুদালিয়র কমিশন ত্রিভাষা সূত্র প্রস্তাব করেছিলেন**—মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক), ইংরেজী ও হিন্দী। (এবং প্রাচীন ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা রূপে স্বীকৃতি।) এই অনুসারে বর্তমানে জুনিয়র হাই স্কুল/সিনিয়র বেসিক স্কুলে ইংরেজী এবং হিন্দী পড়ানো হয় এবং অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত। একথা সর্বজনবিদিত যে বর্তমানে যেভাবে শেখানো হয়, তার ফলে হিন্দী কিম্বা সংস্কৃতে কোন কার্যকরী অধিকার জন্মে না।

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আগেকার সুপারিশগুলি থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত। মাতৃভাষা (কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা), হিন্দী এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি নূতন ত্রিভাষা সূত্র প্রস্তাব করেছেন, যেমন—

(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক)।

(খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দী কিম্বা ইংরেজী।

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজী অথবা হিন্দী, (৩) অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা।

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং উপরে লিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি।

সুতরাং দেখা যায় বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পাঠের কথা বলেছেন; নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তিনটি এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে দুটি ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন।

ত্রিভাষার এই সূত্রটি রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং পার্লিয়ামেন্টের শিক্ষা কমিটির দ্বারা আলোচিত হয়। এবং সেই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ত্রিভাষা সূত্র সমর্থন করে বলা হয় যে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ছাড়া অহিন্দী অঞ্চলে তৃতীয় ভাষাটি হওয়া উচিত হিন্দী এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলে এটি হওয়া উচিত অন্য একটি ভারতীয় ভাষা, সম্ভব হলে দক্ষিণ ভারতীয়।

ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক স্তরে দুই/তিন কিম্বা ততোধিক ভাষা শিক্ষার আবশ্যিক কিম্বা ঐচ্ছিক ব্যবস্থা রয়েছে। ইংলণ্ডে রয়েছে গ্রীক ল্যাটিন এবং যে কোন একটি ইউরোপীয় ভাষার প্রচলন, ফ্রান্স জার্মানীতেও আছে ল্যাটিন এবং ইংরেজীর প্রচলন, পূর্ব জার্মানীতে পড়তে হয় রুশ ভাষা, রাশিয়াতে পড়তে হয় আঞ্চলিক ভাষা, রুশ ভাষা এবং সাধারণতঃ একটি বিদেশী ভাষা। সুতরাং তিনটি ভাষা শেখবার কথাতেই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উপযুক্ত বয়সে, উপযুক্ত প্রণালী ও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব।

মাতৃভাষার স্থান থাকবেই; ইংরেজীরও মূল্য আছে; একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। তবে হিন্দী বিরোধী মনোভাবকে মনে রেখে ধৈর্য সহকারে অগ্রসর হওয়া দরকার। তাছাড়া ছাত্রদের উপর বেশী চাপ না পড়ে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতিকালেও আর একবার দুইটি ভাষার কথা বলেছেন। তবে আবেগ দিয়ে বিচার না করে যুক্তি দিয়ে বিচার করলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব, অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তরে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতি

শিক্ষার পদ্ধতি নির্ভর করে শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অপরদিকে শিক্ষার্থীর বয়স এবং মানসিক শক্তির উপর। প্রাকযৌবন ছাত্র-ছাত্রীদের যে ধরণের বৌদ্ধিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেকথা মনে রাখলে বুঝতে আদৌ কষ্ট হয়না যে **শৈশব ও বাল্যকালীন শিক্ষাপদ্ধতির অসংশোধিত প্রয়োগ এক্ষেত্রে অচল।** প্রোজেক্ট প্রভৃতি পদ্ধতিও নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় না। শৈশবকালীন শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতা একটু ভিন্ন।

মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েরা নৈর্ব্যক্তিক এবং বিমূর্ত চিন্তা করতে শেখে। সময় ও স্থান জ্ঞান যথেষ্ট দানা বাঁধে। চিন্তা ও যুক্তির ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অনেক বেড়ে যায়। তার্কিক পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণের ক্ষমতাও সৃষ্টি হয়। আত্ম-প্রচেষ্টায় কিছু কিছু রেফারেন্স বই পড়বার ক্ষমতাও বাড়ে। শিক্ষকের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে নিজে থেকেই অনেক কিছু তথ্য আহরণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে এই বয়সে সম্ভব। শ্রেণীপাঠের মধ্যে উপকরণ ব্যবহারের বাড়াবাড়িও এই স্তরে ভাল নয়। আলোচনা, বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। শিক্ষকের দেওয়া সামান্য "ক্লাশনোট" অবলম্বন করে পাঠ্য এবং সহপাঠ্য পুস্তকে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়। এইসব কথা মনে রেখেই পদ্ধতি নিরূপণ করা দরকার। **সুতরাং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষকের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দক্ষতা আবশ্যিক।**

এই স্তরে কোন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অন্ধ এবং অনমনীয় ভাবে অনুসরণ করবার প্রয়োজন নেই। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিপক্কতা ও আগ্রহের কথা মনে রেখে পদ্ধতিবৈচিত্র্য অবলম্বনের অধিকার শিক্ষকের আছে। কখনো তিনি উপকরণ ব্যবহার করবেন, কখনো বা যুক্তি এবং মৌলিক চিন্তার দরজায় আঘাত করবেন। কখনো সমস্যা সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করবেন, কখনো বা নির্দেশিত পাঠে (guided study) নিয়োগ করবেন, কখনো আবার আলোচনা এবং বিতর্কে নামাবেন। উদাহরণরূপে বলা চলে যে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে উপলব্ধি এবং ভাবপ্রকাশের উপর জোর দেওয়া দরকার। ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে হিউরিস্টিক পদ্ধতির মূল্য রয়েছে, তেমনি ভূগোলের ক্ষেত্রে আছে হাতেকলমে কাজের মূল্য। বাস্তব সমস্যাকে

অবলম্বন করে গণিত, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান পাঠের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সকলক্ষেত্রেই দেখতে হবে যেন দলগত এবং ব্যক্তিগত কাজের যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

পাঠ্যক্রমিক কাজ (curricular activities)

একথা অনস্বীকার্য যে যেকোন স্তরেই হোক না কেন, কর্মকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষাই সর্বোত্তম। "এ্যাকটিভিটি" কথাটি কেবল সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; **পাঠ্যক্রমকে অবলম্বন করেই নানাধরনের কাজ করা এবং করানো সম্ভব।** ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক রচনা কিম্বা কবিতা রচনা করাও "কাজ"। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বীক্ষণাগারে অভিজ্ঞতা লাভ করাও "কাজ"। ভূগোল পাঠের ক্ষেত্রে ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি আঁকা কিম্বা রিলীফ তৈরী করা বিশেষ মূল্যবান কাজ। ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট অবলম্বন করে স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করাও শিক্ষাগত কাজ। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজ জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাজার দর সংগ্রহ করে 'গ্রাফ' তৈরী করাও শিক্ষাগত কাজ। এই তালিকা দীর্ঘ করবার দরকার নেই। শিক্ষকের উদ্যোগ এবং শিক্ষক-ছাত্রের বন্ধুত্ব থাকলে বিরাট অর্থব্যয় ছাড়াও অনেক কাজ করা সম্ভব।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজ (Co-curricular activities)

পাঠ্যক্রমিক কাজ ছাড়াও **সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মূল্য মাধ্যমিক স্তরে বাস্তবিক সীমাহীন।** কৈশোরকালে আবেগজীবনে যে নূতন জোয়ার আসে, দেহমনে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়, যে নূতনতর অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়, যেভাবে নানা প্রশ্ন এবং নানা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সৃজনশীলতা বাড়ে, যেভাবে যূথ চেতনা বাড়ে, সেগুলি মনে রেখে যথেষ্ট সহপাঠ্যক্রমিক কাজে ছেলেমেয়েদের নিয়োজিত রাখলে সুস্থ দেহ মন গড়ে, সমাজচেতনা সৃষ্টি করে জীবনতরীর পালে হাওয়া লাগানো সম্ভব। এসবের অভাবে অপসঙ্গতি, অসামাজিক ও অসুস্থ দলচেতনা এবং সেখান থেকে অপরাধ প্রবণতার দিতে যাওয়াও সম্ভব। ছেলেমেয়েদের আমরা সুস্থ ছাত্রদল গড়তে সাহায্য করবো কিম্বা অসুস্থ গ্যাঙ্গ (gang) গড়বার দিকে ঠেলে দেব, সেটাই বিচার্য বিষয়।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজের শিক্ষাগত, সামাজিক, নৈতিক মূল্যের কথা এবং কাজের রকমফের, সংগঠন এবং শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, তা এখানেও মূলতঃ প্রযোজ্য। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে **সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সঙ্গে ছাত্র ও যুব কল্যাণ ব্যবস্থাটি অঙ্গাঙ্গী জড়িত।** বিদেশে এ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। **ইংলণ্ডে** ১৯৩৯ সন পর্যন্ত ছাত্রদের সামাজিক ও প্রমোদমূলক কাজের সুযোগ মূলতঃ পাবলিক স্কুল এবং অন্যান্য ভলাণ্টারি স্কুলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা, ছাত্রশাসন, অশ্বারোহণ, নৌচালনা, সাঁতার, ভ্রমণ প্রভৃতিই ছিল কাজের রূপ। সুতরাং ব্যবস্থাটি ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে যুব সম্পদের যে চরম দুর্গতি প্রকাশ পায় তারই ফলে সরকার এবং এল, ই, এ গুলি সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে এই ব্যাপারে এল, ই, এ গুলিকে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং মন্ত্রীদপ্তর থেকেও অর্থবরাদ্দ করবার ব্যবস্থা হয়। আজ সেখানে রয়েছে জাতীয় যুব কমিটি, এল, ই, এর যুব কমিটি এবং অফিসার। বেসরকারী সংগঠনগুলিকেও উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। Boys' Scout, Girls' Guide, Young Farmers' Club, Red Cross, Y.M.C.A, Y.W.C.A, Welsh League of Youth প্রভৃতি নানা ধরণের সংগঠন এখন ইংলণ্ডে আছে। আর আছে জাতীয় স্বেচ্ছাব্রতী যুবসংঘের স্থায়ী কমিটি। ১৯৬০ সন থেকে দশ বৎসরব্যাপী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ হচ্ছে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্কুলেও আছে ছাত্রসংগঠন, ছাত্রপ্রশাসন এবং নানা ধরণের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ।

ফ্রান্সে ছাত্র-স্বাধীনতা সম্প্রতিকাল পর্যন্তও স্বীকৃত ছিলনা। বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলাধূলার বদলে সেখানে শরীর গঠনমূলক খেলারই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলগুলিতে সম্প্রতি যে বিরাট ছাত্রবিদ্রোহ ঘটে গেছে, তার ফলে ভবিষ্যতে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ যে বেড়ে উঠবে একথা নিশ্চিত। **রাশিয়াতে** কিন্তু স্কুলের মধ্যে ও বাইরে ব্যাপকতম ভিত্তিতে ছাত্র-যুব প্রশাসন এবং সংগঠিত কর্মোদ্যম রয়েছে। আর এজন্য রয়েছে সারা দেশ জুড়ে সংগঠিত "ইয়ংপাইওনিয়ার্স" এবং "কমসোমল্"—যার শাখা রয়েছে প্রতিটি রাজ্যে, শহরে ও সোভিয়েটে এবং প্রতিটি শিক্ষায়তনে।

আমেরিকায় ছাত্র প্রশাসন, স্কুল গভর্ণমেন্ট এবং Student Body Officers ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। স্কেটিং, ফুটবল, Base Ball, নৌচালনা, পর্বতারোহণ প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। এছাড়া রয়েছে ছাত্রদের 'প্রকৃতি বিজ্ঞান সমিতি', সঙ্গীত সংগঠন, ক্রীড়াসংগঠন, অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক এবং "ইণ্টারেস্ট" অথবা 'হবি' ক্লাব, সমাজ সেবা ক্লাব, ছাত্রপত্রিকা প্রভৃতি ছাত্রদের চাঁদা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থে এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশে ছাত্র-স্বাধীনতার প্রশ্নটি এখনও রক্ষণশীলতার জালে আবদ্ধ। ছাত্রদের ইউনিয়ন গড়বার অধিকারই অনেকে স্বীকার করতে চাননা। অনেক অভিভাবক সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মূল্যই বোঝেননা। দুঃখের বিষয় অনেক শিক্ষকও প্রায় সেই দলভুক্ত। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। সায়েন্স ক্লাব, হবি ক্লাব, হাউস সিস্টেম কোন কোন স্কুলে গড়ে উঠেছে। স্কাউট, গাইড, ব্রতচারী, এ্যাম্বুলেন্স, এন সি, সি সংগঠন গড়ে উঠেছে। আন্তস্কুল, আন্তজিলা, আন্তরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরন এবং অন্যান্য "দিবস" অনুষ্ঠান এবং মৌসুমী অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। উদ্যোগী শিক্ষকরা অনেক সময় বিতর্ক কিম্বা প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকেন। সঙ্গতিসম্পন্ন কোন কোন স্কুল ভ্রমণ-সূচীও পালন করে।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এইসব কাজের ব্যাপ্তি এখনও নগণ্য। এজন্য আর্থিক সমস্যা কিয়দংশে অবশ্যই দায়ী। কিন্তু পাঠ্যক্রমের এবং পরীক্ষার বোঝা এবং চেতনার পঙ্গুতাও কিয়দংশে দায়ী। অর্থসমস্যা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষক ছাত্রদের সুস্থ দলচেতনা সৃষ্টি করতে পারেন এবং নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক চরিত্র গঠন করতে পারেন। অবশ্য এজন্য সরকারী অর্থ সাহায্যও বিশেষ প্রয়োজন। সুখের বিষয় ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার গুরুত্বটি সম্প্রতি বিশেষভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে যুবকল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা ও প্রমোশন

পরীক্ষা ব্যবস্থার (তা যে কোন প্রকারেরই হোক) যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমরা আগেকার অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে সেই সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হবেনা। বস্তুতঃ পরীক্ষার যৌক্তিকতা

এখনও স্বীকার করা হয় বলেই দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই আছে—অবশ্য বিভিন্ন ধরণের সংস্কারের ফলে প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক হয়েছে। ফ্রান্সের মাধ্যমিক স্কুলে শ্রেণী প্রমোশনের নিয়মিত পরীক্ষা রয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে রয়েছে "বাক্কালরিয়েট" পরীক্ষা এবং সাফল্যের স্বীকৃতিরূপে জাতীয় অভিজ্ঞান পত্র। উভয় জার্মানীতেই আছে "আবিটুর" পরীক্ষা। রাশিয়াতে রয়েছে শ্রেণী প্রমোশনের জন্য লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা এবং ৭ বছর ও ১০ বছর স্কুলের পাঠশেষে প্রান্তিক পরীক্ষা। ইংলণ্ডে রয়েছে পূর্ণ দৈর্ঘ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে জি, সি, ই পরীক্ষা এবং শ্রেণী পরীক্ষা (অবশ্য শ্রেণী প্রমোশনের ক্ষেত্রে সারা বছরে ছাত্রছাত্রীর কাজকে বিচার করা হয়)। জি, সি, ই পরীক্ষা হয় তিনটি পর্যায়ে—সাধারণ, অগ্রবর্তী, স্কলারসিপ (Ordinary, Advanced, Advanced Scholarship levels)। পরীক্ষার বিষয় নির্বাচন এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য স্তর নির্বাচনের স্বাধীনতা ভোগ করে ছাত্রছাত্রীরা। একসঙ্গে সমস্ত পরীক্ষা দেবার দরকার নেই, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পর্যায় পর্যায়ে পরীক্ষা দেওয়া চলে। বিভিন্ন বিষয়ের এগ্রিগেটের উপর চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ভর করেনা। তাই ইংলণ্ডে অসাফল্যের হার অল্প। জি,সি,ই, ছাড়া মডার্ণ স্কুলের ছাত্ররাও অনেক আন্দোলন করে 'স্কুল লিভীং পরীক্ষা' এবং অভিজ্ঞানপত্রের ব্যবস্থা আদায় করেছে।

আমেরিকার ব্যবস্থাটি অবশ্য এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে বাৎসরিক প্রমোশন পরীক্ষার বদলে সারা বছরের ক্রেডিট দিয়ে ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা হয় বহুক্ষেত্রে কার্ণেগি ইউনিট প্রথায়। কিন্তু তা সত্বেও পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি নেই। বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ভর্তিপরীক্ষা বেশ প্রচলিত।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছিল অনড়, অটল। পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন। তাই আধুনিক চেতনা সঞ্চারিত হওয়া সত্বেও পরীক্ষা সংস্কার হয়েছে এখনও নগণ্য মাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

এখানে পুরাতন পরীক্ষা কাঠামোর মধ্যে সামান্য অদলবদল করা হয়েছে মাত্র। দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ

সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাইভেট পরীক্ষায় সুযোগ রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে পাশাপাশি। বাংলা ভাষায় প্রশ্নের অনুলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে পরীক্ষাগৃহে প্রশ্ন বুঝতে সাহায্য করাও হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবজেকটিভ টেষ্ট কিম্বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়ার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে আরও সংস্কার হবে।

কিন্তু এখনও পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা প্রচলিত হয়নি। রচনাধর্মী প্রশ্নের বোঝা এখনও রয়েছে। Suggestion এর সুযোগ এখনও আছে। অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। প্রত্যেকটি বিষয়ে পাশ এবং এগ্রিগেটের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়নি। সাধারণ—অগ্রবর্তী স্তরভেদ নেই। কোন বিষয়ে পরীক্ষা না দেওয়ার অধিকার ছাত্রছাত্রীর নেই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটিমাত্র বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষায় প্রশাসনিক জটিলতার অন্ত নেই। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মেধা অনুসারে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ইত্যাদি স্থান ঘোষণা করা হয়। এ জিনিসটিও অবৈজ্ঞানিক। তা ছাড়া পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়নি। সার্টিফিকেটের গুরুত্ব এখনও রয়েছে এবং সেই তুলনায় আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্য অস্বীকৃত হয়েছে। এমন কি ক্লাশ প্রমোশনের জন্যও বাৎসরিক পরীক্ষাই উপজীব্য। আগে যেখানে বছরে তিনটি পরীক্ষা হতো, এখন সেখানে অধিকাংশ স্কুল কোনরকমে দুটি পরীক্ষায় শেষ করেন। আশ্চর্য নয় যে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হার অত্যন্ত বেশী। ইদানীং প্রত্যেক বারেই মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় দেড়লক্ষ পরীক্ষার্থী হচ্ছে, কিন্তু পাশ করছে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। এই ভাবেই হচ্ছে বিরাট অপচয়। এই বছর স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে ৪০ ভাগের কম।

কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন দুটি পরীক্ষার কথা। দশম শ্রেণীর পরে প্রথম সাধারণ বহিঃপরীক্ষা, এবং উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে আর একটি বহিঃপরীক্ষা। উভয় পরীক্ষাই গ্রহণ করবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং অভিজ্ঞান পত্রও দেবে। তবে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ এবং অগ্রবর্তী স্তরভেদ করবার কথাও বলা হয়েছে। অভিজ্ঞানপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর শুধু উল্লেখ থাকবে, সামগ্রিকভাবে পাশ-ফেল'এর ঘোষণা থাকবেনা। ইচ্ছে হলে ছাত্ররা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারবে। অবশ্য বোর্ডের সার্টিফিকেটের সঙ্গে থাকবে স্কুলের সমীক্ষা রিপোর্ট ও সার্টিফিকেট।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ এখনও মূলতঃ সুপারিশ। তবে এই প্রস্তাব আমাদের সামনে রয়েছে। Evaluation সম্পর্কে অন্যান্য পরীক্ষা ও গবেষণাও চলছে। মোট কথা, প্রশ্ন পদ্ধতি, উত্তর পদ্ধতি, নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি, প্রশাসন প্রভৃতি সকল দিক থেকেই পরীক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশনা

মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যক্তি বৈষম্য পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্য, স্কুলের নানা প্রকার ভেদ, বিচিত্র সহপাঠ্যমূলক কাজ এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা মনে রেখে বিচার করতে হবে যে এই স্তরে শিক্ষাগত নির্দেশনার প্রয়োজন আছে কিনা। বস্তুতঃ পরিচালকহীন শিক্ষার্থী এত বৈচিত্র্যের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে নিজের সর্বনাশই ডেকে না আনে! ছাত্রছাত্রী তখনও অপরিণত, জীবন-পথের যাত্রী। সুতরাং উপযুক্ত পথ সন্ধানের জন্য তাদের সাহায্য দরকার। এই সাহায্য দেওয়াই নির্দেশনার (guidance) কাজ।

নির্দেশনা সংক্রান্ত সাধারণ নীতিগত আলোচনা আমরা আগেকার অধ্যায়েই করেছি। এখানে মাধ্যমিক স্তরের নির্দেশনা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করবো। স্কুলে অধ্যয়নরত ক্রমবর্ধমান শিশুর পাঠ্যকোর্স বাছাই করা (educational guidance), বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করা (Vocational guidance), এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আবেগের ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্যের সহায়তাই স্কুল কাউন্সেলরের পক্ষে গাইডেন্সের কাজ।

শিক্ষা ও নির্দেশনা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। সুতরাং নির্দেশনার কাজ চলবে শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং ধারাবাহিক ভাবে গৃহে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে—পড়ায় ও কাজে। কয়েকজন বিশেষ ছাত্রছাত্রীর "সমস্যা সমাধানের" জন্যই কেবল নির্দেশনা ব্যবস্থা নয়, সকলের জন্য সমভাবেই এই সাহায্য দরকার। বিশেষতঃ বাড়ীর অপূর্ণতা পূরণ করবার জন্য, জটিল জীবনে সারল্য আনবার জন্য, শিক্ষা, বৃত্তি ও আবেগের পথ সহজ করবার জন্য নির্দেশনা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করবার সময় ছেলেমেয়েদের জ্ঞানক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়, বন্ধুত্ব বন্ধন নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়, নূতন আগ্রহ ও আকর্ষণ সংগঠিত হয়, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ গঠন হতে থাকে। এই সময় নির্দেশনার কাজ শিক্ষার্থীকে

দিকভ্রান্তি ও ব্যর্থতা থেকে শুধু উদ্ধার করাই নয়, তার সমস্ত সম্ভাব্য শক্তিকে জাগ্রত করে, কাজে লাগিয়ে, অনেক পুরানো শিক্ষা ভুলিয়ে, অনেক নূতন শিক্ষা দিয়ে, নূতন স্তরে শিক্ষা-সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

সুতরাং গাইডেন্স সম্পর্কে এই স্তরের নীতি হবে—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা, (২) জীবনযাত্রায় ভাল পরিকল্পনার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করা, (৩) শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্যের সহায়তা করা।

এই নীতি অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে **শিক্ষা-নির্দেশনা** কার্যক্রমে থাকবে—

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

(খ) নিজের ক্ষমতা, দক্ষতা, আগ্রহ ও বিশেষ গুণের পরিচয় লাভ করতে তাকে সাহায্য করা।

(গ) বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের বৃত্তিগত তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করা।

(ঘ) কোন বিশেষ স্কুলে শিক্ষার্থীর আকাঙ্খিত বিশেষ বিষয় পড়ানো হয়, সেই সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা।

(ঙ) পলিটেকনিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করা।

(চ) বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পশ্চাৎপদতা দূর করে এবং লেখাপড়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়ে অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

(ছ) লেখাপড়ার জন্য প্রকৃত আন্তরিক প্রেরণা লাভ করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি নির্দেশনার মূল কথা হলো—

(ক) নিজেদের সম্ভাবনা জানতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(খ) কর্মজগৎটিকে জানতে সাহায্য করা।

(গ) ঠিকমত বৃত্তি নির্বাচন করতে সাহায্য করা।

(ঘ) নির্বাচিত বৃত্তিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(ঙ) নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(চ) কলেজীয় স্তরে প্রবেশ করবে কিনা,—এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে উপরে আলোচিত বিষয়গুলি মূলতঃ মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে নির্দেশনার কাজ হবে উন্নত সামাজিক সামঞ্জস্য ও পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে সাহায্য করা, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়া, নিজের ভবিষ্যৎ বাছাই করতে সাহায্য করা, আংশিক সময়ের কাজ কিম্বা আর্থিক সঙ্গতির সন্ধান দেওয়া, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নজর রাখা এবং তার ব্যক্তিত্ব সংগঠনে সাহায্য করা।

এই সূত্রে বলা দরকার যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে **নিম্নমেধা এবং উচ্চমেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী অন্বেষণ করাও গাইডেন্স কার্যক্রমের অন্তর্গত।** মনোবিজ্ঞানীরা একথাই বলেছেন যে সাধারণ বুদ্ধ্যাঙ্ক যদি ১০০ ধরা হয়, তবে ৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যাঙ্কসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকে ধরা হবে সাধারণ মেধাসম্পন্ন; শতকরা ৬০ ভাগ ছেলেমেয়ে এই শ্রেণীর। বুদ্ধ্যাঙ্ক যাদের নব্বুইয়ের নীচে, তারা স্বল্পমেধাসম্পন্ন, এরা মোট ছেলেমেয়ের ২০ ভাগ। এদেরও মধ্যে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৬০'এর নীচে, তারা নিশ্চয়ই মানসিক বাধাগ্রস্থ অথবা পঙ্গু, এদের জন্য বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা দরকার (এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করবো)। আর ৬০ থেকে ৯০ পর্যন্ত বুদ্ধ্যাঙ্কের ছাত্রছাত্রী হয়তো তত্ত্বমূলক শিক্ষার চেয়ে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষায় লাভবান হবে। সুতরাং এদেরকে সেইভাবে নির্দেশিত করা প্রয়োজন। অপরদিকে ১১০এর উপরে বুদ্ধ্যাঙ্ক সম্পন্নদেরকে আবার তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—১১০ থেকে ১২০ এর কোঠায় যারা তাদেরকে বলা হয় উজ্জ্বল (Bright), ১২০ থেকে ১৪০এর কোঠায় যারা তাদেরকে বলা হয় অসাধারণ-ধীশক্তি সম্পন্ন (gifted) এবং ১৪০ এর উপরে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক তাদের বলা হয় প্রতিভাবান (genius)। সহজেই অনুমেয় যে **উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে-মেয়েদেরকে আবিষ্কার করে তাদের জন্য অতিরিক্ত পাঠ, কিম্বা অগ্রবর্তী পাঠ্যক্রমের সুযোগ করে দেওয়াও গাইডেন্স কার্যক্রমের অন্তর্গত।**

শিক্ষা কখনোই উদ্দেশ্যহীন নয়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সামাজিক যোগ্যতা, অর্থনৈতিক যোগ্যতা এবং সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য প্রভৃতি শিক্ষাদর্শের অন্তর্গত। সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ্যতাকে খাপ খাওয়ানোই শিক্ষার

লক্ষ্য। জটিল জীবনে অযোগ্যতার অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীকে রক্ষা করাই গাইডেন্স প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষাগত সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা, ক্ষমতার পরীক্ষা, দুর্বলতা নির্ণয়ের পরীক্ষা যেমন দরকার, তেমন দরকার বৃত্তিগত সম্ভাবনা আবিষ্কারের জন্য হাতে কলমে কাজের পরীক্ষা। আর মানসিক জটিলতা আবিষ্কার এবং ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন শিশুনির্দেশনা ক্লিনিক। এই সূত্রেই আমরা মাধ্যমিক স্তরে অপসঙ্গতির প্রশ্নে এসে পড়ছি।

অপসঙ্গতির সমস্যা

অপসঙ্গতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে মাধ্যমিক স্তরে অপসঙ্গতির সমস্যাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রাক-যৌবনকালে দেহ মনে যে দ্রুত পরিবর্তন আসে, তার ফলেই জীবনের নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই জটিলতার সহজ ও সরল সমাধান সম্ভব না হলেই অসঙ্গতি দেখা যায়।

যৌবনের স্বভাবধর্মই প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মচাঞ্চল্য। এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের বন্ধুবাৎসল্য এবং দলচেতনা বড়ই প্রখর। তাই যদি দেখা যায় কোন ছেলে অথবা মেয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন, অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে অসমর্থ, আত্মকেন্দ্রিক এবং কর্মচাঞ্চল্যহীন কুণো স্বভাবের, তবেই বুঝতে হবে কোথাও গরমিল আছে। প্রাক-যৌবন ছেলেমেয়েরা দায়িত্ব চায়, দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং অপরের স্বীকৃতি আশা করে। এগুলির অভাব ঘটলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়, জুলুম পরায়ণ হয় এবং বিভিন্ন অসঙ্গত পন্থায় স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে। তাছাড়া দিবাস্বপ্ন, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে উদাসীনতা, শিক্ষালাভের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ায় পশ্চাৎপদতা প্রভৃতি নানাভাবেই অপসঙ্গতি প্রকাশ পায়।

আবেগচঞ্চল কৈশোরের সুপ্ত কামনা এবং ভারসাম্যহীন আবেগের তাড়নায় অনেক সময়ই মানসিক জটিলতা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অবদমনের সুস্থ পথ না পেলে আবেগগুলিকে দমন করবার চেষ্টা হয়, তা থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক বিকৃতি। কখনও বা অসঙ্গত পন্থায় সুপ্ত কামনাকে পরিতুষ্ট করবার চেষ্টা হয়। এই পথেই আসে অপরাধ প্রবণতা (delinquency) এবং অসামাজিক দলবদ্ধতা (Gangsterism)।

প্রাকযৌবনকালে অপসঙ্গতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যৌন বিশৃঙ্খলা। যৌনচেতনা এই বয়সের ধর্ম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এবিষয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে বলা হয়েছে যে শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতাই উত্তর জীবনে নানা ধরণের অসঙ্গত আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। তত্ত্বগত কারণ যাই হোক, একথা নিঃসন্দেহ যে জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত দিক যদি অস্বাভাবিকতায় পর্যবসিত হয়ে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার কাজ শিক্ষাকার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা

মানসিক স্বাস্থ্য কথাটির মূল প্রতিপাদ্য হলো মানসিক ভারসাম্য। মনের মধ্যে বিভিন্ন আবেগের যদি ভারসাম্য থাকে, তবে বাইরের পরিবেশের সঙ্গেও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। ভিতর ও বাইরে সার্বিক ভারসাম্যই ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল কথা। সুতরাং মানসিক বিশৃঙ্খলা বলতে বুঝায় সুস্থ আবেগ জীবন নিয়ে জীবনের অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে অক্ষমতা। শিক্ষার্থীকে এই ক্ষেত্রে সাহায্য করাই তার মানসিক স্বাস্থ্যবিধানের মূল কথা। এজন্যে প্রয়োজন মনের জটিল গ্রন্থিগুলি খুঁজে বার করা, জট ছাড়িয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকে তাকে রক্ষা করা। শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় এবং জীবনেতিহাস সংগ্রহ করে, মানসিক সমীক্ষা প্রয়োগ করে, প্রয়োজনবোধে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করে মানসিক ব্যাধি দূর করতে হবে

এই সূত্রেই প্রশ্ন ওঠে যৌনশিক্ষা প্রয়োজন কিনা! বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিকভাবেই যৌনচেতনা সৃষ্টি হয়, নানা ধরণের ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়, কামনা চরিতার্থতার জন্য কিছু কিছু লিপ্সাও দেখা দিতে থাকে। যৌন অনুভূতি যেন ভীষণ অন্যায় এবং অসঙ্গত, এইরকম একটা ধারনা থেকে সবকিছু গোপন করবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কৌতূহল মেটানোর জন্য বন্ধুদের দ্বারস্থ হয়ে প্রায়শঃই ভুল পথে পরিচালিত হয়। এইসব কিছুর ফলেই নানা ধরনের যৌন বিকৃতি দেখা দেয়। বিকৃত যৌনচেতনা থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করাই মূল কাজ।

যৌন সুস্থতার জন্য প্রথম দরকার বাড়ীর পরিবেশ, পিতামাতার জীবনযাত্রা এবং শিক্ষার্থীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া। তাকে তীব্র উত্তেজনার হাত থেকে রক্ষা করা দরকার, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্ভ্রম জাগানো দরকার। গঠনমূলক কাজে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগকে নিবদ্ধ করা দরকার। অতিরিক্ত লজ্জা, আত্মপ্রীতি, অপরাধ চেতনা প্রভৃতি প্রক্ষোভ-বিকৃতি এবং অস্বাভাবিক পন্থায় কামনা পরিতৃপ্তির পথ থেকে সরিয়ে আনা দরকার। তাছাড়া শারীর বিদ্যা, জীববিদ্যা মনোবিদ্যার সাধারণ পাঠের মধ্য দিয়ে তাদের বোঝানো দরকার যে যৌনবোধ প্রত্যেক মানুষের জীবনে অতি স্বাভাবিক জিনিস, এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু ঐসঙ্গে বোঝানো দরকার যে যৌন পরিতৃপ্তির কামনাই ভালবাসা নয়। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ এবং সংস্কৃতিচেতনা একটা বড় স্থান দখল করে থাকে। মোটকথা যৌনতত্ত্বের জ্ঞানগর্ভ বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বদলে আচার আচরণের মাধ্যমে যৌনচেতনাকে স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত করাই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যৌনশিক্ষার (sex education) মূল কথা।

সহশিক্ষার প্রশ্ন

মাধ্যমিক স্তরে ছেলে এবং মেয়েরা একই স্কুলে এবং একই সঙ্গে পড়বে কিনা, এও একটি প্রশ্ন। সহশিক্ষার প্রশ্নটিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দরকার।

সমাজ যেখানে রক্ষণশীল, সেখানে সহশিক্ষা প্রবর্তন করার প্রশ্নই ওঠেনা। বৈপ্লবিকভাবে সহশিক্ষা চাপিয়ে দিয়ে রক্ষণশীলতা দূর করবার পরিকল্পনাও অবাস্তব, কারণ সে অবস্থায় মেয়েদের পড়াশুনাই বন্ধ হবে। বস্তুতঃ আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া যতটা সোজা, গ্রামাঞ্চলে ততটা নয়। আলাদা মেয়ে স্কুল যেখানে নেই, সেখানে অনেক বাপ মা'ই কিশোরী মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে না পাঠিয়ে বরং ঘরে বসিয়ে রাখতেও প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও সংস্কার অত্যন্ত প্রবল।

অর্থনৈতিক কারণে হয়তো অনেক সময় সহশিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তে পারে। ছাত্রীসংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিচালনা হয়তো সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকা

পাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে ছেলেদের স্কুলেই স্বল্প সংখ্যক মেয়ের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরণের সহশিক্ষামূলক স্কুল রয়েছে অনেক।

কিন্তু যে সব দেশে সামাজিক রক্ষণশীলতা তীব্র নয়, এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে সে সব দেশেও শিক্ষাগত কারণে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে প্রাক-যৌবনকালে ব্যক্তি বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্যও এই সময়ে প্রকট হয়ে ওঠে। উভয়ের প্রাণচাঞ্চল্য এবং দৈহিক শক্তি একই প্রকৃতির নয়, উভয়ের খেলাধূলো এবং আগ্রহ-আকর্ষণও সমধর্মী নয়। উভয়ের আবেগজীবনও একই রকম নয়। মেয়েদের স্বাস্থ্য, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের এমন সমস্যা আছে যেগুলি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জটিলতাই সৃষ্টি করে। একথা হয়তো আংশিক সত্য যে ভাই বোনের মত স্বাভাবিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে যৌনবিকৃতি সমস্যার হয়তো আংশিক সমাধান সম্ভব। আবার একথাও সত্য যে অবাধ মেলামেশার ফলে যৌন-বিকৃতিও সম্ভব।

এইসব কারণে বিভিন্ন দেশে মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক স্কুল পরিচালনার দিকেই সাম্প্রতিক ঝোঁক বেশী। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলি এবং অন্যান্য অনেক সরকারী ও ভলাণ্টারি স্কুলই পৃথক। ফ্রান্স ও জার্মানীতেও আছে মেয়েদের পৃথক স্কুল। রাশিয়াতে বিপ্লবোত্তরকালে সহশিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেখানেও পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকাতে সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানই বেশী। সেখানে অবাধ মেলামেশাও রয়েছে, এমনকি "ডেটিং" ব্যবস্থাও প্রচলিত। কিন্তু যৌন অপরাধও আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান। তাই সেখানেও কিছু কিছু ভিন্ন চিন্তা ইদানীং দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশে পৃথক প্রতিষ্ঠানের রীতিই স্বাভাবিক নীতি। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বস্তুতঃ এবিষয়ে ক্রমবর্ধমান চেতনা এই যে প্রাথমিক স্তরে ছেলে ও মেয়ের একই সঙ্গে পড়া উচিত, প্রাক যৌবনকালে পৃথক প্রতিষ্ঠানই শ্রেয়, আবার বিচার যুক্তি ও আবেগের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে

এবং নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নেওয়ার যোগ্য হলে **উচ্চশিক্ষার স্তরে সহশিক্ষা সম্ভব।**

ছাত্র-বিশৃঙ্খলার সমস্যা

উপরে আলোচিত মানসিক বিকৃতি এবং অপসঙ্গতিই অনেক সময় ছাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (indiscipline)। অবশ্য ছাত্র **বিশৃঙ্খলার আরও অনেক কারণ আছে,** যেগুলির মধ্যে **একটি অংশ স্কুলের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়। আর একটি অংশ সৃষ্টি হয় স্কুলের বাইরে** বৃহত্তর সমাজ জীবনে। বিশৃঙ্খলা তখনই ঘটে যখন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষা পরিবেশের গরমিল ঘটে, অথবা উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

ভগ্নস্বাস্থ্য শিক্ষার্থী কখনোই পড়াশুনায় উদ্যোগী হতে পারে না। সে অমনোযোগী হবেই, কিম্বা পিছিয়ে পড়বেই এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। যে শিক্ষার্থীর জীবনে শৈশবকাল থেকে সদভ্যাসের কোন মূল্য সৃষ্টি হয়নি, তার পক্ষেও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীর বয়স এবং মানসিক শক্তির সঙ্গে পাঠ্যক্রম যদি সামঞ্জস্যহীন হয়, তবেও সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা। পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত শক্ত হলেও বিশৃঙ্খলা হবে, অতিরিক্ত নরম হলেও তাই হবে, কারণ বাড়তি মননশক্তি নানাভাবে পথ খুঁজে নেবার ব্যবস্থা করবে। অবৈজ্ঞানিক পাঠপদ্ধতি, ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তার অভাব, পড়ার সঙ্গে বিশ্রাম ও আনন্দের যথাযথ সমন্বয়ের অভাব, সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের ঘাটতি, অতি শাসন ও নিপীড়ন প্রভৃতি নানা কারণেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিকলাঙ্গ, কিম্বা স্বল্পমেধা অথবা মানসিক পঙ্গুতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী যদি সাধারণ স্কুলে পড়ে তবে তাদেরকে কেন্দ্র করেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি উচ্চমেধা অথবা প্রতিভাবান্ শিক্ষার্থী যদি সাধারণ পাঠ্যক্রম এবং বিদ্যালয়ে যথেষ্ট মননশীলতার সুযোগ না পায় তবেও অমনোযোগী ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। অনেক সময় অতি সাধারণ বিষয় নিয়েও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়—যেমন আলো হাওয়া শূন্য ক্লাশঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বসবার এবং শিক্ষকের কথা শোনা অথবা বোর্ডের লেখা দেখবার অসুবিধা প্রভৃতি। তা ছাড়া বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম উৎস, একথা সর্বজনবিদিত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্কের উপর শৃঙ্খলার প্রশ্নটি

বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষকের পক্ষপাতমূলক আচরণ, বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্পর্শকাতর হৃদয়ে বিরূপ আঘাত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, শিক্ষকের আদর্শহীনতা প্রভৃতিও ছাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ। শিক্ষা যখন উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থী যখন আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করে, শিক্ষা পরিবেশে যখন সম্পূর্ণ ভারসাম্য বিরাজ করে, ছাত্র যখন নিবিষ্টচিত্ত কাজের মধ্যে আত্মপরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায়, তখন সে নিজেই সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এ জিনিস শৃঙ্খলা, শৃঙ্খল নয়।

ছাত্র বিশৃঙ্খলার সমস্যা আজকের দিনে অবশ্য কেবল স্কুলের মধ্যেই সৃষ্টি হয় না। স্কুলের বাইরেও ছড়িয়ে আছে বিশৃঙ্খলার নানা উৎস। প্রাকযৌবন শিক্ষার্থী যখন প্রকৃতিগতভাবেই চলতি দুনিয়া সম্পর্কে জানতে চায়, যখন তার সমাজচেতনা সংগঠিত হয়, যখন তার কাছে আদর্শের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন বৃহত্তর সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে থাকবে নিরুদ্বিগ্ন এবং নিরুত্তাপ, এটা আশা করাই যায় না। যদি কেউ থাকে, তবে সেই অবস্থাটিকে সমাজচেতনার অভাব এবং মানসিক অপসঙ্গতি ও বিকৃতি বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উপায়, পদ্ধতি ও ভঙ্গি সম্বন্ধে শিক্ষা মহলে এখনও মতবৈষম্য আছে।

পরিশেষে বলা দরকার যে যৌনবিকৃতি এবং অসুস্থ যূথবদ্ধতাও বিশৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কৈশোর জীবনে ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই বন্ধুবৎসল হয়। পরস্পরের সঙ্গে তারা যূথবদ্ধ হয়ে ওঠে (group), দলচেতনা প্রায়শঃই ব্যক্তিচেতনাকে ছাপিয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা হয় দলের পাণ্ডা। বস্তুতঃ দলনেতৃত্ব এবং দলজীবন যদি সুপথে চালিত হয়, তবে দলের প্রতিটি সভ্যের জীবনেই আসে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পরিতৃপ্তি। কিন্তু দলনেতৃত্ব বিপথগামী হলে দলটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অসুস্থ দলজীবনের সঙ্গে যদি যৌনবিকৃতির উপসর্গটি যোগ হয়, তবে তো আর রক্ষেই নেই।

ব্যক্তিগত অপসঙ্গতি থেকে যেমন ব্যক্তিগত অপরাধ প্রবণতা জন্ম নেয়, তেমনি অসুস্থ যৌথ জীবন থেকে দলবদ্ধ অপরাধ প্রবনতা সৃষ্টি হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম পরিপূর্ণতার স্বাস্থ্যকর পথ না পেয়ে বিকৃত পথ অবলম্বন

করেছে যারা, সমাজের চোখে ঘৃণিত হয়ে তারা সমাজকে প্রত্যাঘাত করতে চায় অপরাধ প্রবণতার দ্বারা। তাই সামাজিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পরস্পরের মধ্যে বেপরোয়া আচরণ করে ছেলে-মেয়েরা। অতি সামান্য কারণে দলবদ্ধ মারপিট কিম্বা রাহাজানি আজ ক্রমবর্দ্ধমান।

এই পরিস্থিতির জন্য বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই বহুলাংশে দায়ি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য স্কুল অথবা শিক্ষক শিক্ষিকারও যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব

শিক্ষকের সাধারণ দায়িত্ব এবং গুণাবলীর কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ)। সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে আরও কিছু দাবি করবার আছে। সেটুকুই এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে।

শিক্ষা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বর্ষণ নয়, সমস্ত জীবনধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা, ভাবজগত থেকে কর্মজগত পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সকল রকম স্বকীয়তাকে সযত্নে লালন করা এবং অভ্যাস, আচরণ আকাঙ্খাকে প্রত্যাশিত পথে পরিচালনা করা—এইসব কিছু নিয়েই প্রকৃত শিক্ষা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকের যোগ্যতা এবং পারদর্শিতা চাই। স্কুল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করবেন শিক্ষক। পরোক্ষভাবে হলেও ছাত্রসমাজের প্রকৃত নেতা হবেন শিক্ষক। তাকে হতে হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকরনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ছাত্রদের উৎসাহিত করা, তাদেরকে শৃঙ্খলাপরায়ন করে গড়ে তোলা, তাদের প্রশংসা কিম্বা তিরস্কার করবার কর্তব্য ও অধিকারও শিক্ষকের। গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, তা ছাত্ররা অর্জন করবে শিক্ষকের নিজস্ব জীবনধারা থেকে। ছাত্রদের মানসিক ভারসাম্য আসবে শিক্ষকের ভারসাম্য-সম্পন্ন মানসিকতার স্পর্শে। এমনকি শিক্ষকের সোনার কাঠির ছোঁয়া না পেলে ছাত্রদের সহপাঠ্যক্রমিক কাজও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনা। মাধ্যমিক স্তরে এইসব বিষয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য স্তর অপেক্ষাও বেশী।

প্রথমেই বলা দরকার যে উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর যে ব্যাপকতা ও গভীরতা, তার উপযুক্ত ফলশ্রুতি পেতে হলে যথেষ্ট শিক্ষাগত

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক দরকার। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অনেক কিছুই জানতে পারছে (এমনকি পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়ও)। সেসব সম্বন্ধে ছাত্রদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার দক্ষতা শিক্ষকের থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ কৈশোরকালে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছাত্র-ছাত্রীকে অনবরত ভাবিয়ে তোলে। সেই ভাবনাকে কাম্য পথে পরিচালন করবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকা চাই। এই বয়সে ছাত্রদের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের জোয়ার চলে, তার সঙ্গে শিক্ষকের স্নিগ্ধ সম্পর্ক চাই। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলোয় প্রত্যক্ষ অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও উৎসাহদানের যোগ্যতা থাকা দরকার। কৈশোর জীবনে মনের অলিতে গলিতে যে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ উপস্থিত হয় তার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষকের অনুভূতিপ্রবণ মন। প্রক্ষোভ বিকৃতির ফলে যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি হয়, তার রূপ নির্দ্ধারণ ও নিরসনের যোগ্যতাও শিক্ষকের কাছে আশা করা হয়। তিনি যৌন চেতনাকে সুস্থ পথে ও পদ্ধতিতে অবদমন করাবেন। ছাত্রদের সুস্থ যৌথজীবন গড়া এবং অস্বাস্থ্যকর দলচেতনার পথ রোধ করবার দায়িত্বও শিক্ষকের। সর্ব্বোপরি, বর্তমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের কালে শিক্ষককে হতে হবে সমাজসচেতন, সামাজিক সমস্যা তথা ছাত্র সমস্যা ও শিক্ষক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সুস্থ মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। কেবলমাত্র তাহলেই তিনি ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসে বহু ধরনের ছাত্র সমস্যারও সমাধান করতে পারেন, শিক্ষাজগতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—বিদেশে

এতক্ষণ আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, স্কুল সংগঠন প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচনা করেছি। এবার আমরা খুব সংক্ষেপে বিদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থাটি পর্যালোচনা করছি। (এই অংশটি পড়বার সময় প্রথম পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ও ডায়গ্রামের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়)।

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি সাধারণ সূত্র খুঁজে পাই, যেমন—

(ক) সমগ্র প্রাকযৌবনকালই মাধ্যমিক শিক্ষার কাল—এই নীতি সব প্রগতিশীল দেশে স্বীকৃত হয়েছে।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষায় সর্বজনীনতা, অর্থাৎ সকলের জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education for all)—এই নীতিও তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাফল্য এখনও আসেনি।

(গ) সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা—এই চেতনার প্রভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থানুকুল্যে অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার নীতিও স্বীকৃত। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও বাস্তব সাফল্যের তারতম্য রয়েছে। অর্থসঙ্গতি অনুসারে বিভিন্ন দেশে ১৪ থেকে ১৮-এর মধ্যে বিভিন্ন বয়স পর্যন্তই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ রয়েছে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাকেই অবৈতনিক করবার।

(ঘ) সর্বজনীনতার নীতি গৃহীত হয়েছে বলেই মাধ্যমিক শিক্ষায় বহু-মুখীনতার নীতিও গৃহীত হয়েছে। তাই প্রাক-যৌবনকালের সমস্ত রকম শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং এই স্তরের শিক্ষায় বৃত্তিমুখীনতার নীতিও কমবেশী সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

(ঙ) বহুমুখীনতা প্রবর্তিত হওয়ায় পাঠ্য নির্বাচনে ছাত্র-স্বাধীনতা অনেকাংশে স্বীকৃত। Guidance ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থাও কমবেশী সর্বত্র প্রচলিত (গাইডেন্স ব্যবস্থার প্রকৃতি ও সংগঠন অবশ্য বিভিন্নদেশে বিভিন্নরকম আছে)। সংক্ষেপে বলা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলের অধিকার স্বীকার করেও Selective Approach রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে।

(চ) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তরেই বিভিন্ন ধরনের, কিন্তু সমমর্যাদাসম্পন্ন স্কুল এবং অভিজ্ঞানপত্রের ব্যবস্থা হয়েছে।

(ছ) এ ছাড়া সহপাঠ্যক্রমিক কাজের পরিধি ও বৈচিত্র্য, এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্র ও পদ্ধতিও ক্রমপ্রসারমান। ছাত্রছাত্রীদের প্রক্ষোভ জীবনের পরিচর্যা-নীতিও সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থা

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রভাবে আমাদের দেশেও মাধ্যমিক শিক্ষার

গুণগত এবং পরিমাণগত উন্নতি হয়েছে। আমরাও এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক-যৌবনকালের শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছি। আমরাও "Secondary Education for All"—এই ধ্বনিকে নীতি হিসেবে অবলম্বন করেছি। ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থে এই নীতিই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যস্থল থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এখনও অনেক দূরে। আগামী ২০ বছরেও ঐ লক্ষ্যে আমরা উপনীত হবো কিনা সন্দেহ। আমাদের বিভিন্ন রাজ্যে অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষানীতি বিভিন্ন ধরনের সাফল্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারতে সামগ্রিকভাবে আমরা অবৈতনিক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য থেকে এখনও অনেক দূরে। এখনও আমরা ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার আশু লক্ষ্য স্থির করে রেখেছি, যদিও ভবিষ্যতে ১৮ বছর পর্যন্তই অবৈতনিক হবে, এই আশা পোষণ করছি। আমরাও বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছি এবং ছাত্র বাছাই নীতিও গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের guidance ব্যবস্থা এখনও শৈশব অতিক্রম করেনি। আমাদের দেশেও আছে বহু ধরনের মাধ্যমিক স্কুল। সহপাঠ্যক্রমিক প্রোগ্রাম এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা নীতিগতভাবে আমরাও নিয়েছি, যদিও সাফল্য আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। (প্রথম পর্বের তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে স্বাধীনতার যুগে আমাদের অগ্রগতি এবং বর্তমান ব্যবস্থাটি বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনাটি এই সঙ্গে পড়া বাঞ্ছনীয়)।

বর্তমান অবস্থার পরিসংখ্যান

তত্ত্ব ও নীতির দিকে আমাদের অগ্রগতি উপরে আলোচনা করা হয়েছে, এবারে সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান বাস্তব অবস্থাটি বুঝে নেব।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার :—

১৯৫১ সনে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা = ১২'১০ লক্ষ
১৯৬৬ „ „ „ „ „ = ৪৬'০০ „
„ „ „ „ স্কুল সংখ্যা = ২১১৫৬ টি
„ „ নিম্নমাধ্যমিক „ „ „ = ৫৫৭৫৬ টি।

কিন্তু ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী অনেক কম। ১৯৬৫-৬৬ সনে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পর্যন্ত মেয়ে ছিল ছেলের মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ। পৃথক মেয়ে স্কুল যোগানো না যাওয়ায় মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগই পড়েছে

ছেলেস্কুলে। ঐ বৎসরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে ছিল ছেলেদের ২৬ ভাগ, এবং ৪০ ভাগ মেয়েই পড়েছে ছেলেদের স্কুলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছে, তার অনেক খানিই অভিভাবকদের কাঁধে ভর করে :—

V-VII ক্লাশে মাইনে আদায় হয়েছে বছরে ৩১৬৭৭০০০ টাকা। ছেলে মেয়ের মধ্যে বেতন দিয়েছে ১৬'৪ শতাংশ, মাইনে থেকে শিক্ষা ব্যয়ের ৭'৪ ভাগ সংকুলান হয়েছে।

VIII—XI ক্লাশে মাইনে আদায় হয়েছে ২৭০৩৯৪০০০ টাকা,

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেতন দিয়েছে = ৬৪'৮ ভাগ,

বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের = ৩৯'২ ভাগ,

মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি শিক্ষালয়ে বেতন আদায় = ১৩৬০৪০০০ টাকা,

বেতন দিয়েছে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে = ৭২ ভাগ

বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের = ১৭'২ ভাগ।

এই হলো ১৯৬৬ সনের হিসেব। এর পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে, সেকথা আমরা পরে বলছি। কিন্তু বেতন ছাড়াও শিক্ষার অন্যান্য ব্যয়ও আছে :—

সপ্তম শ্রেণীতে গড়ে ছাত্রপ্রতি ব্যয় বই বাবদ = ৭'২৯ টাকা,

অন্যান্য = ৪'৮৮টাকা। মোট = ১২'১৭ টাকা

অষ্টম " " " " বই বাবদ ৯'৩০ টাকা, অন্যান্য ৬'৯৫ টাকা ;

মোট ১৬'২৫ টাকা

ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে এই ব্যয় আরও বেশী। দেখা যায় অর্থনৈতিক সামাজিক এবং অন্যান্য কারণে অনেক ছেলেমেয়েই স্কুল ছেড়ে দেয়। প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকে ২৩'৬ ভাগ, সপ্তম শ্রেণীতে ১৯'৫, অষ্টম শ্রেণীতে ১৫'৪ ভাগ। এই অবস্থাকে অপচয়ের মাত্রাধিক্যই বলা চলে।

তা ছাড়া পাঠ্যক্রমের ত্রুটি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি প্রভৃতির ফলে অনুত্তীর্ণতার হারও বেশী। কয়েকবছর আগে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৪ এবং মেয়েদের ১৭'৩ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৩'৭ এবং মেয়েদের ১৭'৯

ভাগ, অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৩'২ এবং মেয়েদের ১৬'৪ ভাগ। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশের হার সাধারণতঃ পঞ্চাশের নীচেই থাকে। এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০'এর সামান্য উপরে থাকলেই আজকাল "ভাল" বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

তবুও বিগত কয়েক বছরে অবৈতনিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়েছে। নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে—উভয় ক্ষেত্রেই অবৈতনিকতা প্রচলিত হয়েছে অন্ধ্র, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থানে ; এবং শুধু মেয়েদের জন্য বেতনহীন নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা চালু হয়েছে ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে। নাগাভূমিতে হয়েছে উপজাতি এবং মাসিক ৩০০ টাকার কম আয়সম্পন্ন পিতামাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ও সকলের ক্ষেত্রে অবৈতনিক করা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূরে ; এবং শুধু মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা হয়েছে অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে কেবল গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু মেয়েদের শিক্ষাই অবৈতনিক করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭০ সনেই গ্রাম-শহরের সর্বত্র এবং ছেলেমেয়ে সকলের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। এই ঘোষণা সত্যে রূপায়িত হলে খুবই আনন্দের কথা।

এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ১৯৬৫—৬৬ সনের তুলনায় ১৯৭০—৭১ সনে ভর্তির যে লক্ষ্য কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন, তাই এখানে তুলে ধরছি।

	১৯৬৫—৬৬	১৯৭০—৭১
V—VII	ছেলে—৯০ লক্ষ ;	১ কোটি ৪০ লক্ষ
	মেয়ে— ৩০ লক্ষ ;	৭০ লক্ষ ;
VIII—X	ছেলে—৪৮ লক্ষ ;	৬৫ লক্ষ ;
	মেয়ে—১৬ লক্ষ ;	২৪ লক্ষ ;
XI—XII	ছেলে—১২ লক্ষ ;	১৬ লক্ষ ; (এর মধ্যে বৃত্তি বিভাগে ৭½ লক্ষ)।

মেয়ে—২১/২ লক্ষ ; 4 লক্ষ ১০ হাজার ; (বৃত্তি বিভাগে ১১/২ লক্ষ)।

১৯৮৫ সনের মধ্যে অন্ততঃ নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সকল শিশুকে সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এবার আমরা শিক্ষক সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি।

	১৯৬৬ সনে	১৯৭১ সম্ভাব্য	১৯৭৬ সনে সম্ভাব্য
কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা	৩'৬ লক্ষ	— ৭ লক্ষ	— ১৪ লক্ষ
শিক্ষক প্রতি ছাত্র সংখ্যা	৩০	— ২৫	— ২৫

অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির ফলে অতিরিক্ত শিক্ষক লাগবে ১৯৭১ সনে ৪'১ লক্ষ ; ১৯৭৬ সনে ৮'৬ লক্ষ। সুতরাং প্রতি বৎসর অতিরিক্ত শিক্ষক লাগবে প্রায় ৭৫ হাজার। অথচ ১৯৭১ সনেও শিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে ৭০ হাজার জনের। সুতরাং শিক্ষণহীন শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। বর্তমানে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বোচ্চ মাদ্রাজে= ৯৩'১ ভাগ, সর্বনিম্ন পশ্চিমবঙ্গে=১৬'৩ ভাগ। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণের হার সর্বোচ্চ কেরলে=৮৯ ভাগ, এবং সর্বনিম্ন আসামে=১৮'৬ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে=৪০ ভাগ।

মাধ্যমিক শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে সংখ্যাগত তারতম্য যথেষ্ট আছে। ১৯৬৬ সনে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সারা ভারতে শিক্ষিকা ছিলেন ১ লক্ষ ৪০ হাজার,—মোট সংখ্যার ৩৭ ভাগ ; উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছিলেন ৯৫ হাজার—মোট সংখ্যার ২৮ ভাগ।

১৯৬৬ সনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে নবনিযুক্ত অল্পবয়স্ক শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষণ পেতে দেরী হয়। ঐ বছরে ২১—২৫ বছর বয়সের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণহীন ছিলেন—শিক্ষক ৪০'৩ ভাগ, শিক্ষিকা ২'৫ ভাগ।

২৬—৩০... ....শিক্ষক ২৯'৮ ভাগ, শিক্ষিকা ৫১ ভাগ

৩১—৩৫... ... .শিক্ষক ১২'৭ ভাগ, শিক্ষিকা ৩০'৬ ,,

তাছাড়া ১৯৬৬ সনে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের গড় বাৎসরিক বেতন ছিল ১২২৮ টাকা ; উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৯৫৯ টাকা।

শতকরা ২'৩ জনের বেতন মাসিক ৬০ টাকা,
" ৪'৩ " " " ১০০ টাকার কম,
" ৩'১ " " " ২০০ টাকা
" ৫৫'৯ " " " ১৮০ টাকা অথবা কম,
" ১'৯ " " " ৩৮০ টাকা অথবা বেশী।

এখনও বিভিন্ন রাজ্যে কমপক্ষে ১০।১২টি বেতন স্কেল রয়েছে। বেতনের এই অবস্থা দেখেই বোঝা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের কোন সম্ভাবনাই নেই। কোঠারি কমিশন সুপারিশ করেছেন বি. এ. বি. টি. ২২০—৪০০ টাকা ; (এবং শতকরা ১৫ ভাগের জন্য বিশেষ স্কেল ৪০০—৫০০ টাকা) ; এবং এম, এ, বি.টি.=৩০০—৬০০ টাকা। এই স্কেল কবে চালু হবে তাই এখন বড় প্রশ্ন !

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে অনেক। পরিকল্পনার যুগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরের কর্মক্ষেত্র প্রসারিতও হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সহায়করূপে রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং আলাদাভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ। মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট N.C.E.R.T সংগঠনও পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা, বিজ্ঞান শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতি করে থাকেন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তাছাড়া ৫০০'এর উপর নানা ধরণের কেন্দ্রীয় স্কুল এবং সর্বভারতীয় মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত।

বাৎসরিক বাজেট এবং পরিকল্পনাখাতে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সাধারণতঃ নির্ধারিত স্কীম অথবা বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই অর্থ বরাদ্দ করা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ কিম্বা বিজ্ঞান-প্রতিভা স্কলারশিপও কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই দেওয়া হয়। উদ্বাস্তু, তপশীল জাতি ও উপজাতি খাতেও বিশেষ বরাদ্দ করা হয়।

রাজ্যস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব একদিকে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রক তথা শিক্ষ বিভাগের এবং অপরদিকে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। প্রায় সব রাজ্যেই বোর্ড গঠিত হয়েছে, তবে গঠন প্রণালী, ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত বোর্ড নেই। সরকারী বিভাগ এবং বোর্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বিভাজনের নীতিতে কাজ চলে।

স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের কোন বাধা নেই। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই এ বিষয়ে দায়িত্ব নিচ্ছেন।

সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে স্কুল কমিটি। এই ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রণালীতেও নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। তবে সর্বত্রই অভিভাবকদের কমবেশী প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত আছে। তবে সরকারী স্কুলগুলিতে রয়েছে ব্যতিক্রম, এই স্কুলগুলির আথিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের, সুতরাং নিয়ন্ত্রণও সম্পূর্ণ সরকারী। বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। বস্তুতঃ মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারী উদ্যম আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন ট্রাষ্ট এবং ধর্মসংগঠনেরও স্কুল রয়েছে অনেক, যদিও পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতিই আমরা গ্রহণ করেছি। বেসরকারী ব্যক্তিগত দানও ম্যাধমিক শিক্ষায় বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশাসনের সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করা হবে। এখন সংক্ষেপে এই মন্তব্যই করা হচ্ছে যে যদিও সমগ্র ভারতের জন্য সামগ্রিক শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার, তবুও রাজ্যস্তরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য আছে। তা ছাড়াও কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য কোন স্তরেই সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ সরকার সম্পূর্ণ আথিক দায়িত্ব পালন করেন না।

বর্তমান অবস্থার মুল্যায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনেক জমে ওঠা সমস্যা সমাধানের জন্যই মুদালিয়র কমিশন বসেছিল, এবং তার সুপারিশ অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। গত ১৫ বছর ধরে ঐ কাজ হয়েছে। **আগেকার সমস্যার কোন কোন ক্ষেত্রে যে সমাধান না হয়েছে এমন নয়।** দীর্ঘতর সময়ের জন্য

স্বয়ংসম্পূর্ণ বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। পাঠ্যক্রম আগের চেয়ে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়েছে ; বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ; তেমনি আবশ্যিকভাবে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে ; মাধ্যমিক স্তরের মধ্য পর্যায়ে একটি হস্তশিল্প প্রচলিত হয়েছে ; ক্যারিয়ার-মাষ্টার শিক্ষণ এবং নিয়োগের ব্যবস্থাও হয়েছে।

কিন্তু পর পর তিনটি পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। আগের চেয়ে প্রসার অবশ্য অনেক হয়েছে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক ভারসাম্যের বদলে স্কুল গড়া হয়েছে এলোমেলো ভাবে। তাই অর্থব্যয়ের তুলনায় প্রতিদান পাওয়া গেছে কম। পাঠ্যক্রমটি হয়েছে গুরুভার। পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয়ে পুঁথিগত বিস্তারের ঝোঁক রয়েছে, অবসরকালীন শিক্ষা কিম্বা সহপাঠ্যক্রমিক কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান করে দেওয়া হয়নি, ব্যবহারিক শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে এবং তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ও হয়নি। তাই পরীক্ষার বোঝা রয়েছে আতঙ্কের মত। হস্তশিল্পের কাজ এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পাঠ সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। সাংগঠনিক দিক থেকে পঞ্চমশ্রেণীর ভাগ্য এখনও সর্বত্র একইভাবে নির্ধারিত হয়নি। গাইডেন্স ব্যবস্থার চরম দুর্বলতার ফলে ছাত্র বাছাইও ঠিকমত হচ্ছে না। প্রবাহ নির্বাচন ব্যবস্থাকে অনমনীয় প্রকোষ্ঠরূপে বিচার করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি-শিক্ষার দিকেও স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই নির্দেশ করা গেছে। সর্বোপরি জটিল ভাষা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নামে নূতন আভিজাত্য গড়ে উঠেছে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিক্ষায় সম-অধিকারের থেকে আমরা অনেক দূরে। গ্রাম-শহরের অসাম্য, ধনী দরিদ্রের অসাম্য, কলা বিজ্ঞানের অসাম্য, শিক্ষকদের বেতনক্রমের অসাম্য, বিভিন্ন মালিকানায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের অসাম্য, স্কুলের মধ্যে শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার অসাম্য প্রভৃতি **অসংখ্য সূত্র ধরে অসম-সুযোগ ব্যাপকভাবে এখনও রয়েছে।**

মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশে প্রবাহ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল উন্নতিকামী দেশের বহুমুখী প্রয়োজনের সাথে এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ। এই নীতির ভিত্তিতে বহুমুখী এবং উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমর্থনযোগ্য ছিল। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দেশের

অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষা সম্পৃক্ত হয়নি; সুতরাং চাকুরীর বাজারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেকারির কশাঘাত ক্রমবর্ধমান। আর বেকারির জ্বালাকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হচ্ছে সংগঠিত যুব বিক্ষোভ, কিম্বা অসংগঠিত যুব অপরাধ।

অবশ্য আমাদের অসাফল্যের পিছনে অনেক ধরণের কারণ আছে, এবং সেগুলি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার জমি বাড়ীর সমস্যা। শহরের কোন বেসরকারী স্কুলই নিজের বৃহদায়তন জমি কিম্বা খেলার মাঠের গর্ব করতে পারেনা। সৌভাগ্যবান স্কুলগুলি কাছাকাছি অবস্থিত পার্কেই খেলাধূলো ড্রিলের কাজ সারে। একাধিক স্কুল একটি পার্কের বেসরকারী অংশীদার হয়ে বসে; এবং এই নিয়ে মারপিটও না হয় এমন নয়। জিমনাসিয়াম কিম্বা সকলের জন্য খেলাধূলার সরঞ্জাম নেই। ছেলেরা ফুটবল ক্রিকেট খেলে প্রধানতঃ পাড়ার ক্লাবে এবং জনপথই হয় তাদের খেলার মাঠ। দ্বিতীয় সমস্যাটি জমি সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শহরের অলিগলিতে অবস্থিত স্কুলগুলির পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক। নোংরা বাজার কিম্বা ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলের স্কুলগুলিতে এই অসুবিধে দেখা দেবেই। তৃতীয় সমস্যাটি বাড়ী সংক্রান্ত। শহরাঞ্চলের বহু স্কুলই বসে ভাড়াটে বাড়ীতে। স্বল্পতম ভাড়ায় বৃহত্তম বাড়ী পাওয়ার ফিকিরে থাকেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্বভাবতঃই বহু ক্ষেত্রে পুরানো, আলো-বাতাসহীন বাড়ীগুলিকেই স্কুলবাড়ী বলে চেনা যায়। (সম্প্রতি অবশ্য সরকারী গৃহনির্মাণ সাহায্য ও ঋণের দৌলতে অনেক স্কুলবাড়ী তৈরী হয়েছে)। স্কুলের ভিতরে তাকালে দেখা যাবে ছোট ছোট ক্লাশঘরে ৫০।৬০টি ছেলে ঠাসাঠাসি করে বসেছে, তাদের নড়াচড়া করবারও স্থান নেই। বাড়ী সমস্যার আর একটি দিক হলো বালিকা বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ীর সংখ্যাল্পতা। শহরাঞ্চলে অনেক মেয়ে স্কুলই প্রাতঃকালীন। এর ফলে পড়াশুনার যে ক্ষতি হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চতুর্থ সমস্যা শিক্ষোপকরণের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান পড়ার ব্যবস্থা যেসব স্কুলে আছে, সেখানেও রসায়ন, পদার্থবিদ্যা কিম্বা জীববিদ্যার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাগার নেই। ইতিহাসের জন্য নানা ধরণের ঐতিহাসিক ম্যাপ, কিম্বা অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু খুব কমই পাওয়া যায়। তেমনি ভূগোল পড়াবার

জন্য উপকরণও প্রায় স্কুলেই মেলে না। এছাড়া সিনেমা প্রজেক্টর, এপিডায়োস্কোপ প্রভৃতি সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের তো কথাই ওঠেনা।

এইসব সমস্যার পিছনে অন্যতম কারণ হলো অর্থসমস্যা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির; তবে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা এবং রাজস্বখাতে অর্থবরাদ্দ করে থাকেন। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫১ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৬৮ কোটি টাকা। এই অঙ্কটি তৃতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষা বরাদ্দের ২১·৬ ভাগ। এর সঙ্গে রাজ্যগুলির বরাদ্দও ধরতে হবে। কিন্তু কোন রাজ্যেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৩৪ ভাগের বেশী নয় (কেরালায় ৩৪ ভাগ)। এর মধ্যেও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ একটি অংশ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ হয় বাজেটের ১৯ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষার ভাগে পড়ে এর একটি অংশ মাত্র। তাছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের বিরাট ব্যয়ও এই বরাদ্দের মধ্যেই। গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যয়ও এই বরাদ্দের মধ্যে। **সুতরাং প্রকৃত পঠন পাঠনের জন্য অর্থসংস্থান খুবই সামান্য।**

সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে সরকারী স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। **বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক।** এগুলির মধ্যে সম্পদশালী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে না এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণও নামে মাত্রই মেনে চলে। এইসব স্কুলে ছাত্রবেতন ৫০ টাকা পর্যন্তও হয়। তার সঙ্গে আছে আনুষঙ্গিক অনেক ব্যয়। সাধারণ বেসরকারী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সরকারী সাহায্য সাধারণতঃ দেওয়া হয় তিনভাবে (১) ঘাটতি পূরণ বাবদ সাহায্য। এক্ষেত্রে ছাত্রবেতন এবং অন্যান্য সূত্রে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি অঙ্কটি সরকারী সাহায্য হিসেবে আসে। (২) নির্দিষ্ট সাহায্য (Lump grant)। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের আয় এবং ব্যয় যাই হোক, সরকারী সাহায্য আসবে বাৎসরিক নির্দিষ্ট টাকা। (৩) এককালীন কিম্বা বিশেষ সাহায্য। অবশ্য এছাড়াও লেবরেটরী, লাইব্রেরী, স্পোর্ট্‌স্ প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে সামান্য সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। (অবশ্য খুব তদ্বিরের জোর ছাড়া এইসব সাহায্য সাধারণতঃ মেলে না)।

সরকারী কিম্বা সাধারণ বেসরকারী স্কুল ছাড়া মিশনারী কিম্বা অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানেরও অনেক স্কুল রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক স্কুলের বেশ ভাল অর্থভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু সাধারণ বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির অন্ত নেই। সরকারী সাহায্যের স্বল্পতার জন্য **মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ব্যয়ভার বহন করতে হয় দরিদ্র পিতামাতাকেই।** সর্বভারতীয় হিসেবে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ১৬'৪ ভাগ ছেলেমেয়ে বেতন দিয়ে পড়ে এবং বেতন থেকে শিক্ষার ৭'৪ ভাগ ব্যয় সংকুলান হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬৪'৮ ভাগ ছেলেমেয়ে মাইনে দেয় এবং মাইনে থেকে সংকুলান হয় ৩১'২ ভাগ ব্যয়। কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি যে কয়েকটি রাজ্যেই নিম্ন মাধ্যমিক এবং কোন কোনটিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক করা হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে পশ্চিমবঙ্গের মত অন্যান্য রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় প্রধানতঃ অভিভাবকের কাঁধে। দরিদ্র দেশের দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে এই বোঝা বহন করে শিক্ষার মানবৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

এইসব সমস্যা প্রতিকারের জন্য কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে। (১) সরকারী নোটিশ জারি করে স্কুলের জন্য জমি সংগ্রহ এবং সরকার নির্ধারিত মূল্য দেওয়া চলে। (২) স্কুল বাড়ী তৈরীর জন্য দুর্নীতিচক্র পোষণ না করে সরকারী গৃহনির্মাণ বিভাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে স্কুলবাড়ী তৈরী করা চলে। (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা স্থাপন করে লেবরেটরীর জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা চলে। (৪) অন্যান্য শিক্ষোপকরণ তৈরীর জন্য সরকারী কারখানা স্থাপন করা চলে। (৫) স্কুলপাঠ্য বইও সরকারী উদ্যোগে কিম্বা সরকারী সাহায্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা চলে। (৬) সর্বোপরি শিক্ষাকর কিম্বা অন্যান্য পন্থায় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। **ফাঁকি দেওয়া আয়করের অংশমাত্রও যদি বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়, তবে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।**

জমি বাড়ী আসবাব প্রভৃতি জড়জাগতিক সমস্যা ছাড়া **পাঠ্যক্রম এবং আনুষঙ্গিক সমস্যাতো আছেই।** সিনিয়র বেসিক এবং জুনিয়র হাইস্কুলের মধ্যে এখনও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থক্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যেও রয়েছে ব্যবধান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে Post Basic স্কুল বিশেষ না থাকলেও তার ভুতুড়ে ছায়া আছে।

এখনও সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যেভাবে স্কুলগুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে, তাও প্রশংসনীয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে কেবল মানবিক শাখাকে অবলম্বন করে। টেকনিকাল প্রবাহ, কৃষি প্রবাহ প্রভৃতি কোনদিনও দৃঢ় ভূমি পেল না। অথচ অনেক সময় অযাচিত এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে এইসব প্রবাহ উদ্বোধন করে অর্থের অপচয় হয়েছে মাত্র। **এইসূত্রেই গ্রাম ও শহরের পার্থক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।**

শহরাঞ্চলে জমির সমস্যা যত তীব্র গ্রামাঞ্চলে ততটা নয়। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক বন্ধন শহরাঞ্চল থেকে অনেক উন্নত। গ্রামাঞ্চলে দুই সিফট'এ স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থাও নেই। গৃহ নির্মাণ সাহায্য যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের স্কুলবাড়ী সহরের স্কুলবাড়ীকে হারিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের সামাজিক সম্ভ্রম এখনও অনেক বেশী।

কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ কিম্বা শিক্ষার উপকরণ যোগান, বিশেষজ্ঞের সাহায্য সংগ্রহ, যানবাহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের সুবিধে বেশী। গ্রামে যাতায়াতের অসুবিধে এবং উপকরণ কিম্বা বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ অসুবিধা। বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ছাত্রদের কৃষির কাজে যেতে হয়। একদিক থেকে এ জিনিস খুবই ভাল, কিন্তু অন্যদিকে আবার অনুপস্থিতির ফলে শিক্ষার মান নেমে যায়। স্কুলকে কেন্দ্র করেই চলে গ্রাম্য মাতব্বরদের মোড়লি। সর্বোপরি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক সংগ্রহ সমস্যাটি তীব্র। এই সূত্রেই আমরা এসে পড়ছি শিক্ষক সংগ্রহ এবং নিয়োগের কথায়।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষক সংগ্রহ ও শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে বাস্তবধর্মী করবার উদ্দেশ্যে আমরা **পশ্চিমবঙ্গের কথাই বিশেষভাবে মনে রেখে আলোচনা করবো।**

উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আগেকার ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের বহু পাঠ্যবিষয় এই পাঠ্যক্রমে স্থান পায়। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষায় বহু-মুখীনতার জন্য বহু প্রবাহে বিভক্ত পাঠ্যক্রমের ফলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হলো। তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বিভিন্ন বিজ্ঞান

বিষয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহের প্রয়োজন হলো। চতুর্থতঃ কারিগরি, কৃষি প্রবাহের জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহের প্রয়োজন হলো। পঞ্চমতঃ স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগের দরকার হলো। ষষ্ঠতঃ গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হওয়ায় গ্রামীণ স্কুলের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা সংগ্রহের সমস্যা সৃষ্টি হলো। সর্বোপরি সমস্ত ধরণের শিক্ষকের জন্যই উপযুক্ত শিক্ষণের প্রয়োজন হলো।

কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষকতার কাজটি পেশাগত সম্মান এখনও অর্জন করেনি। অন্যান্য চাকুরির মত শিক্ষকতাও একটি চাকুরী হয়েই আছে। সুতরাং **শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারটি চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতা এবং আকর্ষনীয় বেতনক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**। বেতনক্রমের কিছু কিছু সংশোধন হওয়া সত্ত্বেও আকর্ষনীয় হয়নি এখনও। বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও গভীর। ভাল কোন চাকুরী পেলেই এঁরা বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গ্রামাঞ্চল এখনও আকর্ষনীয় নয়। তাই গ্রামের স্কুলে বিজ্ঞান ও ইংরেজী প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। গ্রামের জন্য বিশেষ ভাতা প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। তাছাড়া গ্রামে থাকবার সমস্যাও রয়েছে। শিক্ষকাদের পক্ষে এই সমস্যাটি আরও গভীর। এই অবস্থায় আমাদের অনেক স্কুলই শিক্ষক সমস্যায় জর্জরিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শতকরা প্রায় ৪০টি ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত অল্পযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাস্-গ্রাজুয়েটরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন। পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে শিক্ষক নিয়োগের নির্দিষ্ট নিয়মবিধি থাকা সত্ত্বেও এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাই মূল বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত বলে বিবেচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নানা কারণে এই নিয়মনীতি লঙ্ঘন করা হয়।

শিক্ষক সমস্যার দ্বিতীয় দিক হলো উপযুক্ত শিক্ষণের দিক। শিক্ষণের পাঠ্যক্রম সমগ্র ভারতে একই রকম নয়। বিভিন্ন রাজ্যে তারতম্য সত্ত্বেও সাধারণতঃ-শিক্ষা দর্শন ও তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক সমস্যা, স্কুল সংগঠন প্রভৃতি আবশ্যিক পাঠ্যরূপে গৃহীত। এ ছাড়া বিশেষ পাঠ এবং স্কুল পাঠ্য বিষয়ের পাঠ পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে হয়। পশ্চিম বাংলার উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পারি যে এখানে আবশ্যিক পাঠের জন্য আছে

৬টি সাধারণ এবং ২টি বিশেষ পত্র, পাঠ পদ্ধতির জন্য ২টি পত্র। এই ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হয় লিখিত। এ ছাড়া সহপাঠ্যক্রমিক কাজের জন্য ১০০ এবং ক্লাশে পড়ানোর পরীক্ষায় ২০০ নম্বর। সুতরাং মোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা। শিক্ষণকাল মাত্র দশমাস, অথচ পুঁথিগত পাঠের বোঝা বিরাট। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারিক কাজের জন্য (Practice teaching) সময় ও সুযোগ অল্প। তাই শিক্ষণ ব্যবস্থাও মূলতঃ তত্ত্বমূলক, এবং তত্ত্বকথাও ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে সর্বাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই শিক্ষণলব্ধ দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা যায় না। গ্রীষ্মকালীন কোর্স প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান শিক্ষণের সুযোগ সীমাবদ্ধ। তেমনি কৃষি কিম্বা কারিগরি শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা অতি সীমিত। শ্রেণী কক্ষের ৫০/৬০ জন ছাত্রের চাপে শিক্ষণের ফলশ্রুতিও ঘটে না। তা ছাড়া উপকরণের অভাবে আধুনিক পাঠপদ্ধতি প্রয়োগ করাও যায় না।

এর পরে প্রশ্ন শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত অগ্রগতি। এ বিষয়ে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি অনেক বেশী অগ্রসর, যদিও সমস্ত শিক্ষককে শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানেও হয় নি। পশ্চিম বাংলার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এখানে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন ৬৫০০০। এর মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিক্ষণ প্রাপ্ত, অর্থাৎ ২৬০০০ শিক্ষক ট্রেনিং পেয়েছেন, বাকী ৩৯০০০ কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষণ নেই। এই পুরাতন বোঝার সঙ্গে আসছে নূতন বোঝা। প্রতিবছর এইরাজ্যে অবসর গ্রহণ করেন প্রায় সাত হাজার শিক্ষক, তাঁদের জায়গায় নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে বকেয়া রয়েছেন বহু শিক্ষক (backlog)। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজ আছে বর্তমানে ৪০টি। এই কলেজগুলিতে শিক্ষণ পেতে পারে বৎসরে ৬ হাজার। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ সমস্যার সমাধান হতে এখনও অনেক দেরি। এর জন্য **প্রয়োজন আরও অনেক ট্রেনিং কলেজ,** কিম্বা প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা কিম্বা দুই 'সিফট'এ কাজ। বি, এ'তে এডুকেশন নিয়ে পাশ করলে শুধু পদ্ধতিগত ট্রেনিং দিয়েও শিক্ষকতায় যোগ্য করে তোলা যায়। উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যাণ্ডউইচ কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাব পাশ করেছেন। কিন্তু এর দ্বারাও সমস্যার পুরো সমাধান হবে না, কারণ স্যাণ্ডউইচ কোর্স থেকে পাশ করবে বছরে অতিরিক্ত এক হাজার শিক্ষক। সুতরাং **আরও ট্রেনিং কলেজ খুলতেই হবে, কিম্বা সান্ধ্য কলেজের ব্যবস্থা**

করতে হবে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও সান্ধ্য বিভাগ খোলা হবে অদূর ভবিষ্যতে)।

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থাও অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় সেমিনারে দুইটি অভিমত গৃহীত হয়েছে—(১) পাঠ্যবস্তুর বোঝা কমানো হবে, (২) সব বিশ্ব-বিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রম একই রকম হবে। অবশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্নাত-কোত্তর শিক্ষণকে দুই বছরের কোর্স করবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে; কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রশ্ন জড়িত বলে কোন সিদ্ধান্তই হচ্ছেনা। শিক্ষণের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হলো সাধারণ বি, টি/ বি, এড এবং স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণের (P. G. B. T.) মধ্যে ব্যবধান। পাঠ্যক্রমে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও কম নয়। তাই স্নাতকোত্তর বুনিয়াদিশিক্ষণ ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়নি। এই ব্যবধান দূর করবার চেষ্টাও করা উচিত।

শিক্ষামানের অবনতি

পঞ্চাশ বছর আগে স্যাডলার কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চশিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে। তাই ইণ্টারমিডিয়েটকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের নিম্নতম যোগ্যতা বলে নির্দেশ করেছিলেন। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি মানাবনতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন এবং দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। পরিশেষে মুদালিয়র কমিশন ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করলেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যাপকতর ও গভীরতর পাঠ্যক্রম সুপারিশ করলেন। কমিশনের ভরসা ছিল যে দীর্ঘতর শিক্ষাকাল, উন্নত পাঠ্যক্রম এবং ছাত্র বাছাই নীতির ফলে মানের উন্নতি হবে এবং কলেজে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের মানও বাড়বে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে এই কথা আজ সবাই বলেন। শিক্ষাবিদরা অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে ভাল ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে এই কথা খাটেনা; তবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে এই অভিযোগ সত্য।

কিন্তু মানাবনতির কারণও অনেক, যেমন—(১) মুদালিয়র কমিশনের

সুপারিশ অগ্রাহ্য করে শিক্ষার সময় এক বছর কমানো হয়েছে, অথচ পাঠ্য-বিষয়ের গুরুভার রয়ে গিয়েছে। স্বল্প সময়ে ভারী পাঠ্যবস্তু আয়ত্ত করা সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব। (২) অনমনীয় প্রবাহ ব্যবস্থার ফলে ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হচ্ছে। (৩) বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো গাইডেন্স ব্যবস্থা। আমাদের তেমন ব্যবস্থা নেই। তাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রচুর ভুল। (৪) তত্ত্বসমৃদ্ধ এবং তথ্যবহুল পাঠ্যক্রম হজম করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়না। (৫) শিক্ষার উপকরণ এবং অন্যান্য সুযোগের স্বল্পতা সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। (৬) পড়ানোর পদ্ধতিতেও মৌলিক পরিবর্তন আসেনি এখনও। (৭) কোন কোন বিষয়ের জন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক পাওয়াই দুষ্কর। (৮) সহজতম পন্থায় পাশ করবার বাসনায় পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে "প্রশ্নোত্তর পুস্তকের" উপর ছাত্র-ছাত্রীর বেশী নির্ভরতা। (৯) ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা, এবং সর্বোপরি (১০) ছাত্র বিশৃঙ্খলা, শিক্ষাবিরতি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রভাবও শিক্ষা সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

পরীক্ষার সময় এবং ফলপ্রকাশের আগে অভিভাবকরাই আজ বেশী আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু শিক্ষামানের উন্নতি করতে হলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দরকার, একথা উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে।

সমস্যা আমাদের অনেক ; সমস্যার সমাধান না করেও অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। এই পরিবেশেই কোঠারি কমিশন উপস্থিত করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চেতনা ও পরিকল্পনা।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেছেন এবং পাঠ্যক্রমও বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পরসংযুক্ত দুইটি পর্যায়ে (নিম্ন মাধ্যমিক-VIII to X ; উচ্চ মাধ্যমিক-XI and XII) মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হলেও উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির দিক থেকে সমস্ত স্তরটিকেই একক ভাবে দেখতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য একটি শক্তিশালী সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা—যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী

কর্মজীবনে কিংবা উচ্চতর শিক্ষায় কিংবা বিশেষীকরণের শিক্ষা তথা নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পড়া বিষয়গুলিকে **নিম্নমাধ্যমিক স্তরে** আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। পঠ্যক্রমে থাকবে **তিনটি ভাষা**—মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় কিংবা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং অন্য যে কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। **গণিত ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব** আরোপ করা হবে। পদার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্যিক পাঠ্য। ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান পৃথকভাবে পড়ানো হবে। তেমনি শারীরশিক্ষা, যে কোন কলা এবং নৈতিক শিক্ষাও হবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাধ্যতামূলক সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই স্তরে সমষ্টি-উন্নয়নকর্মের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রতি **বৎসরে পূর্ণ দশ দিন কিংবা সমগ্র স্তরের মধ্যে যে কোন সময়ে একসঙ্গে ৩০ দিন** বাধ্যতামূলকভাবে সমাজসেবার কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। কর্মপরিচিতির জন্য এই স্তরে থাকবে কাঠ, ধাতু, চর্ম শিল্প এবং কার্পেট তৈরী, সাবান তৈরী, পুতুল তৈরী, বই বাঁধাইয়ের কাজ। ছাপাখানা, দর্জি কিংবা তাঁতের কাজ গ্রহণ করা চলবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। **নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কর্মপরিচিতিকে উৎপাদনমুখী করবার উদ্দেশ্যে কৃষিখামার কিংবা কারখানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়** ঘটাতে হবে। এই জন্যে গো-সংরক্ষণ, শস্য-সংরক্ষণকেও যথার্থ কাজ বলে গণ্য করা হবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বিশেষীকরণের সুযোগ কিংবা বহুমুখীনতা থাকবে না। অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম হবে সাধারণ চরিত্রের। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পাঠের শেষে হবে **প্রথম সাধারণ বহিঃপরীক্ষা**। এই স্তরে ভর্তির লক্ষ্য হবে :

১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
২৩·৪%	২৯·১%	৪৬·০%

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে লক্ষ্য থাকবে ক্রমান্বয়ে শতকরা ২০টি শিক্ষার্থীকে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া।

এই জন্য সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর পরে আংশিক এবং সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজন হবে। এই স্তরে মোট ছাত্রসংখ্যার তুলনায় নিম্নানুরূপ হারে বৃত্তিশিক্ষার দিকে পরিচালন করবার লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে :

১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
৩.৮%	৬.৯%	২০.০%

এই বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুলে এবং উদ্দেশ্য হবে শিল্পে নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর

পূর্বতন স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে দৃঢ়তর এবং প্রসারিত করা এবং সেই সঙ্গেই ঐচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেষীকরণের সূচনা করাই হবে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে দুই বৎসরের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। পূর্ণাঙ্গ বিশেষীকরণ কাম্য নয় বলেই বর্তমানে প্রচলিত 'প্রবাহ' ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। তদুপরি বর্তমান স্ট্রীমগুলির মধ্যে কারিগরি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান, ললিতকলা এবং কৃষিপ্রবাহে শিক্ষার বিষয়বস্তু-সমূহের প্রকৃত স্থান পলিটেকনিক্ কিংবা কারিগরি ও কৃষিবিদ্যালয়ে। ঐ রকম প্রতিষ্ঠানেই এ সবের স্থান করে দিতে হবে। সুতরাং সাধারণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হবে বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের সাধারণ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা।

এই স্তরের পাঠ্যক্রমে থাকবে দুটি ভাষা। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে অধীত তিনটি ভাষার মধ্যে যে কোন দুটিকে বাছাই করা চলবে, কিংবা য কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করা চলবে। দুইটি ভাষা ব্যতীত আর থাকবে তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়। ঐচ্ছিক বিষয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যে কঠিন ব্যবধান থাকবে না। ছাত্ররা দুটি বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে একটি কলা বিষয়, কিংবা দুটি কলা বিষয়ের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান বিষয় বাছাই করবার অধিকার ভোগ করবে। (অবশ্য তিনটি বিষয়ই শুধু বিজ্ঞান কিংবা শুধু কলা থেকে নির্বাচন করা চলবে।) সুতরাং সর্বমোট পাঠ্যবিষয় হবে পাঁচটি।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিষয় নির্বাচনের অধিকার থাকবে বলেই বিজ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য হবে না। তবে গ্রাম ও সহরের বিদ্যালয়ে স্থান ও পরিবেশোপযোগী

বিজ্ঞান-শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। কৃষিবিজ্ঞানকেও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম থাকবে না। তবে গৃহবিজ্ঞান, সঙ্গীত, কলা প্রভৃতিকে ঐচ্ছিক বিষয় বলে গণ্য করা হবে। পাঠের অর্ধেক সময় ব্যয়িত হবে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির জন্য, এক-চতুর্থাংশ ভাষার জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ শারীরশিক্ষা এবং অন্যান্য সমপাঠ-মূলক কর্মোদ্যমের জন্য। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কর্মপরিচিতি ঘটবে ক্ষেত-খামারে ও কলকারখানায় প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে। এই স্তরে সমাজসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরে। শিবিরজীবনে দৈনিক ছয় ঘণ্টা কায়িক শ্রম করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। বিদ্যালয়ের দুই বছরের জীবনে প্রতি বছর ১০ দিন কিংবা একসঙ্গে ২০ দিন সমাজসেবার কাজে যোগ দিতেই হবে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আর একটি বৈশিষ্ট্য হবে পাঠ্যক্রমে সাধারণ (ordinary) এবং অগ্রবর্তী (advanced) স্তরে বিভাগ। অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্যই থাকবে অগ্রবর্তী পাঠ্যক্রম। এই স্তরের প্রান্তে যে পরীক্ষা হবে, তার সার্টিফিকেটও প্রদান করবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। অভিজ্ঞানপত্রে বিভিন্ন প্রাপ্ত নম্বরের শুধু উল্লেখ থাকবে, সামগ্রিক-ভাবে পাশ ফেল'এর কোন ঘোষণা থাকবে না। ইচ্ছা হলে ছাত্ররা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারবে। বোর্ডের অভিজ্ঞানপত্রের সঙ্গে অবশ্যই থাকবে বিদ্যালয় থেকে সমীক্ষা এবং অভিজ্ঞান-পত্র।

এই স্তরের যোগ্য ছেলেমেয়ের মধ্যে কত শতাংশকে বিদ্যালয়ে আনবার লক্ষ্য প্রস্তাব করা হয়েছে, তা নীচের তথ্যেই পরিষ্কার হবে :

১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
৭·০%	৯·২%	১১·০%	১৪·৮%	২০·৬%

তবে সব ছাত্রই সাধারণ শিক্ষা লাভ করবে না। সাধারণ শিক্ষার বিকল্পরূপে মাধ্যমিক স্তরে থাকবে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা। আগামী বিশ বছরের মধ্যে নিম্নানুরূপ হারে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষায় নেওয়া হবে।

১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
৪০·৬%	৪২·১%	৪৫·৯%	৪৭·৯%	৫০·০%

এই বৃত্তিশিক্ষার জন্য পূর্ণ সময়ের পলিটেকনিক, শিল্পকারখানায় কর্মনিয়ত অবস্থায় আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ জন্য Day Release, Sandwich Course কিংবা Correspondence ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। তদুপরি রয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি। কৃষি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অবলম্বন করে নূতন ধরণের পলিটেকনিকের প্রয়োজন রয়েছে। তা'ছাড়া জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য, প্রশাসন, ক্ষুদ্র-শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য তিন বছরের সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার কথা

ইংরেজ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাবে বাংলা দেশেই প্রথম নব জাগৃতির সূচনা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই অপরাপর প্রদেশ থেকে অগ্রবর্তী ছিল। ১৮৫৪ সনের আগেই মাধ্যমিক স্তরের বহু উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় এখানে গড়ে ওঠে। মিশনারীর দল এ ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রদূত। তাঁদের অনুসরণ করেছেন বেসরকারী দেশীয় উদ্যোগীরা।

উড্ ডেসপ্যাচের উত্তরকালে সরকারী সাহায্যনীতির সুযোগে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। কিন্তু এই সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে প্রচেষ্টা অন্যান্য প্রদেশে হয়েছিল, বাংলা দেশে তেমন কিছুই হয় নি। তাছাড়া প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন দ্বারাই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে বাংলা দেশ জাতীয় জাগরণের অন্যতম উৎসভূমি ছিল বলে শিক্ষার নবচেতনাও এখান থেকেই দানা বাঁধে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যেই এ চেতনা প্রতিফলিত হয়।

লর্ড কার্জনের সংকোচন নীতি সত্ত্বেও স্যার আশুতোষের উপাচার্যত্বকালে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। একদিকে সংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চেতনার ফলে স্যাডলার কমিশন পৃথক বোর্ডের অধীন স্বয়ং-সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বাংলা ভাষাকে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ। এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তারপর স্বাধীনতা এলো বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। বহু স্কুল গেল পূর্বপাকিস্তানে। কিন্তু পূর্ববঙ্গাগত বাস্তুহারাদের সংগঠিত বেসরকারী প্রয়াসে রাতারাতি গড়ে উঠলো বহু স্কুল। সরকার থেকে বাস্তুহারা শিক্ষা সাহায্য দেওয়া হলো মাত্র। তদুপরি বহু শিক্ষিত তরুণ পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডগ্রামে পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। গড়ে উঠলো আরও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সব লোকসান পূরণ হয়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা আগের চেয়েও বেড়ে গেল।

স্বাধীনতার উত্তরকালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অভিমত প্রকাশ করলেন তারাচাঁদ কমিটি। এই কমিটির রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাকেও প্রভাবিত করলো। সমসাময়িককালেই পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হলো School Education Committee (রায় চৌধুরী)। এই কমিটিও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করেন। একই সময়ে প্রকাশিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের বক্তব্য। একটি সামগ্রিক সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চেতনা সৃষ্টি হয়।

এই অবস্থার প্রথম ফলশ্রুতি হলো ১৯৫০ সনে সরকার মনোনীত ব্যক্তির সভাপতিত্বে স্বয়ংশাসিত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন। এই পর্ষদের কাছে বিরাট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া হলো। জনমানসে ও শিক্ষাজগতে আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু আর্থিক চাবিকাঠি রইলো সরকারী বিভাগের হাতে। সুতরাং অতি সত্বর শিক্ষা পর্ষৎ অকর্মণ্যতার দোষে দুষ্ট হলো। ১৯৫৪ সনে পর্ষৎ বাতিল করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশাসকের অধীন করা হলো।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৪ সনে গঠিত হলো 'দে' কমিটি। এই কমিটিও মুদালিয়ার প্রস্তাবিত দ্বাদশ শ্রেণীর বহুমুখী পাঠের কথাই সমর্থন করলেন। তবে নতুন কিছু প্রস্তাব করলেন শিক্ষা বোর্ডের গঠন এবং কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবের সারমর্ম হলো বোর্ডের স্বাধীনতা সংকোচন। নতুন বোর্ড অবশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত গঠিত হলো না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করলো। কিন্তু যে পদ্ধতিতে স্থান, কাল, প্রয়োজন ও সম্ভাবনার বিচার না করে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন হয়, কিম্বা বিদ্যালয়গুলি একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়, তার ফলে লাভ থেকে অপচয়

হয়েছে বেশী, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তদুপরি উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে প্রধানতঃ মানবিক প্রবাহকে অবলম্বন করে। অর্থাভাবের অজুহাতে দায়সারা গোছের এই ব্যবস্থা যে মুদালিয়ার রিপোর্টের মর্মকথাকেই ব্যঙ্গ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবুও শিক্ষার প্রসার হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় আছে বহুরকমের যেমন ;—দুই শ্রেণীর (V+VI) জুনিয়র হাই, কিংবা চার শ্রেণীর জুনিয়র হাই (V—VIII), তিন শ্রেণীর সিনিয়র বেসিক (VI—VIII), দশ শ্রেণীর (I—X) কিম্বা ছয় শ্রেণীর (V—X) হাই স্কুল এবং সাত শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (V—XI)। এছাড়া মাদ্রাসা এবং কোন কোন সংস্কৃত বিদ্যালয়কেও মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা চলে ; তবে টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়, যদিও সেগুলিকে মাধ্যমিক স্তরের স্কুল বলেই মনে করা হয়।

মালিকানার বিচারেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে নানা শ্রেণীর। সরকারী স্কুল আছে স্বল্পসংখ্যক। সরকারী স্পনসর্ড স্কুল আছে আর কিছু। Calcutta Improvement Trust-এর অল্প সংখ্যক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কোন ভূমিকাই পালন করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্যালয়ই অবশ্য বেসরকারী। এক্ষেত্রে রয়েছে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উদ্যোগ। অধিকাংশ স্কুলই সাহায্যপ্রাপ্ত, যদিও কিছু সংখ্যক স্কুল সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন না। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজও রয়েছে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে তা পরবর্তী তালিকাতেই প্রতীয়মান।

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	৮৫৮	৩৮৬৯৭২	১১৬৪৪
১৯৫০-৫১	১১০৭	৩৯৩২৫১	১৫২২৮
১৯৫৫-৫৬	১৫৫৬	৪৫৩১০২	২০৬৮৪

	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১৯৬০-৬১	১৯৫৭	৭৭৮৬৭৫	২৯৩৯১
১৯৬৫-৬৬	২৮০৫	১২৪৯৪৮২	৪৭০১৪
	জুনিয়র হাই এবং মিড্‌ল স্কুল		
১৯৪৭-৪৮	১০৪৫	১৩৫৫২৮	৫৯৮৭
১৯৫০-৫১	১২৬১	১৩৯২৭৬	৬২৫৮
১৯৫৫-৫৬	১৬১০	১৪০৩০১	৭৫০৪
১৯৬০-৬১	২১২০	২০৫০৭৯	৯৮৫৬
১৯৬৪-৬৫	২০৭৬	২৫০০১৯	
	উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		
১৯৫৫-৫৬	৪	৩৯৭	২৫
১৯৬০-৬১	২৩৯	২০৫৮৪	১০১১
১৯৬৪-৬৫	২৭২	২৩৭২২	১২৫৮

১৯৬৬ সনে উচ্চ বুনিয়াদি ছাড়া অপর সব ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট ছিল ৫০০৩টি, ছাত্র সংখ্যা ১৪ লক্ষ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৫২০০০।

সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে এই সংখ্যা যতই বড় মনে হোক, এই বয়সের মোট বালক-বালিকার তুলনায় বিদ্যালয়ে ভর্তি অতি নগণ্য। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের বয়সে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে ছেলেদের ৩১.৩ শতাংশ এবং মেয়েদের ১১.৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী শিক্ষা আজও পশ্চাৎপদ। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের ১৫.১ শতাংশ এবং মেয়েদের ৪.৩ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। উপজাতিদের শিশু-সংখ্যার মাত্র ৩.২ শতাংশ নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১.৪ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করছে।

মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচারে পশ্চিবঙ্গের অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আশাপ্রদ। এখানে স্নাতক-নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আছেন অতি নগণ্য সংখ্যক। শিক্ষক সংখ্যার অর্ধেকই স্নাতক; এক-পঞ্চমাংশ অনার্স স্নাতক; এবং অবশিষ্টাংশ স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত।

কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হতাশাজনক।

শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের হার—নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল মাত্র ১৬·৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পঞ্চদশ। ঐ বছরেই মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণের হার ৩৫·৬ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ ত্রয়োদশ স্থান দখল করে আছে। বিগত কয়েকবছরে বেতনক্রম সংশোধিত এবং উন্নত হয়েছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, পেন্সন স্কীমও আছে। তবুও বেতনক্রম এখনও আকর্ষণীয় নয়। তদুপরি **সরকারী, বেসরকারী এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে তারতম্য আছে।** এই তারতম্যের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের স্বার্থহানি হচ্ছে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬ সনে পাঁচ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে চার হাজারই বেসরকারী।) শিক্ষক বেতনে যেমন তারতম্য আছে, তেমনি তারতম্য আছে ছাত্র বেতনে।

রায়চৌধুরী কমিটির অভিমত এবং মুদালিয়র সুপারিশ অনুসারে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে **পাঠ্যক্রমের গুরুভার শিশুর পক্ষে অবহনীয়।** ষষ্ঠ শ্রেণীতে পুস্তকের সংখ্যা ১৬।১৭, এবং সপ্তম শ্রেণীতে প্রায় ২২ খানা। মাতৃভাষাই আজ মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন। কিন্তু পঞ্চম থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী আবশ্যিক পাঠ্য, পঞ্চম শ্রেণী থেকে তিন বৎসর হিন্দী অবশ্য পাঠ্য, সপ্তম শ্রেণী থেকে দুই বছর সংস্কৃত পাঠ্য এবং মানবিক প্রবাহে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরেও সংস্কৃত আবশ্যিক। পাঠ্যক্রমের গুরুভার রয়েছে, অথচ গ্রামাঞ্চলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের চরম অভাব রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ পরিচালিত সমীক্ষায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার, লেবরেটরী প্রভৃতি সম্বন্ধে বেদনাদায়ক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আদৌ বিচিত্র নয় যে পরীক্ষার ফলাফল ক্রমাগত নিম্নমুখী। পরীক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টায় কম্পার্টমেণ্টাল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সর্বব্যাপক অপচয়ের পথ সম্পূর্ণই উন্মুক্ত রয়েছে।

শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দও করা সম্ভব হয় নি। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাথা পিছু শিক্ষার ব্যয় আনুমানিক ৬৪ টাকা, উচ্চ বুনিয়াদিতে আনুমানিক ৫৩ টাকা, এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে আনুমানিক ৮৩ টাকা। কিন্তু এই বরাদ্দের বহুলাংশ ব্যয়িত হয়েছে প্রশাসনিক খাতে এবং দালানকোঠা নির্মাণে, ছাত্রকল্যাণ কিংবা শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য নয়।

সরকারী দপ্তর, শিক্ষা বোর্ড এবং ম্যানেজিং কমিটির ত্রিকোণের মধ্যে শিক্ষকদের জীবন ওষ্ঠাগত। দশ বৎসর অবলুপ্তির পরে শিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যক্রম নির্ধারণ এবং স্কুল ফাইনাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা ব্যতীত বোর্ডের প্রায় কোন ক্ষমতা কিম্বা দায়িত্বই নাই। সুতরাং সরকারী দপ্তরকেই এখন সর্বময় কর্তা বলা চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত দুর্বলতাগুলি দূর করতে হলে প্রয়োজন—(ক) অনতিবিলম্বে ভাষা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (খ) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা পুনর্গঠন, (গ) একাদশ শ্রেণীর তথাকথিত উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার অবসান (দশ শ্রেণী কিংবা বার শ্রেণীতে নব রূপায়ণ), (ঘ) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ, (ঙ) কারিগরি ও বৃত্তি বিদ্যালয়গুলিকেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি, (চ) কমন স্কুল প্রবর্তন, (ছ) পরীক্ষার বৈপ্লবিক সংস্কার এবং অপচয় নিবারণ, (জ) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, (ঝ) শিক্ষকের স্বার্থ সংরক্ষণ, (ঞ) অধিক অর্থ বরাদ্দ এবং আরও আকর্ষণীয় বেতনক্রম, (ট) ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন, (ঠ) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠন, প্রয়োজনবোধে জেলাভিত্তিক বোর্ড সংগঠন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নব রূপায়ণ।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

এখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় বর্তমানে তিনটি পর্যায়—(ক) পঞ্চমশ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র হাই (নিম্ন মাধ্যমিক), অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সিনিয়র বেসিক (উচ্চ বুনিয়াদি) ; (খ) নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক ; (গ) নবম-দশম-একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়। নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মধ্যে কোন বহিঃপরীক্ষা নেই। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শেষে আছে স্কুল ফাইনাল, এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শেষেও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। এই দুটিই বহিঃপরীক্ষা ; পরিচালনা করেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। বোর্ডই অভিজ্ঞানপত্র দিয়ে থাকে। উচ্চতর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেই সরাসরি কলেজীয় উচ্চশিক্ষা। স্কুল ফাইনাল পাশ করলে কলেজে একবছরের প্রাকবিশ্ববিদ্যালয় পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষা গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়। এর পরে সুরু হয় ত্রিবর্ষ ডিগ্রীস্তরে উচ্চশিক্ষা।

সংশোধিত মুদালিয়র স্কীম পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করেছে। তাই এখানে এগার বছরের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সৃষ্টি হয়েছে। সব স্কুলে অবশ্য সমভাবে সকলগুলি প্রবাহে পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। মানবিক প্রবাহই সর্বাধিক। তারপরে বিজ্ঞান, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বাণিজ্য প্রবাহ। তিনটি প্রবাহ যেসব স্কুলে আছে সেগুলি খুবই ভাগ্যবান, কারণ ততোধিক প্রবাহসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। ইতঃস্ততঃভাবে কোন কোন স্কুলে কারিগরি, কৃষি, এবং চারুকলা প্রবাহ রয়েছে। মেয়েদের অনেক স্কুলে অবশ্য গৃহবিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুলের আকার ও গঠনে প্রচুর হেরফের রয়েছে। নিম্নতম ১৫০ জন ছাত্র'ছাত্রী নিয়েও স্কুল চলে, এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা গড়ে ৮।৯ জন। আবার ১০০০ ছাত্রছাত্রীর স্কুলও আছে অনেক ; এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা গড়ে ৩৩।৩৪ জন। বৃহদায়তন স্কুল অবশ্য কলকাতাতেই বেশী। এখানে সরকারী সাহায্যভোগী স্কুলগুলি ছাত্রসংখ্যাকে ১ হাজারের মধ্যে সীমিত রাখে, নচেৎ সাহায্য পাওয়া যায় না। সাহায্য দাবী করে না—এমন স্কুলে ৪ হাজার পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যার উদাহরণ কলকাতাতেই আছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। এই বোর্ডই অধিকাংশ স্কুল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরীক্ষা পরিচালনা করে। কিন্তু **বিশ্বভারতীর আছে নিজস্ব স্কুল** এবং পৃথক পরীক্ষা, **যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল পরিচালিত একটি স্কুলও আছে** (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত—যদিও সম্প্রতি বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা চলেছে)। তা ছাড়া **অনেক স্কুল আছে "ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার" সঙ্গে যুক্ত** (এটি কেম্ব্রিজ পরীক্ষার নব সংস্করণ এবং আভিজাত্যের অন্যতম লক্ষণ)।

ভাষা মাধ্যমের বিচারে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, হিন্দী, নেপালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা ভাষায় পরিচালিত স্কুল আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাও কয়েকটি ভাষাতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রেণীবৈষম্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ্ প্রভৃতি শৈলাবাসে আবাসিক স্কুলগুলি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। মিশনারী স্কুলগুলি এবং মেয়েদের কনভেণ্টও তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। কলকাতায় স্বাধীনতার যুগে গজিয়ে ওঠা ইংলিশ

মিডিয়াম স্কুলগুলিও তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্য এইসব স্কুলের অধিকাংশই শহর এবং শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় সব স্কুলই "বাংলা মিডিয়াম"। সবগুলি ব্যয়সাপেক্ষ স্কুলেই যে শিক্ষার মান উঁচু, তেমন নয়। বাংলা মিডিয়াম স্কুলের মধ্যেও কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী স্কুল আছে কুলীন জাতীয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ স্কুলই গড্ডলিকার মধ্যে।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সমস্যা

সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গ ঘনবসতি রাজ্য। তা ছাড়াও শহর ও শিল্পাঞ্চলেই লোকবসতি কেন্দ্রীভূত। ছাত্রসংখ্যাও এইসব অঞ্চলে অত্যধিক। বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মাধ্যমিক ছাত্র আছে। সুতরাং স্কুলে স্থানাভাব এখানে খুবই বেশী। গ্রামাঞ্চলে অনেক বড় বড় স্কুল বাড়ীতে যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ে, সেই তুলনায় শহরাঞ্চলে স্কুলপ্রতি ছাত্রসংখ্যা খুবই বেশী। নিয়মসিদ্ধ ভাবে প্রতি ছাত্রের জন্য ১০ বর্গফুট জায়গা এখানে খুব কম সংখ্যক স্কুলেই মিলবে। তাই স্বল্প পরিসর ক্লাশঘরে এক একটি সেকশনে ৫০টি, এমনকি ৬০টি পর্যন্ত ছাত্র হামেশাই দেখা যায়। এ অবস্থা যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি লেখাপড়ার পক্ষেও ক্ষতিকর। প্রতি বছর বিদ্যালয়ে ভর্তির চাপ বাড়ছে, এবং ক্রমান্বয়ে আরও বাড়বে। ছাত্রসংখ্যার তালে তালে স্থানসংকুলানের ব্যবস্থা না হলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়বে। তা ছাড়া স্থান সমস্যা থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যাও সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আরও বেশী সংখ্যায় স্কুল এবং ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু আরও জায়গার বন্দোবস্ত করে ছাত্রভর্তির সমস্যাকে সহজ করে আনা সম্ভব।

এই সূত্রেই আলোচনা করতে হয় স্কুল বাড়ীর কথা। মফঃস্বলে অধিকাংশ স্কুলেই নিজস্ব বাড়ী রয়েছে—পাকা কিম্বা কাঁচা—যাই হোক না কেন। কিন্তু শহরাঞ্চলে ভাড়াটে বাড়ীতেও অনেক স্কুল চলছে। এই বাড়ীগুলি কোনমতেই স্কুল বাড়ী হওয়ার যোগ্য নয়। তেমনি গ্রামাঞ্চলেও অনেক বাড়ী আছে মাটির ভিটি, মাটির দেয়াল এবং টিন অথবা টালির ছাউনি। ঝড়ঝঞ্ঝায় স্কুলবাড়ী ধ্বংস হওয়ার সংবাদ প্রতিবারেই সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সরকারী সাহায্যের জোরে যে সব বাড়ী তৈরী হয়েছে, সেখানেও অর্ধসমাপ্ত বাড়ীর সংখ্যা কম নয়। তা ছাড়া বাড়ী তৈরীর সময় বিশেষ করে ক্লাশ ঘরের কথাই ভাবা হয়েছে।

লেবরেটরী, লাইব্রেরী, কমনরুম, শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বসবার ঘরের প্রতি নজর পড়েছে অল্প। বিশেষ বিশেষ বিষয় পড়াবার জন্য বিষয়-কক্ষ পাওয়া প্রায় দুষ্কর। সুতরাং নূতন বাড়ী তৈরী করা ছাড়াও বর্তমান বাড়ীগুলির আরও সম্প্রসারণ এবং সংস্কার প্রয়োজন।

তৃতীয় সমস্যা হলো আসবাব এবং শিক্ষা উপকরণের। অধিকাংশ স্কুলেই সরু সরু বেঞ্চিতে ছাত্রদের বসবার বন্দোবস্ত। শিক্ষকের জন্য নামে মাত্র একখানা চেয়ার ও টেবিল থাকে। রং-চটা বোর্ড নিয়েই শিক্ষকদের কাজ চালাতে হয়। ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব, জ্যামিতির যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বিশেষ অভাব। বিজ্ঞানের লেবরেটরিগুলি উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত নয়, প্রাকটিক্যাল ক্লাশও নিয়মিত হয় না। পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা না থাকলে নয়, সেটুকুই থাকে মাত্র। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নামীয় ব্যবস্থার প্রতি তাকালে যে কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির বেদনা লাগবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যম প্রয়োজন। সরকারী অর্থসাহায্য দরকার নিশ্চয়ই, কিন্তু শিক্ষকরা উদ্যোগী হলে অনেক সমস্যার সমাধান তাঁরাই করতে পারেন নামমাত্র ব্যয়ে।

চতুর্থ প্রশ্ন হলো খেলাধুলা স্পোর্টস'এর সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলের মাঠ দেখা যায়, কিন্তু শহরাঞ্চলে এ বস্তু খুবই দুষ্প্রাপ্য। তাই স্কুলের নিজস্ব উদ্যোগে নিয়মিত খেলাধুলোর ব্যবস্থা খুবই কম। কিছু কিছু সরঞ্জাম অনেক স্কুলেই থাকে, কিন্তু সেগুলির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। বছরের শেষে একবার স্পোর্টস হয় অনেক স্কুলেই। কিন্তু সারা বছর ধরে নিয়মিত তালিম দেওয়ার দায়িত্ব স্কুলের থাকে না। স্কুলের বাইরেই ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতা অর্জন করে এবং সেই দক্ষতা প্রদর্শন করে বার্ষিক স্পোর্টস'এর সময়। তেমনি আন্তস্কুল, এবং আন্তজিলা ফুটবল কিম্বা ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও হয়। কিন্তু খুব কম ছেলেকেই স্কুল থেকে তৈরী করা হয়। তৈরী ছেলেদের নিয়ে স্কুল কৃতিত্বের গর্ব করে মাত্র।

ঠিক এইরকমই অবস্থা সহপাঠ্যক্রমিক কাজের। বিতর্ক কিম্বা রচনা প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে হয়, কোন কোন স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়। বছরে বিশেষ বিশেষ দিবস উদযাপনও অনেক সময় হয়ে থাকে। ভাগ্যবান স্কুলগুলি নাটক কিম্বা প্রদর্শনীও করে থাকে। কিন্তু দরিদ্র স্কুলগুলিতে এ ক্ষেত্রে

রয়েছে বিরাট শূন্যতা। আর্থিক প্রশ্ন যত বড়ই হোক, শিক্ষকরা সচেতন চেষ্টা করলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

আমাদের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক টিফিনের ব্যবস্থা নেই। এ জন্য কোন "সাবসিডি" (subsidy) দেবার প্রথাও নেই নিয়মিত। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও নেই (যদিও স্কুল কমিটিতে একজন ডাক্তার থাকেন এবং স্কুলের জন্য বেতনভোগী ডাক্তারও থাকবার কথা)। অসুস্থ ছাত্রছাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি অবশ্য ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ্ হোম প্রভৃতি সংস্থার মারফত কিছু কিছু বেসরকারী প্রচেষ্টা হচ্ছে।

বহুমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational guidance) একটি আবশ্যিক ব্যবস্থা। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশনার অভাবে আত্ম-নির্দেশনাই আমাদের বড় সত্য। তাই অপচয় এবং অনুত্তীর্ণতার সমস্যাও প্রবল। এই সূত্রেই উল্লেখ করা দরকার পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা। প্রতি বছর স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেয় প্রায় দেড়লক্ষ ছেলেমেয়ে। এর অর্ধাংশই অকৃতকার্য হয়। উত্তীর্ণদের মধ্যে শতকরা ৪।৫টি প্রথম বিভাগে (অধিকাংশই বিজ্ঞান শাখায়), দশ থেকে পনের ভাগ দ্বিতীয় বিভাগে এবং অবশিষ্ট বিরাট বাহিনী তৃতীয় বিভাগে পাশ করে। এরা না পায় কলেজে প্রবেশাধিকার, না পায় চাকুরী, না অর্জন করে বৃত্তিগত দক্ষতা। এদের মধ্যেই সৃষ্টি হচ্ছে জাতির অসন্তুষ্ট বংশধর। অথচ পরীক্ষা ব্যবস্থার বহুবিধ সংস্কার প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও কম্পার্টমেণ্টালের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ উদার ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই হয়নি। তা ছাড়া বাধাহীনভাবে অসদুপায় অবলম্বনের জোয়ারে পরীক্ষা ব্যবস্থাটিই হয়েছে হাস্যকর।

পাঠ্যক্রম সমস্যার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে ভাষা সমস্যাটি আলোচনা করা দরকার। উত্তরবঙ্গে নেপালী ভাষার নিজস্ব দাবি আছে। তাছাড়া বৃহত্তর কলকাতা, খড়্গপুর, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল বহুভাষাভাষী। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়ার দাবি আছে। ইংরেজীর স্বপক্ষে দাবিও পশ্চিমবঙ্গে প্রবল। তেমনি হিন্দী বিরোধী মনোভাবও খুব দুর্বল নয়। তাই খুব বিবেচনার সঙ্গে ভাষা নীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য মন্ত্রীসভায় সম্প্রতিও দ্বিভাষা ব্যবস্থার পক্ষে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।

যে ফর্মুলাই হোক, সকলের কাছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সমাধান অনতিবিলম্বে সরকারীভাবে ঘোষণা করা দরকার।

সর্বশেষে বলা দরকার শিক্ষক সমস্যার কথা—অর্থাৎ শিক্ষক সংগ্রহ, নিয়োগ, শিক্ষণ, বেতনক্রম প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষায় দ্বৈত শাসন, কারণ এখানে দুইটি শাসন কেন্দ্র—মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগ। সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের উপর অবশ্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে শিক্ষামন্ত্রকের, কারণ শিক্ষামন্ত্রীই নীতি নির্ধারণ করেন এবং বাজেট তৈরী করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেন শিক্ষাসচিব। কিন্তু গৃহীত নীতি প্রয়োগ করা হয় শিক্ষাঅধিকারিক (ডি, পি, আই) এবং শিক্ষা পর্ষদের মারফত। আমরা পর্ষদের কথাই আগে বলছি।

১৯৫০ সনে যখন প্রথম বোর্ড গঠিত হয়েছিল, তখন বোর্ডের গঠনতন্ত্র এবং ক্ষমতার তালিকা আদর্শস্থানীয় না হলেও বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল। বেসরকারী তথা শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সনে নূতনভাবে গঠিত শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি মাত্র ৪ জন। তাছাড়া রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষালয়, আইনসভা প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং পদাধিকার বলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা। বোর্ডের সভাপতিও সরকার মনোনীত ব্যক্তি। সভাপতি, সম্পাদক, এবং ৪ জন সহকারী সম্পাদকই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে **বোর্ডের ক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্র এখন খুবই সীমাবদ্ধ।** পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস্ নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রশ্ন করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট দেওয়াই বোর্ডের প্রধান কাজ। শিক্ষাগত দিকে এই দায়িত্ব ছাড়া প্রশাসনগত দিকে বোর্ডের ক্ষমতা হলো স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া, শিক্ষক অনুমোদন এবং বেতন নির্ধারণ, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন এবং বিদ্যালয়ের অন্তর্বিরোধে হস্তক্ষেপ করা। এই সূত্রেই এ্যাডহক কমিটি গঠন, প্রশাসক (administrator) নিয়োগ প্রভৃতিও বোর্ডের দায়িত্ব। **কিন্তু বোর্ডের হাতে কোন আর্থিক**

ক্ষমতা নেই। বোর্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সদ্ভাব প্রয়োজন, কারণ বিদ্যালয় পরিদর্শকের রিপোর্ট এবং ডি, পি, আই'এর সুপারিশের ভিত্তিতেই স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা শিক্ষকদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও নির্ভর করে বিভাগীয় রিপোর্টের উপর। তাই বোর্ড প্রায়শই থমকে থমকে চলতে বাধ্য হয়।

প্রশাসনের দ্বিতীয় বাহু হলো সরকারী শিক্ষা বিভাগ, যার শীর্ষে আছেন ডি, পি, আই। ছেলে ও মেয়ে স্কুলের পরিদর্শন বিভাগও বিভিন্ন। উভয় বিভাগে প্রধান পরিদর্শকের নীচে আছেন জিলা পরিদর্শক এবং সহকারী পরিদর্শক। সহজেই অনুমেয় যে স্বল্পসংখ্যক পরিদর্শকের পক্ষে বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কয়েক বছরে একবারও স্কুল পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। অফিসে বসেই এঁরা নিয়ন্ত্রণের কাজ সারেন।

শিক্ষা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হলো (ক) সরকারী স্কুল পরিচালনা করা, (খ) বেসরকারী স্কুল পরিদর্শন করা, (গ) বেসরকারী স্কুলে সরকারী গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড দেওয়া, (ঘ) মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি অন্যান্য ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা এবং অর্থ সাহায্য দেওয়া, (ঙ) পি,জি বি,টি পরীক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া (চ) স্কুলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের তদন্ত করে বোর্ডের কাছে সুপারিশ করা প্রভৃতি।

কিন্তু সাহায্যবিহীন বহু স্কুল, বিশেষতঃ বৃহৎ স্কুলের উপর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ নাম মাত্র। এইসব স্কুল বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করে। পরিদর্শকরা এইসব স্কুল পরিদর্শন করবার অধিকারও ভোগ করেন; তাছাড়া হিসেব নিকেশও অডিট করাতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রনই থাকেনা। প্রতিটি স্কুল পকেট-কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন ব্যবস্থাও প্রায়ই কমিটিগুলির ইচ্ছাধীন।

প্রশাসনের নিম্নস্তরে আছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও স্কুলের জন্য যারা দান করেছেন এমন ৩ জন প্রতিনিধি, একজন ডাক্তার, একজন সরকার মনোনীত সভ্য এবং ৪ জন অভিভাবক প্রতিনিধি—এই ১২ জন সভ্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কমিটির মধ্যে দুর্নীতি, দলাদলি, অক্ষমতা প্রভৃতির

ফলে প্রায়শঃই স্কুল প্রশাসনে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১২০০ স্কুলেই এ্যাডহক কমিটি কিম্বা প্রশাসক নিযুক্ত করতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার——যেমন (১) দ্বৈত শাসনের অবসান করা প্রয়োজন। এ জন্য শিক্ষাসচিব, ডি,পি, আই এবং বোর্ডের ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী সুনির্ধারিত হওয়া দরকার। (২) আরও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধি গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠন করা দরকার এবং বোর্ডের হাতেই আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষমতাও অর্পণ করা দরকার। (৩) সকল ধরণের স্কুলের উপর শিক্ষা বিভাগ এবং বোর্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা দরকার। (৪) পরিদর্শন ব্যবস্থাকে একদিকে শক্তিশালী করা দরকার, অপরদিকে আমলা-তান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করা দরকার। পরিদর্শকরা যেন বিদ্যালয়ের প্রভু না হন। যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন পরিদর্শক যেন শিক্ষকের বন্ধুরূপে সর্বশেষ শিক্ষাপ্রণালী ও পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে শিক্ষকদের সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টাই হবে তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। (৫) বিদ্যালয়ের সাহায্যদান ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক, উদার, সরল করা দরকার। (৬) স্কুল কোড ও ম্যানুয়াল সংশোধন করা দরকার। (৭) বৃত্তি শিক্ষালয়গুলিকেও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার মধ্যে আনা দরকার। (৮) স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নবরূপায়ণ এবং আইনসিদ্ধ শিক্ষক কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। (৯) শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার, এবং (১০) বেতন ও মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাকে উন্নত করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে শিক্ষাপর্ষৎ নূতনভাবে গঠনের জন্য শীঘ্রই আইন প্রণীত হবে। ম্যানেজিং কমিটির নবরূপায়ণের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষক প্রতিনিধি, ৪ জন অভিভাবক প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি, এবং দাতা ও বাছাই করা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নিয়ে নূতনভাবে কমিটি গঠিত হবে। তাছাড়া প্রধান শিক্ষক, আর একজন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং সম্পাদককে নিয়ে গঠিত হবে অর্থ-উপসমিতি। (এই ব্যবস্থা ৪০০০ উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে প্রযুক্ত হবে)। যাই হোক, পূর্ণাঙ্গ আইন রূপে সমগ্র ব্যবস্থাটি

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে গৃহীত হবে। আশা করা যায় বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত ব্যবস্থাটি হবে উন্নত।

অর্থসংস্থানের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অর্থসংস্থানের প্রশ্নটি এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী স্কুলগুলিতে সরকারী সাহায্য সময়মত পাওয়া না গেলে শিক্ষকদের বেতন দেওয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলের অর্থাভাব, সরকারের অর্থাভাব এবং সাহায্য দেওয়ার নিয়মকানুনের জটিলতার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় অর্থের উৎস হলো প্রধানতঃ সরকারী সাহায্য, ছাত্রবেতন এবং বেসরকারী দান। আগে যে পরিমাণে দান পাওয়া যেত, আজকাল আর তেমন পাওয়া যায় না। ফলে ছাত্রবেতন এবং সরকারী অর্থের উপরই নির্ভরতা বেশী। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে এখানে কেবল গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভারই বহন করেন অভিভাবকরা। ১৯৬০-৬১ সনের কয়েকটি হিসেব থেকে অবস্থাটি পরিষ্কার হবে। ঐ বছরে জুনিয়র হাই স্তরে শিক্ষার জন্য মোট প্রত্যক্ষ ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে সরকার দিয়েছিল মাত্র ৪৮ লক্ষ টাকা। সিনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য মোট ব্যয় হয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে সরকারী অর্থ ছিল ১০ লক্ষ টাকা। মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে মোট ব্যয় ছিল ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে সরকার দিয়েছিলেন ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। সহজেই বোঝা যায় যে আর্থিক দিক থেকে সরকারের ভূমিকা এখনও গৌণ। বস্তুতঃ জনসংখ্যার মাথা পিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক ৯ টাকা ৮০ পয়সা মাত্র। এখানে বাজেটের ১৯ ভাগ বরাদ্দ হয় শিক্ষার জন্য। এর মধ্যে একটি সামান্য অংশ মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়।

সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় তিনভাবে—(১) ঘাটতি পূরণ বাবদ সাহায্য। এই ক্ষেত্রে হিসেব করা হয় দুটি বিষয়—নিম্নতম শতকরা ১০ জনকে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে ধরে অবশিষ্ট ছাত্রদের বেতন বাবদ আদায় (বেতনের হার গ্রামাঞ্চলে ৩'৫০ টাকা থেকে ৪'৫০ টাকা, সহরতলীতে ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা,

সহরে ৫ টাকা থেকে ৮ টাকা) এবং শিক্ষকদের বেতন বাবদ ব্যয়। বিদ্যালয়ে যতটি সেকশন সেই অনুসারে শিক্ষক সংখ্যাও নির্দিষ্ট থাকে। শিক্ষকদের বর্তমান বেতনক্রম গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১৬৭ টাকা, অনার্স গ্রাজুয়েটদের ২৩০ টাকা, স্নাতকোত্তরদের ২৪০ টাকা, প্রধান শিক্ষকদের ৩৫০ টাকা এবং অতিরিক্ত ভাতা সর্বোচ্চ ৭৫ টাকা পর্যন্ত। তা ছাড়া আছে মহার্ঘ ভাতা। বেতনক্রম অনুযায়ী অশিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দেয় বেতন থেকে ছাত্রবেতন আদায়ের যে ঘাটতি থাকে, তাই সরকারী সাহায্য হিসেবে আসে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ১ হাজার ছাড়ালেই আর সাহায্য মিলবে না। এইসব স্কুলে কন্টিঞ্জেন্সি, বাড়ী মেরামত, পুরস্কার বিতরণ, এবং আসবাব পত্রের জন্য প্রতিটিখাতে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা বার্ষিক দেওয়ার নিয়ম আছে। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনে এককালীন সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। স্কুলগুলিও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ছাত্রদের কাছ থেকে আরও টাকা তুলতে পারে। তবে তারও হিসেব দাখিল করতে হবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শতকরা ৬০ ভাগ স্কুলই ঘাটতি সাহায্য ব্যবস্থার অন্তর্গত নয়। তা ছাড়া ঘাটতি-সাহায্য বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের অংশ মাত্র পূরণ করে। ঘাটতি পূরণের বেলায় বর্তমানে আরও অসুবিধা রয়েছে। ১৯৬৩ সনের আগে যে সব স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে হায়ার সেকেণ্ডারী শিক্ষকদের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরে যে সব স্কুল উন্নীত হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি অবশ্য শিক্ষামন্ত্রক ঘোষণা করেছেন যে এদের সম্পর্কেও সুবিবেচনা করা হবে।

সরকারী সাহায্যের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো lump grant. এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের হদিশই করা হয় না। সাহায্যের **তৃতীয় পদ্ধতি হলো কোন বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ব্যয়ের জন্য সাহায্য।** এসব ক্ষেত্রে এককালীন সাহায্যই বেশী প্রচলিত।

অর্থ সমস্যার সর্বাপেক্ষা ভাল সমাধান হলো সকল ধরনের সকল স্কুলকেই "ডেফিসিট সাহায্যের" ভিত্তিতে নিয়ে আসা, এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সাহায্য প্রেরণ করা।

স্কুল যোগান ও ছাত্রভর্তি

বর্তমানে ১৯৬৯ সনে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে ৬ হাজার (এর মধ্য

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল প্রায় ৪ হাজার)। বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১১ লক্ষ ৫০ হাজার, শিক্ষক সংখ্যা ৬৫ হাজার (এর মধ্যে ৪০ ভাগ ট্রেনিংপ্রাপ্ত)। প্রতি বছর নূতন স্কুল হয় ৩০০টি; ছাত্রসংখ্যা বাড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার এবং শিক্ষকসংখ্যা বাড়ে ২৫০০। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৫০ ছাত্র হলেই মাধ্যমিক স্কুল এবং ২০০ ছাত্র হলে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদন পেতে পারে। নিজস্ব বাড়ী হলে অনুমোদন সহজলভ্য। রিজার্ভ ফাণ্ড লাগে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই অবস্থাকে আশাপ্রদ মনে হতে পারে। কিন্তু ছাত্রভর্তির হার দেখলেই মোহমুক্তি ঘটবে। বর্তমানে ১১—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ২৯'৯ ভাগ এবং ১৪—১৭ বছরের ১৭'১ ভাগ স্কুলে যেতে পারছে। এ ক্ষেত্রেও আছে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ১৯৬৬ সনের ছাত্র এবং ছাত্রী সংখ্যার হিসেব দেখলেই পরিষ্কার হবে :—

	ছাত্র	ছাত্রী
জুনিয়র হাই=	১৬৬৫৬৯	৮৩৪৫০
সিনিয়র বেসিক=	১৫০৭২	৮৬৫০
উচ্চ-উচ্চতর মাধ্যমিক=	৮৬৬৫৪৩	৩৫২৯৩৯

ঠিক এমনিই বলা যায় যে শিক্ষক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও শিক্ষক ছাত্রের হার এখনও প্রশংসনীয় নয়।

ভবিষ্যতের চিন্তা

পশ্চিমবঙ্গকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, যেমন—(ক) সিনিয়র বেসিক স্কুলের ভাগ্য বিধান করা প্রয়োজন, (খ) সকল রকম প্রাইভেট স্কুলকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন, (গ) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন, (ঘ) ভাষার প্রশ্নে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান দরকার, (ঙ) কারিগরি স্কুলগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা দরকার, (চ) ব্যাহত শিশুদের জন্য স্পেশাল স্কুল তৈরী করা প্রয়োজন, (ছ) কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১০ বছর কিম্বা ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। (সরকারী মহল থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে সেণ্ট্রাল স্কুল গড়বার কথা বলা হয়েছে। এইসব

স্কুলে ২।৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে, অন্যান্য স্কুল হবে দশ ক্লাশের), (জ) শিক্ষার জন্য ব্যয়বৃদ্ধি প্রয়োজন, (ঝ) সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থাটি আরও জটিলতাশূন্য হওয়া প্রয়োজন, (ঞ) স্কুলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে অবৈতনিক শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া দরকার। সুখের বিষয় নীতিগতভাবে কয়েকটি প্রগতিশীল চেতনা আমরাও গ্রহণ করেছি, যেমন—মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমুখীনতা, দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষা, ছাত্র বাছাই নীতি, পাঠ্যক্রম সংশোধন, সমাজসেবা, কর্মপরিচিতি এবং শিক্ষায় সমসুযোগ। এই নীতিগুলিকে কাজে রূপ দেওয়াই বড় কথা।

এই পরিবেশে চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখায় বলা হয়েছে—(ক) আরও স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা, (খ) প্রতি জেলায় আদর্শ স্কুল এবং স্পেশাল স্কুল স্থাপন, (গ) মেয়েদের শিক্ষা প্রসার, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, (ঘ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রসার, (ঙ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং (চ) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা।

এই কাজগুলিই সকল সমস্যার সমাধান করবে, এমন কথা নয়, তবে উন্নতির সূচনা করবে নিশ্চয়ই। একটি আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষার রূপরেখা সামনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হওয়া ভাল।

আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষা

একটি আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষা ববস্থায় অন্ততঃ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যেমন—(১) সমগ্র প্রাকযৌবনকালের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, (২) সমসুযোগ এবং কমন স্কুল রীতিই হবে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, (৩) তত্ত্ব এবং ব্যবহারের সমন্বয়ে গঠিত হবে পাঠ্যক্রম, (৪) বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের থাকবে স্বাধীনতা, (৫) পরীক্ষার বেলাও ছাত্রদের নির্বাচনের অধিকার থাকবে, (৬) খেলাধূলো, স্বাস্থ্যচর্চা, সহপাঠ্যক্রমিক কাজ এবং যৌথ জীবনের অবারিত সুযোগ থাকবে, (৭) পাঠ পদ্ধতিতে থাকবে বিজ্ঞানের প্রভাব, (৮) শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে বৃত্তিমুখীনতা, কর্মমুখীনতা, সমাজমুখীনতা, (৯) আত্মশৃঙ্খলাই হবে শিক্ষার্থীর কাম্য, (১০) উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকবৃন্দ আর্থিক নিশ্চিন্ততা নিয়ে কাজ করবেন, (১১) শিক্ষা প্রশাসন হবে গণতান্ত্রিক ; এবং (১২) অর্থচিন্তায় শিক্ষার কাজ ব্যাহত হবে না।

প্রশ্নাবলী

১। "মাধ্যমিক শিক্ষা" কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং এই স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

(Discuss the meaning and aims of Secondary Education.)
(১৭৫-১৭৬ এবং ১৯৫ পৃষ্ঠা)

২। বয়ঃসন্ধির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর এবং এই সময়ের শিক্ষাগত এবং অন্যান্য প্রয়োজন আলোচনা কর।

(Discuss the nature and characteristics of Adolescence and its needs and provisions). (১৭৬-১৮১ পৃষ্ঠা)

৩। বিদেশে এবং এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার চিন্তা-চেতনায় বিবর্তন আলোচনা কর।

(Trace the evolution of the concept of Secondary Education abroad and in India). (১৮২-১৮৯ পৃষ্ঠা)

৪। মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন এবং অন্যান্য শিক্ষাস্তরের সঙ্গে এর যোগাযোগ আলোচনা কর। এই শিক্ষার পরে কোন কোন পথ ছাত্রছাত্রীদের কাছে উন্মুক্ত থাকে ?

(Discuss the organisation of Secondary Education and its link with other stages of education. What are the different avenues open after this stage ?) (১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা)

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম গঠনের নীতি কি হওয়া উচিত ? আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রমের শক্তি ও দুর্বলতা কি ? কোঠারি কমিশন কি ধরণের পাঠ্যক্রম সুপারিশ করেছেন ?

(What should be the principles of curriculum-construction for Secondary Education ? What are the strong and weak points in our present curriculum ? What are the recommendations of the Kothari Commission ?) (১৯৬-২০৪ পৃষ্ঠা)

৬। মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ? কি ভাবে শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করা যায় ?

What should be the teaching methods at the Secondary stage ? How can "activity" be provided ? (২০৫-২০৭ পৃষ্ঠা)

৭। মাধ্যমিক স্তরে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মূল্য, রকমভেদ এবং আমাদের স্কুলগুলিতে বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

(Discuss the values and types of co-curricular activities at the Secondary stage and give an account of the condition in our schools.) (২০৬-২০৮ পৃষ্ঠা)

৮। অন্যান্য দেশে মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থাটি আলোচনা কর। তাদের উদাহরণ থেকে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে উন্নত করা সম্ভব?

(Give an account of the system of examination at the Secondary stage in other countries. How can their examples help us improve our system ?) (২০৮-২১১ পৃষ্ঠা)

৯। মাধ্যমিক স্তরে নির্দেশনার প্রয়োজন, নীতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss the needs, aims, principles and methods of guidance at the Secondary stage of education). (২১১-২১৪ পৃষ্ঠা)

১০। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অপসঙ্গতির বিশেষ সমস্যা কি? কিভাবে যৌন বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা যায়? তুমি কি সহশিক্ষা সমর্থন কর?

(What are the special problems of maladjustment in Secondary School children ? How can sex disorders be prevented ? Do you support co-education ?) (২১৪-২২১ পৃষ্ঠা)

১১। ভারতে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ দাও এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা কর।

(Give an account of the present system of secondary education in India and compare it with the systems in other countries). (১৯০-১৯৪ পৃষ্ঠা ,

১২। ভারতের মাধ্যমিক স্কুল সংগঠন, আভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস এবং বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা কর।

(Write an essay on the organisation of Secondary Schools, ncluding internal divisions into phases and the types of Secondary Schools in India). (১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা)

১৩। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসার সম্পর্কে লক্ষ্যের পটভূমিতে বিগত তিনটি পরিকল্পনাকালে প্রকৃত সাফল্যের বিবরণ দাও। ধীরগতি প্রসারের কারণ কি? সমাধানই বা কি?

(Give an account of the expansion of Secondary Education in India in relation to the targets during the 3 Five Year Plans. Account for the slow progress and suggest remedies).

(২২৩-২২৭ পৃষ্ঠা)

১৪। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থ সংস্থান ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

(Give an account of the administration, control and financing of Secondary Education in India). (২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা)

১৫। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর।

(Make an analysis of the general problems of Secondary Education in India). (২২৯-২৩৩ পৃষ্ঠা)

১৬। পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক সংগ্রহ এবং শিক্ষণ সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss, with special reference to West Bengal, the problem of recruitment and training of teachers for secondary schools). (২৩৩-২৩৬ পৃষ্ঠা)

১৭। মুদালিয়ার পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নতি ঘটেছে কি? মানাবনতির কারণ কি ?

(Has the Mudaliar Scheme raised the standard of Secondary Education ? Account for the falling standard. (২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠা)

১৮। পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা সমস্যার উপর নিবন্ধ রচনা কর।

(Write an essay on the Language Problem in Secondary Education, with special reference to West Bengal). (২০৩,২৫০ পৃষ্ঠা)

১৯। কোঠারি কমিশন রিপোর্টে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার রূপরেখা এবং প্রসারের লক্ষ্য আলোচনা কর।

(Discuss the character and target of Secondary Education proposed by the Kothari Commission). (২৩৭-২৪১ পৃষ্ঠা)

২০। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের প্রকারভেদ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের বিবরণ দাও।

(Give an account of the system of Secondary Education, the types of schools and the expansion of Secondary Education in West Bengal). (২৪১-২৪৮ পৃষ্ঠা)

২১। গ্রাম ও শহরের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন কর।

(Make a total evaluation of Secondary Education in West Bengal, specially mentioning urban and rural conditions).

(২৪০-২৪৬ পৃষ্ঠা)

২২। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, জমি বাড়ী, আসবাব, উপকরণ এবং পরীক্ষা সমস্যার আলোচনা কর।

(Discuss the problems of carriculum, methods, land and building, furniture and equipments, and examination in Secondary Education in West Bengal). (২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা)

২৩। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থা, ঐ ক্ষেত্রে সমস্যা এবং সমাধান আলোচনা কর।

(Discuss the system of administration of Secondary Education, its problems & solution in West Bengal). (২৫১-২৫৩ পৃষ্ঠা)

২৪। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষায় অর্থসংস্থান পদ্ধতি ও সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss the methods of financing Secondary Education in West Bengal & the problems thereof). (২৫৪-২৫৫ পৃষ্ঠা)

২৫। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান কালে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের অবস্থা এবং সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss the present state of Expansion of Secondary Education in West Bengal and the problems thereof). (২৫৫ পৃষ্ঠা)

২৬। মাধ্যমিক শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি কি? আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি কি?

(Discuss the future view of Secondary education in West Bengal and explain the character of an ideal system). (২৫৬ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

'ঘ' বিভাগ

কারিগরি, বৃত্তিগত, পেশাগত শিক্ষা

আমরা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা আলোচনা করেছি। এবার আমরা কয়েকটি বিশেষ ধরণের শিক্ষার কথা আলোচনা করবো। কিন্তু আলোচনা স্থুরু করবার আগে আমাদের কয়েকটি মৌলিক ধারনা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা হামেশাই কতগুলি কথা শুনি এবং বলে থাকি, যেমন—ট্রেড শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা, টেকনিকাল শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, টেকনোলজিকাল শিক্ষা, শিল্প-কলা শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা প্রভৃতি।

বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষ কাহাকে বলে

এইসব বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। উপরে যে সব নামগুলি বলা হয়েছে, তার প্রতিটির বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। ভিন্ন অর্থ, ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বলেই শিক্ষার পাঠ্যক্রম, প্রয়োগমূলক শিক্ষণ, শিক্ষাকালের দৈর্ঘ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও পার্থক্য হয়।

এদের মধ্যে সর্বনিম্নস্তরের হলো ট্রেড ট্রেনিং। ট্রেড কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো mechanical employment. স্থতরাং বিশেষ কোন যন্ত্র ব্যবহার করে বিশেষ একটি দক্ষতা বা কর্মকুশলতা আয়ত্ত করাই ট্রেড ট্রেনিংয়ের মূল কথা। ছুতোরের কাজ (Carpentry), কর্মকারের কাজ (Smithy) কিম্বা এইরকম বিশেষ দক্ষতাই এ ধরণের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। স্বভাবতঃই এই শিক্ষার ক্ষেত্র তেমন ব্যাপক নয়। কিন্তু Vocation কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Calling কিম্বা Occupation. এখানে কর্মক্ষেত্রটি আরও একটু ব্যাপক। এবং বর্তমানের শিল্পসভ্যতায় "বৃত্তি" কথাটিতে বহুলাংশে শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রকেই বুঝায়। টেকনিকাল কথাটির আভিধানিক ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Skill in the method of executing any artistic work. বাংলায় বলা যায় শিল্পপ্রণালীর দক্ষতা। প্রণালীগত ব্যবহারিক দক্ষতার প্রশ্ন আছে

বলেই আমরা অনেক ধরণের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকেই টেকনিকাল শিক্ষা বলে অভিহিত করে থাকি। **ইঞ্জিনিয়ারিং** কথাটির বাংলা অর্থ যন্ত্রবিদ্যা। এ ক্ষেত্রে যন্ত্র সম্পর্কিত তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু **টেকনোলজি** কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Science of Industrial Arts. বাংলায় বলা চলে শিল্পবিজ্ঞান কিম্বা প্রযুক্তি বিদ্যা। **পেশা** (Profession) কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ একটি বিশেষ জীবিকায় লিপ্ত ব্যক্তিদের যৌথজীবন ও কর্মসংগঠন। সংগঠনের নিয়মবিধি অনুসারেই পেশাগত জীবন পরিচালিত হয়।

উপরে আলোচিত অর্থগত কিছু কিছু বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ট্রেড এবং বৃত্তির পার্থক্য খুব বেশী নয় বলেই **সমস্ত ক্ষেত্রটিকে আমরা বৃত্তিশিক্ষা রূপেই বিচার করতে পারি।** তেমনি টেকনিকাল, টেকনোলজিকাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে আমরা একসঙ্গে **কারিগরি শিক্ষারূপে** বিচার করতে পারি। তেমনি আইন, চিকিৎসা, শিক্ষকতা প্রভৃতি জীবিকার ক্ষেত্রকে আমরা **সামগ্রিকভাবে পেশাগত শিক্ষারূপে** আলোচনা করতে পারি।

শিক্ষা-বিশেষীকরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়েছে যে বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রটি জীবিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। অবশ্য সকল শিক্ষার সঙ্গেই জীবিকার যোগ আছে। কিন্তু **এইসব ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজনে বিশেষীকরণের শিক্ষাই মূল কথা।** কিন্তু সমাজের অর্থনীতি যদি সেই ধরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে থাকে, তবে বিশেষ শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না। যে দেশে শিল্প নেই, সে দেশে টেকনিকাল শিক্ষার প্রশ্ন অবান্তর। আমাদেরই দেশে যতদিন পর্যন্ত শিল্পায়নের সূচনা হয়নি, যতদিন অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ ই কৃষিভিত্তিক, ততদিন টেকনোলজিকাল শিক্ষার চাহিদা হয়নি। সুতরাং **অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর শিল্পশিক্ষা বিশেষভাবে নির্ভরশীল** একথা বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ পেশাগত ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া এবং **বিশেষ পেশার জন্য বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন বোধ করার উপরই পেশাগত শিক্ষা নির্ভরশীল।** আমাদের দেশে পুরাতন হিন্দু ও মুসলীম আইনের ব্যাখ্যা করতেন পণ্ডিত/মৌলভীরা। মুসলীম আমলে বিচার করতেন কাজীরা।

সেইযুগের প্রয়োজনীয় পেশাগত দক্ষতা তাঁদের ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনে নূতন আইনবিধি প্রচলিত হওয়ায় এজন্য নূতন শিক্ষা, শিক্ষণ এবং পেশাগত সনদ নেওয়ার প্রয়োজন হলো। সুতরাং আইনের পেশা দ্রুত প্রসারিত হলো। তেমনি আয়ুর্বেদীয় কিম্বা হেকিমী চিকিৎসার বদলে যখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের দেশে প্রচলিত হলো, তখনই প্রয়োজন হলো চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষণ ও পেশাগত নিয়মবিধির। ঠিক তেমনি আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রভাবেই শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন হলো।

তৃতীয়তঃ **সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক চেতনার উপরও কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রশ্নটি নির্ভরশীল**। আমাদেরই দেশে ১৮৮২ সনে হাণ্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষায় বাণিজ্য ও বৃত্তি প্রবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেইযুগে আমাদের চেতনা ছিল উদার মানবিক বিদ্যার প্রভাবে আড়ষ্ট এবং লক্ষ্য ছিল সাধারণ উচ্চশিক্ষা লাভ করে সরকারী চাকুরী কিম্বা সম্মানজনক পেশা (Respectable Professions)। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সুরু থেকেই আমাদের চেতনা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, চাকুরীর বাজারও ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে। তাই সমাজে নূতন শিক্ষাগত মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার দিকে আমরা আকৃষ্ট হই। পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রকোষ্ঠ-গুলি ভেঙে নূতনভাবে বৃত্তিচেতনা রূপ পায় এবং নূতনভাবে সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

চতুর্থতঃ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির উপরও বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা নির্ভরশীল**। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হয়, বিশেষীকরণের প্রয়োজন তত বেশী হয়। বাণিজ্য কিম্বা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ যত বাড়ে বিশেষীকরণের প্রয়োজনও ততই বাড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই শিল্পদক্ষতার প্রয়োজন হয়। এইক্ষেত্রে শিল্পের মালিকরাও বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা সমর্থন করেন (যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়)। তা ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বর্তমানে যে স্তরে পৌঁছেছে (মানুষ যখন চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে), তখন তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিশেষ জ্ঞান ছাড়া জীবনযাত্রাই অচল হতে বাধ্য।

পঞ্চমতঃ বলা দরকার যে **রাজনৈতিক প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়**। পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার প্রসার কখনো

সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কাম্য হতে পারে না। অজস্র লোকবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং অপব্যয়ই সেক্ষেত্রে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উন্নতিকামী সার্বভৌম দেশে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া দেশে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রত্যেকের সম্ভাবনা অনুসারে শিক্ষালাভের এবং শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়, যদি পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রচলিত হয়, যদি কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং সর্বোপরি সমাজবাদী আদর্শ গৃহীত হয়, তবেও বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক।

এতক্ষণ আমরা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি আলোচনা করেছি। কিন্তু **শিক্ষাগত বিচারের উপরেও কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা বিশেষ নির্ভরশীল**। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে ব্যক্তি বৈষম্যকে স্বীকার করা হয় এবং ব্যক্তিগত সম্ভাবনা, ক্ষমতা ও আকর্ষণের ভিত্তিতেই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিতে ব্যবহারিক শিক্ষা আজ সর্বজনস্বীকৃত রীতি। অপরদিকে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন মেটানোও শিক্ষাদর্শের কথা। ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্যের খাতিরে যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে স্থাপন করাই আধুনিক শিক্ষানীতি। তাই বর্তমান যুগে শিক্ষাগত কারণেও বিশেষীকরণ, তথা বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক।

বৃত্তি-কারিগরি-পেশাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনার পটভূমিতে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে এখন কষ্টসাধ্য নয়। **শিক্ষার মূল প্রকৃতিই হলো সামাজিক পরিচালনা** (social direction), অর্থাৎ সমাজ তার নিজস্ব প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যেভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাই প্রতিফলিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থায়। সুতরাং সমাজজীবনে বিচিত্র এবং গতিশীল কর্মকাণ্ডের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা এবং সেই অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানে এবং দক্ষতায় তাদেরকে তৈরী করে তোলাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কারিগরি, বৃত্তি ও পেশা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু শিক্ষা কেবল সামাজিক চাহিদাই পূরণ করবেনা, ব্যক্তির পূর্ণতা অর্থাৎ তার সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। সহজাত বুদ্ধি,

দৈহিক কর্মশক্তি, প্রকৃতিদত্ত বিশেষ সম্ভাবনা এবং আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা প্রভৃতি আয়ত্তাধীন বিষয়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। যার যে বিশেষ কর্মক্ষেত্রে সুদক্ষ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, তাকে সেইভাবে তৈরী করাই প্রকৃত শিক্ষা।

সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদা আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই দুইটি চাহিদা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। দুইটি চাহিদার সামঞ্জস্য করাই শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং **সমাজ জীবনে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের জন্য, বিশেষতঃ যে সব কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা এবং বিশেষীকরণের প্রয়োজন রয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রের জন্য প্রশিক্ষিত লোকবল (man power) যোগান দেওয়াই বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য।**

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে **এই উদ্দেশ্য সফল করবার কয়েকটি পূর্বসর্ত রয়েছে।** প্রথম পূর্বসর্ত হলো পূর্বে আলোচিত সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীদের আন্তরিক প্রেরণা এবং স্বভাবজাত সম্ভাবনা; তৃতীয়তঃ ব্যবহারিক শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ; চতুর্থতঃ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা; পঞ্চমতঃ উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিচয়ও সাফল্যের পূর্বসর্ত। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলেও সাফল্য অসম্ভব। কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার সংহতি ও সম্পৃক্ততা না হলে ব্যর্থতা আসতে বাধ্য (যেমন হয়েছে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাটি)। সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষার দৃঢ়ভিত্তি না হলেও বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা সাফল্যলাভ করতে পারে না। শেষোক্ত তিনটি বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষার প্রশ্ন

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা হলো বিশেষীকরণের শিক্ষা (Specialisation)। এ ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানও বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট এবং ব্যবহারিক দক্ষতাও (skill) বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একধরণের তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের কাজে প্রয়োগ করা অসম্ভব; কোন বিশেষ দক্ষতা সম্পূর্ণ ভিন্নক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও অসম্ভব।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রেই এর সহজতম উদাহরণ রয়েছে। সিভিল, ইলেকট্রিকাল, মেকানিকাল, মেটালারজি, কেমিক্যাল, এরোনটিকস্ প্রভৃতি সংই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্র। কিন্তু এদের প্রতিটিতেই রয়েছে এমন বিশেষত্ব যে একটি ক্ষেত্রে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও অন্য ক্ষেত্রে প্রায় অদক্ষ কর্মীর পর্যায়ে পড়েন। তেমনি পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রেও আজ রেডিওফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স, মহাকাশ-বিজ্ঞান প্রভৃতি এমন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে যে **বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতা ছাড়া চলে না।** রসায়নশাস্ত্র, বিশেষতঃ প্রযুক্তি রসায়নের ক্ষেত্রে, এমন কি গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ প্রযোজ্য।

কারিগরি শিক্ষা সাধারণ লিবারেল শিক্ষার মত নয়। সাধারণ শিক্ষায় সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ গড়বার জন্য বিস্তৃত জ্ঞানক্ষেত্র পরিক্রমার শেষে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে (ভাষা-সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ বিশেষীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু **সেই শিক্ষা কোন একটি বিশেষ পেশা কিম্বা বৃত্তির জন্য নয়।** শিক্ষার শেষে পেশা নির্বাচনের সুযোগ সেক্ষেত্রে থাকে। কিন্তু **কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার সমগ্র প্রয়াসটিই কোন এক নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রকে সামনে রেখে,** সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সেই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং শিক্ষা প্রয়াসের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেই শিক্ষা সংকট আসতে বাধ্য। যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারিত হলে, কিম্বা প্রয়োজনের তুলনায় দক্ষ লোকশক্তি তৈরী না হলে, অথবা প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি লোকশক্তি তৈরী হলেই সংকট অবশ্যম্ভাবী। দেশে যে ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, সেই ধরণের কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা গড়ে ওঠা দরকার। এ জন্যই অনেক দেশে বিশেষ বিশেষ শিল্প সংগঠন নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিজেরাই সুদক্ষ কর্মী তৈরী করে থাকেন।

মোটকথা কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশেই বর্তমান অবস্থায় ভারসাম্যহীনতার প্রভাবে সংকটের উদাহরণ রয়েছে। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই, একথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে বিশেষজ্ঞ সরবরাহের জন্য এখনও আমরা বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে উচ্চতম স্তরে

বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা, তথা গবেষণার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে কম।

দ্বিতীয়তঃ C. S. I. R'এর তালিকা থেকেও দেখা যায় যে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞের সংখ্যাধিক্য, আবার অন্যত্র রয়েছে সংখ্যাল্পতা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলি ঠিকমত পরিবেশিত নয়, কিম্বা শিক্ষা গ্রহণের আগে শিক্ষার্থীরাও ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা ভেবে দেখেন না, অথবা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতাও সকলের নেই।

তৃতীয়তঃ বলা দরকার যে কর্মক্ষেত্রে **বিভিন্ন পর্যায়ের অনুপাতিক প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা না হলেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।** এক একটি শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারের যত প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন হয় কারিগরের। অথচ উচ্চ ডিগ্রী কিম্বা সামাজিক সম্মানের মোহে যদি কারিগরি ডিপ্লোমার বদলে গ্রাজুয়েট ডিগ্রীর দিকে ঝোঁক বেশী হয়, এবং প্রয়োজনের তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারের আনুপাতিক সংখ্যাধিক্য হয়, তবেও ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং বেকারত্বের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বলা যায় যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের দক্ষ লোকশক্তির প্রয়োজন এবং লোকশক্তি উৎপাদনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যের উপর কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার সাফল্য খুবই নির্ভরশীল। **এই ভারসাম্য দুই ধরণের।** (১) বাহ্যিক ভারসাম্য (external balance), অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনের সঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভারসাম্য। (২) আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য (internal balance), অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রয়োজন ভিত্তিক ভারসাম্য। **এ জন্যই কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট নমনীয় (elastic) হওয়া দরকার**—যেন যখন যে দিকে ও যে স্তরে প্রসার ও সংকোচন করা দরকার, সেই অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত খাপ খাওয়ানো যায়।

কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক প্রশ্ন হলো কর্মসংস্থানের (Employment) উপর কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার নির্ভরশীলতা। সাধারণ লিবারেল শিক্ষা যারা গ্রহণ করেন কর্মসংস্থানের জন্য তাঁদেরকে বহুলাংশেই

ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অফিস আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে তাঁরা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ খুঁজে নেন। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্ব বিশেষী-করণের ক্ষেত্র থেকে বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতার সুযোগ সীমাবদ্ধ। দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য ক্রমাগত সম্প্রসারিত না হলে কর্মক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হবে না; অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে না। সে ক্ষেত্রেও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট আসবেই।

অনিয়ন্ত্রিত এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রটি বহুলাংশে শিল্প-বাণিজ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তেজি অর্থনীতির যুগে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটতে থাকলে কর্মসংস্থান বাড়ে, দক্ষ লোকের প্রয়োজন পড়ে এবং কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষাও প্রসারিত হয়। কিন্তু অর্থ নৈতিক মন্দার কালে শিল্পজগতে আসে স্তব্ধতা। নূতন কর্মসংস্থান তো হয়ই না, বরং পুরাতন কর্মীও কর্মচ্যুত হয়। এইসঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষায়ও আসে সংকট।

পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবস্থাটি ভিন্ন হওয়াই উচিত। **অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মূল কথা হলো**—(১) দেশের বর্তমান অর্থনীতির সার্বিক সমীক্ষা, (২) প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসম্পদের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা, (৩) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস্তবানুগ অর্থ নৈতিক লক্ষ্য নিরূপণ, (৪) সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সম্ভাব্য অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় নিরূপণ, (৫) প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান, (৬) কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিরূপণ এবং সেই অনুযায়ী অর্থ ও লোকশক্তি বিনিয়োগ। পরিকল্পনার যেমন বাস্তবতা এবং সার্বিক রূপ থাকা দরকার, তেমনি বিভিন্ন দিক এবং পর্যায়ের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য দরকার। কোন ক্ষেত্রে কোন গরমিল হলেই সমগ্র পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপরে আলোচিত **অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত।** অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য যে শিক্ষিত ও সুদক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়াই শিক্ষাব্যবস্থার কাজ। সুতরাং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষাপরিকল্পনাও সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসংহত হওয়া দরকার।

কারিগরি, বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশী সত্য। পরিকল্পনা অনুসারে কোন শিল্প কি ভাবে প্রসারিত হবে, এবং সেই অনুসারে কোন ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন কতজন লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং তদনুসারে কতজন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক—কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর এবং সুদক্ষ শ্রমিকের দরকার হবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী (forecast) করাই পরিকল্পনাকারীদের দায়িত্ব। আর সেই অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জন্য বিশেষজ্ঞ এবং সুদক্ষ কর্মী তৈরী করাই বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব। অর্থনৈতিক প্রসার ঠিকমত হলে কর্মসংস্থান হবে, এবং কারিগরি শিক্ষায়ও সংকট আসবেনা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গরমিল ঘটলেই হয় শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, নচেৎ পরিকল্পনা বানচাল হবে। ঠিক বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক মন্দা এবং স্থিতিশীলতার ফলে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিয়েছে, এবং উপায়ান্তর না পেয়ে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে সংকোচন করা হচ্ছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উপর বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা কতটা নির্ভরশীল।

সাধারণ শিক্ষা বনাম কারিগরি শিক্ষা

পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্তও বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানবিক বিদ্যার যে একাধিপত্য ছিল এবং লিবারেল উচ্চশিক্ষার জন্য যে মোহ ছিল, তার ফলে "সম্মানজনক" পেশাগত শিক্ষার সামাজিক মূল্য ছিল, কিন্তু কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার তেমন মূল্য ছিলনা। বিশেষতঃ নিম্নস্তরের বৃত্তি শিক্ষাকে "শিক্ষা" বলে মনেই করা হতোনা। এই শিক্ষাকে নিতান্তই "মজদুরী দক্ষতা" বলে মনে করা হতো, "ভদ্রলোকের শিক্ষা" বলে বিচার করা হতোনা। কিন্তু শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষীকরণের প্রয়োজন যখন পড়লো, তখন বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই নানা ধরনের ট্রেড স্কুল, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল এবং উচ্চস্তরে কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃতি পেতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। পরিশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালের মধ্যে স্বীকৃতি পাওয়াও গেছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন রেষারেষি অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে। অবশ্য স্বীকৃতির ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সময়

ও প্রকৃতিগত তারতম্যও হয়েছে। আমেরিকায় স্বীকৃতি মিলেছে সর্বপ্রথম এবং ব্যাপকতমভাবে। আমেরিকায় দ্রুত এবং বৃহদায়তন শিল্পায়নই এ জন্য কৃতিত্বের অধিকারী। জার্মানীতে স্বীকৃতি মিলেছে গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে। ইংলণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই সরকারী স্বীকৃতি এসেছে। রাশিয়াতে বিপ্লবের সময় থেকেই পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি মিলেছে। কিন্তু ফ্রান্সের রক্ষণশীলতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্তও পথ আগলে বসেছিল।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে এই স্বীকৃতির পিছনে শিল্পায়নই একমাত্র কারণ নয়। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার, অপরদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাচেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের জয়যাত্রা এই নূতন মূল্যায়নের পথ সুগম করে দিয়েছে। শিক্ষায় সর্বজনীনতা এবং সমসুযোগের নীতি গৃহীত হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখীনতা এসেছে। তার ফলে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকেও সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দীর্ঘদিনের বৈরীতার ফলে সমস্বীকৃতি সত্ত্বেও উভয় ধরণের শিক্ষার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতচেতনা বিরাজ করছিল। কিন্তু **সম্প্রতি এই দ্বৈতচেতনার অবসান ঘটেছে** এবং ক্রমে এই চেতনাই দানা বেঁধেছে যে উভয় ধরণের শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। কয়েকটি দিকে এই নবচেতনা রূপ লাভ করেছে, যেমন,—

(১) দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান দুনিয়ায় পুরাতনধর্মী লিবারেল শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, কারণ বিশেষত্বহীন সাধারণ শিক্ষা বর্তমানের বিশেষীকরণের যুগে জীবনসংগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার স্পর্শ দিয়ে লিবারেল শিক্ষারও নূতন মর্ম এবং নবরূপায়ন প্রয়োজন।

(২) বর্তমান দুনিয়ায় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাকা প্রয়োজন।

(৩) শিক্ষাকে কর্মমুখী এবং উৎপাদনমুখী করা প্রয়োজন, যেন শিক্ষার ফলশ্রুতিতে জাতীয় উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির পথেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

(৪) শিক্ষায় বহুমুখীনতা প্রয়োজন।

(৫) মাধ্যমিক স্তর থেকেই উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি

লম্বমান ও সমান্তরালভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত, কিন্তু পরস্পর-সংযুক্ত রূপে সুসংহত বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষাতেও বৃত্তিমুখীনতা (Vocationalisation) আনা দরকার।

(৭) সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমেই কর্মপরিচিতির ব্যবস্থা করে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া তথা ভবিষ্যৎ বিশেষীকরণের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

(৮) সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজ জীবনে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বৃত্তি পরিচিতির ব্যবস্থাটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, যেমন রাশিয়াতে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রেই Polytechnisation নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ভারতীয় অনুকরণ হয়েছে "Work Experience" প্রস্তাবে। সর্বোপরি কারিগরি শিক্ষার প্রথম শ্রেণীর প্রবক্তারাও আজ একথা স্বীকার করেন যে **শক্তিশালী সাধারণ শিক্ষার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে কারিগরি শিক্ষাও সম্ভব নয়।** বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আজ এমন সূক্ষ্ম বিশেষীকরণের স্তরে পৌঁছোচ্ছে যে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যা অর্জন করাও সম্ভব নয়, কারণ প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করতেই হয়। তাই বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞানের শক্ত ভিত্তি চাই। তেমনি পেশাগত শিক্ষার প্রস্তুতি রূপেও সাধারণ বিদ্যার পটভূমি প্রয়োজন।

কারিগরি বিদ্যার ভিত্তিরূপে সাধারণ শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে এই চেতনা বর্তমানে আরও প্রসারিত হয়েছে। দেশের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি সম্পর্ক রয়েছে জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে। সেদিক থেকেও সাধারণ মানবিক বিদ্যার ভিত্তির উপর কারিগরি বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাছাড়া কেবল উৎপাদনী দক্ষতাই বড় কথা নয়, সামাজিক এবং নাগরিক দক্ষতাও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান। সর্বোপরি মানুষ কেবল উৎপাদক নয়। তার মননশীলতা ও সংস্কৃতির আরও ব্যাপক ক্ষেত্র দরকার। উৎপাদনের কাজে সারাদিনের

যে সময়টি ব্যয় হয়, তা ছাড়া বাকি সময় তার অবসরকাল। এই অবসরকাল যদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অতিবাহিত হয়, তবে ব্যক্তি ও সমাজের সাংস্কৃতিক মানই উন্নত হবে। **তাই অবসর যাপনের শিক্ষাও বড় কথা।** এ জন্যই বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানবিক শিক্ষার সম্পৃক্ততা দরকার।

উপরের আলোচনাকে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে বলতে পারি যে (ক) বিশেষ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা পরস্পরের শত্রু নয়। সাধারণ শিক্ষার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে বিশেষ শিক্ষা। **যত উন্নতমানের বিশেষ শিক্ষা চাই, ততো উন্নতমানের সাধারণ শিক্ষা চাই।** তাই দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে ট্রেডস্কুলে ভর্তি করা হয় না; নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা হলো জুনিয়র টেকনিক্যাল কিম্বা বৃত্তিশিক্ষায় প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা; স্কুল ফাইনাল হলো (বর্তমানে এতেও কুলোয়না) পলিটেকনিকে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা; উচ্চতর মাধ্যমিক এবং একবছরের প্রস্তুতিপাঠ হলো ডাক্তারি কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঢুকবার নিম্নতম যোগ্যতা; এবং স্নাতক স্তর হলো আইন অধ্যয়নের সর্বনিম্ন যোগ্যতা।

(খ) দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে **কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।** এই শেষোক্ত চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেই আমেরিকায় গড়ে উঠেছে "সাধারণ শিক্ষা আন্দোলন" (General Education Movement)।

সাধারণ শিক্ষা আন্দোলন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা লাভ করার পরেও আমেরিকার উপর ইউরোপের প্রভাব প্রায় চল্লিশবছর ধরে ছিল। পরিশেষে ১৮২৩ সনে "মনরো নীতি" ঘোষণা করে আমেরিকা অবলম্বন করে "বিচ্ছিন্নতা নীতি" (Isolationism)। সেই সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমেরিকা মন দেয় অর্থনৈতিক সংগঠনে। অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহার করে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে, বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়। এরই ফলে **শিল্পে-বাণিজ্যে চূড়ান্ত বিশেষীকরণ সৃষ্টি হয়।** বিশেষজ্ঞ এবং সুদক্ষ কর্মীর চাকুরীর সংকট তখনও হয়নি। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেও সাধারণ-

শিক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই বিশেষীকরণের প্রতি ঝোঁক ক্রমান্বয়ে চরম বিশেষীকরণে পৌছায়।

কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বিচ্ছিন্নতার নীতি ত্যাগ করে আমেরিকা বিশ্বদরবারে হাজির হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করবার মধ্য দিয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকার পরিচয় আরও বাড়ে। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকা ক্রমেই নেতৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আমেরিকার শিল্পপতি এবং শিক্ষাবিদরা বিশ্বের পটভূমিতে নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই করে দেখেন। কয়েকটি বিশেষ চেতনা তাঁদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে, যেমন—

(ক) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় অতি বিশেষীকরণের ঝোঁক রয়েছে। (খ) অতি বিশেষীকরণের প্রভাবে আমেরিকার লোক নিজেদের সংকীর্ণ এবং বিশেষত্বমূলক কর্মক্ষেত্রের বাইরে সমাজ জীবন এবং জ্ঞানক্ষেত্র সম্বন্ধে বহুলাংশে অজ্ঞ এবং আগ্রহহীন হয়ে পড়ে। মানবিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানক্ষেত্র সম্বন্ধে থাকেন প্রায়ান্ধ; আবার বিজ্ঞান ও কারিগরির বিশেষজ্ঞরা কাব্য-সাহিত্য-দর্শন এবং নন্দন জগতের অস্তিত্বই প্রায় ভুলে যান। (গ) সংকীর্ণ বিশেষীকরণের ফলে সমাজের মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে সংকীর্ণ বৃত্তি-প্রকোষ্ঠে। বিভিন্ন বৃত্তি-সংগঠন নিজস্ব ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যত। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষাগত সমস্যা। তাছাড়া সংকীর্ণতার চাপে সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক সংহতিও বিপন্ন হতে পারে। (ঘ) সুতরাং সমাজ সংহতির স্বার্থে, সুস্থ নাগরিকতা সৃষ্টির স্বার্থে, এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ গড়বার স্বার্থে সাধারণ শিক্ষার মান বাড়ানো দরকার এবং সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার সমন্বয় ও সংমিশ্রণ দরকার। (ঙ) তাছাড়া প্রযুক্তি বিদ্যাও এমন স্তরে উপনীত হচ্ছে যে সাধারণ বিদ্যার শক্ত ভিত্তি না থাকলে বিশেষ শিক্ষাও সফল ও কার্যকর হবেনা। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার মান বাড়ানো দরকার। (চ) এবং যে কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্রেই যে কোন লোক যাক না কেন, সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষার নিম্নতম মান আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। (ছ) সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষার সময়কে দীর্ঘতর করবার প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষাবিদরা বলেন যে ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষা যথেষ্ট নয়; আরও দু'বছরের শিক্ষাকে (অর্থাৎ কলেজীয় স্তরের প্রথম দুইটি বছরকে) সাধারণ শিক্ষার বর্ধিত সময়কাল বলে বিবেচনা করা প্রয়োজন। (জ) শিক্ষাবিদরা অবশ্য

পরিস্কার বলেন যে সাধারণ শিক্ষার প্রতি এই নূতন ঝোঁকের অর্থ বিশেষীকরণের প্রতি অবহেলা নয় ; উন্নততর বিশেষ শিক্ষার ভিত্তিরূপে উন্নত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। সুতরাং একটি শিক্ষা হবে আর একটির পরিপূরক।

সাধারণ শিক্ষার এই নীতি অচিরেই আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। উদ্যোক্তারা বলেন এই আন্দোলন চলবে স্কুলে কলেজে, পাঠ্যক্রমে এবং সহপাঠ্য-ক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে, কর্মক্ষেত্রে এবং অবসরকালে। (ক) পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়—"Constant" অথবা "Solid" বিষয়গুলি অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান ও সাধারণ গণিত, সমাজ বিদ্যা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (খ) সাধারণ শিক্ষার সময়কে দীর্ঘায়িত করবার উদ্দেশ্যে জুনিয়র কলেজ গড়ে তোলা হয়। (গ) গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই জুনিয়র কলেজগুলি রূপান্তরিত হয় "কমিউনিটি কলেজে"। (ঘ) সংস্কৃতিমূলক সহপাঠ্যক্রমিক কাজকে উৎসাহ দেওয়া হয়। (ঙ)। কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিদ্যা—অর্থাৎ ভাষা সাহিত্য, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি সংযোজন করা হয়। (চ) কর্মরতদের জন্য অবসরকালীন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বের স্থান দখল করে। মার্কিণ নাগরিকদেরকে এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাধারণ শিক্ষা আন্দোলন আরও সম্প্রসারিত হয়। আমেরিকার এই আন্দোলন বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশকে কমবেশী প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনটি আমদানী করা হয়। তবে আমরা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিয়েছি। পনের বছর আগে যখন আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষারই ছিল প্রাবল্য, যখন কারিগরি শিক্ষা সবেমাত্র যাত্রা সুরু করেছে, এবং কোন মতেই অতি বিশেষীকরণের বিপদ সংকেত ছিল না, তখনই আমরা সাধারণ শিক্ষা আন্দোলনের তত্ত্ব কথাটি গ্রহণ করেছি। মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত "কোর" বিষয়গুলি সেইভাবেই সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়া কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষা সাহিত্য অর্থনীতি ইত্যাদির পাঠ। (অবশ্য একথা বললে সত্যের অপলাপ হবেনা যে এবিষয়ে আমাদের সাধারণ চেতনা, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের চেতনাও তেমন ইতিবাচক নয়। তারা কারিগরি বিদ্যার মধ্যে মানবিক বিদ্যার এই অনুপ্রবেশকে অতিরিক্ত

জঞ্জাল বলেই মনে করে। পঠন-পাঠনও হয় দায়সারা গোছের। সুতরাং আগ্রহহীন পাঠের ফলশ্রুতির প্রশ্ন অবান্তর)।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে আদর্শগত পার্থক্য

সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা যে সমন্বয় সূত্রে বাঁধা পড়া দরকার একথা আমরা আলোচনা করলাম। একথাও আলোচনা করা হয়েছে যে সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ শিক্ষা নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ আদর্শের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্টই পার্থক্য রয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হলো মানবসভ্যতার দীর্ঘ পরিক্রমা পথে মানুষের গড়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিয়ে তাকে সেই সংস্কৃতির অংশীদার করে নেওয়া। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Cultural heritage) কেবল ভাষা-সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই যে জ্ঞানের সঞ্চয় সৃষ্টি হয়েছে, সেইসব তত্ত্বক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানোও সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে সাধারণ শিক্ষার অন্যতম আদর্শ হলো সংস্কৃতিবান মানুষ গড়া। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সাধারণ শিক্ষা কেবল পশ্চাৎমুখী এবং ঐতিহ্যপন্থীই নয়। ঐতিহ্যের সংরক্ষণ যেমন কাম্য, তেমনি বর্তমানের জীবনধারায় নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করাও কাম্য। সুতরাং চলতি জীবনকে বুঝতে সাহায্য করাও সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ সংস্কৃতির আরও পরিমার্জনা এবং প্রসার করাও সাধারণ শিক্ষার কাম্য। এই অর্থে সাধারণ শিক্ষা ভবিষ্যৎমুখীও বটে। সংক্ষেপে বলা যায় যে শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য। চতুর্থতঃ মনে রাখা দরকার যে সাধারণ শিক্ষায় যেমন ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির কথা বলা হয়, তেমনি সামাজিক সত্তা উপলব্ধি করবার কথাও বলা হয়। সুতরাং সামাজিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করা; আদর্শবান এবং চরিত্রবান

মানুষ তৈরী করাও সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই বোঝা যায় যে সাধারণ শিক্ষার এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে ভাববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার আদর্শ বহুলাংশে জড়বাদী এবং প্রয়োগবাদী দর্শন দিয়ে প্রভাবিত। এখানেও রয়েছে আত্মোপলব্ধির কথা, সামাজিক উপলব্ধির কথা, কিন্তু সবই রয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজকে এগিয়ে যেতে হলে কেবল ভাবজগতের প্রগতিই যথেষ্ট নয়, জাগতিক চাহিদা মেটানোও দরকার। সুতরাং **মানুষকে কেবল সংস্কৃতিবান নাগরিক হলেই চলে না, উৎপাদনশীল নাগরিক হতে হয়।** অর্থাৎ তার Social Efficiency'র সঙ্গে Productive Efficiency'ও থাকা দরকার, নইলে সভ্যতার চাকা ঘুরবেনা। সুতরাং কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মোপব্ধির অর্থ শিক্ষার্থীর উৎপাদনী সম্ভাবনা এবং সহজাত ক্ষমতাগুলির পূর্ণ প্রয়োগ। এবং সামাজিক উপলব্ধির অর্থ সমাজে প্রচলিত বিচিত্র উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজের যোগ্য স্থানটি গ্রহণ করা।

স্বভাবতঃই সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্র যেখানে অনেক প্রসারিত এবং আদর্শটি বিমূর্ত, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রটি সেখানে অনেক নির্দিষ্ট এবং আদর্শও তুলনামূলকভাবে মূর্ত। নির্দিষ্ট কর্মজীবনকে সামনে রেখেই এক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, এবং ঐ কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বজ্ঞান ও সুদক্ষতা সৃষ্টি করতে পারার মধ্যেই ঐ শিক্ষার ফলশ্রুতি।

যদি **প্রশ্ন করা হয় যে ভারতের বর্তমান কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোক্ত উদ্দেশ্য কতখানি সাফল্য লাভ করেছে,** তবেই আমরা নাচার। (১) আমাদের কারিগরি শিক্ষাও এখন পর্যন্ত মূলতঃ তত্ত্বমূলক। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ওয়ার্কসপ এবং যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে; কারখানাগুলির সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই; সুতরাং "প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার" নীতিটি লঙ্ঘিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। (২) মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাটি ক্রমমানভাবে সুসংহত নয়, এবং সর্বনিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত উঠবার সিঁড়িও ঠিক নেই (যদিও প্রস্তাবনা আছে)। (৩) বৃত্তিগত নির্দেশনা, Job Analysis ব্যবস্থা, বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। তাই "উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির" নীতিটিও কার্যকর নয়। (৪) অর্থনৈতিক

উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ "man power planning" কথাটি আমাদের চিন্তার দরজায় এসেছে মাত্র, কাজে রূপান্তরিত হয়নি। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা দিয়েই খালাস্। চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরবার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীর। (৫) আমাদের কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সব সময়েই সর্বশেষ প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক পিছনে পড়ে থাকে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রয়োগ বিজ্ঞানীরা গবেষণামূলক সৃষ্টিশীলতার দিকে বিশেষ এগুতে পারেননি। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার বিশেষ ধাঁচ (Orientation) গড়ে ওঠেনি। (৬) অথচ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য অতি প্রকট। (৭) সর্বোপরি আমাদের কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অবসর যাপনের শিক্ষা প্রভৃতিও সংমিশ্রিত হয়নি।

অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে সম্পর্ক

সবকিছু সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশেও গড়ে উঠেছে। প্রশ্ন হলো এই শিক্ষাধারাটি কি অন্যান্য শিক্ষা ধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারা, কিম্বা অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

এই সম্পর্কে প্রথমেই বলা দরকার যে সমাজজীবনে অসংখ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমাজের একটি সার্বিক এবং অবিভাজ্য রূপ আছে। তেমনি সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যেও আন্তসম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রেও রয়েছে সার্বিকতা। স্বভাবতঃই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে কারিগরি শিক্ষাধারার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষাধারার প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ সংযোগ অবশ্যই আছে।

আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি,—(১) আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে চরম বিশেষীকরণ এসেছে। বিশেষ বিশেষ চিকিৎসাক্ষেত্রে সর্বাধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগ দরকার হয়। এইদিক থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। (২) আইনের পেশার সঙ্গেও শিল্প বাণিজ্যের পরিস্থিতি তথা শিল্পবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে, কারণ শিল্পশ্রমিক সংগঠন কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্যকে অবলম্বন করে নিত্যনূতন আইন সৃষ্টি হচ্ছে।

(৩) প্রশাসনগত কাজের এবং শিক্ষণের সঙ্গেও তেমনি সংযোগ আছে, কারণ শিল্পোৎপাদন সমস্যা তথা অর্থসমস্যার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা সমস্যার যোগ আছে, (৪) শারীরবিদ্যা ও জীববিদ্যার সঙ্গে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কারণ শারীরবিদ্যার তত্ত্বের উপর কারিগরি শিক্ষণ প্রক্রিয়া অনেকখানি নির্ভরশীল। (৫) প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, একথা আমরা আগেই বলেছি। (৬) মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে বলেই "শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology) নামে মনোবিদ্যার একটি শাখাই তৈরী হয়ে গিয়েছে। (৭) সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গেও কারিগরি শিক্ষার সম্পর্কটি বেশ ঘনিষ্ট, কারণ কৃষি ও শিল্পে অগ্রগতির ফলে সামাজিক জীবনে আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা চেতনাটি সংযুক্ত। সুতরাং সংক্ষেপে আমরা এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে **বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত শিক্ষাধারার সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাধারার সম্পর্ক আছে—প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ।**

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষালয়ের প্রকার ভেদ

কারিগরি শিক্ষার অর্থ, ঐ শিক্ষার ভিত্তি, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য ধরণের শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করছি বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষালয়ের প্রকারভেদ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের সন্ধান পাই :—

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই বৃত্তি শিক্ষাধারা। এই ধরণের ব্যবস্থা ফ্রান্সে, পূর্ব জার্মানীতে, রাশিয়ায় এবং আমেরিকায় বিশেষভাবে রয়েছে। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা হয়েছে।

(খ) সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের সমান্তরালরূপে ট্রেড স্কুল, জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল প্রভৃতি। আমাদের দেশেও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিদ্যালয়—যেমন ইংলণ্ডের সিনিয়র টেকনিকাল স্কুল, কিম্বা আমেরিকার কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতির পৃথক স্কুলগুলি। আমাদের দেশে রয়েছে টেকনিকাল, বাণিজ্য,

কৃষি, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রবাহগুলি। তা ছাড়া এই স্তরের পৃথক ট্রেনিং ইউস্টিটিউটও আছে।

(ঘ) অনেক দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্তির পরে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্বেচ্ছামূলক কিম্বা বাধ্যতামূলক, আংশিক সময়ের কিম্বা পূর্ণসময়ের, কর্মরত অবস্থায় কিম্বা কর্মবিহীন অবস্থায় কন্টিনিউয়েসন (Continuation) শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষা মূলতঃ বৃত্তিগত। এর জন্যে আছে বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ড এবং জার্মানীতে এই ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে প্রচলিত।

(ঙ) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কর্তৃত্বে এবং পরিচালনায় নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এসব ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রহণ করা হয়, অথবা শিক্ষানবিশির শেষে কর্মে নিয়োগ করা হয়। (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের কোন বাধ্যবাধকতা কর্তৃপক্ষের থাকেনা।) আমাদের দেশে বড় বড় লৌহ প্রকল্পগুলি ছাড়া রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতিরও নিজস্ব ট্রেনিং ব্যবস্থা আছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের অতিরিক্ত ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মাসিক ভাতার ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

(চ) মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চস্তরে বিভিন্ন দেশে রয়েছে পলিটেকনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। এখানে একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাকোর্স চালু করা হয়। এগুলি মূলতঃ ডিপ্লোমা স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপরই গুরুত্ব আরোপিত হয় বেশী।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অথবা ইনস্টিটিউট। কলেজগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। আর ইনস্টিটিউটগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। উচ্চস্তরের এইসব প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থাও থাকে।

(জ) সর্বোচ্চস্তরে হলো গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতাও ভিন্ন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কারিগরি শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য চূড়ান্ত বিশেষীকরণ নয়। তা ছাড়া ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সুযোগ এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সুতরাং বৃত্তিমুখীনতা সৃষ্টি এবং ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ বিশেষীকরণের প্রস্তুতিরূপেই এই স্তরের শিক্ষাধারার উপযোগিতা।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পৃথক কারিগরি বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য সুদক্ষ কর্মী তৈরী করা। সুতরাং দক্ষ শ্রমিক তৈরী করার মধ্যেই এইসব প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা। ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর এক্ষেত্রে গুরুত্ব বেশী। কন্টিনিউয়েসন বিদ্যালয়ে কর্মহীনদের জন্য পূর্ণ সময়ের শিক্ষায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর সমগুরুত্ব আরোপ করা হয়; কিন্তু কর্মরতদের আংশিক সময়ের শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কাজটি হয় কারখানায়, এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান পরিবেশিত হয় বিদ্যালয়গুলিতে।

পলিটেকনিকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তিবিদ অর্থাৎ টেকনিসিয়ান তৈরী করা। শিল্প বানিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের শিক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। স্নাতকস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য যন্ত্রবিদ তৈরী করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানের বিরাট ভূমিকা আছে, অবশ্য তত্ত্বকে কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্য ব্যবহারিক কাজেরও ভূমিকা আছে। দেশের উৎপাদনী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি যন্ত্রবিদের দরকার হয়, তবে এই স্তরের প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা নিশ্চয়ই আছে।

সর্বোচ্চ স্তরে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো বৃত্তি ও প্রযুক্তি বিস্তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা, নিত্য-নূতন আবিষ্কার করা এবং শিল্পোৎপাদনে সহায়তা করা। এইসব ক্ষেত্রে ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা নিঃসন্দেহ।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম

আগে আমরা একাধিকবার বলেছি যে পাঠ্যক্রম তৈরী হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী। উপরে আমরা আলোচনা করলাম বিভিন্ন স্তরে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেকটির বিশেষ উদ্দেশ্য। এখন আমাদের পক্ষে পাঠ্যক্রম তৈরীর সাধারণ নীতি স্থির করা আদৌ কষ্টকর নয়। নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে,

(১) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেহেতু বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সুদক্ষ কর্মী তৈরী করাই মূল উদ্দেশ্য, সেহেতু পাঠ্যক্রমের মধ্যে ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশী থাকা প্রয়োজন। কারিগরি সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান এক্ষেত্রে বেশী চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই; বরং সাধারণ শিক্ষার দিকে একটু বেশী নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই বয়সটি বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বয়সের

অন্তর্গত। সুতরাং বৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল নাগরিকের যে নিম্নতম সাধারণ শিক্ষার দরকার, সেই শিক্ষা এদেরও দরকার।

সুতরাং পাঠ্যক্রমে সংযোজিত হওয়া উচিত (ক) নির্দিষ্ট বৃত্তির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, (খ) ঐ সম্পর্কিত ব্যবহারিক শিক্ষা (প্রাকটিকাল), এবং (গ) ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ও সমাজ বিদ্যার সাধারণ পাঠ।

(২) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে তত্ত্বমূলক পাঠের দিকে আর একটু জোর পড়া স্বাভাবিক। তবে এ ক্ষেত্রেও তত্ত্বকে প্রয়োগমুখীন ভাবে পরিবেশন করা দরকার। তাই গণিত, রসায়ন শাস্ত্র কিম্বা পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে প্রয়োগমূলক গণিত, রসায়ন, পদার্থশাস্ত্র (Applied Mathematics, Applied Chemistry, Applied Physics) প্রভৃতিতে। ঐ সঙ্গে থাকবে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং, ডিজাইনিং প্রভৃতি। ওয়ার্কসপ অভিজ্ঞতাও এই স্তরে কাম্য। কিন্তু ভাষা ও সমাজপাঠের প্রশ্নটি আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ইংলণ্ডের টেকনিকাল হাইস্কুল, আমেরিকার কারিগরি স্কুলসমূহ এবং আমাদের টেকনিকাল প্রবাহের পাঠ্যক্রম মোটামুটি এই নীতিকে অবলম্বন করেই গঠিত হয়েছে। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মত কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতির বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষালয়েও একই নীতি প্রয়োগ করা উচিত।

তা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির সব ছেলেমেয়েই যে এই স্তরেই পড়া শেষ করবে এমন নয়। এইসব প্রতিষ্ঠান উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারও বটে। সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির স্বার্থে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সহজ সংহতিও (integration) দরকার।

(৩) মাধ্যমিকোত্তর স্তরের প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দুই রকম—(ক) পলিটেকনিক, এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। পলিটেকনিকগুলি মূলতঃ প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই তৈরী হবে কারখানার ড্রাফ্‌টসম্যান, ফোরম্যান, চার্জম্যান শ্রেণীর সুদক্ষ কর্মী। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে ছেলেমেয়েরা সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠানে একদিকে থাকবে গণিত, পদার্থবিদ্যা (এবং বিশেষ বিশেষ কোর্সে রসায়নবিদ্যা), ধাতু বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং, ডিজাইনিং, সার্ভে প্রভৃতির উপর

বিশেষ নজর, অপরদিকে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব। বস্তুতঃ ওয়ার্কসপের কাজ এইসব প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মূল্যবান। তা ছাড়া ভাষার পাঠও এই পাঠ্যক্রমে সাধারনতঃ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। (কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পলিটেকনিকগুলিতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি দায়সারা গোছের। তাই পলিটেকনিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীর ভাষাগত দুর্বলতা বহু ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়)।

(৪) **স্নাতক স্তরের কলেজ এবং ইনস্টিটিউটগুলির মূল লক্ষ্য** যন্ত্রবিদ এবং বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। সুতরাং এখানে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবেই। শিক্ষাকোর্সের প্রথম দিকে সকলের জন্যই এক পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হয়। প্রথম বছরটিতে সাধারণতঃ স্নাতক স্তরের পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা এবং গণিতের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ সঙ্গে থাকে ভাষাশিক্ষা। (সাধারণ শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের দেশেও ইংরেজী এবং মাতৃভাষাকে এই স্তরের পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে)।

দ্বিতীয় বৎসর থেকে যন্ত্রবিদ্যার দিকে ক্রমে ক্রমে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ সঙ্গে হাতে কলমে কাঠের কাজ, লোহার কাজ, লেদ এবং মিলিং যন্ত্র চালনার শিক্ষা দেওয়া হয় ওয়ার্কসপে। তৃতীয় বৎসর থেকে বিশেষীকরণের সূচনা হয়। পরিশেষে মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল, সিভিল, ম্যারাইন, মেটালারজি, কেমিক্যাল, এরোনটিকস, আরকিটেকচার প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় বিশেষজ্ঞ সুলভ পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা দরকার যে **প্রতিটি স্তরেই তত্ত্বমূলক শিক্ষার সঙ্গে যথেষ্ট ব্যবহারিক শিক্ষার মিশ্রণ না হলে,** অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞান দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানকে শক্তিশালী করা না হলে সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই কলেজের ওয়ার্কসপ ছাড়াও পাঠ্যকালের মধ্যেই আবশ্যিকভাবে, কিম্বা পাঠ্যকালের পরে কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে আবশ্যিকভাবে কোন উপযুক্ত কারখানায় শিক্ষানবিশি দাবি করা হয়। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতায় ঘাটতি থাকে বলেই আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাটি হয়ে পড়ে দুর্বল)।

পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কাজ

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষায় পাঠ্যক্রমিক কাজের অন্ত নেই, কারণ প্রতিটি

তত্ত্বকথার সঙ্গেই রয়েছে ব্যবহারিক কাজের সংযোগ। ড্রইং, ডিজাইনিং, সার্ভে; কিম্বা ওয়ার্কসপ ও লেবরেটরীর কাজ—সবই আবশ্যিক পাঠ্যক্রমিক কাজ। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আলোচনার দরকার নেই। তবে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ঐ কাজ করবার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে লেবরেটরী এবং যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা একান্তই আবশ্যিক। তা ছাড়া অন্যান্য কারখানায় বাস্তব উৎপাদনে অংশ গ্রহন করবার মধ্য দিয়ে ওয়ার্কসপের কাজকে পরিপূরণ এবং শক্তিশালী করা যায়।

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা শরীর চর্চা ও খেলাধূলা, সাহিত্য ও কৃষ্টিমূলক কিম্বা বিভিন্ন প্রমোদমূলক যে সব কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রতিটিই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরি আরও কিছু করণীয় আছে। বিভিন্ন নির্মাণপ্রকল্প পরিদর্শন, ছুটির সময় নির্মাণ প্রকল্পে অংশ গ্রহন, বিভিন্ন কারখানার বাস্তব কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করা, নিজেদের হাতে গড়া জিনিস দিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিভিন্ন মেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টল খোলা, ছবি ও মডেলের মাধ্যমে সাধারণ জনতার মধ্যে প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার তথ্যাদি পরিবেশন প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবান সহপাঠ্যক্রমিক কাজ। এর ফলে একদিকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব উন্নতি হয়, অন্যদিকে কারিগরি ক্ষেত্র সম্পর্কে সমাজেরও চেতনা বাড়ে।

কারিগরি শিক্ষার পাঠপদ্ধতি

পাঠপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথমেই পরিষ্কার বলা দরকার যে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নিছক বক্তৃতাধর্মী পাঠ নিতান্তই অচল। বক্তৃতার অবশ্য আংশিক ভূমিকা থাকবেই, কারণ কোন তত্ত্বকথা উপস্থাপনের সময় মৌলিক ব্যাখ্যার যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে থাকবে যথেষ্ট বোর্ডের কাজ। বোর্ড-চিত্রাঙ্কন, কিম্বা চার্ট, গ্রাফ এবং মডেলের ব্যবহার করতেই হবে। বস্তুতঃ উপযুক্ত উপকরণ ছাড়া কারিগরি পাঠ দেওয়াই অসম্ভব। তা ছাড়া মডেল বা যন্ত্রগুলি যে কেবল শিক্ষকই প্রদর্শন করবেন এমন নয়; ছাত্রছাত্রীরা ঐগুলি নিজেরা নেড়েচেড়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা পরিষ্কার করে নেবে।

পাঠপদ্ধতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ওয়ার্কসপের যথেষ্ট ব্যবহার, কারণ ওয়ার্কসপের কাজ কিছু উপরি অথবা অতিরিক্ত নয়, শ্রেণী কক্ষে পাঠের পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং শিক্ষক কিম্বা ডেমনেস্ট্রেটর সদাসর্বদা ওয়ার্কসপ প্র্যাকটিস'এ ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করবেন।

শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষকের দায়িত্ব এবং গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা আগে যে সব আলোচনা করেছি (১২৭ এবং ২২০ পৃষ্ঠায় দেখ), তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং সে কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পাঠপদ্ধতি সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয় যে কারিগরি শিক্ষালয়ে শিক্ষকদের কাছে আরও কিছু দাবি করবার আছে। যে শিক্ষক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশেষ অবদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রের সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, যিনি ছাত্রদের অসংখ্য প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কিম্বা কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অক্ষম, যিনি নিজে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রতিটি যন্ত্র কিম্বা যন্ত্রাংশ চালাতে পারেন না, তিনি শত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হলেও সার্থক শিক্ষক হতে পারেন না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার যথাযথ সমন্বয়ই সুশিক্ষকের কাছে কাম্য। এই কারণেই কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যও শিক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষণের তেমন ব্যাপক এবং সার্থক ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের কারিগরি শিক্ষাও বহুলাংশে তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে থাকে।

পরীক্ষার সমস্যা

সাধারণভাবে এখন পর্যন্ত অন্যান্য পরীক্ষার সঙ্গে কারিগরি পরীক্ষার মৌলিক কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য ঘটেনি। কারিগরি পরীক্ষার ব্যবস্থাটি মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—তত্ত্বসম্পর্কিত লিখিত পরীক্ষা এবং প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা। কিন্তু প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রতি যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তা আসেনি। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষারও রীতি আছে। ঠিকমত পরিচালিত হলে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য। (কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রমহলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। তাদের অভিযোগ যে মৌখিক পরীক্ষাটি ছাত্রদের জব্দ করবার জন্য শিক্ষকদের হাতিয়ার। এখানে আমরা এই অভিযোগের সত্যমিথ্যা

যাচাই করব না। এখানে এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের বিধি বিদেশেও প্রচলিত। তা ছাড়া আমরা আগেই মন্তব্য করেছি যে "ঠিকমত পরিচালিত হলে" মৌখিক পরীক্ষার বিশেষ মূল্য আছে)।

পরীক্ষার বিষয়ে কোন কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (যেমন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিগুলিতে) আরও একটি নিয়ম প্রচলিত। এখানে সর্বশেষ পরীক্ষা দিয়েই ছাত্রের গুণাগুণ বিচার করা হয় না। বিভিন্ন বাৎসরিক ফলাফলকে একসঙ্গে বিচার করে Cumulative প্রথায় ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। এই ব্যবস্থাটিও সমর্থনযোগ্য।

অপসঙ্গতি ও নির্দেশনার প্রশ্ন

শিক্ষাক্ষেত্রে অপসঙ্গতি প্রসঙ্গে আগেকার অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রেও সাধারণভাবে খাটে। (২১১-২১৪ পৃষ্ঠায় দেখ)। কিন্তু **বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির আলাদা সমস্যা রয়েছে।** নিম্নস্তরের বৃত্তি শিক্ষায় কার্পেন্ট্রি, মিলিং, টার্নিং, ওয়েল্ডিং, ফিটিং, মেকানিকস্ প্রভৃতি নানা ধরণের কোর্স রয়েছে। বিশেষ ছাত্রের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযোগী কোর্স বাছাই করতে ভুল হলে যোগ্যতার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটবে। এ থেকেই সৃষ্টি হবে শিক্ষায় অপসঙ্গতি। তেমনি পলিটেকনিক স্তরে মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল, সিভিল প্রভৃতি নানা ধরনের "লাইসেন্স কোর্স" রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যোগ্যতানুসারে নির্বাচন প্রয়োজন। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও রয়েছে নানা ধরণের স্নাতক পাঠ। সে ক্ষেত্রেও **বিজ্ঞান সম্মত নির্বাচন প্রয়োজন।**

নির্বাচন প্রশ্নের মূল কথাটি হলো বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে যে বিভিন্ন যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সম্ভাবনা স্থির করা এবং প্রতিটি উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে যথাযোগ্য প্রবাহে স্থাপন করা। এ জন্য **নির্দেশনার কাজটি তিনভাগে বিভক্ত**—(ক) ব্যক্তিগত সম্ভাবনার সমীক্ষা, (খ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিশ্লেষণ, এবং (গ) কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে পূর্বাভাস এবং তথ্য সরবরাহ করা।

ব্যক্তিগত সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য Mechanical Ability, Musical Aptitude, Artistic Aptitude, Professional Aptitude প্রভৃতি সম্পর্কে নানা ধরণের "স্ট্যাণ্ডার্ড টেষ্ট" প্রচলিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের Performance

Test চালু আছে। সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশেষ দক্ষতা পরিমাপের জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা প্রচলিত। Aptitude, Interest এবং Personality পরিমাপের জন্যও বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। এইসব অভীক্ষা প্রয়োগ করে বৃত্তি, কারিগরি, শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; এবং সেই অনুসারে পরামর্শ দেওয়া চলে। দ্বিতীয় প্রয়োজন হলো বিভিন্ন ধরনের কাজের বিশ্লেষণ। একেই বলে Job Analysis. কোন কাজের জন্য কোন ধরণের যোগ্যতা প্রয়োজন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঐ বিশ্লেষণের মাধ্যমে; এবং সেই অনুসারে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে সেই বিশেষ পাঠ্যকোর্সের জন্য নির্বাচন করা যায়।

তৃতীয় প্রয়োজন হলো কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষা প্রয়াসের সামঞ্জস্য। জাতীয় অর্থনীতি কোন পথে প্রসারিত হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে, এই সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করা এবং পূর্বাভাস দেওয়া—এই হলো কাজ। এই পূর্বাভাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরাও পথ বেছে নেবার সুযোগ পায়। পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে পূর্বাভাসের কাজটি সহজ, কারণ পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে জনশক্তি প্রয়োজনের তালিকা। কিন্তু পরিকল্পনা যদি ভেঙ্গে পড়ে, কিম্বা আকাঙ্খিত সাফল্য লাভ না করে, তবে শিক্ষার্থীর ভাগ্যও পড়ে ভেঙ্গে (যেমন হয়েছে বর্তমানে আমাদের দেশে)। সুতরাং আমরা এই কথাটি পরিষ্কার বলতে পারি যে সার্থক Vocational Guidance এবং Counselling Service ছাড়া সার্থক বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা সম্ভব নয়। (অথচ এই দুর্বলতাটিই আমাদের দেশে সর্বাধিক প্রকট এবং আমাদের ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দাবি।

ভোকেসনাল গাইডেন্সের কাজ আরম্ভ হতে পারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই। তবে এই স্তরের উদ্দেশ্য হবে কায়িক শ্রম সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগানো, হাত পা সঞ্চালনের শিক্ষা, দৃষ্টিশক্তি ও পেশীশক্তির সমন্বয়, সুষ্ঠুভাবে যে কোন কাজ সম্পাদনের শিক্ষণ, সৃজনশীল কাজের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি এবং অপরের সঙ্গে সহযোগিতার শিক্ষা প্রভৃতি।

মাধ্যমিক স্তরে গাইডেন্সের উদ্দেশ্য থাকবে শিক্ষার্থীকে নিজের ক্ষমতা

ও সম্ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করানো, কর্মজগৎ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা, উপযুক্ত শিক্ষা কোর্স নির্বাচনে সাহায্য করা, নির্বাচিত কোর্সে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করানো, এবং পরিশেষে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা।

উচ্চস্তরে গাইডেন্সের কাজ আরও জটিল। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন বহুবিস্তৃত Testing Service, Job Analysis প্রকল্প, এবং কর্মজগতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংযোগ। স্বভাবতঃই বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই কাজ অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী, শিল্পমালিক, বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এবং পরামর্শদাতা, মনোবিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, অভীক্ষক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

মাধ্যমিকোত্তর স্তরে বহুমুখী পথ

নির্দেশনার প্রশ্নটি বর্তমান জটিল জীবনে মাধ্যমিক স্তরের ঊর্ধ্বে আরও গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বাবা মায়ের সামনে বিরাট প্রশ্ন "এখন কোন দিকে"! ছাত্রছাত্রীর কাছেও বিরাট প্রশ্ন "কি করবো—কোন লাইনে যাব!" **তাদের সামনে রয়েছে অনেকগুলি পথ, যেমন**—(ক) কলা, বিজ্ঞান কিম্বা বাণিজ্য শাখায় সাধারণ শিক্ষার জন্য ডিগ্রী কলেজ, (খ) প্রাথমিক শিক্ষকতায় প্রবেশ করবার জন্য শিক্ষণ কলেজ, (গ) চিকিৎসা বিদ্যার জন্য মেডিক্যাল কলেজ, (ঘ) পশু চিকিৎসা ও পোলট্রির জন্য ভেটারেনারী কলেজ, (ঙ) কৃষিবিজ্ঞানের জন্য এগ্রিকালচারাল কলেজ, (চ) কারু ও চারু শিল্পের জন্য আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টস কলেজ, (ছ) সঙ্গীত শিক্ষার জন্য মিউজিক কলেজ, (জ) মেয়েদের জন্য গৃহ বিজ্ঞান কলেজ, (ঝ) মধ্যম স্তরের পরিসংখ্যান টেনিং ব্যবস্থা, (ঞ) আরও নানা ধরণের পেশাগত শিক্ষালয় এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়।

বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়ের মধ্যে আবার আছে নানা শ্রেণীভেদ এবং প্রকারভেদ, যেমন—(ক) টাইপিং, সর্টহ্যাণ্ড, টেলিগ্রাফী, ওয়ারলেস, ষ্টেশন মাষ্টারসিপ প্রভৃতি নানারকম বিশেষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান; চর্মশিল্প, বয়নশিল্প, রেশম শিল্প, পটারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (গ) পলিটেকনিক। এর প্রতিটির মধ্যে আছে পাঠ্যবৈচিত্র্য—সিভিল, মেকানিকাল, ইলেট্রিকাল প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজ। এক্ষেত্রেও আছে পাঠ্যবৈচিত্র্য। (ঙ) নানা ধরণের শিক্ষানবিশি এবং আংশিক সময়ের অথবা রাত্রিকালীন কোর্স।—এই বিচিত্র পথের মধ্য থেকে **ঠিক পথটি বেছে নেওয়ার জন্যই নির্দেশনার প্রয়োজন,** যেমন ছেলেমেয়ের, তেমন পিতামাতার।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

প্রশ্ন হতে পারে যে এমন বিচিত্র ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা (provision) কিভাবে সম্ভব এবং দায়িত্বই বা কার? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর হলো **মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের।** বস্তুতঃ রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি যে সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র শিক্ষার দায়িত্বই রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মালিক এবং পরিপোষকও রাষ্ট্র। কিন্তু অন্যান্য বহু দেশেই সরকারী ও বেসরকারী যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে **আমেরিকায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক।** আমাদের দেশের শিল্পমালিকরা তৈরী জনশক্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভালবাসেন, সুদক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে তেমন পছন্দ করেন না। তাই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা খুবই লাজুক (shy)। অবশ্য কোন কোন বৃহৎ শিল্পের যে শিক্ষণ প্রকল্প না আছে, তা নয়। তাই মূল দায়িত্ব পড়েছে সরকারের উপর—বিশেষতঃ সরকার যখন পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং শিল্পায়নের পথ ধরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলেই কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যমের পথ খোলা রাখা হয়েছে।

তাই আমাদের দেশে মালিকানার ভিত্তিতে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মূলতঃ তিন ধরণের—(ক) সম্পূর্ণ সরকারী—কেন্দ্রীয় কিম্বা রাজ্য সরকারের; (খ) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত (sponsored), কিম্বা সরকারী মালিকানাধীন (Public Sector) শিল্পে শিক্ষণ প্রকল্প, যেমন রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি; (গ) সম্পূর্ণ বেসরকারী (সরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত) প্রতিষ্ঠান।

টাইপিং সর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি নিম্নস্তরের এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেসরকারী উদ্যোগ রয়েছে ব্যাপকভাবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থাটি

সরকারী সাহায্য পুষ্ট (সরকারী স্কুলে সম্পূর্ণ সরকারী)। জুনিয়র টেকনিক্যাল কলেজ কিম্বা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে একাংশ রয়েছে সরকারী, আর একাংশ স্পনসর্ড। পলিটেকনিক থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মূলতঃ সরকারী। (পলিটেকগুলি অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের)। গৃহবিজ্ঞান শিক্ষালয়গুলির মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী দুইরকমই আছে, সঙ্গীত কলেজগুলি অধিকাংশই বেসরকারী, চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারীও আছে, বেসরকারীও আছে। বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতির শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠান।

Provision'এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বিদ্যালয়ের গঠন ও স্থান নির্বাচন। বিদ্যালয়ের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে দেখা যায় তিন রকমের প্রচেষ্টা যেমন—(ক) সাধারণ বিদ্যালয়ের অংশরূপে কারিগরি কিম্বা কৃষি ইত্যাদি প্রবাহ; (খ) একটি মাত্র বৃত্তি কিম্বা শিল্পে বিশেষীকরণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যেমন Textiles, Ceramic, Jute, Leather প্রভৃতির টেকনোলজি ইনস্টিটিউট; (গ) একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের কোর্স সম্বলিত প্রতিষ্ঠান। আই, টি, আই ; পলিটেক ; আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ কলেজ, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে **শিল্পে localisation প্রশ্নের সঙ্গে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট।** কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সেই ধরণের শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই ছাত্ররা শিক্ষা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে লাভবান হয়, আবার শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর যোগানের দিক থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও লাভবান হয়। ধানবাদের খনিবিজ্ঞান কলেজ যদি চব্বিশ পরগণার দক্ষিনাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে অবস্থাটি কেমন হতো ? তেমনি আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে ট্রেনিং স্কুল কিম্বা পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার বদলে শিল্পহীন গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগহীন প্রান্তরে (বেড়াচাপার মত) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেও সমভাবে লাভবান হওয়া যায় না। সুতরাং শিল্পাঞ্চলেই শিল্পস্কুল এবং গ্রামাঞ্চলেই কৃষিস্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আমাদের দেশে কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক ব্যতিক্রম ঘটেছে। এলোমেলোভাবে, নানা স্বার্থের টানাপোড়েনের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যালয়গুলি অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে)।

কারিগরি শিক্ষা চেতনার বিকাশ—বিদেশে

এতক্ষণ আমরা কারিগরি শিক্ষার রূপ, পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয় সংগঠন প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামনে যে অবস্থাটি রয়েছে, তাও সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কারিগরি শিক্ষা চেতনার বিবর্তন এবং বর্তমান অবস্থার কথা এখন আলোচনা করবো। প্রথমেই আমরা বিদেশের কথা একটু বলছি।

এই অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা বলেছিলাম যে বাস্তব জীবনযাত্রা, উৎপাদন প্রণালী এবং সমাজ ব্যবস্থার উপর কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমাজ বিবর্তনের পথে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিফলন হয়েছে বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থায়। পারিবারিক বৃত্তিই যখন ছিল উৎপাদনের মূল পদ্ধতি, তখন বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল গৃহে এবং পিতৃকুলের কাছে। মধ্যযুগে উৎপাদন ব্যবস্থা আরও একটু জটিল হলো, পারিবারিক বৃত্তির ব্যবস্থা সর্বাংশে টিকে থাকতে পারলো না। ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো এ্যাপ্রেনটিস্‌শিপ ব্যবস্থা। বিভিন্ন শিল্প সংগঠন (গিল্ড) গড়ে উঠলো। শিল্পের নিয়মবিধি, এমনকি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত গিল্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ছিল মূলতঃ হস্তশিল্প ; যন্ত্রশিল্পের যুগ তখনও আসেনি, তাই আধুনিক শিক্ষণও জন্মায়নি।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সমগ্র অবস্থাটি গেল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে। বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হলো, প্রয়োগবিদ্যা যত অগ্রসর হলো, উৎপাদন ব্যবস্থা যত জটিল হতে লাগলো, দক্ষতার প্রশ্নটিও ততোই বড় হয়ে দেখা দিল। সুতরাং কারিগরি শিক্ষা ও শিক্ষণ চেতনা ক্রমে রূপ পেতে লাগলো। কিন্তু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যেহেতু বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসমবিকাশ ঘটেছে, সেহেতু কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও হয়েছে অসম অগ্রগতি।

ইংলণ্ডে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছে সবচেয়ে আগে, তাই উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হয়েছে আগে। কিন্তু আভিজাত্যের ঐতিহ্যপূর্ণ ইংরেজ সমাজে নিম্নস্তরের দক্ষতা সৃষ্টির প্রতি নজর পড়েছে অনেক পরে। বিশাল সাম্রাজ্যের বাজার করায়ত্ত ছিল বলেই প্রতিযোগিতার ভাবনা অনেকদিন ছিল না। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জার্মানী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে বিশ্বের বাজারে প্রতি

যোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করবার প্রশ্ন এলো, সুতরাং সুদক্ষ জনশক্তি তৈরীর দিকে নজর গেল। শিল্পপতিরাও নিজেদের স্বার্থে এবিষয়ে উদ্যোগী হলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল গড়ে উঠলো। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চিন্তার আকাশ আরও পরিচ্ছন্ন হলো। কন্টিনিউয়েসন শিক্ষা প্রবর্তিত হলো। ইতিমধ্যে শ্রমিক আন্দোলনও শক্তিশালী হয়েছে। পরিশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডে স্কুল স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

ফ্রান্সে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই। কিন্তু অভিজাত শাসিত সমাজে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি আমল পায়নি। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই রক্ষণশীল চেতনায় ধাক্কা লেগেছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের উত্তরকালে আবার স্থিতাবস্থাই ফিরে আসে। প্রয়োজনের খাতিরে কারিগরি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, কিন্তু "সংস্কৃতিমূলক সাধারণ শিক্ষা" চেতনার কাছে স্বীকৃতি পায়নি। অবশ্য উচ্চতম স্তরে বিশেষজ্ঞ তৈরীর কাজ অগ্রসর হয়েছে অনেক। ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে যোগ্য আসন করে নিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

জার্মানীতে কিন্তু তেমন নয়। সাধারণ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার একাধিপত্য সেখানে গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে দ্রুত শিল্পায়নের ধাক্কায় যুগপৎ উচ্চ ও নিম্নপর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার প্রসার হয়। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে গড়ে ওঠে নানা ধরণের কারিগরি বিদ্যালয় এবং কন্টিনিউয়েসন স্কুল।

আমেরিকাতেও দ্রুতগতি শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার প্রসার হয়েছে। ১৮৫০ সন নাগাদ সময়েই এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ১৮৬২ সনে "মরিল আইনের" সাহায্যে ল্যাণ্ড গ্র্যাণ্ট কলেজের মাধ্যমে কৃষি এবং যন্ত্রবিদ্যার জন্য (Mechanic Art) অর্থ সাহায্য করা হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধরণের টেকনিকাল কোর্স এবং বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। বেসরকারী সংগঠনও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ১৯১৭ সনে পাশ হয় বৃত্তিশিক্ষায় সাহায্যের জন্য "Smith Hughes" আইন। তারপর থেকে বিভিন্ন ধরণের বিশেষ শিক্ষার

জন্য অনেকগুলি আইন পাশ হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলে কৃষি, গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প বিষয়ের পাঠ্য সংযুক্ত হয়েছে; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের "ভোকেসনাল বিভাগ" স্থাপিত হয়েছে। সর্বশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের বৃত্তি শিক্ষার জন্য পাশ হয়েছে G. I. Bill of Rights.

জার শাসিত রাশিয়াতে কারিগরি শিক্ষার তেমন কোন প্রচলনই ছিলনা, কারণ দেশটি ছিল আধা ঔপনিবেশিক এবং সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু **বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ায়** স্বাভাবিকভাবেই কারিগরি শিক্ষার অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করা হলো রাশিয়ার অন্যতম শিক্ষাদর্শ। তাছাড়া, পরিকল্পিত অর্থনীতির সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাও অগ্রসর হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

বিদেশে বর্তমান অবস্থা

ইংলণ্ডে আজ তিন ধরণের মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে অন্যতম হলো টেকনিক্যাল হাইস্কুল। তাছাড়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা বয়সের উর্দ্ধে আছে বিভিন্ন দৈর্ঘের কারিগরি, আর্ট এবং বাণিজ্য কোর্স। সান্ধ্যকালীন কোর্স রয়েছে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্শিয়াল আর্ট, পোশাক তৈরী, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। তাছাড়া তিন থেকে পাঁচ বছরের দৈর্ঘসম্পন্ন কোর্স রয়েছে ইলিকট্রিকাল, কেমিক্যাল, গৃহনির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট স্কুলে পড়ছে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। কর্মরত শ্রমিকদের আছে আংশিক সময়ের বিদ্যালয়। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রেনিং স্কুল আছে। রাত্রীকালীন কোর্স রয়েছে এ্যাকাউণ্ট্যান্সি, বিজনেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন প্রভৃতি বিষয়ে। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি এবং বহু স্বয়ংশাসিত ইনস্টিটিউট।

ফ্রান্সে এখন আছে চৌদ্দ বছর বয়সের পরে ৩ বৎসরের বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থা, টেকনিক্যাল লাইসী, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি এবং খুব উচ্চমানের অনেক স্বশাসিত ইনস্টিটিউট।

পূর্ব জার্মানীতে মাধ্যমিক স্কুলেই রয়েছে প্রাকটিক্যাল ব্রাঞ্চ। তাছাড়া **উভয় জার্মানীতেই** আছে বেরুফ স্কুল, বেরুফ ফ্যাক স্কুল, ফ্যাক স্কুল জাতীয়

বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের করিগরি বিভাগ এবং উচ্চমানের বিশেষ প্রতিষ্ঠান—Hochschulen.

আমেরিকায় কম্প্রিহেনসিভ স্কুলেই আছে বৃত্তিমূলক পাঠের ব্যবস্থা; আর আছে পৃথক কারিগরি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতির হাইস্কুল, ফোর্ড-কোম্পানীর মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কারিগরি বিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ এবং বহু ধরণের ইনস্টিটিউট।

রাশিয়াতে আছে বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রম সম্বলিত টেকনিকামি, গ্রামীণ কর্মীদের জন্য বিশেষ স্কুল, কারখানার শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্য স্কুল, বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য নানা ধরণের বিশেষ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কারিগরি কলেজ এবং ৭২৭ টি ইনস্টিটিউট।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা চেতনার বিকাশ—এদেশে

আমাদের দেশেও **প্রাচীনকালে** পৈতৃক বৃত্তিতে ব্যবহারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল পারিবারিক জীবনের মধ্যেই। বৈশ্যদের জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষারও প্রচলন ছিল। তা ছাড়া চিকিৎসা বিদ্যা, সামরিক বিদ্যা, চারু ও কারু বিদ্যা (প্রাচীন ভারতে অষ্টাদশ শিল্প প্রচলিত ছিল), এমনকি যাজনিক বিদ্যার জন্যও বিশেষ শিক্ষণের প্রচলন ছিল। **মধ্যযুগে** অনেক সুলতান এবং বাদশাও বৃত্তি-মূলক পারদর্শিতায় উৎসাহ যোগাতেন। কোন কোন সুলতান কারখানা স্থাপন করে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, বিশেষ করে তরুণ ক্রীতদাসদের জন্য।

কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতে ছিল, তার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল আধুনিক যুগের প্রাক্কালে। শুধু পারিবারিক ঐতিহ্যকে বহন করে বেঁচে ছিল বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, সূচিশিল্প, দারুশিল্প, প্রস্তরশিল্প প্রভৃতি নানাধরণের শিল্পদক্ষতা। কিন্তু এগুলি সবই হস্তশিল্পের নিদর্শন। মিশনারীরা কয়েকটি বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। তবে এগুলির সঙ্গেও আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার কোন সম্পর্ক ছিলনা।

বস্তুতঃ দেশে যখন আধুনিক শিল্প বাণিজ্য ছিলনা, তখন আধুনিক কারিগরি শিক্ষাও ছিলনা। তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই ধরণের শিক্ষা দেওয়ার গরজও বোধ করেননি। কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁদেরকেও কিছু ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। যে ধরণের এবং যতটুকু শিল্পপ্রসার যে পর্যায়ে হয়েছে ততটুকুই অগ্রসর হয়েছে কারিগরি শিক্ষা—অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকদের স্বর্থে।

উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন প্রশাসন-ব্যবস্থায় জমি জরিপ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের যে কার্যক্রম গৃহীত হয়, তাকে অবলম্বন করেই সুরু হয় আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা। বোম্বাইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশ আরম্ভ হয় ১৮২৪ সনে। পুনাতে পি. ডব্লিউ. ডি.-র জন্য মেকানিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে স্থাপিত হয় জরিপ স্কুল। উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুরেও কারিগরি শিক্ষার সূচনা হয় ১৮৪৫ সনে। মধ্য-শতাব্দীর পূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত রুড়কি কলেজ।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সরকারী ও মিউনিসিপালিটির পূর্তবিভাগ, রেলওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি এবং নব প্রতিষ্ঠিত পাটকল, সুতাকল, এবং খনির জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রকৃত সূচনা। ১৮৫৬ সনে স্থাপিত হয় কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৮৫২, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে আগ্রা, মীরাট ও বেনারস কলেজ, ১৮৫৬ সনে স্থাপিত হয় পুনা কলেজ। শতাব্দীর শেষভাগে, ১৮৮০ সন থেকে শিবপুর প্রভৃতি কলেজে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়।

এদিকে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে **জাতীয় চেতনাও ক্রমেই উন্মেষিত হতে থাকে।** ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সনেই কংগ্রেস কারিগরি এবং বাণিজ্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী করে। এর ফলে কারিগরি শিক্ষায় প্রসারও ঘটে। ১৮৮৪-৮৫ সনে যে ক্ষেত্রে সারা ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল ৪ টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও জরিপ স্কুল ছিল ২০টি এবং শিল্পবিদ্যালয় ছিল ৪২টি, সে ক্ষেত্রে ১৯০১-০২ সনে শুধু টেকনিক্যাল এবং শিল্পবিদ্যালয়ই ছিল ৮০টি, ছাত্রসংখ্যা ৬৮৯৪। কিন্তু গত শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় ত্রুটির অন্ত ছিল না। স্থির-নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতির অভাব ছিল, উদ্যোগের স্থিরতা ছিল না, সর্বোপরি দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা হয়নি।

বর্তমান শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে জাতীয় চেতনা তথা **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে** কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব অর্জন করে। মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স অবলম্বন করে জন্ম নেয় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষ সত্ত্বেও লর্ড কার্জন কারিগরি পাঠের জন্য বৃত্তিব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

১৯১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বেনারস কলেজ। ঐ বৎসরই মরিসন কমিটি বয়নশিল্প, খনিশিল্প, ট্যানিং, পটারী, কাগজ ও চিনিকল প্রভৃতির জন্য দক্ষ কারিগর তৈরীর উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনার অনেক প্রসার ঘটেছে। ১৯০৪ সনেই গঠিত হয়েছিল "Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of India"। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তরুণদেরকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করা হয়। সরকারী মনোভাবও অপেক্ষাকৃত উদার হয়। ১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় Indian Institute of Science এবং ১৯২৬ সনে স্থাপিত হয় ধানবাদের খনিবিজ্ঞান কলেজ। ১৯২১-২২ সনে লিটন কমিটি ভারতীয় কারিগর নিয়োগে বিলেতী মালিকদের সংকোচ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। পরোক্ষভাবে এই মন্তব্য ভারতীয় উদ্যমকে উৎসাহিত করে।

বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা ক্রমপ্রসারমান। কিন্তু ১৯২৯-৩২ সনের অর্থনৈতিক সংকটের আঘাত আমাদের চেতনাকে অনেক বেশী বাস্তব করে তোলে। ইতিমধ্যে হার্টগ কমিটিও নিম্নমাধ্যমিক স্তরেই বৈচিত্র্যমূলক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন এবং ঐ স্তরের শেষে ছাত্রদের একাংশকে শিল্প ও বাণিজ্যিক শিক্ষার দিকে পরিচালিত করার সুপারিশ করেন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিকল্প পাঠ্যক্রমের কথাও বলা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য যে এই সব সুপারিশ তদানীন্তন কালে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়নি।

অর্থনৈতিক সংকট কেটে গেলেও দেশের অর্থনীতির মূল দুর্বলতাগুলি উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে যায়। কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটিও তাই যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। তাই কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৩৭ সনে A. Abbot এবং S. H. Wood' এর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাঁদের রিপোর্টের প্রথম অংশে আলোচনা করা হয় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার কথা। এই অংশে শিশু শ্রেণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব, প্রাথমিক স্তরে প্রবণতার স্বীকৃতি, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর বোঝা লাঘব, এই স্তরের শেষে ৩ বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ, এবং সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে (আবশ্যিক রূপে ইংরেজী ভাষা সহ) মাতৃভাষাকে মাধ্যম করবার সুপারিশ করা হয়।

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে উপস্থাপিত কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে এ্যাবট-উড কমিটির মন্তব্যই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কমিটি সুপারিশ করেন যে **বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং বৃত্তি শিক্ষাকে সমমর্যাদা দিতে হবে।** সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে পৃথক বিদ্যালয়ে, কিন্তু **এই দুই রকমের শিক্ষা হবে পরস্পরের সম্পূরক।** প্রাদেশিক সমীক্ষার সাহায্যে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বৃত্তি শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা চলে। কিন্তু **শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা চাই।** শিল্প মালিকরা গৃহ, সরঞ্জাম ও অর্থ দিয়ে বৃত্তি শিক্ষার সহায়তা করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠনের প্রশ্নে বলা হয় অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ পাঠের পরে **উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমান্তরাল রূপে থাকবে তিন বছরের জুনিয়র কোর্স।** এই শ্রেণীর কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনই সর্বাধিক। আর একাদশ শ্রেণীর সাধারণ পাঠের পরে **উচ্চশিক্ষার সমান্তরাল রূপে থাকবে ২ বছরের কোর্স।** তদুপরি কর্মরত সময়ে সপ্তাহে দুই বেলা করে **আংশিক সময়ের শিক্ষার** কথা বলা হয়। কমিটির সুপারিশে কলেজীয় স্তরে বৃত্তিগত শিক্ষা, Vocational Guidance এবং Career Pamphlet প্রকাশ করার কথা এবং জুনিয়র, সিনিয়র, আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষা এবং শিল্প ও কলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সংহত করে "বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র" (composite centres) গড়বার কথাও বলা হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় এ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই সম্ভব হয়নি। অথচ যুদ্ধের সময় দেশে অনেক শিল্প গড়ে উঠলো। যুদ্ধের পরেও সেগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন উঠলো। তাই **১৯৪৪ সনের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনায়** (সার্জেণ্ট পরিকল্পনায়) আবার এ সম্পর্কে বলা হলো।

রিপোর্টে বলা হলো যে উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে দুই ধরণের। কলা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অব্যবহারিক বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য থাকবে এক শ্রেণীর বিদ্যালয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকবে প্রয়োগবিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি এবং মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের স্কুল। প্রয়োজন অনুসারে কারিগরি, শিল্পকলা ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। উচ্চ বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে তিন বছরের জুনিয়র টেকনিক্যাল, শিল্প ও ট্রেড স্কুল। এর মর্যাদা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার

সমতুল্য। (কিম্বা নিম্নবুনিয়াদির পরে থাকতে পারে ৬ বছরের টেকনিক্যাল স্কুল)। একাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার শেষে থাকবে দুই বছরের টেকনিক্যাল স্কুল। এ ছাড়া থাকবে আংশিক সময়ের স্কুল, এবং উচ্চস্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ। কিন্তু উল্লেখ করা দরকার যে এইসব সুপারিশ প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হলো না, কারণ স্বাধীনতার আশু প্রশ্নটি সকল গঠনমূলক প্রশ্নকে পিছনে ঠেলে দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয় শম্বুক গতিতে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধশিল্প এবং আনুষঙ্গিক শিল্পে বিকাশ ঘটে। সেই সময় থেকে এই গতি অব্যাহত রয়েছে। স্বভাবতই বিশ্বযুদ্ধের পরে কারিগরি শিক্ষারও দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৯৪০ সনেই স্থাপিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণা বোর্ড। ১৯৪৫ সনে স্থাপিত হয় "সরকার কমিটি" এবং নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা সংসদ। ১৯৪৭ সনে "বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটি" দশ বছরের জন্য প্রয়োজনের সমীক্ষা করেন।

তারপর এলো স্বাধীনতা। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারত দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হলো। পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হলো: (ক) প্রচলিত ডিগ্রী কলেজগুলির উন্নয়ন, (খ) নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, (গ) স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা প্রণয়ন।

ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন—"বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও" (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন) উচ্চশিক্ষার স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বল্প পরেই স্থাপিত হয় "মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন" (মুদালিয়র কমিশন)। এই কমিশনও টেকনিকাল স্কুল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল এবং শিক্ষানবিশি ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। ঐ কমিশন শিল্পবাণিজ্য সংস্থার উপর বিশেষ কারিগরি শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাবও করেন। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই সব আলোচনা ও সুপারিশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সচেতনতা এবং আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ, আজ বোধ হয় সাধারণ মেধার এমন ছাত্র খুব অল্পই আছে যাদের কাছে কারিগরি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-থাকলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার দরজায় ধর্ণা দিত।

যে কোন দেশের দ্রুত শিল্পায়নের যুগে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি সহজেই গুরুত্ব

অর্জন করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তদুপরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে Public Sector এবং Private Sector উভয় অংশেই শিল্পায়নের কর্মসূচী গৃহীত হওয়ায় সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার পরিকল্পনাও একান্তরূপে আবশ্যিক হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃই সরকারী প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সব কারণের সমন্বয়ে কারিগরি শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে নীচের তালিকায় তা বুঝা যায় :

স্বাধীনতার যুগে কারিগরি শিক্ষার প্রসার

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা—	২৯৩৯	৩০৭৪	৪১৪৫	৫৮৪৪
শিক্ষার ব্যয়—	৩·৬৯ কোটি ;	৫·৫৫ কোটি ;	১১·৪১ কোটি ;	১৩·৪৮ কোটি।

এই মোট সংখ্যার মধ্যে শুধু কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ১৯৬০ সনে ৩৪৩৬টি। এর মধ্যে শুধু পেশা ও বৃত্তিশিক্ষার "কলেজ"ই ছিল ১০৭৭টি।

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার জন্য নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন— উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিগরি প্রবাহ, ট্রেড স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, পলিটেকনিক্, বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষণ-বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট্ প্রভৃতি। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কলেজের (সর্বভারতীয়) সংখ্যাগত বৃদ্ধি পরবর্তী তালিকায় উপস্থিত করা হয়েছে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫
ডিগ্রী কলেজ—	৫৩	৭১	১১১	১৩৩
ঐ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা—	২৮৯৩	৪৩৩৭	৭০২৬	১০১০০
ডিপ্লোমা কলেজ—	৮৯	১০৯	২০৯	২৭৪
ঐ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা—	২৬২৬	৪১০৩	১০৩৪৯	১৭৫০০

ডিপ্লোমান্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পলিটেকনিক ছিল ১৯৬৫ সনে মোট ২২১টি।

কেবলমাত্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই ৮টি আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং

২৬টি পলিটেকনিক স্থাপনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। ৫টি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজী বর্তমানে চালু আছে। ১৯৬৫-৬৬ সনে এগুলির মোট ছাত্রভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৯৮৪। কলকাতা ও আমেদাবাদে দুটি ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিলানীর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র এবং বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার কাজও সুরু হয়েছে। ৪১টি প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর পাঠের সুযোগ রয়েছে। এগুলিতে আসন সংখ্যা ২ হাজার। এদের মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠানে পি, এইচ, ডি করবার সুযোগ আছে। তার জন্যে মোট আসন সংখ্যা ১২৫টি। বর্তমানে পেশাগত এবং বৃত্তিগত কলেজ আছে সারা ভারতে ১০৭৭টি। এর মধ্যে শুধু বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানই প্রায় অর্দ্ধেক। উচ্চশিক্ষার স্তরে বিভিন্ন বিজ্ঞান, পেশা ও কারিগরি বিভাগে এখন ছাত্রসংখ্যা মোট সংখ্যার ৪২.৫ ভাগ। ভারতের ৪৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকগুলিতেই প্রয়োগবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার কাজ হচ্ছে। সুতরাং তিনটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার হয়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে অনেক গভীর সমস্যা। (এ কথা আমরা পরে আলোচনা করবো)।

পশ্চিমবঙ্গের কথা

ইংরেজী শিক্ষার মোহঘোর বাংলা দেশেই ছিল সর্বাধিক। তাই এখানে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা বিলম্বিত। কিন্তু একবার যখন সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তখন তা ব্যাপ্তিলাভ করে দ্রুত। অবশ্য অনেকদিন পর্যন্ত কেবল ডিগ্রী-স্তরে উচ্চশিক্ষার জন্যই ঝোঁক ছিল বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ডিপ্লোমা-স্তরে শিক্ষা প্রসার হতে থাকে। দেশ-বিভাগের পরে বাস্তুহারা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ডিপ্লোমার নিম্নস্তরে ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। প্রসারের কাজ অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত হয় ১৯৪৮ সনে সরকার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশনার পরে।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে আজ ভূমিকা পালন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকারী উদ্যোগ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর,

ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্প দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন অধিকর্তা, উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর, পুনর্বাসন দপ্তর এবং শিক্ষা বিভাগের নিজস্ব ট্রেনিং প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, শ্রম, পুনর্বাসন ও শিক্ষা দপ্তর সমূহেরও নিজস্ব উদ্যোগ রয়েছে। শিক্ষা দেওয়া হয় ট্রেনিং কলেজ অথবা স্কুল কিংবা উৎপাদন কেন্দ্রে। ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায় অর্থাৎ সার্টিফিকেট—এই তিন স্তরেই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ধারনা করা সম্ভব হবে এই তথ্য থেকেই যে **বর্তমানে এখানে রয়েছে ১টি টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।** এগুলিতে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, মেটালার্জি, কেমিক্যাল, ম্যারাইন, এরোনটিক্স প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের সুযোগ রয়েছে। এই কলেজগুলিতে বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬ হাজার, তার মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ৪০। (১৯৪৮ সনে ছিল ২টি কলেজ, ছাত্র ১৮৮৬ ; তার মধ্যে ছাত্রী মাত্র ২টি)। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চস্তরের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট—যেমন বেঙ্গল ট্যানিং, বেঙ্গল টেক্সটাইল, বহরমপুর টেক্সটাইল, সেরামিক, জুট প্রভৃতি ইনস্টিটিউট, কিংবা প্রিন্টিং টেকনোলজীর মত প্রতিষ্ঠান। হুগলীর সার্ভে স্কুল কিংবা হাওড়ার ক্যালকাটা ম্যারাইন টেকনিক্যাল স্কুলও এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ২৪টি পলিটেকনিক। এগুলিতে ৩ বছরের L.C.E., L.M.E., L.E.E, এবং দুবছরের Draftsmanship কোর্স প্রচলিত। তা ছাড়া ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বহরমপুর, বেলঘরিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ৪ বছরের পাঠক্রম প্রচলিত। আসানসোলে রয়েছে আংশিক সময়ের মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স। তৃতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্কুল অথবা ইনস্টিটিউট। চতুর্থ স্তরের প্রতিষ্ঠান হলো নানা ধরণের কুটিরশিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সাথে বেসরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট প্রসারিত। পঞ্চম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো বিকলাঙ্গদের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এর সংখ্যা পাঁচটি।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গেই ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। তদুপরি

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলের প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্কুল ও কলেজগুলি রয়েছে যত্রতত্র বিক্ষিপ্তভাবে। শিক্ষণ প্রোগ্রামের সমতা নেই। উপযুক্ত প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে। জুনিয়র পলিটেকনিকগুলি আজও উপযুক্ত সম্মান লাভ করে নি। ওয়ার্কসপ এবং লেবরেটরির সুযোগের অভাব রয়েছে মারাত্মকভাবে। তাছাড়া কোন 'Follow up' ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতই শিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে বেকারী ও হতাশা অতি তীব্র। (ত্রুটি ও সমস্যার কথা আমরা পরে আলোচনা করবো)।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ

বর্তমানে ভারতে মূলত তিন ধরনের কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে: (ক) ডিগ্রী কলেজ এবং টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, (খ) ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স এবং (গ) দক্ষ শ্রমিক তৈরীর জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, শিল্প ও কারু বিদ্যালয়। এই তিনটি স্তরের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টি আলোচনা করছি। কিন্তু এই আলোচনাটি সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রতিষ্ঠানগুলি হলো:—

(১) **জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল।** ভর্তির যোগ্যতা হলো অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তি। উদ্দেশ্য হলো সুদক্ষ শ্রমিক তৈরী করা। প্রাঠ্যক্রমের মধ্যে ২০ ভাগ তত্ত্বমূলক এবং ৮০ ভাগ প্রাকটিকাল। প্রাকটিকাল ট্রেনিং নিতে হয় স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ওয়ার্কসপে। ছাত্রদের মাইনে দিতে হয়না। তিন বছর কোর্সের শেষে পাশ করতে পারলে উত্তীর্ণ ছাত্ররা (ক) কারখানার চাকরীতে ঢুকতে পারে, কিম্বা (খ) ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালন করেন রাজ্য টেকনিকাল শিক্ষা পর্ষৎ।

(২) **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিগরি প্রবাহ।** ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য ছাত্র তৈরী করাই এর উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রবাহের মত এখানেও পাঠকাল ৩ বছরের এবং ছাত্রদের বেতন দিয়ে পড়তে হয়। স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন, পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং সার্টিফিকেট দেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ। কিন্তু এখান থেকে পাশ করা ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির ব্যাপারে কোন বিশেষ সুবিধে পায়না, বরং মনে করা হয় যে এই

ছাত্রদের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নে মৌল জ্ঞান সঞ্চিত হয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই বর্তমানে টেকনিক্যাল প্রবাহের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে।

(৩) **ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট** (আই, টি, আই)। ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা হলো ষষ্ঠশ্রেণী উত্তীর্ণতা। বিশেষ কর্মক্ষেত্রে বিশেষাত্মক প্র্যাকটিকাল শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ধরণের ট্রেড'এর জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাঠ্যকোর্স রয়েছে ১ থেকে ৩ বছরের, যেমন রেফ্রিজারেশন মেকানিকস' এ ১ বছর, আবার ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ২ বছর। অনেক কোর্সেই অবশ্য ২ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আই টি, আই গুলির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যেখানে উত্তীর্ণ ছাত্ররা কাজে নিযুক্ত হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এবং প্রশাসনের দায়িত্ব হলো কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের।

(৪) **পলিটেকনিক**। ভর্তির যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল পাশ কিম্বা জুনিয়র টেকনিকাল পাশ। L.C.E.; L.E.E.; L.M.E.; L.Ch.E. প্রভৃতি ডিপ্লোমার জন্য তিন বছরের পাঠ্যকোর্স রয়েছে। তত্ত্বজ্ঞান এবং পলিটেকনিকের ওয়ার্কসপে টেনিংয়ের সমন্বয়ে পাঠ্যকোর্স গঠিত। মাঝে মাঝে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিম্বা শিল্প কারখানায় ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সিলেবাস তৈরীতে ত্রুটি রয়েছে। মাধ্যমিক কিম্বা উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কোন সংহতি কিম্বা সামঞ্জস্য নেই। তা ছাড়া প্রাকটিকাল ট্রেনিংও যথোপযুক্ত ভাবে হয়না। এর অন্যতম কারণ হলো শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত নন। এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বেতন দিয়ে পড়তে হয়। মেয়েদেরও ভর্তির সুযোগ আছে। তা ছাড়া একটি মহিলা পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পলিটেকনিকগুলি প্রশাসন করেন রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিই কেন্দ্রীয় স্কীম অনুসারে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ক্ষেত্রেও আন্দোলন চলছে।

(৫) **বি, ও, এ, টি** (Board of Apprenticeship Training) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ভর্তির যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল কিম্বা হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট এবং একটি ভর্তি পরীক্ষায় পাশ (এইটিতেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে)।

চার বছরের শিক্ষানবিশি ট্রেনিংয়ের (Apprenticeship Training) পাঠ্যক্রম ; সুতরাং শিক্ষাকালে প্রতি ছাত্রকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এ্যাপ্রেন্টিস থাকতে হয়। পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদক্ষ এবং দক্ষ কর্মী তৈরী করা। সুতরাং পাঠ্যক্রমে তত্ত্ব এবং ব্যবহারের মিশ্রণ আছে ; অবশ্য শিল্পকলায় বাস্তব এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতিই নজর বেশী। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত আছে রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদের উপর।

(৬) **স্নাতক স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ** (বি, ই)। ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিক অথবা P.U. পরীক্ষায় সাফল্য। অবশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র নির্বাচন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন বিভাগে ৫ বছরের কোর্স এবং পরিশেষে স্নাতক ডিগ্রী। কিন্তু কলেজের নিজস্ব ওয়ার্কসপের বাইরে বাস্তব ট্রেনিংয়ের অভাব রয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব। প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত। (অবশ্য উপযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুমোদন পাওয়া সম্ভব)। টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউটগুলি (যেমন খড়্গপুরের) অবশ্য স্বয়ংশাসিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান। এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের।

(৭) **আংশিক সময়ের ডিগ্রী** (বি, ই) কিম্বা সমকক্ষ কোর্স। লাইসেন্সিয়েট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। রাত্রীকালীন কোর্স—পাঁচ বৎসরের। পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া বেসরকারী পেশাগত প্রতিষ্ঠান থেকেও এই ধরণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যেমন A.M.I.E. পরীক্ষার ব্যবস্থা।

(৮) **স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং**—M.E. অথবা M. Tech. বি,ই, কিম্বা তিন বছরের B. Sc/B. Tech' এর পরে দু'বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ। পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অথবা টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। গবেষণা কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষকতার জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করাই উদ্দেশ্য ; তত্ত্বজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(৯) **বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র** (Vocational Training Centre)। এগুলি সরকারী কিম্বা আধা সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা পরিচালিত। কারিগরি বিদ্যার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষণ

প্রতিষ্ঠান যেমন Printing Technology, Leather Technology, Jute Technology, কিম্বা Textile Technology—ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, কিন্তু টেক্সটাইল টেকনোলজির মত প্রতিষ্ঠানে B. Sc. চাওয়া হয়। এগুলির মালিকানা কেন্দ্রীয় কিম্বা রাজ্য সরকারের।

(১০) **কারিগরি বিদ্যার উচ্চতম পাঠ কিম্বা বিশেষ বিশেষ বিভাগে গবেষণা প্রতিষ্ঠান**—যেমন T.I.F.R. (Tata Institute for Fundamental Research), B.A.R.C. (Bhaba Atomic Research Centre) প্রভৃতি। এই ধরণের আরও অনেক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে। কোনটি সরকারী, কোনটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, কোনটি সম্পূর্ণ বেসরকারী।

কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা

আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে আমাদের অনেক ধরণের এবং বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু **প্রশ্ন হলো এগুলি এলোমেলোভাবে প্রয়োজনমাফিক গড়ে উঠেছে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, কিম্বা নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সুগ্রথিতভাবে একটি কারিগরি "শিক্ষা ব্যবস্থা" সৃষ্টি করেছে।** একথা নিঃসন্দেহ যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রয়োজনের চাপে এবং বিভিন্ন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে এবং এদের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণেও আছে বিভিন্নতা। কিন্তু তাহলেও ক্ষতি নেই যদি ক্রমান্বয়ে নীচু থেকে উপর পর্যন্ত সিঁড়ি বাঁধা হয়ে থাকে। (সেই রকমই আছে রাশিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে কারিগরি শিক্ষাকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সড়ক)। বর্তমানের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা নীচের ডায়গ্রাম দিয়ে উপস্থিত করছি :—

Class VI—I.T.I.

Class VIII—জুনিয়র-টেক (৩ বছর)—পলিটেক (৩)—বি,ই (৫)—M,E (২)—ডক্টরেট

Class XI—বি,ই (৫)—M,E (২)—ডক্টরেট

উপরের ছক থেকে বোঝা যায় যে I.T.I. থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েদের কাছে **উচ্চশিক্ষার দরজা প্রায় বন্ধ।** জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল থেকে

ছাত্র যেতে পারে পলিটেকনিকে ; পলিটেক থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রের একাংশ ৫ বছর ধরে রাত্রিকালীন ডিগ্রীপাঠের জন্য যেতে পারে এবং সেখান থেকে যেতে পারে উচ্চতর স্তরে। কিন্তু এই যোগসূত্রটি অত্যন্ত পরোক্ষ এবং ক্ষীণ। যদি প্রতি বছর পাশ করেও কোন ছেলে অগ্রসর হয়, তা হলেও অষ্টম শ্রেণীর পরে বি, ই, পাশ করতে লাগবে ১১ বছর। কিন্তু তৃতীয় লাইনে দেখছি একাদশ শ্রেণীর পরে সরাসরি বি. ই, কোর্স। অষ্টম শ্রেণীর পরে বি, ই, পাশ করতে মোট সময় লাগবে ৮ বছর। স্বভাবতঃই সমগ্র চিত্রটি অসমতা এবং অসংলগ্নতার পরিচায়ক। তা ছাড়া আমরা দেখেছি যে মাধ্যমিক টেকনিক্যাল প্রবাহ এবং বি, ই, তে তত্ত্বের উপর জোর বেশী। এবং অন্যদিকে জুনিয়র টেক এবং পলিটেক'এ প্রয়োগের উপর জোর বেশী। কিন্তু উপরে আলোচিত ব্যবস্থায় তত্ত্বাশ্রয়ী কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাই সুবিধে পাচ্ছে বেশী। এই অবস্থাটি আমাদের কারিগরি শিক্ষার অন্যতম দুর্বলতা এবং শিক্ষায় শ্রেণী বৈষম্যেরও পরিচায়ক।

কারিগরি শিক্ষার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্যোক্তা এবং মালিকানা সম্বন্ধে উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে আজ বহু নেতা ও কর্তা। তাই প্রশাসন ব্যবস্থাটি জটিল।

প্রথমে আমরা সর্বভারতীয় অবস্থাটি বিচার করছি। সর্বভারতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব রয়েছে U.G.C'র উপর। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউ, জি, সি'র নিয়ন্ত্রণ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব মূলতঃ সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থিত B. Tech, M. Tech ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর এই কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নিতান্তই পরোক্ষ। তা ছাড়া পৃথক ইন্‌স্টিটিউট কিম্বা নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠানের উপর এই কমিশনের কোন নিয়ন্ত্রণই নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা, শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প, যোগাযোগ (রেল এবং ডাক তার), পুনর্বাসন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, এবং এদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষালয় আছে। আর আছে শিক্ষা

মন্ত্রকের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের প্রতিষ্ঠান। তা ছাড়া সর্বভারতীয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্ বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষণ প্রকল্প এবং বিদ্যালয় আছে। সুতরাং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রটি পুরোপুরি শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন নয়। তবে উপর তলায় পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষার উপর পরিকল্পনা কমিশনও সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রটি বিভিন্ন-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তবুও সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে A.I.C.T.E. (**সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল**)। এর অধীনে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য রিজিওন্যাল কাউন্সিল। শিল্পমালিক, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে এইসব কাউন্সিল গঠিত। সর্বভারতীয় সমীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষালয় স্থাপনা এবং পরিচালনাই এই কাউন্সিলগুলির দায়িত্ব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাঁচটি টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটও এই কাউন্সিলেরই নিয়ন্ত্রণে।

তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেহেতু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত, সেহেতু রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গেও রয়েছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের যোগাযোগ। কোন কোন প্রতিষ্ঠান রাজ্য কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল দ্বারা পরিশাসিতও হয়। তবুও মন্তব্য করা প্রয়োজন যে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও সরল এবং এককেন্দ্রিক করা দরকার এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্তরে প্রশাসন সম্পর্কেও একথা খাটে যে এখানেও আছেন বহুকর্তা। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মালিক হলেন রাজ্য সরকার। সুতরাং এগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রকের। কিন্তু পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা প্রভৃতি সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু অন্যান্য স্তরে সরকারী উদ্যোগ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিগরি প্রবাহটি নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং কুটির শিল্প দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর, উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর, পুনর্বাসন দপ্তর, এবং শিক্ষা দপ্তরের নিজস্ব ট্রেনিং প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান আছে। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, শ্রম, পুনর্বাসন ও শিক্ষা

দপ্তর সমূহের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানও এই রাজ্যের মধ্যে আছে। সর্বোপরি এখানে বেসরকারী কিম্বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ। স্বভাবতঃই শিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। বিভিন্ন উদ্যমের মধ্যে সমন্বয়ও ঘটে না, অনেক সময় সহযোগিতারও অভাব ঘটে। অবশ্য সমগ্র রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য আছে একটি 'রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ।' পশ্চিমবঙ্গেও প্রয়োজন প্রশাসন ব্যবস্থার সরলীকরণ।

কারিগরি শিক্ষায় অর্থসংস্থান

কারিগরি শিক্ষার প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যেমন বহু প্রভু, তেমনি অর্থসংস্থানের উৎসও বিভিন্ন। এই শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় দুই স্তরে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য, এবং দুইভাগে—পরিকল্পনা এবং রাজস্বখাতে। পরিকল্পিত অর্থ ব্যয় হয় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি শিক্ষা পর্ষতের মাধ্যমে। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ছিল প্রথম পরিকল্পনায় ২৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮·৭ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪২ কোটি টাকা। পরিকল্পনা খাতে এই ব্যয় ছাড়াও রাজস্বখাতে পৌনঃপুনিক এবং অন্যধরণের ব্যয় হয়েছে।

অথচ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭২ ভাগ ছাত্রছাত্রীই বেতন দিয়ে পড়ে এবং বেতন থেকে সংকুলান হয় শিক্ষাব্যয়ের ১৭·২ ভাগ। সমালোচনা হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন করা চলে। শতকরা ৭২টি ছাত্রই যদি মাইনে দিয়ে পড়ে, এবং কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে যদি ওয়ার্কসপ এবং শিক্ষকের অভাব হয়ে থাকে, তবে এই অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হয়েছে? স্বভাবতই অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দালানবাড়ী তৈরীর জন্য। বস্তুতঃ অনেক অর্থই যে অপব্যয় হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যবস্থা হলে, কিম্বা প্রশাসন ও অর্থব্যয়ের ব্যবস্থাটি কেন্দ্রীকৃত হলে অনেক ভালভাবে ব্যয় করা সম্ভব। রাজ্যস্তরের অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থাতেও এই কথা খাটে।

অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা সম্বন্ধেও নূতনভাবে ভাবা দরকার। কারিগরি

শিক্ষা থেকে সমগ্র জাতিই লাভবান হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় শিল্পপতিরা। সুতরাং কারিগরি শিক্ষার অন্ততঃ আংশিক দায়িত্ব বহন করা উচিত শিল্পসংগঠনগুলির। এ জন্যে আইন করে তাদেরকে বাধ্য করা উচিত শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষালয় খুলতে। এ বিষয়ে হয় দালানবাড়ীর প্রাথমিক ব্যয় কিম্বা পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন করা শিল্পপতিদের দায়িত্ব। অন্যথায় শিল্পের উপর কারিগরি শিক্ষা কর বসিয়ে অর্থসংস্থানের নূতন পথ অন্বেষণ করা দরকার। তা ছাড়া জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট অংশও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

বৃত্তি, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সমস্যা

আজও ভারত শিল্পায়নে এবং কারিগরি শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর নয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা **সমস্যা এবং অশুভ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে**। সমস্যা এসেছে কারিগরি শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত—উভয় দিক থেকেই।

সমস্যাগুলি কয়েক ধরণের, যেমন শিক্ষাগত এবং গুণগত, পরিমাণগত এবং প্রশাসনগত। গুণগত বিচারে প্রথম কথাই হলো পাঠ্যক্রম। অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে আজও উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা মূলতঃ তত্ত্বগত। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। বহু ক্ষেত্রেই পুরাতন পাঠ্যক্রম চালু আছে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সর্বশেষ কথার সাথে ছাত্ররা আদৌ পরিচিত হয় না। কলেজগুলির ওয়ার্কসপ এবং ল্যাবরেটরি অত্যন্ত দরিদ্র। তদুপরি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষানবিশির সুযোগও সীমিত। এদিক থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের অবস্থা বরং ভাল, কারণ এক্ষেত্রে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অবস্থার ফলে একদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক, অপরদিকে শিল্পমালিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্নাতকরা অসুখী এই জন্য যে স্নাতক উপাধির যোগ্য দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয় না। অপরদিকে মালিকরা বলেন যে স্নাতকরা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দায়িত্বের জন্য বহু ক্ষেত্রেই অযোগ্য। ডিপ্লোমা-প্রাপ্তদের দিয়ে কাজ চলে যায় বলে মালিকরা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে তাঁদেরকেই নিয়োগ করেন।

এমন কি নিম্নস্তরের পাঠ্যক্রমও বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তৈরী করা হয় নি। তা ছাড়া সকল ছাত্রের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য কোর বিষয়গুলির পাঠ্যক্রম আরও যুক্তিশীলভাবে তৈরী করা দরকার, এবং এইসব বিষয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ডিগ্রীস্তর অপেক্ষা ডিপ্লোমা স্তরে যদিও ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তাও অল্প। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ওয়ার্কসপই আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত নয়। এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওয়ার্কসপও যথোপযুক্ত নয়। তা ছাড়া ওয়ার্কসপের কাজ ছাড়া কারখানায় বাস্তব শিক্ষণ ব্যবস্থাও অপ্রচুর।

শিক্ষাগত তৃতীয় বৃহৎ সমস্যা হলো ভাষার সমস্যা। আমাদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হলো মাতৃভাষা। বর্তমানে মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষারও মাধ্যম হতে যাচ্ছে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে সরকারীভাবে গ্রহণ না করবার কোন যুক্তি নেই। আই, টি, আই গুলিতে ভর্তির যোগ্যতা হলো ষষ্ঠশ্রেণীর বিদ্যা। এদের ক্ষেত্রে ইংরেজী মাধ্যম থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি জুনিয়র স্কুলে ভর্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা। সেক্ষেত্রেও মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন। এমন কি ডিপ্লোমা স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মাতৃভাষা প্রচলনের প্রয়োজন আছে। এই স্তরের ছাত্ররা সাধারণ কলেজের ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্স ছাত্রদের সমতুল্য। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহু পরিমাণেই মাতৃভাষায় পঠন পাঠন প্রচলিত হয়েছে। স্নাতক স্তরে মাতৃভাষার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য অনতিবিলম্বে মাতৃভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। ঐ সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশ করা দরকার।

একমাত্র প্রশ্ন হতে পারে ডিগ্রী এবং উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষার প্রশ্নে। এ সম্পর্কেও নীতিগত এবং আদর্শগত ভাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষায় মাতৃভাষা প্রয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পর্যায় পর্যায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ করা দরকার। তাছাড়া ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত যথেষ্ট বইয়ের যোগান রাখাও দরকার।

শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ সমস্যা হলো **শিক্ষক সংগ্রহ এবং শিক্ষণের প্রশ্ন।** শিল্পকারখানায় নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ারের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সমযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির বেতন অনেক কম। তাই শিক্ষকতার জন্য প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়াই দুষ্কর। কিছুদিন আগেকার একটি হিসেবে দেখা যায় ৮৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য অনুমোদিত শিক্ষকের পদ ছিল ৪৮০৮টি ; কিন্তু এর মধ্যে ১৮৭২টি পদই ছিল শূন্য। ঐ সময়েই ২২১টি পলিটেকনিকের জন্য অনুমোদিত শিক্ষক পদ ছিল ৫৫২৯ টি ; কিন্তু এর মধ্যে ১৭২৬টি পদই ছিল শূন্য। প্রায়শঃই সংবাদ-পত্রে প্রকাশ পায় কোন না কোন কারিগরি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অনেক বিভাগের অনেক পাঠ্য বিষয় দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপঠিত থাকে। শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ওয়ার্কসপে ডেমনেষ্ট্রেটরের পদের কথা। অনেক ক্ষেত্রেই এদিকেও ঘাটতি আছে। স্বভাবতঃই অনুমেয় যে শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সমস্যা এবং ওয়ার্কসপ সমস্যার ফলে কারিগরি শিক্ষার মান নিম্নমুখী।

তাছাড়া পাশ করে যাঁরা বেরুচ্ছেন তাঁরাও পুঁথিগত বিদ্যাকেই সম্বল করেন। সুতরাং **আমাদের যন্ত্রবিদরা বিদেশাগত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ** (maintenance) **করতে পারছেন, যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সৃজনী প্রতিভা দেখাতে পারছেন না,** অর্থাৎ Creative Engineers তৈরী হচ্ছেন না।

শিক্ষক সংগ্রহের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে **শিক্ষক শিক্ষণের প্রশ্নটি।** তত্ত্বজ্ঞান থাকলেই ভাল পড়ানো যায় না। পাঠপদ্ধতির উপর যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। এজন্য একদিকে শিক্ষানীতি ও তত্ত্ব, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে কারিগরি শিক্ষার স্থান, শিল্পাশ্রয়ী এবং শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় দরকার, আর দরকার পঠন পদ্ধতিতে দখল এবং সর্বোপরি ব্যবহারিক দক্ষতা। এজন্য চাই শিক্ষণ। কিন্তু আমাদের কারিগরি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। **শিক্ষণের ব্যবস্থাও খুব অপ্রতুল।** উচ্চতর কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সারা ভারতে রয়েছে সামান্য কয়েকটি রিজিওন্যাল শিক্ষণ কলেজ। তার একটি আছে কলকাতার আলিপুরে। নিম্নতর স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের জন্যও আছে কয়েকটি মাত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে একটি

আছে হাওড়ার দাশনগরে। এই দুই ধরণের প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা পর্যতের নিয়ন্ত্রণে।

প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কিছুদিন যথেষ্ট কর্মব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল। কর্মরত এবং কর্মবিহীন—উভয় ধরণের শিক্ষার্থীই তখন গ্রহণ করা হতো। কিন্তু শিল্পে মন্দাবস্থার পরে, এখন কেবল কর্মরত শিক্ষকদের জন্যই শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তদুপরি, এই সামান্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানও যে কোন সময়ে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় রয়েছেন এখানে কর্মরত শিক্ষকগণ।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা হলো **নির্দেশনার অভাব**। এই অভাবের কুফল সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা শুধু এইটুকুই বলছি যে সুনির্দেশনার অভাব এবং অন্যান্য কারণে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণতাও যথেষ্ট। তাছাড়া অপচয় হয় অনেক। সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে ডিগ্রী স্তরে অপচয় ২০ ভাগ। এবং কোন কোন বিশেষ কোর্সে শতকরা ৪৪ ভাগ পর্যন্ত।

এর পরে উল্লেখ্য হলো **পরিমাণগত সমস্যা**। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সংকট এসেছে সত্য, কিন্তু দেশের সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শিল্প প্রসারের সম্ভাবনার বিচারে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এখনও যথেষ্ট নয়। (অবশ্য আমাদের শিল্পায়ন প্রচেষ্টাও অকালবার্দ্ধক্য লাভ করেছে)। তাছাড়া, যতটুকু প্রসার হয়েছে, সেখানেও পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন **স্তরের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা আছে**। উদাহরণরূপে বলা যায় ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার আনুপাতিক হারের কথা। অপরাপর প্রগতিশীল দেশে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার হার থাকে ন্যূনপক্ষে ১ : ৩। কিন্তু ডিগ্রীর প্রতি আমাদের মোহের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের হার ছিল প্রায় ১ : ১। সম্প্রতি অবশ্য এ বিষয়ে সচেতনতা এসেছে। এর প্রতিকার না হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবেই!

পরিকল্পনা সংক্রান্ত অপর সমস্যা হলো স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে যত্রতত্র দায়সারা গোছের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি। এর ফলে শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত হতে পারে না। **এপ্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষামানের কথা**। কারিগরি শিক্ষার প্রতি সাম্প্রতিক

ঝোঁক, সরকারের কৃপাদৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদার জন্য সাধারণ শিক্ষার মত এ ক্ষেত্রেও ছাত্রবন্যার ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে।

পরিমাণগত প্রসারের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সর্ববৃহৎ সমস্যা হলো শিল্পায়নের সঙ্গে প্রসারের সঙ্গতি রক্ষা। এ ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। লাভের লোভে আমাদের শিল্পপতিরা অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগে পারদর্শী। **শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেকারত্ব দেখা দিয়েছে।** সাধারণ শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষিত বেকার বাহিনী যুক্ত হলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

মেয়েদের জন্য কয়েকটি হস্তশিল্প শিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছে, কয়েকটি পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যেভাবে বাড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরও বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার। কিন্তু তা হয়নি।

প্রশাসনগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার শিল্পপতিদের উদ্যোগহীনতা এবং দায়িত্বহীনতার কথা। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য হলো বহু কর্তার জটিলতা। তৃতীয় বক্তব্য হলো যথেষ্ট অর্থসংস্থান এবং অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ের সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের পথ

সমস্যার যে উল্লেখ আমরা করেছি, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত। **সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাধানগুলি হলো**—(১) সকল স্তরে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস; কোর পাঠ্যক্রমের সংহতি; ছাত্রদের প্রয়োজন এবং শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি। (২) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুসজ্জিত ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান। (৩) বিভিন্ন কারখানায় ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া। (৪) নিম্নস্তরে এখুনি মাতৃভাষায় পঠন পাঠন এবং অনতিবিলম্বে উচ্চস্তরেও মাতৃভাষার প্রয়োগ। (৫) সুসংগঠিত নির্দেশনা ব্যবস্থা গঠন করা। (৬) শিক্ষকদের বেতনহার পুনঃনির্দ্ধারণ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা। (৭) শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। (৮) আরও

গবেষণা সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষমানের উন্নয়ন। (৯) সার্বিক সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগের সমবণ্টন। (১০) মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। (১১) আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার অনুপাতকে অন্তত ১ : ৩ স্তরে উন্নয়ন। (১২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়। এজন্য প্রয়োজন উন্নত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা। (১৩) শিল্পমালিকদের উপর দায়িত্ব অর্পণ। (১৪) প্রশাসনের ক্ষেত্রে বহু কর্তৃত্বের অবসান, এবং (১৫) আরও বেশী অর্থসংস্থান এবং সুসম বণ্টন।

ভবিষ্যতের চিন্তা

সুখের বিষয় ১৯৬৪-৬৬ সনের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারি কমিশন) অন্যান্য ধরণের শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বিস্তারিত সুপারিশ করেছেন।

কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষার প্রতি কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সম্পর্কিত নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ **উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগতকরণের সুপারিশ** Vocationalisation of Secondary Education)। কেবল সাধারণ বিদ্যালয়ে (General) শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হবে না। **প্রাথমিকোত্তর স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরের পূর্ব পর্যন্ত সকল রকম শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হবে।** এই স্তরে বৃত্তিগত শিক্ষার প্রসার সাধন করে একদিকে সাধারণ শিক্ষার উপর চাপ হ্রাস করা হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও কার্যকরী করা হবে। শিল্প-বাণিজ্য এবং কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থাটি হবে সহায়ক। এই হলো Vocationalisation নীতির মর্মকথা।

এই নীতি অনুসারে প্রস্তাব করা হয়েছে যে **নিম্নমাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষার বৃত্তিকরণ প্রচলিত হবে।** ১৯৮৬ সনের মধ্যে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রসংখ্যার বিশ শতাংশ এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রই থাকবে বৃত্তিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। এ সব প্রতিষ্ঠান হবে আংশিক কিংবা সর্বক্ষণের এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতাই (Terminal) হবে এর চরিত্র, অর্থাৎ **এই শিক্ষার পরে সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করা যাবে।**

যারা সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর পরে পড়াশুনা ত্যাগ করবে, তাদের জন্য

থাকবে Industrial Training Institute-এ ১৪ বছরে ভর্তির ব্যবস্থা। শিল্পকারখানায় নিয়োগের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে টেকনিক্যাল স্কুলগুলিকে প্রসারিত করা হবে। সাধারণ ও বৃত্তি শিক্ষার সমন্বয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হবে। গ্রামাঞ্চলে তরুণদের জন্য **সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষার সমন্বয়ে** *Further Education* **ব্যবস্থা থাকবে।** তেমনি মেয়েদের জন্য সাধারণ ও গার্হস্থ্যশিক্ষার সমন্বয়ে Further Education-এর ব্যবস্থা থাকবে।

কমিশন প্রস্তাব করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তরে সহরাঞ্চলে সর্বক্ষণের পলিটেকনিক্; গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পলিটেকনিক্; স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, প্রশাসন ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ৩ বছরের ডিপ্লোমা কিংবা সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বৃত্তিশিক্ষা কোর্স প্রবর্তন। কর্মরত তরুণদের জন্য Correspondence Course, Sandwich Course, Short Intensive Course এবং Day Release ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। পলিটেকনিকগুলিতে মেয়েদের জন্য বিশেষ কোর্স প্রবর্তনের কথাও কমিশন বলেছেন।

এই ব্যাপক কর্মোদ্যম সংগঠন করার উদ্দেশ্যে Industrial Training Institute গুলির প্রসার, **জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল হাইস্কুল হিসেবে রূপান্তর**, স্থানীয় শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে স্থানীয় কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই পলিটেকনিক্ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে।

উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধেও কমিশনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মনোন্নয়ন, পাঠ্য বিষয়ের আরও বৈচিত্র্যকরণ এবং গভীরতর ওয়ার্কসপ-অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশন **কারিগরি শিক্ষাকে আরও বাস্তবানুগ এবং ব্যবহারিক শিক্ষণকে আরও কার্যকরী** করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ডিগ্রী ডিপ্লোমার পারস্পরিক হারে বর্তমানের ১ : ১.৪ স্থলে ১৯৭৫ সনে ১ : ২.৫ এবং ১৯৮৫ সনে ১ : ৩ অথবা ৪-এর হার প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে "বাছাই নীতি" বিশেষ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যুগপৎ এই শিক্ষা প্রসারেরও প্রয়োজন রয়েছে।** সেই কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নূতন প্রতিষ্ঠান

স্থাপন ছাড়া বাছাই করা পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা-উত্তর কোর্স প্রবর্তন এবং কর্মরতদের জন্য Correspondence Course-এর কথা বলা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাপনা হবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও বৃত্তিজীবীদের পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। এ জন্য রাজ্যভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা অধিকার (Directorate) সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশনের মত সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

নীতি নির্দ্ধারণ ছাড়া কমিশন পরিমানগত লক্ষ্যও স্থির করে দিয়েছেন। স্কুল স্তরে লক্ষ্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। উচ্চতর স্তরে আশু লক্ষ্য হলো ১৯৭০-৭১ সনের মধ্যে কারিগরি ডিগ্রী স্তরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসন ব্যবস্থা এবং ডিপ্লোমাস্তরে ৬৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসন ব্যবস্থা করা। তা ছাড়া কমিশন সুপারিশ করেছেন যেন বৃত্তি ও কারিগরি ছাত্রপিছু বার্ষিক ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বাড়ানো হয় (টাকার হিসেবে):—

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি	৪১৭	৫০০	৬০০
উচ্চ " " "		৭০০	৮০০
স্নাতক স্তরে কারিগরি	১১৬৭	১৫০০	২০০০
স্নাতকোত্তর " "		৫০০০	৬০০০

কারিগরি শিক্ষায় সংকট

কিন্তু কোঠারি কমিশনের আশাবাদী রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিরাশায় নিমজ্জিত হলাম যখন শুনলাম আমাদের শিল্পবাণিজ্যে মন্দা লেগেছে, এবং দেখলাম ক্রমবর্ধমান ছাটাই এবং বেকারত্ব। এই বেকারত্ব বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদেরই আঘাত করেছে সর্বাধিক, কারণ শিল্পে ছাড়া এদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে এদেশে বেকার ছিল সরকারী হিসেবে ৫০ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ লক্ষতে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ, এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে চতুর্থ

পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষতে পৌঁছতে পারে, এবং অর্ধবেকার থাকবে আরও দেড় কোটি লোক। যেখানে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বেকারত্ব কমবার কথা, সেখানে এই হারে বৃদ্ধি পরিকল্পনার চরম ব্যর্থতার পরিচয় এবং "জনশক্তি পরিকল্পনা" তত্ত্বের ব্যঙ্গ মাত্র। তবে কি দেশে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হয়েছে? কিন্তু এখনও আমাদের উচ্চশিক্ষার স্তরে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সনের শেষে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকার ছিল ৪০ হাজার এবং ১৯৬৯ সনের শেষে হবে ৭০ হাজার।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে আমাদের কারিগরদের চাকরি হয়না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার আছেন ২৩০০ জন। এদের মধ্যে ১০৩ জনের ডক্টরেট ডিগ্রী আছে এবং ২৩ জনের আছে ততোধিক কিছু। বিগত ১৮ বছরে আমেরিকা গ্রহণ করেছে এক লক্ষ ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এঁদের শিক্ষার জন্য তাকে কিছু ব্যয় করতে হয়নি; এইভাবে আমেরিকা বাঁচিয়েছে ৪০০ কোটি ডলার। বস্তুতঃ আমেরিকা থেকে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের ৩৮ ভাগই বিদেশাগত। শুধু ভারতেরই এই কারিগর-বহির্গমনের জন্য লোকসান হয় ৫৫ লক্ষ ডলার। এবং এখান থেকে শতকরা ৬ ভাগ বিশেষজ্ঞ বাইরে চলে যাচ্ছেন। অথচ বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবস্থাপক আমদানী বাবদ আমাদের ব্যয় হচ্ছে বছরে ৩০ কোটি টাকা। এই টাকার অঙ্কটি চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১০০ কোটিতেও উঠতে পারে বলে প্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীহনুমন্থাইয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

কারিগরদের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী পরিকল্পনা মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। সমাধান হিসেবে বলা হয়েছে। (ক) ইঞ্জিনিয়ারদের স্বাধীন ব্যবসা। (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে কারখানা স্থাপন। (গ) বেকার ভাতা। (ঘ) উচ্চতর শিক্ষার জন্য ষ্টাইপেণ্ড। (এইভাবে এদের চাকুরীর বাজার থেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখা যাবে)। (ঙ) সর্বোপরি বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সংকোচন। বস্তুতঃ এই বছর থেকেই কারিগরি শিক্ষালয়ে ২০ ভাগ আসন হ্রাস করা হয়েছে। আর নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবেনা বলে ঘোষণা করা হয়েছে (পশ্চিম বঙ্গ সরকারও করেছেন); তা ছাড়া

শক্ষিত ছাত্ররা নিজে থেকেই এই পথ ছেড়েছে। এ বছর অনেক পলিটেকনিক প্রায় ছাত্রশূন্য ; অনেকগুলি উঠে যাওয়ার মুখে।

প্রকৃত সমাধান নির্ভর করে শিল্পবাণিজ্যের চাকা ঘোরাবার উপর। শিল্পের ব্যাপক প্রসারের উপরই অধিকতর কর্মসংস্থান এবং বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভরশীল। বেসরকারী শিল্পপতিদের মর্জির উপর ছেড়ে দিলে এই সমাধান অসম্ভব। আরও বেশী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেই সামাধানের পথে এগুনো যায়। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার নীতি এবং রূপরেখা থেকে এ বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার কারণ নেই।

(খ) কৃষি শিক্ষা

আমরা বৃত্তি, কারিগরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথা আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করবো কৃষি শিক্ষার কথা। বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞান এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং এত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে যে যথেষ্ট বিশেষীকরণ এবং সুদক্ষতা ছাড়া বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়াও অসম্ভব। বস্তুতঃ **কৃষি শিক্ষাও প্রায় কারিগরি শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে।**

বিভিন্ন দেশে কৃষি শিক্ষার ক্রমবিকাশ হয়েছে দেশের অবস্থা অনুসারে। মরুভূমির দেশে কিম্বা জলাভূমির দেশে কৃষি শিক্ষার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হতে বাধ্য। জমির প্রকৃতি, ভূমির মালিকানা এবং রাজস্ব ব্যবস্থা, বৃহদায়তন কৃষির সম্ভাবনা, জলসম্পদ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কৃষি শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই ইংলণ্ডে এবং রাশিয়ায় হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যখন কৃষি উৎপাদনের সমস্যা এলো, তখন থেকেই কৃষি শিক্ষার দিকে দৃষ্টি গেল। তাই সেখানে ১৮৬২ সনে মরিল আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়া হলো ল্যাণ্ড গ্র্যাণ্ট কলেজের মারফত কৃষি শিক্ষার জন্য। তারপরে ক্রমান্বয়ে গবেষণা কেন্দ্র, এক্সটেনসন সার্ভিস, মডেল ফার্ম, demonstration service প্রবর্তিত হলো। কেন্দ্রীয় সরকার অঢেল অর্থ সাহায্য দিলেন। গড়ে উঠলো কৃষি স্কুল ও কলেজ। কৃষি যন্ত্রও এলো খামারে খামারে। বর্তমান দুনিয়ায় আমেরিকা এবং রাশিয়াতে কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুসংগঠিত।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক জীবনের ফলে এবং মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার ফলে **ভারতে কৃষি শিক্ষার চেতনা এবং বাস্তব প্রয়াস হয়েছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে।**

ভারতে কৃষিশিক্ষার ক্রমবিকাশ

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গঠনের প্রয়োজনে **অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই** চার্লস গ্রাণ্ট ভারতে "উন্নত" কৃষি-শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রেভাঃ এড্যামও প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কৃষি-শিক্ষার সংযোজন এবং সেই অনুসারে শিক্ষক শিক্ষণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু পুরাতন কৃষি ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় অপর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু **বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে** চা, রাবার, কফি'র চাষ বেশ দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। সেই প্রয়োজন সাধন করার জন্যই হর্টিকালচারাল সোসাইটি কর্মব্যস্ত হয়ে উঠে। ১৮৭৯ সনে পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৪-৮৫ সনে দুটি কৃষি-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৬ সনে মাদ্রাজেও কৃষি-স্কুল স্থাপিত হয়। কোন কোন উচ্চবিদ্যালয়েও কৃষিবিষয়ে পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবেই আধুনিক কৃষি শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে সারা ভারতে কয়েকটি লোকক্ষয়ী দুর্ভিক্ষের ফলে "দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিখ্যাত কমিশনের রিপোর্টে কৃষিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তদনুসারে ১৮৯৭ সনে কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে (১) কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমমর্যাদায় কৃষি-শিক্ষার ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা হবে। (২) উচ্চ মর্যাদার ডিপ্লোমাদানকারী অন্তত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। (৩) কোন কোন সরকারী চাকুরিতে কৃষি ডিপ্লোমাকে আবশ্যিক করা হবে। (৪) স্কুলে বিশেষ কৃষি-পাঠক্রম প্রচলিত হবে। (৫) শিক্ষকদেরকে কৃষি-ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তগুলি অবলম্বন করেই পরের কয়েকটি বছর কৃষি-শিক্ষার প্রসার ঘটে। মাদ্রাজের স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। নাগপুর ও কানপুরে যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৮৯২ সনে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিবপুর কলেজে কৃষি শাখা

খোলা হয়। উচ্চবিদ্যালয় এবং নরম্যাল স্কুলেও ক্লাশ খোলা হয়। অবশ্য কেবল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ই কৃষি-বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়বস্তু রূপে স্বীকৃতি দেয়।

লর্ড কার্জনের আমলে আবার ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কার্জন কৃষি-শিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। ৯০১ সনে Inspector General of Agriculture পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ সনে কয়েকটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই অনুসারে কানপুর ও পুনায় যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১০ সনে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পুসা কৃষি ইনস্টিটিউট।

এর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার প্রশ্নটি আবার গুরুত্ব লাভ করে ১৯২৮ সনের রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। ঐ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে "ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ" এবং 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট' স্থাপিত হয়।

গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন প্রকল্পে গ্রামীণ পুনর্গঠন তথা কৃষি-শিক্ষার প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্ন রূপে উথাপিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস ছাড়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। স্বাধীনতার উত্তরকালে সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন গ্রামীণ শিক্ষার প্রশ্নটি সর্বাত্মকভাবে বিচার করেন এবং গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃষি-শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিশেষ প্রকৃতির কয়েকটি গ্রামীণ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে, একথা প্রথম পর্বেই আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এইসব ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে কৃষি-শিক্ষা সমস্যার সমাধান হয়নি একথা বলাই বাহুল্য।

কৃষি শিক্ষার বিস্তার

কিন্তু আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষি-কলেজ কয়েকটি স্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনার যুগে কৃষি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে এই ধরণের কলেজের সংখ্যা সারা ভারতে ১৭টি এবং কৃষি স্কুলের সংখ্যা ৩৮। তা ছাড়া ধান, পাট, আলু, আখ, মাছ এবং অন্যান্য ফসল ও বনসম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবেষণা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু

কৃষি-শিক্ষার ক্ষেত্রে **সর্বাধুনিক প্রবণতা রয়েছে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে।** বিগত ৪/৫ বছরে পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিতও হয়েছে।

সাম্প্রতিক খাদ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোঠারি কমিশন কৃষি সমস্যাকে ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যারূপে আখ্যা দিয়ে কৃষি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু কৃষি কলেজের পুঁথিগত বিদ্যার ব্যর্থতা অনুধাবন করে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও এক্সটেনসন সার্ভিসের সমন্বয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশই কমিশন করেছেন।

কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলাদেশের নিজস্ব অবদান আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। বস্তুতঃ বাংলা দেশ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চাৎপদ। এখানে বর্তমানে রয়েছে কেবল একটি কৃষি কলেজ, দুইটি স্কুল এবং ১টি মাত্র ভেটোরনারী কলেজ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়রূপেই তৈরী করার প্রস্তাব ছিল। দীর্ঘদিন পরে সম্প্রতি তা কার্যকরী হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো কৃষি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে। কিন্তু এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে পুরাতন ভূমি ব্যবস্থার পরিবেশে আধুনিক কৃষি শিক্ষা আদৌ প্রয়োগ যোগ্য হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে নূতন অপচয়ের পথরোধ করতে হলে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, অর্থ সংস্থান

কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃষি প্রবাহ; কিম্বা কৃষি স্কুল, (২) কৃষি কলেজ, (৩) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং (৪) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন স্তরের জন্য পাঠ্যক্রমেও রয়েছে বিভিন্নতা। সাধারণতঃ নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠানে সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম গঠিত হয়। উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভূমিবিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি সার, জলসেচ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞসুলভ পাঠের ব্যবস্থা থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে প্রচেষ্টা হয় উন্নত বীজ চাষের, অর্থকরী ফসল উৎপাদনের এবং শিল্পে কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে।

প্রশাসনগতভাবে **কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই রাজ্য-**

সরকারের। কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রাজ্য আইন সভার আইনের মাধ্যমে। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন রাজ্য সরকারগুলি। সাধারণতঃ রাজ্য কৃষি দপ্তরই প্রত্যক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। (পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি দপ্তরের অধীন করা হয়েছে)। উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের।

কৃষি শিক্ষার জন্যও অর্থসংস্থান করা হয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে এবং রাজস্ব ও পরিকল্পনাখাতে। সম্প্রতি কোঠারি কমিশন কৃষি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং সেই অনুসারে বেশী অর্থবরাদ্দের সুপারিশ করেছেন।

কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান

কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু আমাদের কৃষি শিক্ষালয়গুলিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক কৃষিখামারের ব্যাপক ব্যবস্থা কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ অভাব রয়েছে। তৃতীয়তঃ গবেষণার কাজও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে, জমির প্রকৃতি এবং জলসেচ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালনা করা উচিত। বিদেশী জ্ঞানকে সরাসরি প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া না যেতেও পারে। সুতরাং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে আরও অনেক আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র কিম্বা গবেষণা ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। চতুর্থতঃ কৃষির প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এক্সটেনসন সার্ভিস এবং কৃষকদের সামনে ডেমনেস্ট্রেশনের প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে আমাদের অভাব রয়েছে। উচ্চ ডিগ্রীসম্পন্ন কৃষি বিশেষজ্ঞ অনেক সময়ই প্রকৃত স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নন। পঞ্চমতঃ বলা দরকার শিক্ষক শিক্ষণের কথা। কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। অথচ এই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।

আমাদের দেশে কৃষি শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন (১) স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা; (২) ছোট চাষীর পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন শিক্ষা; (৩) নিম্নস্তরে কৃষি শিক্ষার প্রসার; (৪) আরও সার উৎপাদন প্রকল্প এবং সারের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষি

কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা ; (৫) এক্সটেনসন ব্যবস্থার প্রসার ; (৬) অর্থকরী ফসল সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ; (৭) কৃষি-শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে স্থানীয় ভিত্তিতে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ; (৮) ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান ; (৯) কৃষি শিক্ষার সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সংযোগ সাধন, এবং (১০) কৃষি শিক্ষার আবশ্যিক অংশরূপে অর্থনীতি এবং "এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং" শিক্ষার সংযোজন।

পেশাগত শিক্ষা—(ক) আইন শিক্ষা

অন্যান্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও আধুনিক কালে আইনের পেশা হলো অন্যতম সম্মানজনক ভদ্র পেশা। প্রায় একই সময়ে পাশ্চাত্য আইনবিধি এবং আধুনিক লিবারেল পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়। সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে আইনের পেশা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আইনের শিক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত হতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত আইন শিক্ষা ক্রমাগত প্রসার লাভ করে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসার ঘটে, অথচ বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়না। তারই ফলে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে একপেশে ছাত্রভর্তি হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যার চাপে পেশার জগতে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হতে থাকে। আনুপাতিকভাবে আইন শিক্ষার প্রতি বিমুখতা কখনো হয়নি, একথা স্বীকার করতেই হবে।

স্বাধীনতার উত্তরকালে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রটি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। হিন্দু সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন, বিবাহ সংক্রান্ত আইন, সংবিধান সংক্রান্ত আইন নিত্যনূতনভাবে সৃষ্টি হতে থাকে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রতিটি রাজ্যে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া আয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর, বিক্রয়কর প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম আইন পাশ হয়। সর্বোপরি শ্রম আইনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি আবার আইন শিক্ষা অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় এবং প্রসারিত হয়েছে। তবে এখন যাঁরা আইন শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা সবাই যে স্বাধীন ব্যবসা করেন, কিম্বা সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষাগ্রহণ করেন এমন নয়। সরকারী কোন কোন বিভাগে কিম্বা সওদাগরী অফিসে কাজের সুবিধের জন্যও অনেকে আইন পড়ে থাকেন। এজন্য স্বাধীনতার

উত্তরকালেও আইন কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে বিভিন্ন পেশাগত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল সারা ভারতে মোট ২০৮টি। ১৯৫৫-৫৬ সনে এই সংখ্যা হয় ৩৪৮টি। এর মধ্যে ৭৯টিই ছিল আইন কলেজ। তারপরে বিগত দশ বছরে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

আইন শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্তরভেদ আছে, যেমন—ব্যারিষ্টারি, ওকালতি, মোক্তারি। সম্প্রতি অবশ্য একটিমাত্র স্তর প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই চলছে। ব্যারিষ্টারি এবং ওকালতিকে আজ সমপর্যায়ের জ্ঞান করা হয়। তেমনি কোন কোন রাজ্যে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে) মোক্তারি শিক্ষার অবসান করা হয়েছে।

বর্তমানে আইন শিক্ষায় প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা হলো স্নাতক ডিগ্রী। আইন অধ্যয়নকাল সাধারণ বিচারে তিন বছর। পাঠ্যক্রম তিনটি স্তরে বিভক্ত (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ফাইনাল)। পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণই লিখিত। আইন শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত কলেজেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় (যেমন কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে)। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং বি, এল কিম্বা এল, এল, বি ডিগ্রী দেওয়ার অধিকার ভোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

(খ) মেডিক্যাল শিক্ষা

গত শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের দেশে আস্তে আস্তে নিজের আসন করে নিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, এমনকি সংস্কৃত বিদ্যালয়েও শারীর বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ এবং জনপ্রিয় পাঠ দেওয়া হতে থাকে। অবশ্য লর্ড বেন্টিঙ্ক'এর উদ্যোগে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংগঠিত চিকিৎসা শিক্ষার যাত্রা সুরু হয়। এই ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ছিল মিশনারী উদ্যোগ। তাঁদের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি পরিণামে উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয় (যেমন ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ)।

চিকিৎসা শিক্ষার প্রশ্নটি জনজীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। তাই সূচনার পর থেকে এই শিক্ষা ক্রমাগত প্রসারিতই হয়েছে।

সরকারী জনস্বাস্থ্যবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শহর ও গ্রামে সরকারী চিকিৎসালয় ও হাসপাতালের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল শিক্ষা আরও প্রসারিত হয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে রাষ্ট্রের "জনকল্যাণ আদর্শ" ঘোষিত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি আরও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার যুগে হাসপাতাল, হেলথ সেণ্টার, মেটারনিটি সেণ্টার, শিশু হাসপাতাল, যক্ষ্মা হাসপাতাল মানসিক হাসপাতাল, বিকলাঙ্গদের হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষারও প্রসার হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সনেই সারা ভারতে মেডিক্যাল কলেজ ছিল ৯৯টি, এবং মেডিক্যাল স্কুল ছিল ১০৯টি। বিগত দশ বছরে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা শিক্ষায় নানা ধরণের স্তরভেদ ছিল, ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ছিল পার্থক্য, এবং সার্টিফিকেটও ছিল নানা ধরণের, যেমন—L.M.P ; L.M.F ; M.B ইত্যাদি। কিন্তু নিম্নতর স্তরগুলি তুলে দিয়ে স্নাতক স্তরের শিক্ষা প্রবর্তন এবং M.B.B.S. ডিগ্রীর দিকেই সাম্প্রতিক ঝোঁক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল স্কুলগুলি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

স্নাতক স্তরে মেডিক্যাল শিক্ষাকালের দৈর্ঘ অনেকদিন থেকেই সাধারণতঃ ৫ বছরের। আগে স্নাতক স্তরে ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা ছিল I. Sc. কিন্তু মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ভর্তির যোগ্যতা ধরা হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য। কিন্তু নূতন স্কীমে ১ বছরের প্রাক মেডিক্যাল (Pre-Medical) পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। এই একবছর রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ভাষা-সাহিত্যের পাঠ দেওয়া হয়। বছরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৎসর থেকে প্রকৃত মেডিক্যাল পাঠের সূচনা হয়। প্রথম দুই বছর সাধারণ পাঠের পরে সুরু হয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পাঠ। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয় ডেমনেস্ট্রেশন এবং হাসপাতালে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অভিজ্ঞান পত্রও দিয়ে থাকে।.

বর্তমান যুগই বিশেষীকরণের যুগ। তাই M.B.B.S. উপাধির পরেও নানা ধরণের বিশেষ ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্স প্রচলিত হয়েছে, যেমন—

D.P.H ; D.T.M ; D.C.H ; D.G.O ; D.P.M. প্রভৃতি। তা ছাড়া M.D ; M.S প্রভৃতি **নানাধরণের গবেষণা ডিগ্রীও প্রচলিত হয়েছে,** এবং এজন্য এখন আর বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তদুপরি All India Institute of Hygiene and Public Health, Malaria Institute, Indian Cancer Research Institute, T.B. Association, Central Drug Research Laboratory প্রমুখ প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী এবং ভেলোরে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে **মৌলিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির।** সুতরাং অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের হাতে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে **কেন্দ্রীয় সরকারেরও ভূমিকা রয়েছে।** সুতরাং প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কেন্দ্রীয় স্তরে আছে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে স্বশাসিত রিজিওন্যাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দিকে বর্তমানে ঝোঁক রয়েছে। অবশ্য বেসরকারীভাবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনও মেডিক্যাল শিক্ষা এবং ডাক্তারি পেশার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব, তেমনি **রাজ্যস্তরে রয়েছে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ দায়িত্ব।** পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়েই এই বিষয়টি বোঝা সহজ। এখানে মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে পাঁচটি। এগুলির ব্যয়ভার বহন করে মূলতঃ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং এখানকার কর্মচারীরাও সরকারী কর্মচারী। কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের অধিকারও বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত। কিন্তু পাঠ্যক্রম নির্ধারণ এবং পরীক্ষা পরিচালন করে বিশ্ববিদ্যালয়। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সমস্ত ডিগ্রীও দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব "কলেজ অফ মেডিসিনও" আছে।

চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই আমাদের আছে। এখানে আমরা **কয়েকটি মূল সমস্যার উল্লেখ করছি।** (১) সর্ববৃহৎ সমস্যাই হলো শিক্ষা প্রসারের সমস্যা। আমাদের আরও অনেক ডাক্তার দরকার, কিন্তু সেই তুলনায় মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা সীমিত। পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ

করে আমরা বলতে পারি যে এখানে পাঁচটি কলেজে বৎসরে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা হয় মাত্র ১০০০ জন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজটি চালু হলেও সংখ্যাগত সমস্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে না। (২) চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে হাসপাতালে ব্যবহারিক শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক জনাকীর্ণ হাসপাতালে ব্যবহারিক শিক্ষণ ব্যবস্থাটিও দুর্বল। ঠিক একই কারণে স্নাতকোত্তর ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য হাউস সার্জন ব্যবস্থাটিও উৎসাহজনক নয়। হাউস সার্জনদের ভাতার স্বল্পতাও এজন্যে কিয়দংশে দায়ী। (৩) ব্যবহারিক শিক্ষাকে ফলপ্রদ করতে গেলে ওষুধপত্রের কার্পণ্য করা চলে না। কিন্তু আমাদের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এদিকেও রয়েছে কৃচ্ছ্রতা। (৪) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বহুলাংশে যন্ত্রনির্ভর। কিন্তু আমাদের কলেজগুলিতে অনেক আধুনিক যন্ত্রের অভাব রয়েছে। শিক্ষোপকরণের স্বল্পতার ফলে শিক্ষামানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। (৫) স্বনামধন্য চিকিৎসকদের স্বাধীন ব্যবসায়ে সম্ভাব্য আয়ের তুলনায় শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্য বেতন একটি ভগ্নাংশও নয়। তাই সর্বসময়ের জন্য শিক্ষক পাওয়াই দুষ্কর। (৬) বিশেষীকরণের প্রতিষ্ঠানগুলিও আমাদের দেশে খুব সংগঠিত নয় (৭) সংগঠিত গবেষণা প্রয়াশও আশাপ্রদ নয়। (৮) আমাদের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও গণমুখীন নয়। প্রতি বছরই পশ্চিম বঙ্গে গড়ে ১০০০ জন ডাক্তার হচ্ছেন, অথচ এখানে বর্তমানে পাঁচশতাধিক গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ডাক্তার পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ শিক্ষার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আসছে না। (৯) প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর্তৃত্বও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। (১০) আর্থিক অস্বচ্ছলতাও অন্যতম বৃহৎ সমস্যা।

পরিশেষে বলা দরকার যে আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। তেমনি লাইসেন্সবিহীন হাতুড়ে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণ

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়বার কৃতিত্ব যেমন বহুলাংশে মিশনারীদের প্রাপ্য, তেমনি আধুনিক শিক্ষক শিক্ষণ সূচনার কৃতিত্বও তাঁদের। কেরী সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীরামপুরে শিক্ষণ বিদ্যালয়। বোম্বাইতে

নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি শিক্ষণের সূচনা করেন। এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন, পুনার সংস্কৃত কলেজ এবং সুরাট কলেজে নর্ম্যাল ক্লাশ খোলা হয়। মাদ্রাজে মনরো সাহেব নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন। বাংলাদেশে "কলকাতা স্কুল সোসাইটি" এবং "কলকাতা লেডিস্ সোসাইটিও" এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই হলো গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। উদ্যোগ ছিল মূলতঃ বেসরকারী।

১৮৫৪ সন থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৪ সনে শিক্ষক শিক্ষণে সরকারী সাহায্যের নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৯ সনের ডেসপ্যাচে শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ্যাংলো-ভার্নাকুলার শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১ সনের মধ্যে মাদ্রাজ, চুঁচুড়া, ঢাকা, পাটনা, লাহোর প্রভৃতি জায়গায় নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সনে সারা ভারতে নর্ম্যাল স্কুলের সংখ্যা হয় ১০৬টি।

হাণ্টার কমিশন শিক্ষণের উপর আরও গুরুত্ব দেন এবং শিক্ষণকে চাকুরীর পূর্বসর্ত করবার প্রস্তাব করেন। তাই পরবর্তী বিশ বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ১৯০২ সনে সারা ভারতে ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টি; মাধ্যমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং স্কুল (এল, টি) ৫০টি; প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য পুরুষদের ১৩৩টি, মহিলাদের ৪৬টি নর্ম্যাল স্কুল।

শিক্ষার সাধারণ নীতি সম্পর্কে দেশনেতাদের সঙ্গে মতবৈষম্য সত্বেও শিক্ষণের প্রশ্নটি লর্ড কার্জন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন। ১৯০৪ সনে সরকারী প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে স্নাতকদের জন্য ডিগ্রী কিম্বা ডিপ্লোমা-স্তরে এক বছরের বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স এবং অস্নাতকদের জন্য ২ বছরের এল, টি কোর্স থাকবে, তত্ত্বমূলক পাঠের সঙ্গে থাকবে টিচিং প্রাকটিস্। কার্জনের এই নীতিকে অবলম্বন করেই ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সনের মধ্যে বোম্বাই কলেজ, কলকাতার ডেভিড হেয়ার কলেজ এবং ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সনে সরকারী প্রস্তাবে বলা হয় যে শিক্ষণ বিহীন কোন শিক্ষক রাখা হবেনা।

এর পরবর্তী পর্যায়ে স্যাডলার কমিশন শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসার এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "শিক্ষা" বিভাগ খুলবার সুপারিশ করেন। হার্টগ কমিটি দীর্ঘতর শিক্ষণকাল, Refresher Course, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি এবং শিক্ষা গবেষণার সুপারিশ করেন। সেই থেকে সার্জেণ্ট কমিটি, মুদালিয়র কমিশন, রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন প্রভৃতি সব কয়টি কমিটি ও কমিশনই শিক্ষণ

ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। ১৯৫৪ সনে একটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলও বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যক্রমও সংশোধিত হয়।

বর্তমানে ভারতে আছে সাত ধরণের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান—(১) স্বল্প সংখ্যক প্রাক-প্রাথমিক ট্রেনিং স্কুল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মন্তেসরি কোর্স ; (২) এক থেকে তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ; (৩) বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ ; (৪) স্নাতক-নিম্নদের জন্য এক কিংবা দুই বছরের সিনিয়র বেসিক শিক্ষণ ; (৫) স্নাতকদের জন্য স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি ; (৬) স্নাতকোত্তর বি. টি./বি. এড. কোর্স এবং (৭) কোন কোন রাজ্যে সার্টিফিকেট কোর্স। এ ছাড়া অঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য গৃহবিজ্ঞান শিক্ষণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

তদুপরি রিফ্রেসার, স্বল্পকালীন কোর্স, সেমিনার ও সম্মেলন, সপ্তাহান্তিক আলোচনাচক্র, শিক্ষা-প্রদর্শনী, Advisory and Guidance Scheme, Career Master's Course প্রভৃতিও আজ বহুল প্রচলিত। এর সাথে রয়েছে শতাধিক "এক্সটেনশন বিভাগ"। শিক্ষণ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দান করেন N.C.E.R.T. সংগঠন।

বিগত বিশ বছরে সাফল্য অনেক কিছু হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেক কিছুই হয় নি একথাও নিঃসন্দেহ। সাফল্য ব্যর্থতার পরিমাণগত বিচার যুগপৎ উপলব্ধি করা যাবে নীচের তালিকা থেকে :

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা	৭৮২	১৩০৭	১৪২৪
ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা	৫৩	২৩৬	৩১২
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার—(সর্বভারতীয় হিসেব)			
প্রাথমিক স্তরে	৫৮·৮শতাংশ	৬৫ শতাংশ	৭৫ শতাংশ
নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর	৫৩·৩ „	৬৫ „	৭৫ „
মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩·৮ „	৬৮ „	৭৫ „

শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত 'National Council of Educational Research and Training (N.C.E.R.T.) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো শিক্ষা-গবেষণায়

উৎসাহ দান, উচ্চস্তরের শিক্ষণ-ব্যবস্থা সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং গবেষণা-কেন্দ্রের জন্য 'Extension Service'-এর ব্যবস্থা, পাঠ্য-পুস্তক এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি।

এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগীরূপে কাজ করছে National Institute of Education. এই সংগঠনের আবার রয়েছে নানা ধরনের অঙ্গ সংগঠন ; যেমন— National Institute of Audio-visual aids, National Institute of Basic Education, Directorate of Extension Programme, National Fundamental Education Centre, Department of Science Education, Central Bureau of Text Book Research এবং Central Bureau of Educational and Vacational Guidance প্রভৃতি।

তা ছাড়া আনন্দের কথা যে আগেকার তুলনায় অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমানে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করছেন। সর্বভারতীয় হিসেবে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৫২ জন শিক্ষক স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১ জন ; কিন্তু প্রাথমিক স্তরে সম্প্রতি উচ্চশিক্ষিত লোক আসছেন। এই স্তরে বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত আছেন, শতকরা ৬ জন।

বাংলা দেশে প্রাথমিক সূচনাকালে শ্রীরামপুর মিশন, কলকাতা স্কুল সোসাইটি এবং লেডিস্ সোসাইটির কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপরে উল্লেখযোগ্য হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দান। সংস্কৃত কলেজে তিনি নর্ম্যাল বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সঙ্গে স্থাপন করেন একটি মডেল স্কুল। ১৮৫৬ সনে প্র্যাট সাহেব স্থাপন করেন চুঁচুড়ার নর্ম্যাল স্কুল। পরের বৎসর স্থাপিত হয় ঢাকার নর্ম্যাল স্কুল। ক্রমে ক্রমে নর্ম্যাল স্কুলে ইংরেজী বিভাগ খোলা হতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষণ ব্যবস্থার যতটা প্রসার হয়েছিল বাংলা-দেশে সেই তুলনায় প্রসার হয়নি। বর্তমান শতাব্দীতে লর্ড কার্জনের আমলে সরকারী সিদ্ধান্ত হলো বি, টি এবং এল, টি কোর্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ স্থাপনের। ডেভিড হেয়ার কলেজ হলো ১৯০৮ সনে এবং ঢাকা কলেজ হলো ১৯০৯ সনে। তারপরে অনেকদিন বাদে ১৯৩৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন কোর্স প্রবর্তিত হয়। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯৪০ সনে এবং স্নাতকোত্তর "শিক্ষা" বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯-৫০ সনে। ক্রমান্বয়ে বহরমপুর, স্কটিশ চার্চ, লোরেটো হাউস এবং হুগলীতে ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সন থেকে এই ক্ষেত্রে প্রসার হয়েছে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে। পশ্চিমবঙ্গে আজ রয়েছে বুনিয়াদি ধরণে রূপান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষণ কলেজ, নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ এবং স্নাতকোত্তর বি, টি,/বি,.এড কলেজ। তা ছাড়া রয়েছে গৃহবিজ্ঞান শিক্ষণ কলেজ, শারীর শিক্ষণ কলেজ, এক্সটেনসন সার্ভিস বিভাগ, ইভ্যালুয়েশন সেণ্টার, আংশিক সময়ের ক্যারিয়ার-মাষ্টার কোর্স এবং শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান গবেষণা ব্যুরো।

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজগুলি মূলতঃ তিন শ্রেণীর—সরকারী, স্পনসর্ড এবং বেসরকারী। তা ছাড়া স্নাতক স্তরেও পাশ এবং অনার্সে 'শিক্ষা' বিষয়ের পাঠ চালু হয়েছে। প্রাথমিক এবং স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সরকারী শিক্ষা বিভাগ। অন্যান্য কলেজগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভাল। কিন্তু শিক্ষণের হার এখানে অনেক নীচে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণপ্রাপ্ত আছেন ৪০ শতাংশ, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ১৬.৩ শতাংশ, প্রাথমিক স্তরে ৩৮.৩ শতাংশ (প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যার কথা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে। ব্যাহতদের ক্ষেত্রে শিক্ষণ সমস্যা আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে। সুতরাং এখানে কোন পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন)।

পরিশেষে বলা দরকার যে শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোঠারি কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন, যেমন—(১) বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেনিং কলেজ এবং স্কুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, (২) বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ, (৩) পাঠ্যক্রম সংস্কার, উন্নত শিক্ষণ, প্রাকটিস টিচিং, (৪) প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষণ, (৫) তিন বছরের স্নাতকোত্তর "শিক্ষা" পাঠ্যক্রম এবং (৬) ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা গবেষণা।

অপরদিকে সুপারিশ করা হয়েছে বেতনক্রমের উন্নতি এবং মূল্যমানের সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য, প্রভিডেণ্টফাণ্ড ও অবসরভাতা, শিক্ষক কল্যাণ, কাজের উন্নত সর্ত এবং প্রমোশন, শিক্ষক সংগঠন এবং শিক্ষক কাউন্সিলের স্বীকৃতি প্রভৃতি। এইসব সুপারিশ কার্যকরী হলে নিশ্চয়ই অবস্থার উন্নতি হবে।

চারুকলা ও শিল্পশিক্ষা (Art & Craft)

চারুকলা ও শিল্পশিক্ষার প্রশ্নটি দুইদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য এই শিক্ষার বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাগত কারণেও ঐ শিক্ষার মূল্য রয়েছে। শিক্ষাগত মূল্যের দিকটি বিচার করলে দেখবো (১) শিল্প ও চারুকলার মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পায় এবং বিকশিত হয়ে ওঠে, (২) সৌন্দর্যপ্রীতি জাগ্রত নয়, (৩) সৃষ্টির আনন্দ অর্জন করা যায় (৪) দৃষ্টিশক্তি এবং পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা জন্মে, (৫) পরিমিতি ও সামঞ্জস্যবোধ সৃষ্টি হয়। এইসব শিক্ষাগত কারণেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় অঙ্কনচর্চা আজ প্রায় সর্বজনীন। মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের ড্রইং এবং মেয়েদের সেলাই শিক্ষাও সর্বত্রই প্রচলিত। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে Work Experience সম্পর্কে যে সব কাজের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অনেকটাই চারুকলা ও শিল্পশিক্ষার অন্তর্গত। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার অংশ রূপেই এই শিক্ষা আজ স্বীকৃত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো দক্ষতার জন্য শিক্ষা। এ জন্যেও বর্তমানে নানাধরণের হস্তশিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষার বহু স্কুল এবং কলেজও স্থাপিত হয়েছে। এগুলি বেশীরভাগই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। কোন কোনটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং স্বীকৃত। কোন কোনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত (যেমন বেঙ্গল মিউজিক কলেজ)। এ ছাড়া চারুকলা স্কুল এবং মহাবিদ্যালয়ও আছে প্রতি রাজ্যেই। এদের মধ্যে স্বনামখ্যাতগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার আর্টস কলেজ এবং দিল্লীর পলিটেকনিক। এইসব কলেজের ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা প্রবেশিকা পাশ। এইসব কলেজে চারুকলার বিভিন্ন বিভাগে চার থেকে পাঁচ বছরের শিক্ষাকোর্স চালু। তা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের Fine Arts প্রবাহেও চারুকলা শিক্ষার সুযোগ আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উৎসাহদানের জন্য রয়েছে Academy of Fine Arts এবং ললিতকলা এ্যাকাডেমী।

হস্তশিল্পের জন্য প্রতিটি রাজ্যে রয়েছে অসংখ্য ছোটখাট প্রতিষ্ঠান। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারীভাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করে থাকেন। তা ছাড়া বেসরকারী মহিলা সংগঠন সমূহ মেয়েদের হস্তশিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে

বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের কথা এ ক্ষেত্রে উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যায়। বস্তুতঃ বেত ও বাঁশের কাজ, সূচি ও সীবন শিল্প, পুতুল তৈরী, গৃহসজ্জার বস্তু কিম্বা সৌখীন জিনিস তৈরীর ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধানতম বাধা হলো অর্থ সমস্যা এবং বাজার সমস্যা। (অবশ্য বাজার ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে এবং বিদেশেও চাহিদা বাড়ছে)। সরকারী উদ্যোগ সম্বন্ধে বলা যায় যে রাজ্য শিল্প বিভাগের অধীনে Wood Industry, Poultry, বয়ন শিল্প প্রভৃতির জন্য শিক্ষণ চালু আছে।

অন্যান্য বৃত্তি ও পেশা (Other Vocations & Professions)

পূর্বে আলোচিত বৃত্তি ও পেশা ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র আজ উন্মুক্ত। টেলরিং এবং কমার্শিয়াল স্কুল আছে অনেক ধরণের। এগুলি মূলতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ক্যাটারিং স্কুল রয়েছে সরকারী মালিকানায় (পশ্চিমবঙ্গে আছে কল্যাণীতে)। নার্সিং স্কুল রয়েছে সিনিয়র ও ডিগ্রী স্তরে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও ব্যয়ে মেডিক্যাল কলেজগুলির দায়িত্বে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে রয়েছে জার্ণালিজম্, লাইব্রেরিয়ানসিপ প্রভৃতি এবং বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট কিম্বা সমাজসেবামূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা। এ ছাড়া চাটার্ড এ্যাকাউণ্টস্, কষ্ট এ্যাকাউণ্টস সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ঐসব ক্ষেত্রে পেশাগত সংগঠনগুলি। শারীর শিক্ষার শিক্ষণ শিবিরও পরিচালিত হয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে All India Council of Sports'এর উপর। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সংগঠনকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। (বস্তুতঃ বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির তালিকা এইভাবে অনেকটা দীর্ঘ করাই সম্ভব।)

প্রশ্নাবলী

১। বৃত্তি, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য কি? শিক্ষা বিশেষীকরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনা কর।

(Discuss the meaning and aims of vocational, technical and professional education. What is the socio-economic basis of educational specialisation?) (২৬২-২৬৬ পৃষ্ঠা)।

২। জাতির প্রয়োজন এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

(Show the relation between vocational and technical education on the one hand and country's requirements and employment prospects on the other). (২৬৬-২৭০ পৃষ্ঠা)

৩। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার সম্পর্ক কি? এই সূত্রে সাধারণ শিক্ষা আন্দোলনের বিবরণ দাও।

(How is Technical Education related to General Education ? Give an account of the General Education Movement).

(২৭০-২৭৫ পৃষ্ঠা)

৪। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার আদর্শগত পার্থক্য কি এবং অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি ?

(How does technical education differ from general education in respect of objectives ? How is it related to other types of education ?) (২৭৬-২৭৯ পৃষ্ঠা)।

৫। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষালয়ের প্রকারভেদ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম আলোচনা কর।

(Enumerate the types of vocational and technical institutions and discuss the curriculum for each). (২৭৯-২৮৩ পৃষ্ঠা)

৬। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মূল্য আলোচনা কর। এই ক্ষেত্রে পাঠপদ্ধতি এবং শিক্ষকের দায়িত্ব কি ?

(Discuss the value of co-curricular activities in technical education. Discuss also the methods of instruction and the teacher's responsibility.) (২৮৩-২৮৬ পৃষ্ঠা)

৭। কারিগরি শিক্ষায় অপসঙ্গতি ও নির্দেশনার সমস্যা আলোচনা কর। মাধ্যমিক শিক্ষার পরে ছাত্রদের কাছে কোন কোন পথ খোলা থাকে ?

(What is maladjustment in technical education ? Discuss the need of guidance. What are the different avenues after Secondary Education ?) (২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠা)

৮। বিদেশে কারিগরি শিক্ষাচেতনার বিকাশ এবং বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

(Give an account of the development and present state of technical education in the leading Western countries).

(২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠা)

৯। ভারতে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা চেতনার বিকাশ আলোচনা কর।

(Give an account of the development of consciousness for Vocational and Technical education in India.) (২৯৪-২৯৯ পৃষ্ঠা)

১০। স্বাধীন ভারতে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের বিবরণ দাও।

(Give an account of the growth of technical education in Independent India.) (২৯৯-৩০০ পৃষ্ঠা)

১০। পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ আলোচনা কর। এখানে কারিগরি শিক্ষা "ব্যবস্থার" বিবরণ দাও।

(Discuss the types of vocational and technical institutions in West Bengal. Give an account of the "system" of technical education in West Bengal.) (৩০০-৩০৬ পৃষ্ঠা)

১১। কারিগরি শিক্ষার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা কর। এই শিক্ষায় অর্থসংস্থানের পদ্ধতি কি?

(Write an essay on the administration, control and management of technical education. How is this education financed ?)

(৩০৬-৩০৯ পৃষ্ঠা)

১২। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান বিবৃত কর।

(Discuss the problems of technical and vocational education and suggest solutions). (৩০৯-৩১৩ পৃষ্ঠা)

১৩। কারিগরি শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? এই শিক্ষায় বর্তমান সংকটের কারণ ব্যাখ্যা কর।

(What is the prospect of technical education ? Explain the causes of the current crisis in this field.) (৩১৪-৩১৮ পৃষ্ঠা)

১৪। ভারতে কৃষি শিক্ষার ক্রমবিকাশ এবং প্রসার আলোচনা কর।

(Discuss the development and expansion of Agricultural Education in India.) (৩১৮-৩২১ পৃষ্ঠা)

১৫। কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, অর্থসংস্থান এবং সমস্যা আলোচনা কর।

(Discuss the types of agricultural institutions, their administration and financing as well as problems.) (৩২১-৩২৩ পৃষ্ঠা)

১৬। আইন শিক্ষা, মেডিক্যাল শিক্ষা (বিশেষতঃ প্রি-মেডিক্যাল কোর্স), চারুকলা ও শিল্পশিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তি ও পেশা শিক্ষা সম্পর্কে টীকা লেখ।

(Write notes on Legal Education, Medical Education, (specially Pre Medical Course), Arts & Crafts Education and other types of vocational and professional education.)

(৩২৩-৩২৭ এবং ৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠা)

১৭। ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণের ক্রমবিকাশ বিবৃত কর।

(Narrate the development of Teacher Education in India, specially West Bengal). (৩২৭-৩২৮ এবং ৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠা)

১৮। ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে কয়প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে? শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ কি?

(Enumerate the types of Teacher Training Institutions in India, specially West Bengal. What are the suggestions of the Kothari Commission in this field ?) (৩২৯ এবং ৩৩১ পৃষ্ঠা).

পঞ্চম অধ্যায়

'ঙ' বিভাগ

ব্যাহতদের শিক্ষা

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার কথা। কিন্তু এবার আলোচনা করবো ব্যাহত শিশুদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরণের শিক্ষার কথা।

ব্যাহত কিম্বা পশ্চাৎপদ কথাটির সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা ধরণের অর্থ করা চলে। রক্ষণশীল এবং বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজে শূদ্ররা ছিলেন সামাজিক দিক থেকে ব্যাহত। তাঁদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতোনা। তাঁদের কাছে শিক্ষার দ্বারও ছিল রুদ্ধ। দীর্ঘকাল অবজ্ঞার ফলে তাঁরা আজ অন্যান্যের

তুলনায় পশ্চাৎপদ। তাই তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য এখন বিশেষ চেষ্টা চলছে। এদেরই Backward Classes অথবা Backward Tribes বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি রক্ষণশীল সমাজে মহিলারাও ছিলেন সামাজিক দিক থেকে ব্যাহত। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের পশ্চাৎপদতার দ্রুত অবসান ঘটছে। আবার অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমাজের দরিদ্র শোষিত শ্রেণী ছিল শত শত বছর ধরে ব্যাহত। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে সর্বজনীন শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। দরিদ্র জনতাও আজ শিক্ষামন্দিরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। সুতরাং অতীত কালের ব্যাহতরা আজ আর পশ্চাৎপদ থাকছে না।

এইসব পশ্চাৎপদতা মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সমাজ সংস্কারের মধ্যেই এর প্রতিবিধান। কিন্তু আমরা আলোচনা করবো শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার কথা। এ ক্ষেত্রেও সমস্যাটি দুই রকমের। এমন বহু শিশু দেখা যাবে যারা গায়ে পায়ে অন্য শিশুদেরই মত, সুযোগ সুবিধায় সকলের সমান, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় কম নয়। উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষাস্তর আয়ত্ত করা এদের পক্ষে উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষমতার তুলনায় শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হয়। শিশুর লেখাপড়ায় মন নেই, কিম্বা তার বিশেষ কোন একটি ত্রুটি আছে, কিম্বা স্কুলের পরিবেশ এবং পড়াশুনা তার মনে দাগ কাটতে পারেনা, হয়তো কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়কে কিম্বা শিক্ষককে সে অপছন্দ করে (এবং সেই বিষয়টি চর্চা করেনা), কিম্বা তার বাড়ীর পরিবেশ অনুকূল নয়, হয়তো বা তার মনে বিশেষ কোন জটিলতা রয়েছে। স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এইসব শিশুর পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি হয়। অন্তর্নিহিত বিশেষ কোন কারণের ফলে এই অবস্থা ঘটে। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় Under Achievers. এরা নৈসর্গিক কারণে ব্যাহত নয়। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই এদের জন্য বিশেষ অনুশীলন, বিশেষ পড়ানো এবং বিশেষ আচরণ প্রয়োজন হয়। এরা প্রকৃত অর্থে ব্যাহত নয়, যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

আমরা আলোচনা করবো এমন শিশুদের কথা যারা নৈসর্গিক কারণে জন্ম থেকে কিম্বা জন্মের অল্পক্ষণ পর থেকেই দেহে কিম্বা মনে অস্বাভাবিক। মূক,

বধির, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, পোলিওর আক্রমণে চলচ্ছক্তিহীন, কিম্বা দুর্ঘটনায় অঙ্গহীন প্রভৃতিরা প্রকৃতপক্ষে বাধাগ্রস্ত, যেহেতু তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই। তেমনি জড়বুদ্ধি কিম্বা স্বল্পবুদ্ধি শিশুরাও এই শ্রেণীর, কারণ বুদ্ধির স্বল্পতা এবং জড়তার ফলেই স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এরাও বাধাগ্রস্ত। আমরা এই ধরণের বাধাগ্রস্তদের কথাই আলোচনা করবো।

আমাদের ব্যবহৃত "বাধাগ্রস্ত", "ব্যাহত" প্রভৃতি কথাগুলি সমার্থক। ঠিক এমনি সমার্থক শব্দ রয়েছে ইংরেজীতে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেগুলির ভাবার্থে বিশেষ পার্থক্য নেই। ইংরেজীতে Handicapped, Retarded, Backward—এই তিনটি কথাই বিশেষ প্রচলিত, যেমন আমরা ব্যবহার করেছি বাধাগ্রস্ত, ব্যাহত, পশ্চাৎপদ। নৈসর্গিক কারণে বাধাগ্রস্ত (handicapped) বলেই শিশুটির ক্রমবিকাশ ব্যাহত (retarded) হয়, এবং এ জন্যই তুলনামূলকভাবে সে হয় পশ্চাৎপদ (backward)। সুতরাং বাধাগ্রস্ত, কিম্বা ব্যাহত শব্দ দু'টি ভাবার্থে এক। অমরা এই পটভূমিতেই আলোচনা করব।

ব্যাহতদের সম্বন্ধে নবচেতনা

সেই অতীতকাল আমরা খুব পিছনে ফেলে আসিনি যখন দেহে বিকলাঙ্গ, বুদ্ধিতে খর্ব, অন্ধ-মূক-বধির-খঞ্জ ব্যক্তিদেরকে সমাজের ভোজ সভার উচ্ছিষ্ট গ্রহীতা হিসেবেই বিচার করা হতো। অপরের দয়ার উপরেই এদেরকে বাঁচতে হতো। বাপ মায়ের কাছে এরা ছিল পূর্বজন্মের পাপের ফল কিম্বা ভগবানের অভিশাপ, নিদ্রাহীন রজনী যাপনের উপলক্ষ, সমাজের কাছে অপাংক্তেয় বোঝা।

আধুনিক যুগের সঙ্গী হিসেবে এলো মানবতাবাদ। তাই মানবতাবাদী দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ-ব্যাহতদের সমস্যাটি দেখা হতে লাগলো। উদার মানবিকতার প্রভাবে কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এদের জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার পিছনে ছিল সেবার মনোভাব, যেমন খৃষ্টান পাদ্রী এবং অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর। বাপ মায়ের মনোভাবও একটু পরিবর্তিত হয়। তাঁরা চেষ্টা করেন এই অক্ষমদের জন্য কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা

ও ট্রেনিং পেলে ব্যাহতদের মধ্যে অন্ততঃ একটি অংশ যে উৎপাদনী ক্ষমতাসম্পন্ন ভদ্র নাগরিক জীবন যাপন করতে পারে, সে চেতনা তখনও ছিলনা।

কিন্তু নূতন চেতনার বিকাশ ঘটেছে বিগত একশত বছরে, বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্দীতে। এর পিছনে অবশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি অনেক কারণ আছে। পুরাতন কৃষিজীবি সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে। জমি থেকে পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে ব্যাহতদের পক্ষে বেঁচে থাকাও অসম্ভব হয়েছে। পুরানো যৌথ পরিবার গেছে ভেঙ্গে। সুতরাং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সাহায্যে বেঁচে থাকাও হয়েছে অসম্ভব। অথচ ইতিমধ্যে মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। দেহে ও মনে বিকলাঙ্গতার কারণ আমরা আজ জানতে পেরেছি, অনেক প্রতিষেধক ও প্রতিবিধানের কথাও জেনেছি। **সর্বোপরি জেনেছি যে বিকলাঙ্গতা ভগবানের অভিশাপ নয়; বংশধারার ত্রুটি, পিতামাতার অবিমিশ্রকারিতা এবং পরিবেশের প্রভাব এজন্য দায়ি।** সুতরাং আমরা দায়িত্ব বোধ করেছি। তাছাড়া শিল্পবিপ্লব এবং শ্রম বিভাজনের ফলে এমন অনেক কাজ প্রয়োজন হয়েছে যেগুলি একঘেয়ে যান্ত্রিকতার কাজ, যার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার হয়না, কিম্বা যেগুলি কোন বিকলাঙ্গ লোকের দ্বারাও সম্ভব। সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে এইসব ব্যাহতদেরকে উপার্জনক্ষম আত্মনির্ভর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। **তাই মূকবধির-অন্ধ-ক্ষীণবুদ্ধি শিশুদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বদলেছে।**

তাছাড়া বর্তমানে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সকল মানুষের সমসুযোগে বিশ্বাসী। আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনই হলো সমাজবাদ। সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ না করলেও জনকল্যাণ আদর্শকে কোন রাষ্ট্রই অস্বীকার করেনা। সকল মানুষের উৎপাদনী এবং সামাজিক দক্ষতা প্রতিটি রাষ্ট্রই দাবি করে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে আজ সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে, এবং রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে এই আদর্শকে কার্যকর করবার দায়িত্ব। স্বভাবতঃই বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বয়সের অন্তর্গত সকল শিশু—সে বিকলাঙ্গ কিম্বা জড়বুদ্ধি যাই হোক—রাষ্ট্রের দায়িত্বে শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। শিক্ষার প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন হতে পারে। সর্বোপরি আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এইসব শিশুদের অন্ততঃ

একাংশের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা আছে, এবং উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক সুফল পাওয়া সম্ভব।

চেতনার জগতে এই পরিবর্তনের ফলেই আজ বলা হয় যে 'কি ধরণের মানুষ তৈরী হলো, তাই থেকে বিচার হবে শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য।' বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন "জনসাধারণের প্রতি কতটুকু যত্ন নেওয়া হয়, তাই দিয়ে বিচার হবে সমাজের মূল্য। যে কোন সভ্যতার মান বিচার হবে সহায় সুযোগহীন এবং ব্যাহতদের প্রতি যত্নের নিরিখে। বর্তমান কালের শিক্ষাবিদরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে ব্যাহত শিশুদের অবস্থাটিই আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ এবং হৃদয়হীন, অপ্রতুল এবং অক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নীরব ধিক্কার। (The presence of these children is a silent but grave commentary on the inefficiency, ignorance, indifference and inadequacy of our educational system and on the pathological condition of our society".)

আমাদের চেতনার জগতে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে অনেক বাস্তব উদাহরণ। ইতিহাস-পুরাণের পাতায় রয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং হোমার। সভ্যতার উপর স্বাক্ষর রেখে গেছেন বেথোভেন। ব্যাহত বিকলাঙ্গদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছেন অনেক কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞ, সুবক্তা এবং আইনবিদ ও সার্থক শিক্ষক। শ্রীমতী হেলেন কেলার জীবিত ছিলেন কয়েকমাস আগে পর্যন্ত। আজও বিভিন্ন দেশে রয়েছেন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। আমাদের দেশেও আছেন। তাই এদের সম্বন্ধে নূতন চেতনা বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিপুঞ্জ প্রস্তাবিত বিশ্ব শিশুসনদে বলা হয়েছে, "The child that is seek, must be nursed; the child that is physically and mentally handicapped, must be taken care of."

ব্যাহতদের প্রকার ভেদ

বাধাগ্রস্তদের আমরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—দৈহিক ক্ষমতায় বাধাগ্রস্ত এবং মানসিক ক্ষমতায় বাধাগ্রস্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে আবার প্রকারভেদ আছে। দৈহিক বাধাগ্রস্তদের মধ্যে প্রকারভেদ হলো (১) অন্ধ। এই শ্রেণীর মধ্যেও মাত্রাগত এবং গুণগত পার্থক্য আছে, যেমন—

(ক) সম্পূর্ণ অন্ধ, (খ) আংশিক কিম্বা প্রায়ান্ধ, বর্ণান্ধ, রাত্রিকালীন অন্ধ প্রভৃতি। (২) মূক ও বধির। এক্ষেত্রেও আছে মাত্রাগত পার্থক্য। সম্পূর্ণ বধিরতা আছে, আর আংশিক বধিরতা (কালা) আছে। সম্পূর্ণ মূক যেমন আছে, তেমনি তোৎলা কিম্বা অন্যান্যভাবে ত্রুটিপূর্ণ বাকশক্তিও আছে। (৩) অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকলাঙ্গ—যেমন জন্মগত কারণে, অসুখের পরিনতিতে কিম্বা দুর্ঘটনায় হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসারতা এবং অক্ষমতা।

মানসিক বাধাগ্রস্তদের মধ্যেও আছে মাত্রাগত শ্রেণীভেদ—যেমন (১) মূর্খ কিম্বা বোকা (dull); (২) ক্ষমতা থাকা সত্বেও বিভিন্ন কারণে যারা পশ্চাৎপদ (Under Achiever); এবং (৩) মানসিক ভাবে ব্যাহত। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেও রয়েছে উপশ্রেণী, যেমন (ক) স্বল্পবুদ্ধি (Moron), (খ) ততোধিক জড়বুদ্ধি (Imbecile), এবং (গ) সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীন (Idiot)।

দৈহিক দিক থেকে বাধাগ্রস্তদের শিক্ষার প্রশ্নটি ততোটা জটিল নয় যতটা জটিল মানসিক বাধাগ্রস্তদের শিক্ষা। অন্ধদের কিম্বা বধিরদের একটি ইন্দ্রিয়হানি হলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে প্রখর। হাত পায়ে যারা বিকলাঙ্গ, তাদের ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক থাকে সজাগ (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেহ ও মনের বিকলাঙ্গতা পরস্পর যুক্ত থাকে)। কিন্তু মানসিক ব্যাহতদের ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণের প্রধান সম্ভাবনা—মস্তিষ্কই থাকে খর্ব হয়ে। তার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা দেয় খর্বতা। আমরা এই জটিল বিষয়টিই আগে এবং অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আলোচনা করবো।

মানসিক খর্বতার প্রকারভেদ ও প্রকৃতি

আমরা আগেই মানসিক খর্বতাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছি। প্রথম শ্রেণীতেই উল্লেখ করেছি নির্বোধ কিম্বা মূর্খ কিম্বা বোকাদের কথা। এদেরকেই ইংরেজীতে বলা হয় Dull। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে "dullness"এর সমস্যা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। প্রতি বারেই পশ্চাৎপদ শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছে। বিদ্যালয় জীবন ছাড়বার পিছনে অক্ষমতা, পড়াশুনায় বিরক্তিজনক একঘেয়েমি, হতাশা এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়াই থাকে কারণ। যারা লেখা-পড়ায় ক্রমাগত পশ্চাৎপদ (backward), তাদেরই আমরা বলি মূর্খ (dull)। এই

পশ্চাৎপদতা হতে পারে দুই ধরণের (১) জন্মসূত্রে কিম্বা অন্যান্য কারণে স্বল্পবুদ্ধির ফলে। (এদের কথা আমরা পরে আলোচনা করবো)। (২) প্রক্ষোভের জটিলতা, আগ্রহের অভাব, সাংস্কৃতিক দৈন্য, লেখাপড়ার ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতি, আর্থিক দুর্গতি প্রভৃতি নানাকারণে সহজাত বুদ্ধির তুলনায় অক্ষমতা কিম্বা শিক্ষায় অনগ্রসরতা। অন্যান্য উন্নত দেশে পশ্চাৎপদ শিশুদের ৭৫ ভাগই প্রথম শ্রেণীর এবং ২৫ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমাদের দেশে আর্থিক দৈন্য, শিক্ষাসুযোগের অভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ক্রটির ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুর অনুপাত আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এদেরই মধ্যে একটি বিরাট অংশ হলো dull.

Dull শব্দটিতে বুঝা যায় এমন শিশু যার মানসিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধীরগতি (slower rate of mental development). সুতরাং বিদ্যালয়ের সাধারণ শ্রেণীতে অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষালাভ করতে পারে না। তারা কাজ করে মানসিক প্রতিকূলতার মধ্যে। কিন্তু তাই বলে এদেরকে অপরাপর স্বাভাবিক শিশু থেকে বিচ্ছিন্ন করবারও দরকার নেই। এদের প্রয়োজন হলো ব্যক্তিগত দৃষ্টি, প্রতিবিধান মূলক ব্যবস্থা এবং এদের মানসিক গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি। কোন কোন উন্নত দেশের বড় বড় সহরে অবশ্য এদের জন্য বিশেষ স্কুল তৈরী হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ স্কুলে 'বিশেষ ক্লাশ' এবং ব্যক্তিগতভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আবেগ জীবন এবং সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্যের জন্য অবশ্য দ্বিতীয় পদ্ধতিই শ্রেয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে আর একদল অনগ্রসর শিশু যারা নির্বোধ নয়, বরং স্বাভাবিক কিম্বা স্বাভাবিক থেকেও বেশী বুদ্ধিমান, কিন্তু শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। এদেরকে বলা হয় Under Achiever. এদের পশ্চাৎ-পদতার কারণ দৈহিক, প্রক্ষোভগত এবং পরিবেশগত। এদের ক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার নিরীক্ষণ করে, প্রশ্নোত্তর করে, অভীক্ষা করে দুর্বলতার প্রকৃত স্থান এবং কারণ নির্ণয় করা এবং সেই অনুযায়ী নিরাময় ব্যবস্থা করা। কখনো ব্যক্তিগত, কখনো দলগত জীবনের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে, নূতন আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে মৌলিক দুর্বলতা দূর করা দরকার। শিশুর নিজেরই অতীত সাফল্যের মানদণ্ডে নূতন সাফল্যের পরিমাপ করা দরকার। পড়া, বানান করা, ভাষার

ব্যবহার করা, অঙ্ক করা—প্রভৃতির ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে নিরাময় ব্যবস্থার (remedial measures) প্রয়োগ দরকার।

এইসব শিশুদের পশ্চাৎপদতা মানসিক অক্ষমতার জন্য নয়। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই এদের স্থান। বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত সময়ের জন্য এদের সাহায্য প্রয়োজন। এজন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষককে দৈনিক সময় নির্ঘণ্টের মধ্যেই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া চলে। শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে সপ্তাহে ৩।৪ দিন ছুটির পরে বিশেষ ক্লাশ করা চলে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা থাকবেন এই ক্লাশের দায়িত্বে। তা ছাড়া কাছাকাছি কয়েকটি স্কুলের জন্য একদল বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকও নিয়োগ করা চলে।

এই ধরণের পশ্চাৎপদ শিশুদের খুঁজে বার করা, দুর্বলতা নির্ণয় করা (diagnosis), শিক্ষা পরিকল্পনা করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধে ভাববার জন্য **গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।** সাফল্য নির্ভর করে সমস্ত শিক্ষকের যৌথ চেষ্টা, সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এবং পিতামাতা ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর। তা ছাড়া প্রতিটি সহরে উপযুক্ত কর্মীদের দায়িত্বে অন্ততঃ একটি করে শিশু নির্দেশনা ক্লিনিক থাকা দরকার। বিশেষ বিশেষ শিশুর দুর্বলতা আবিষ্কার এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য এইসব ক্লিনিকের সাহায্য নেওয়া দরকার।

মানসিক ব্যাহতদের কথা (Mentally Retarded)

এবার আমরা আলোচনা করছি তাদের কথা, যারা মৌলিকভাবে বুদ্ধির দিক থেকে ব্যাহত কিম্বা বাধাগ্রস্ত। ত্রুটিহীন এবং সুস্থ সন্তান প্রত্যেক পিতামাতারই কাম্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক শিশু ত্রুটি নিয়ে জন্মলাভ করে, ক্রমে সেই ত্রুটি বেড়ে ওঠে এবং জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে; শিশুটি হয় কাজের অযোগ্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই আত্মনির্ভর হতে পারে না।

এই ধরণের **মানসিক বাধাগ্রস্ততার সংজ্ঞা** দিয়েছেন সিরিল বার্ট। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, "Mental defectiveness means a condition of arrested or incomplete development of mind existing before the age of 18 years, whether arising from inherent causes or induced by disease or injury." অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সের আগে জন্মসূত্রে

কিম্বা রোগ অথবা আঘাতের ফলে বুদ্ধির বিকাশ থেমে যাওয়া কিম্বা মানসিক অপূর্ণতা সৃষ্টি হওয়াকেই বলে মানসিক ব্যাহতাবস্থা। মনোবিজ্ঞানীরা একে বলেন Amentia. এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় A=without; mens=mind. সুতরাং জীবনের বিকাশপর্বে সাধারণের তুলনায় বুদ্ধির স্থবিরতা এবং খর্বতাকেই বলা যায় ব্যাহতাবস্থা। এই অবস্থার ফলেই জীবনে সামঞ্জস্য করবার ক্ষমতা লোপ পায়। সুখের বিষয়, এই স্বল্পবুদ্ধির সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ২।৩ শতাংশের বেশী নয়।

ব্যাহতাবস্থার স্তরভেদ

ব্যাহতরা আবার সকলেই সমভাবে ব্যাহত নয়। এদের মধ্যে ক্ষমতার হেরফের আছে। স্তরভেদ করবার জন্য মনোবিজ্ঞানের বুদ্ধ্যাঙ্ক তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণভাবে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৭৫'এর (মতান্তরে ৭০) নীচে তারা সকলেই স্বল্পবুদ্ধি (feebleminded)। এই স্বল্পবুদ্ধিদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়।—

(ক) ৫০ থেকে ৭৫ (কিম্বা ৭০) পর্যন্ত বুদ্ধ্যাঙ্কসম্পন্নদেরকে বলা হয় Moron. এদের মানসিক বয়স (M.A) ৭—১২ বছর। সাধারণ তত্ত্বমূলক শিক্ষা থেকে এরা লাভবান হতে পারে না। এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিনিয়ত দেখাশোনা দরকার। কিন্তু নির্দিষ্ট অনুশীলনের পন্থায় অদক্ষ কাজের জন্য এদের তৈরী করা সম্ভব। হাতের কাজ এবং অঙ্কন প্রভৃতিতেও অনেকের দক্ষতা থাকে। উপযুক্ত শিক্ষণ পেলে এরা জীবিকা নির্বাহের যোগ্য হতে পারে। শিক্ষা গবেষণার ভাষায় এদেরকে বলা হয়েছে Educable. ব্যাহতদের মধ্যে ৭৫% এই শ্রেণীর।

(খ) ২৫ (অথবা ২০) থেকে ৫০ পর্যন্ত বুদ্ধ্যাঙ্কসম্পন্নদেরকে বলা হয় Imbecile. এদের মানসিক বয়স ৩—৭ বছর। এদের প্রক্ষোভ জীবনে থাকে অস্থিরতা এবং অব্যবস্থা; কথাবার্তা হয় ত্রুটিপূর্ণ; একটি শব্দের বেশী এরা একসঙ্গে পড়তে পারে না। সাহায্য ছাড়া নিজেদের জীবন যাপন এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিয়মমাফিক কাজে রুটিন মাফিক ট্রেনিং দিয়ে আত্মরক্ষার যোগ্য করা যায়। তাই এদেরকে বলা হয়েছে Trainable. ব্যাহতদের মধ্যে এরা ১৯ শতাংশ।

(গ) ২৫ (অথবা ২০) এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক, তাদের বলা হয় Idiot. এদের মানসিক বয়স ২—৩ বছর। এরা জন্মক্ষণ কিম্বা তার অল্প পর থেকেই থাকে ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। ঠিকমত কথাও বলতে পারে না ; এমন কি খাওয়া, হাত পা ধোওয়া, জামা কাপড় পরবার ক্ষমতাও থাকে না। এরা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং উপযোগী কাজেও অক্ষম। স্বভাবতঃই এদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হয় সমাজকে। তাই এদেরকে বলা হয় Custodial. ব্যাহতদের মধ্যে এরা শতকরা ৬ ভাগ। তবে এদের মধ্যে মৃত্যু হার বেশী।

মানসিক বাধাগ্রস্তদের ঠিক সংখ্যা নিরূপণ কোন দেশেই পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণ সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে জনসংখ্যার ২ থেকে ৩ ভাগ হলো মানসিক খর্বতাসম্পন্ন (অবশ্য এদের মধ্যে স্তরভেদ আছে)।

এই অনুপাতের বিচারে, যাদের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের দরকার ভারতে তেমন লোকের সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ। টাটা সমাজবিজ্ঞান সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশু ক্লিনিকে আগতদের মধ্যে ২৫% হলো মানসিক ব্যাহত। ঐ সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে যে স্কুল শিশুদের মধ্যে ১'৪ শতাংশই মানসিকভাবে ব্যাহত।

মানসিক বাধাগ্রস্ততার কারণ

মানসিক বাধাগ্রস্ততার অনেকগুলি কারণ হতে পারে। তবে এগুলিকে মোটামুটি ২ ভাগে ভাগ করা যায়—বংশগতির সূত্রে পাওয়া, এবং বাহ্যিক প্রভাবে হওয়া। Tredgold কারণগুলিকে ৪ ভাবে ব্যাখ্যা করেন, (ক) শুক্রকোষের অন্তর্নিহিত ত্রুটি, (খ) মাতৃগর্ভে কিম্বা জন্মের পরে বহিঃপ্রভাব, (গ) জন্মগত এবং বাহ্যিক কারণের সমন্বয়, এবং (ঘ) অন্যান্য অজানা কারণ। জন্মসূত্রের ত্রুটিকে বলে প্রাইমারী এবং অন্যগুলিকে বলে সেকেণ্ডারী। প্রাথমিক কারণেই ৮০ ভাগ (মতান্তরে ৭০) এবং সেকেণ্ডারী কারণে ২০ ভাগ (মতান্তরে ৩০ ভাগ) ব্যাহতাবস্থা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক কারণগুলিকে একটু ব্যাখ্যা করা চলে। দৈহিক উপাদানগুলি ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হলে (defective metabolism) মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানও জড়বুদ্ধি হতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপান, টি, বি, সিফিলিস প্রভৃতি ব্যাধি এবং বাবা ও মায়ের বয়সে

অতিরিক্ত ব্যবধান প্রভৃতির ফলে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ এবং মানসিক বাধাগ্রস্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

সেকেণ্ডারী কারণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়,—(১) যান্ত্রিক, (২) রাসায়নিক, (৩) রোগবীজাণুঘটিত। নিম্নলিখিত কারণগুলির কথা উল্লেখ করা চলে।

(ক) মাতৃগর্ভে ডিম্বকোষে আঘাত, (খ) গর্ভাবস্থায় মায়ের ক্ষতিকর ওষুধ খাওয়া (যেমন Thalidomide), (গ) অতিরিক্ত রঞ্জনরশ্মি লাগা, (ঘ) জন্মের সময় কিম্বা পরে মস্তিষ্কে আঘাত লাগা, (ঙ) হাম প্রভৃতি অসুখ, (চ) পুষ্টির অভাব প্রভৃতি। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে মনে হয় যে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যেই ব্যাহতদের সংখ্যা বেশী।

প্রতিষেধক (Preventive) ব্যবস্থা

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে বংশগতির ফলে (heredity) জন্মসূত্রে যে বাধার সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ব্যবস্থা এখনও মানুষের আয়ত্বে নেই। কিন্তু অন্যান্য, **বিশেষতঃ "সেকেণ্ডারী" কারণগুলির ক্ষেত্রে নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে। কয়েকটি ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।** (ক) পিতামাতার সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করা এবং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, যেন তাদের অবিমিশ্রকারিতার ফলে জড়বুদ্ধি শিশুকে পৃথিবীতে না আনেন। (খ) সন্তান ধারণের সময় মায়ের যত্ন, কয়েক ধরণের শারীরিক শ্রম থেকে অব্যাহতি, পুষ্টিকর খাদ্য এবং নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা। (গ) বাড়ীতে আনাড়ি ধাত্রীর সাহায্য না নিয়ে প্রসবকালে হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া ; (বস্তুতঃ প্রসবক্ষণে মস্তিষ্কের আঘাত থেকে শিশুকে বহুলাংশে রক্ষা করা যায় বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন)। (ঘ) জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যেই শিশুর ডাক্তারি পরীক্ষা। কিন্তু মানসিক ব্যাহতাবস্থা সব ক্ষেত্রেই একসঙ্গে ধরা পড়েনা, ক্রমে ক্রমে ধরা পরে, যেমন "ক্রেটিনিজম্"এর ক্ষেত্রে ক্রমিক ধারায় মস্তিষ্কের অবসাদ সৃষ্টি হয়। আয়োডিন'-এর অভাব কিম্বা থাইরড গ্ল্যাণ্ডের ত্রুটির ফলেও ধীরে ধীরে ব্যাধিটি বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে আইওডিন দেওয়া যায় এবং ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই থাইরড ইনজেকশন দেওয়া চলে। (ঙ) শরীরের বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক

হার বিনষ্ট হলে শিশুর রক্তে পাণ্ডুরোগ (Jaundice) হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিশুকে নূতন রক্ত দেওয়া চলে। (চ) মস্তিষ্কের শিরা উপশিরায় ত্রুটির জন্য Hydrocephalus হতে পারে। শিশুর মাথাটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে। প্রতি ৫০০'এর মধ্যে একটি বিকৃতি হয় এই কারণে। এই ক্ষেত্রে অপারেশন করা সম্ভব। আবার অপর দিকে Microcephally হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মাথাটি হয় অস্বাভাবিক ছোট, এর ফলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে বেশী। (ছ) মায়ের বয়স, কিম্বা বাবা ও মায়ের বয়সে অস্বাভাবিক পার্থক্যের ফলেও সৃষ্টি হয় 'মঙ্গোলিজম্'; সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে যেন এই ধরণের অবিমিশ্রকারিতা না হয়। (জ) মা এবং বাবা উভয়েই স্বল্পবুদ্ধি হলে সন্তানের পক্ষে মানসিক ব্যাহতাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে এবিষয়েও সাবধানতা দরকার। (ঝ) পিতামাতা অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে বিরত হয়ে সন্তানের জীবনকে সুস্থ রাখতে পারেন। (ঞ) সিফিলিস্ কিম্বা যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত পিতামাতারও সন্তান না হওয়া বাঞ্ছনীয়। (এই রোগগুলি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে জন্মের আগে, গর্ভাবস্থায় কিম্বা জন্মক্ষণে, অথবা জন্মের পরে—এই বিভিন্ন স্তর ও সময়েই ব্যাহতাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং প্রথম থেকেই শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা, বুদ্ধির ক্ষমতা এবং সামগ্রিক বিকাশ ধারাটি প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজন মত ঠিক সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া দরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোন একটি ওষুধে একদিনেই স্বাভাবিকতা আনতে পারে, এমন ওষুধ আজও সৃষ্টি হয়নি; কিম্বা অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মলাভ করে যে শিশু, তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করবার সামর্থ্যও আমাদের এখন পর্যন্ত হয়নি। তেমনি অপারেশনও ভেল্কিবাজির মত ফলপ্রদ নয়।

ব্যাধি নির্ণয়ের উপায় (Diagnosis)

শিশুর বাধাগ্রস্ততার প্রকৃতি এবং গভীরতাটি প্রথমেই নির্ণয় করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে শৈশব থেকে অন্তত: ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করা দরকার। ব্যাহতাবস্থার ক্রমিক প্রকাশ ঘটে দৈহিক আকারে, ক্রমবৃদ্ধির (Maturation) খর্বতায়, ভাষার জড়তায়, শিক্ষার অক্ষমতায়,

সামাজিক সামঞ্জস্য সৃষ্টির অক্ষমতায়। এইসব চিহ্নগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পর সংশ্লিষ্ট। তবে বিভিন্ন লক্ষণ বিভিন্ন সময়ে, তীব্রতায় এবং বিভিন্ন-ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। সুতরাং নিরীক্ষকের পক্ষে স্থিতিশীল চেতনা রাখা চলেনা।

শৈশবকাল থেকেই কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন, মায়ের স্তন চুষবার অক্ষমতা কিম্বা খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটাতে অসম্ভব দেরি, ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্বলতা, বুদ্ধির হ্রস্বতা, সাধারণভাবে কথা বুঝবার অথবা নির্দেশমত কাজ করবার অক্ষমতা, সাধারণ বিচার শক্তির অভাব প্রভৃতি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ত্রুটিগুলি ক্রমেই বেশী বেশী ধরা পড়ে। তাছাড়া ব্যাহতদের চরিত্রেও দৃঢ়তা থাকে না, আবেগ জীবনে থাকে অস্থিরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে আবেগের প্রকৃতি হয় বিচিত্র এবং একদিক থেকে আর একদিকে অস্থির দোলায়মানতা থাকে বেশী। এজন্যই সামাজিক আচরণে সামঞ্জস্য স্থাপন করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়।

শারীর জীবনের সঙ্গে মানসিক জীবন ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। তাই মানসিক বাধাগ্রস্ততা নানা ধরণের বিকলাঙ্গতায়ও ধরা পরে। (ক) এদের মাথার গড়ন এবং আকার হয় অস্বাভাবিক। (খ) মুখের গড়নেও অস্বাভাবিকতা এসে যায়। (গ) ঘাড় এবং চোয়াল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব উঁচু হয়। (ঘ) দাঁতগুলি হয় এলোমেলো এবং অনেক ক্ষেত্রেই উঁচু। (ঙ) জিহ্বাটি হয় প্রায়শই বড় এবং মোটা (তাই কথায় থাকে আড়ষ্টতা)। (চ) কানের লতিটি প্রায় থাকেনা। (ছ) খর্বিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রায়শই থাকে। (জ) গায়ের চামড়া হয় অতি রুক্ষ এবং (ঝ) চলাফেরায় থাকে অসংলগ্নতা।

শৈশব কাল থেকে ১৫।১৬ বছর বয়স পর্যন্ত এইসব লক্ষণ ক্রমাগত প্রকাশ পেতে থাকে, গভীরতর হয় এবং স্বাভাবিক শিশুর থেকে পার্থক্য বেড়ে যেতে থাকে। তাই প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধির অভীক্ষাও প্রয়োগ করা দরকার। পরিসংখ্যানতত্ব অনুযায়ী বলা চলে যে বিশেষ বয়সে বুদ্ধির গড় ক্ষমতা থেকে যাদের ক্ষমতা এক Standard Deviation নীচে, তাদেরকেই স্বল্পবুদ্ধি (feebleminded) বলা চলে। এই স্বল্পবুদ্ধির ক্ষেত্রেও আবার বিভিন্ন স্তর আছে, একথা আমরা

আগেই বলেছি। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির অভীক্ষা, বিশেষতঃ Performance Test, Motor Test, Achievement Test, Adjustment Test ইত্যাদি প্রয়োগ করে বুদ্ধির হ্রস্বতা, শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা, সামাজিক অক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করা সম্ভব। এই সমস্ত দিকেই মানসিক ব্যাহতাবস্থার প্রকাশ ঘটে। স্তরভেদ অনুসারে এদেরকে Moron, Imbecile এবং Idiot পর্যায়ে ভাগ করা চলে এবং সেই অনুযায়ী Educable, Trainable, Custodial (uneducable) রূপে চিহ্নিত করা চলে।

মানসিক অবক্ষয়কে প্রতিরোধ (Prevention) করা না গেলে সমাজের পরবর্তী দায়িত্ব হলো প্রতিবিধান (Remedy)। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে ইডিয়টদের কোনভাবেই কর্মক্ষম করা যায় না। সুতরাং এদের জন্য "কেয়ার হোম" প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। ইমবেসাইলদের মানসিক বয়স ৭।৮ পর্যন্ত। সুতরাং লেখা পড়া শিখবার ক্ষমতা খুবই কম। কিন্তু এদের পক্ষে রুটিনমাফিক কাজ করা সম্ভব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মূলতঃ বৃত্তিগত শিক্ষণ (Occupational therapy)। মোরনদের মানসিক বয়স ১২।১৩ বছর পর্যন্ত। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার সমপর্যায়ে লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা এদের পক্ষে দরকার। ঐ সঙ্গে দরকার বৃত্তিশিক্ষণ।

ব্যাহতদের শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম, বিশেষ স্কুল (কিম্বা সাধারণ স্কুলে বিশেষ ক্লাশ), বিশেষ পরিবেশ, স্বাধীনতার আবহাওয়া, স্কুল ও বাড়ীর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং আবাসিক স্কুলের ব্যবস্থা হলে নিয়মিত বাড়ীতে যাওয়া আসার ব্যবস্থা দরকার।

প্রতিবিধান ব্যবস্থা (Remedial Treatment)

প্রতিবিধান এবং শিক্ষণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে যুগপৎ প্রচেষ্টা দরকার, যেমন—(ক) চিকিৎসা (Medical Therapy); (খ) দলগত জীবন যাপনের শিক্ষণ (Milieutherapy); (গ) ব্যক্তিগত মনস্তাত্বিক নির্দেশনা (Individual Psycho-Therapy); (ঘ) লেখাপড়ার বিশেষাত্মক প্রচেষ্টা (Specialised academic education); (ঙ) আত্মনির্ভরতা, কথোপকথন, সামাজিকতা এবং কর্মসম্পাদনের শিক্ষণ; (চ) বৃত্তিগত শিক্ষণ (Occupational Therapy); (ছ) আমোদ প্রমোদের শিক্ষা (Recreational Therapy); (জ) পুনর্বাসন (Rehabilitation)।

শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক জিনিস মনে রাখা দরকার। ব্যাহত শিশুরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের মোট শিশু-সংখ্যার ২।৩ শতাংশ। সুতরাং এদের শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অংশরূপে দেখা দরকার। তাই সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—অর্থাৎ "জীবন সামঞ্জস্য এবং জীবিকার ক্ষমতা" থেকে বিচ্যুতির প্রয়োজন নেই। এদের শিক্ষায়ও উদ্দেশ্য থাকবে চারটি—(ক) ব্যক্তিগত সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার, (খ) উৎপাদনের দক্ষতা, (গ) জীবিকার্জনের ক্ষমতা (ঘ) পরিবার ও সমাজের অংশরূপে চলবার দক্ষতা। এই উদ্দেশ্যকেই বলা চলে—আত্ম-পরিপূর্ণতা, সামাজিক দক্ষতা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, নাগরিক দক্ষতা।

সাধারণ বিদ্যালয়ে এদের শিক্ষার প্রশ্নটি জটিলতায় পূর্ণ, কারণ এদের পক্ষে বিশেষ দরকার হলো সামাজিক স্বীকৃতি ও সাফল্যের অনুভূতি। কিন্তু স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা হলে এই ক্ষেত্রেই আসতে পারে মৌলিক বিপর্যয়। নিজেদের তুলনামূলক অক্ষমতা, অপরের করুণা এবং সামাজিক সামঞ্জস্যের অভাবে আবেগের রাজ্যে চরম বিপর্যয় আসতে পারে। (অবশ্য এইসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের সাথে এক সঙ্গে থাকলে সবদিক থেকেই ভাল)।

তা ছাড়া ব্যাহতদের ক্ষেত্রে লেখাপড়ার সঙ্গে অনেক বেশী পরিমানে থাকবে হাতের কাজ। ইমবেসাইলদের বলা হয় Trainable. এরা আবেগ জীবনে খুবই ভারসাম্যহীন। এদের বাকশক্তি জড়তাপূর্ণ এবং লেখাপড়া শিখবার ক্ষমতা খুবই সীমিত। একবছরের শিক্ষনীয় জিনিস এরা আয়ত্ত করতে পারে ৩।৪ বছরে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষায় থাকবে বেশী গুরুত্ব। সংরক্ষিত কর্মশালায়" (Sheltered workshop) এদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

মোরনদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে সাধারণ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ নির্দেশনায় স্বনির্ভর জীবন ও জীবিকার শিক্ষণ। উচ্চশিক্ষার জন্য অবশ্যই এদের প্রস্তুত করা হবে না। সুতরাং পাঠ্যক্রমে থাকবে ব্যবহারিক ঝোঁক। গুরুত্ব দিতে হবে সামাজিক সামঞ্জস্যের প্রশ্নকে, কারণ চাকুরি পেয়েও চাকুরি রক্ষা করা এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং সু-অভ্যাস, ভদ্র আচরণ ও কথাবার্তা,

পোশাক পরিচ্ছদ ও হাঁটাচলার পারিপাট্য এবং আকর্ষনীয় চরিত্র সৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

পাঠ্যক্রমের প্রশ্ন

পাঠ্যক্রমে ভাষা, অঙ্ক, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও গৃহবিজ্ঞান, চারুকলা ও হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষা, সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি সবই থাকবে। কিন্তু **বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং বিদ্যালয়ের স্তরবিন্যাস থাকবে ভিন্ন প্রকৃতির। ঐ সঙ্গে ব্যক্তিগত শিক্ষণ থাকবে ব্যাপকভাবে** (অবশ্য এদের ক্ষমতার মধ্যে) নিম্নানুরূপ ভাবে বিদ্যালয়ের স্তরবিন্যাস এবং পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা চলে।—

(ক) **নার্সারি স্তর।** ছয় থেকে আট বছর পর্যন্ত, এবং মানসিক বয়স পাঁচ বছর পর্যন্ত। ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনুশীলন, দৈহিক সামঞ্জস্য, খেলাধূলো, ব্লক বিল্ডিং, পেইন্টিং, সংখ্যা গণনা, মাটির কাজ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং পরিচিত বস্তুর নাম শেখা, পরিচ্ছন্নতা, দৈনিক জীবন যাপনের শিক্ষা, নার্সারি ছড়া, কথা বলা, নির্দেশমত কাজ করার শিক্ষা এবং অক্ষর পরিচয়ই এই স্তরের পাঠ্যক্রমে যথেষ্ট।

(খ) **প্রথম শ্রেণী**—৭।১০ বছর বয়স। ভাষার শিক্ষা, বিশেষতঃ মৌখিক পাঠ, বই পড়ার সূচনা, ছবি, পশুপাখী প্রভৃতির উপর গল্পশোনা এবং বলা, আবৃত্তি, লেখার শিক্ষা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দক্ষতা, শারীর শিক্ষা, হাতের কাজ, এক থেকে একশ' পর্যন্ত গণনা এবং ৫০ পর্যন্ত লেখা, বিদ্যালয় ও বাড়ীর জীবন সম্বন্ধে সমাজ-পাঠই এই শ্রেণীর পক্ষে যথেষ্ট।

(গ) **প্রথম শ্রেণী 'খ' বিভাগ**, বয়স ১০—১২ বছর। নিজের চেষ্টায় বই পড়া, লেখবার শিক্ষা, ছোট ছোট যোগ বিয়োগ, বাগানের কাজ, প্রাথমিক সূচিশিল্প, শারীর শিক্ষা, নাচ গান, বাড়ীর দৈনিক কাজ সম্পাদন, স্কুলের অনুষ্ঠান, চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের কার্যক্রম নিয়ে হবে এই স্তরের পাঠ্য।

(ঘ) **দ্বিতীয় শ্রেণী**, বয়স ১০—১৪; মানসিক বয়স ৭ বছর। ভাষা শিক্ষায় আসবে আর একটু গভীরতা, গণিতের ক্ষেত্রে সহজ গুণ ও ভাগ, গৃহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খাদ্য ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষা, সেলাই, পেইন্টিং, কাপড় কাচা, শারীর শিক্ষা, নাচগান, কবিতা বলা, গ্রাম ও সহর জীবন এবং সমাজ-বন্ধু সম্বন্ধে পাঠ এবং ভ্রমণ সূচী নিয়ে হবে এই স্তরের পাঠ্য।

(ঙ) তৃতীয় শ্রেণী—বয়স ১২—১৫ বছর। মানসিক বয়স ৮ বছর পর্যন্ত। অর্থ বুঝে বই পড়া, নীরব পাঠ, পরিষ্কার কথোপকথন, পরিষ্কার হাতের লেখা, ভগ্নাংশের অঙ্ক, গৃহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোনার কাজ, পোশাক পরিচ্ছদে পারিপাট্য, বাসন মাজা, বিছানা করা, জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি, এবং সমাজ বিজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ, আমাদের জীবনযাপন ও উপার্জন, উৎপন্ন বস্তু সম্পর্কে তথ্য; এবং শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলো, নাচগান উৎসব, পশুপাখী ও গাছপালা সম্বন্ধে বিজ্ঞান পাঠ প্রভৃতি নিয়ে পাঠ্য তৈরী করা দরকার।

(চ) চতুর্থ শ্রেণীতেও থাকবে ১৫ বছর পর্যন্ত শিশু, কিন্তু বুদ্ধ্যাঙ্ক হবে ৬০ পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে আগেকার বিষয়গুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। তবে ভাষার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞার ক্ষেত্রে 'যোগাযোগ ব্যবস্থার' উপর কিছু শেখানো দরকার।

(ছ) পঞ্চম শ্রেণী—বয়স ১৬ পর্যন্ত, মানসিক বয়স ১০ বছর, বুদ্ধ্যাঙ্ক ৬০-৭৫ পর্যন্ত। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কের ক্ষেত্রে সময় ও দূরত্ব কিম্বা লাভ-ক্ষতির অঙ্ক, সমাজপাঠের ক্ষেত্রে মানুষের বিবর্তন এবং ইতিহাস রূপে মহাপুরুষদের জীবনী; জড় পদার্থ এবং নক্ষত্র মণ্ডলী সম্পর্কে সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ সংযোজন করা চলে। তবে প্রতিটি স্তরেই সামাজিক সামঞ্জস্য শিক্ষার জন্য ভালভাবে কথা বলা, আচরণ করা, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা ও সহযোগিতা করা, অপরকে সাহায্য করা, পোশাক পরিচ্ছদের ভদ্রতা এবং আবেগের অবদমন করবার শিক্ষা থাকবেই। তেমনি কর্মগত শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ জীবনের কাজ, ব্যক্তিগত নৈসর্গিক অভ্যাস, জামা কাপড় পরা, ভালভাবে খাওয়া, হাতের কাজ এবং ক্রমান্বয়ে বৃত্তিদক্ষতা সংযুক্ত থাকবে পাঠ্যক্রমে। শুধু বুদ্ধ্যাঙ্ক হিসেবে স্তরভেদই থাকবে না, প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই থাকবে বিশিষ্টতা।

পাঠপদ্ধতি

ব্যাহত-শিক্ষায় পারদর্শীরা পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নানুরূপ চারটি মূল নীতি প্রস্তাব করেন (অবশ্য এগুলি স্বাভাবিক শিশুদের পাঠপদ্ধতি থেকে ভিন্ন কিছু নয়)। (ক) Gradation, অর্থাৎ জানা থেকে অজানায় যেতে হবে। (খ) Proportion, অর্থাৎ বিষয়বস্তুর প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। (গ) Concentration, অর্থাৎ মূর্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্ত জ্ঞানের

দিকে যেতে হবে। এজন্য প্রতিটি বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ উপস্থিত করতে হবে। (ঘ) Progression, অর্থাৎ সহজ বিষয় থেকে ক্রমশ কঠিন বিষয়ের দিকে এগুতে হবে। সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যে যেহেতু ব্যাহতদের মানসিক ক্ষমতা সীমায়িত, সেইহেতু নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেনের মত 'প্রত্যক্ষ পদ্ধতি' (Direct Method) এবং এই পদ্ধতিও কাজের ভিত্তিতে (activity) প্রয়োগ করা দরকার। সুতরাং এদের শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষোপকরণ প্রয়োজন।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা দরকার।

(ক) মেডিক্যাল থেরাপি—ব্যাহত শিশুদের সাধারণ এবং বিশেষ চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলিকে শিক্ষা প্রয়াসের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ শিক্ষা ও চিকিৎসা হবে সমন্বিত। কিন্তু ওষুধের চেয়েও বেশী দরকার পুষ্টিকর খাদ্য এবং আনন্দময় জীবন। সুতরাং বাড়ীর পরিবেশটি (অথবা স্কুলের) হওয়া চাই স্নেহশিক্ত। সকল ত্রুটি নিয়েই শিশুকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে এবং তার প্রতি আচরণে সর্বদাই থাকবে সামঞ্জস্য। শিশুকে খেলতে দিতে হবে এবং অন্যান্য লোকের সংসর্গেও আসতে দিতে হবে। তার জগৎকে নিষেধের জালে বেঁধে না দিয়ে সে কি চায়, সেটি নিরীক্ষণ করতে হবে। তাকে সুখাদ্য দিতে হবে; ভাল সাজপোশাকে রাখতে হবে, হাঁটাচলার ভাল ভঙ্গি শেখাতে হবে, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিতে অভ্যস্ত করতে হবে। ব্যাহত শিশুকে কথা বলায় উৎসাহিত করে, প্রতিনিয়ত আঁচলে না বেঁধে সাবলম্বী করে তোলা উচিত।

(খ) Psychotherapy—এই সূত্রেই শিশুর প্রক্ষোভ জীবনের কথা বলা দরকার। ব্যাহত বলেই শিশুর মনে নানা জটিলতা আসা স্বাভাবিক। হীনমন্যতাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই স্বাভাবিক শিশু এবং নিজের ভাইবোনের সঙ্গে খুব সহজ আচরণও তার পক্ষে সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া আবেগের ভারসাম্যও এক্ষেত্রে থাকে খুবই কম। সুতরাং বিশেষ যত্ন নিয়ে তার প্রক্ষোভ জীবনকে সাধ্যমত সুগঠিত করা দরকার।

এই সূত্রেই এসে পড়ে **সামাজিকতা শিক্ষার প্রশ্ন**। অন্যান্য শিশুকে সহানুভূতিশীল করিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বাস্তব জীবনযাত্রা এবং অপরের সহৃদয়তার উপর তার নির্ভরশীলতার অভিজ্ঞতা থেকেই সামাজিক বোধ আসতে পারে।

আবেগের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রশ্ন হলো যৌন চেতনার সমস্যা। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যাহত শিশুর মধ্যেও উপযুক্ত বয়সে যৌন চেতনা জাগে। কিন্তু অন্যান্য শিশুর মত তার ন্যায় অন্যায় বোধ, সামাজিক রীতিবোধ থাকে না বলেই তার পক্ষে দৃষ্টিকটু আচরণ করাও সম্ভব। এজন্যই প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়ে, তার মনের গতি গঠনাত্মক ক্ষেত্রে প্রবাহিত করে যৌন চেতনার অবদমন করা দরকার।

(গ) Speech Therapy—অনেক সময়ই ব্যাহত শিশুদের বাকশক্তিও হয় ত্রুটিপূর্ণ। ঠিকভাবে কথা বলতে পারার জন্য প্রয়োজন ভাল শ্রুতি শক্তি, কণ্ঠনালি ও পেশীর কর্মসমন্বয়, স্মৃতি শক্তি, প্রক্ষোভের ভারসাম্য। এগুলি অনেক ব্যাহত শিশুর মধ্যেই থাকে না। তারা কথা বলে দেরিতে, যখন বলে তখনও কথাগুলি থাকে ত্রুটিপূর্ণ এবং একটু বেশী কিছু একসঙ্গে বলতে গেলেই পূর্বাপর সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এজন্যই কথা শেখাবার জন্য বিশেষ প্রয়াস দরকার। পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব অনুভূতি, ইন্দ্রিয়ানুশীলন, ঠোঁট জিহ্বা চোয়ালের সমন্বিত আন্দোলন প্রভৃতির বিশেষ মূল্য আছে। ছবি প্রভৃতি চাক্ষুষ বিষয়বস্তু এবং অনুকরণ শক্তিকে অবলম্বন করে তার বাকশক্তির উন্নতি সম্ভব। এজন্য আনন্দদায়ক পরিবেশ চাই। তা ছাড়া শিশুকে দলের মধ্যে না ফেলে একা একা কথা শেখানো যায় না।

(ঘ) Occupation Therapy—কর্মগত শিক্ষণের সূচনা করতে হবে চারুকলা ও হাতের কাজ, খেলাধূলো এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজকে অবলম্বন করে। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর মনোভাব, আগ্রহ এবং দক্ষতা নিরীক্ষণ করতে হবে। তার দৈহিক, সামাজিক এবং প্রক্ষোভগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করা দরকার। সেই অনুসারে তাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করানো দরকার, ইন্দ্রিয়ানুশীলন দরকার। নানা ধরণের খেলাধূলোর মধ্য দিয়েও শিশুর প্রবণতার হদিস পাওয়া যায়। তাই কাজের ক্ষেত্রে সাফল্যের গর্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। নিতান্তই গৃহস্থালী এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলি অনুশীলন করবার মধ্য দিয়ে occupation therapy সূচনা করা চলে।

নির্দেশনার প্রশ্ন

শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশনার প্রশ্নটি কেবল স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই

খাটেনা, ব্যাহতদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও খুব বেশী খাটে। প্রতিটি ব্যাহত শিশুর মানসিক ও দৈহিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাবনা কার কতটুকু আছে, এই কথা বলবার দায়িত্ব গাইডেন্স্ সংস্থার। প্রতিটি শিশুর বৃত্তিগত সম্ভাবনা কোন ক্ষেত্রে এবং কতটুকু, একথা বলার দায়িত্ব গাইডেন্স কর্তৃপক্ষের। কিন্তু ব্যাহতদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং ব্যবস্থার আর একটি বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে। তা হলো **অভিভাবকদের জন্য কাউন্সেলিং**।

অভিভাবকদের বোঝাতে হবে যে হতাশ না হয়ে নিজের শিশুকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে, ভালবাসা ও আনন্দ দিয়ে শিশুকে সঞ্জীবিত করতে হবে। শিশুকে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করবার দায়িত্ব পিতামাতার। সুতরাং শিশুর অসংলগ্ন আচরণ, দুষ্টুমি কিম্বা অক্ষমতায় ক্রুদ্ধ হওয়া চলবে না। উপযুক্ত খাদ্য, ঘুম, পোশাক শিশুর দরকার। তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের কথা বলা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাতে শিশুকে তুলে দিলেও পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয় না।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া **ব্যাহতদের অধিকাংশ পিতামাতাই স্বাভাবিক মানুষ**। শিশুর সম্পর্কে তাঁরা উদ্বিগ্ন এবং লজ্জিত থাকেন। এই সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব তাঁরা পরিমাপ করতে চান। আর কোন সন্তান তাঁদের হওয়া উচিত কিনা—একথা তাঁরা জানতে চান। অন্যান্য সন্তানদের কাছে ব্যাহত শিশুর কথা কিভাবে কতটুকু বলবেন—একথা তাঁরা জানতে চান। শিশুর নিরাময়ের সম্ভাবনা কতটুকু আছে, একথা তাঁরা শিক্ষকদের কাছে অনবরত জানতে চান।

এইসব প্রশ্নের কোন ছকবাঁধা উত্তর নেই। প্রতিটি পিতামাতার বিশেষ সমস্যা অনুসন্ধান করে তাঁদেরকে পরামর্শ দেওয়া এবং মনের দিক থেকে সঞ্জীবিত রাখাও কাউন্সেলিং ব্যবস্থার দায়িত্ব।

ব্যাহতদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (১) ব্যাহত শিশুকে বাড়ীতে রাখা ভাল কিম্বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ভাল! এই প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান নেই। বাধাগ্রস্ততার গভীরতা, বাড়ীর পরিবেশ, বাড়ীতে শিশুর শিক্ষা, কাজ এবং চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এই প্রশ্নের সমাধান নির্ভরশীল। গৃহ পরিবেশ যথেষ্ট ভাল না হলে প্রতিষ্ঠানের

সাহায্য নেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু শিশুকে প্রতিষ্ঠানের হাতে দিলেও বাড়ীর সঙ্গে স্কুলের খুবই ঘনিষ্ঠ সংযোগ দরকার, এবং শিশুকে মাঝে মাঝেই বাড়ীতে নিয়ে আসা দরকার।

(২) ব্যাহত শিশুর জন্য বিশেষ স্কুল থাকবে কিম্বা সাধারণ স্কুলেই তাকে ভর্তি করা হবে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই, কারণ শিশুর সমস্যার গভীরতা এবং সাধারণ স্কুলে তার বিশেষ প্রয়োজন কতটুকু মিটবে, সে কথা বিচারের উপরই স্কুল নির্বাচন নির্ভরশীল। সাধারণ স্কুলে বিশেষ ক্লাশ এবং সরঞ্জাম ও শিক্ষক রাখা চলে। আবার বাধাগ্রস্ততার গভীরতা বেশী হলে বিশেষ স্কুলে দেওয়াই ভাল।

(৩) স্কুলে দেওয়া হলে স্কুলটি কি হবে লেখাপড়ার স্কুল কিম্বা শিল্পশিক্ষার স্কুল? ব্যাহত শিশুদের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলেই তাদের ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের সীমা আছে। আবার অন্যদিকে যতটুকু সম্ভাবনা তার আছে, তারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। সর্বোপরি জীবিকার জন্য তাকে প্রস্তুত করতেই হবে। বস্তুতঃ বৃত্তিশিক্ষা হলো ব্যাহত শিশুর শিক্ষা প্রয়াসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। **তাই শুধু লেখাপড়া কিম্বা শুধু বৃত্তি শিক্ষার বদলে উভয়ের ব্যবস্থাই ব্যাহতদের স্কুলে থাকা দরকার।**

তাই দেখা যায় আজকাল **ব্যাহতদের স্কুলে চার ধরণের কাজ** করা হয়—শিক্ষা, বৃত্তি, চিকিৎসা ও গবেষণা। তা ছাড়া আলাদা ভাবে Diagnostic Centre, Vocational Centre, After care Home, Rehabilitation Centre প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

(৪) এই ক্ষেত্রে চতুর্থ প্রশ্ন হলো স্কুলটি হবে দিবা-প্রতিষ্ঠান (Day School) কিম্বা আবাসিক প্রতিষ্ঠান (Residential School)? এ ক্ষেত্রেও ব্যাহত শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিচার করতে হবে। বাধাগ্রস্ততার স্তরের উপরই বিদ্যালয়ের প্রকৃতি নির্ভর করবে। যে শিশুর বাধাগ্রস্ততা খুব গভীর, তার পক্ষে আবাসিক স্কুলই ভাল। তা ছাড়া স্বল্প ব্যাহতদেরও আবাসিক স্কুল দরকার হতে পারে যখন তাদের বিশেষ শিক্ষণের দরকার হয়। দরিদ্র এবং অনাথ শিশু কিম্বা অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ই প্রয়োজন।

আবাসিক বিদ্যালয়ের সুবিধা এবং অসুবিধা—দুইই আছে। সুবিধের মধ্যে বলা যায়—(ক) শিক্ষার পক্ষে সহায়ক পরিবেশ, (খ) দলগত

জীবন ও সহযোগিতা, (গ) অতি লালনের বদলে আত্মনির্ভরতা শিক্ষার সুযোগ এবং (ঘ) শিশুর গৃহে শান্তি। অসুবিধের মধ্যে বলা যায় যে (ক) বাড়ীর তুলনায় এখানে ব্যক্তিগত নজর এবং ভালবাসা কম হতে পারে, (খ) সংখ্যাধিক্যের ফলে সুযোগ সুবিধার স্বল্পতা ঘটতে পারে, (গ) বাড়ী এবং সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, (ঘ) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও বাবা মা'র স্থান আংশিকভাবে মাত্র পূরণ করতে পারেন।

আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকবে—(ক) শিশুকে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দেওয়া, (খ) তাকে সামাজিক, মানসিক এবং আবেগ জীবনে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা, (গ) তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, (ঘ) সম্ভাবনা অনুসারে তাকে শিক্ষা ও দক্ষতা দেওয়া, (ঙ) প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুখ, সম্ভ্রম এবং উপযোগিতা-পূর্ণ জীবন যাপনে সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেলে **প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ ধরণের কর্মসূচী (Services) থাকা প্রয়োজন**, যেমন—(১) শিক্ষা ও শিক্ষণের ব্যবস্থা, (২) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রতি শিশুর বিশেষ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে সৃজনশীল এবং উপযোগী কাজ শিক্ষা দেওয়া দরকার। মেয়েদের ক্ষেত্রে রান্না, ধোলাই, দর্জির কাজ, বোনা এবং এম্ব্রয়ডারির কাজ বাছাই করা চলে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বেতের কাজ, বই বাঁধাই, ছাপাখানার কাজ, বয়ন কিম্বা মিস্ত্রীর কাজ, মাদুর কিম্বা বাস্কেট কিম্বা কুশন তৈরী, পোলট্রি কিম্বা পশু-পালনের কাজ, বাগানের কাজ, হোটেলের কাজ প্রভৃতি নির্বাচন করা চলে। (৩) চিকিৎসা ও নার্সিং সার্ভিস। এজন্য মনোসমীক্ষক, শিশু চিকিৎসক, চক্ষু ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সংযুক্ত থাকা দরকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে। (৪) সহপাঠ্যক্রমিক কাজ। অভিনয়, সঙ্গীত, ভ্রমণ, যাদুঘর চিড়িয়াখানা, এ্যাকোয়ারিয়াম দর্শন, সাপ্তাহিক সিনেমা প্রদর্শনী, মাসিক বিচিত্রানুষ্ঠান, স্কাউটিং, ক্যাম্পিং প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা চলে। (৫) সামাজিক কর্মসূচী। স্কুল, বাড়ী ও সমাজের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা, পিতামাতার কাউন্সেলিং, শিক্ষান্তে যারা কর্মজীবনে ঢুকেছে তাদের জন্য পরামর্শ দেওয়াই হবে এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। (৬) স্বেচ্ছাসেবা সূচী। ব্যাহত শিশুদের সাহায্য করবার জন্য স্কাউট, গাইড, Y.M.C.A.,

রোটারী ক্লাব প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করাই হবে এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। (৭) গবেষণা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

আবাসিক বিদ্যালয়ের ক্লাশগুলি হওয়া উচিত ৫ থেকে ১০ জন শিশু নিয়ে। মনোবৈজ্ঞানিক নীতিতে ক্লাশগুলি গঠন করা দরকার। কোন স্কুলেই ১০০ থেকে ১৫০-এর বেশী ছাত্রছাত্রী থাকা উচিত নয়। ৫।৬টি করে শিশুকে একটি ঘরে রাখা উচিত। বিদ্যালয়ে থাকা দরকার যথেষ্ট খেলাধূলো এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। এইসব স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যাও হওয়া উচিত বেশী। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদেরকেই অন্যান্য কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা ভাল, কারণ তারা কাজ করবে অনেক দরদ দিয়ে। শিক্ষকদের যৌথ দায়িত্ব ছাড়া সাফল্য অসম্ভব। সর্বোপরি অসন্তুষ্ট শিক্ষক দিয়েও ব্যাহতদের সার্থক শিক্ষা চলে না।

ব্যাহতদের পুনর্বাসন

বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষা এবং শিক্ষণই ব্যাহতদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সামাজিক এবং আর্থিক জীবনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এই সূত্রেই আসে পুনর্বাসনের প্রশ্ন। পুনর্বাসনের সংজ্ঞা হলো—ব্যাহত শিশুর সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার মধ্যেও তার দৈহিক, মানসিক, বৃত্তিগত এবং আর্থিক যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ। ("Restoration of the handicapped to the fullest physical, mental, social, vocational and economic usefulness of which they are capable.") এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রয়োজন। **নিজের কাছে উপযোগী জীবন যাপন করতে ব্যাহত শিশুকে সাহায্য করা যায়—এই বিশ্বাসই হবে পুনর্বাসন ক্রিয়ার সূচনা।**

পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন বলতে বোঝায় ব্যাধি নির্ণয়, চিকিৎসা, শারীর শিক্ষা, লেখাপড়া, বৃত্তি শিক্ষা, নির্দেশনা, পিতামাতার শিক্ষা ও কাউন্সেলিং, জীবিকার্জনের ব্যবস্থা, কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত সহায়তা (follow up on the job), সামাজিক জীবনে follow up, এবং ব্যক্তিগত জীবন সমঞ্জস্যের জন্য সাহায্য। এগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আলোচনা করবো বৃত্তিগত ও সমাজগত পুনর্বাসনের কথা।

বৃত্তিগত পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা হতে পারে। (ক) বাড়ীতে বসে অর্থোপার্জন, (খ) সংরক্ষিত কর্মশালায় (Sheltered

workshop) নিয়োগ, (গ) অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অদক্ষ অথবা অর্ধদক্ষ কাজে নিয়োগ। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে কোন ব্যাহত ব্যক্তিরই পুরোপুরি স্বনির্ভর হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাদেরকে বিশেষ দক্ষতার কিম্বা জটিলতার কাজ দেওয়াও চলে না। কিন্তু job analysis করে দেখা গেছে যে প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রেই অন্ততঃ ১০ ভাগ কাজে কোন বিশেষ দক্ষতা লাগে না, কিম্বা সামান্যমাত্র ট্রেনিং লাগে। এগুলিই ব্যাহতদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমস্যার অভাব নেই। ব্যাহত ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তাই অন্যান্য সুস্থ কর্মীদের মধ্যে তারা নিজেদের বেমানান মনে করে হতাশ হতে পারে। উপরওয়ালার মনোভাবও সর্বদা সহানুভূতিশীল না হতে পারে। ব্যাহতরা অনেক ক্ষেত্রেই একটু একগুঁয়ে হয়। তাদের এই ত্রুটিকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখতে নাও পারে। তদুপরি এদের অসুখ বিসুখও একটু বেশী। সর্বোপরি অন্যায় শোষণ থেকেও এদের বাঁচানো দরকার। তাই Custodial'দের জন্য Care Home, Trainable এবং Educable দের জন্য সংরক্ষিত কর্মশালা কিম্বা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। গ্রামাঞ্চলেও উপনিবেশ গড়া চলতে পারে, এবং সে ক্ষেত্রে কৃষি, দুগ্ধ প্রকল্প, পোলট্রি, ধোলাইখানা প্রভৃতির কাজে এদের নিয়োগ করা সম্ভব। এইসব প্রতিষ্ঠান গড়বার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্রের অগ্রগামী ভূমিকা না থাকলে দাতব্য প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্যোগেও কারখানা ও কলোনী গড়া সম্ভব। এইসব প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন জিনিস সরকারী সহায়তায় বিক্রীর ব্যবস্থা হলে আর্থিক দিক থেকেও প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনির্ভর হতে পারে, এবং ব্যাহতরা পরগাছা জীবন যাপন না করে নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে। সুতরাং বৃত্তিগত পুনর্বাসনের মূলকথা হলো, "A work oriented rehabilitation facility with controlled working environment and individualised vocational goal which utilises the working experiences and related services for assisting the handicapped person to progress towards normal living and a productive vocational status."

বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হলো সামাজিক পুনর্বাসনের প্রশ্নটি। বস্তুতঃ ব্যাহতদের সমস্যা কেবল ডাক্তারি কিম্বা

মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা নয়, বরং একটি সার্বিক সামাজিক সমস্যা, কারণ ব্যাহত শিশুরা স্বাধীনভাবে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে অক্ষম। সামাজিক অবজ্ঞা তাদের অহরহ সহ্য করতে হয়। সুতরাং সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে তৈরী করা যেন ব্যাহতরাও সমাজের মূল্যবান অংশরূপে নিজেদের মনে করতে পারে এবং সামাজিক জীবনে একাত্মতা বোধ করতে পারে।

ব্যাহতদের শিক্ষা প্রচেষ্টা—বিদেশে

পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে ব্যাহতদের শিক্ষা প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। বিদেশে এই সম্বন্ধে সচেতনতা আসতে থাকে গত শতাব্দীর মধ্য ভাগেই। কিন্তু তখন সব দেশেই ছিল বেসরকারী উদ্যমের প্রাধান্য। তবুও ১৮৯৯ সনেই ইংলণ্ডে ব্যাহত ও মৃগী রোগাক্রান্ত শিশুদের সম্বন্ধে আইন পাশ হয়। জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ হিসেবে আন্দাজ করা হয় যে আমেরিকায় ব্যাহতদের সংখ্যা ৫৪ লক্ষ। এদের জন্য আমেরিকায় বহু স্কুল গড়া হয়েছে। কিন্তু এইসব স্কুলকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এখনও যথোপযুক্ত স্থান করে দেওয়া হয়নি। এবিষয়ে চেষ্টা চলছে। ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দিতে। অন্যান্য দেশেও এই শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলিও cottage প্রস্তাব নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। রাশিয়াতে ব্যাহত স্কুলের শিক্ষকরা শতকরা ২৫ ভাগ মাইনে বেশী পেয়ে থাকেন। সেখানে শিক্ষক-ছাত্রের হার ১ : ২। মোটকথা অন্যান্য দেশে ব্যাহতদের শিক্ষাও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এবং পুনর্বাসন প্রচেষ্টা খুবই সংগঠিত।

ব্যাহতদের শিক্ষা প্রচেষ্টা—ভারতে

আমাদের দেশে এই শিক্ষা প্রচেষ্টার ইতিহাস মাত্র ৩০ বছরের। ১৯৩৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় রাঁচির Central Nursing Home. বম্বের Children's Aid Society রাঁচিতেই পূর্ণাঙ্গ স্কুল স্থাপন করেন ছয়টি শিশুকে নিয়ে ১৯৪১ সনে। এটিই বর্তমানে Home for Mentally Deficient Children. তারপরে ১৯৪৪ সনে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় School for Children in need of Special

Care. এটিই বর্তমানে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত স্কুল ছিল মাত্র তিনটি। স্বাধীনতার পরে ১৯৫১ সনে সৃষ্টি হয় কলকাতার বোধিপীঠ, ১৯৫৩ সনে নয়াদিল্লীর Child Guidance School. ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সনের মধ্যে জন্ম নেয় আরও ১৭টি প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১—১৯৬৬ সনের মধ্যে আরও ২৩টি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমান ভারতে মানসিক ব্যাহতদের জন্য দিবা ও আবাসিক বিদ্যালয় আছে মোট ৫১টি। ছাত্রছাত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা আছে মাত্র ১৮৬০ জন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশী। মহারাষ্ট্রেই স্কুলের সংখ্যা সর্বাধিক (১৮টি), দিল্লীতে ৭টি, পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, উত্তর প্রদেশে ৫টি। অবশিষ্ট রাজ্যগুলিতে ২।১টি করে। আসাম এবং ওড়িষ্যার মত কোন কোন রাজ্যে আদৌ স্কুল নেই। সারা ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে মাত্র ২টি।

ব্যাহতদের প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ধরণের। দশটি আছে Home, দুটি হসপিট্যাল, আর বাকিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষণ দেওয়া হয়। বহুমুখী প্রোগ্রাম আছে খুব কম স্কুলেই। ক্লিনিকাল ব্যবস্থা রয়েছে ১০টিতে, মেডিক্যাল ৫টিতে, শুধু বৃত্তিশিক্ষা ১টি, আর বাকিগুলিতে শিক্ষা, চিকিৎসা, বৃত্তি ও গবেষণা প্রোগ্রামের সমন্বয় করেছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর বয়স ৬ থেকে ১৬ বছর। আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজীর প্রচলন আছে। স্কুলগুলিতে ভর্তির নিয়ম অত্যন্ত অযৌক্তিক। অনেক রাজ্যেই কোর্টের আদেশ নিয়ে কিম্বা শিশু কল্যাণ পর্ষদের অনুমতিপত্র নিয়ে ভর্তি করতে হয়। তাছাড়া কতগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বেতনও বেশী। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতন ধার্য নেই। কিন্তু কতগুলি প্রতিষ্ঠানে বেতন হলো মাসিক ১৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা। সহজেই বোঝা যায় যে এগুলি ধনীপুত্রদের জন্য।

এইসব প্রতিষ্ঠানের সমস্যা রয়েছে অসংখ্য। সর্বপ্রথম সমস্যাই হলো অর্থসমস্যা। এখনও স্কুলগুলি দানের উপর নির্ভরশীল। ব্যাপক সামাজিক সমর্থন এখনও নেই। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অল্প। তাছাড়া ব্যাহতদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আইনেরও আছে প্রচুর গলদ।

পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলি গড়ে উঠেছে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ সনের মধ্যে। ছাত্রছাত্রীর বয়ঃসীমা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৩ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত। বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যেও আছে বিভিন্নতা। একটি প্রতিষ্ঠানে আছে Educational, Vocational, Clinical, Research programme, ১টিতে উপরোক্ত চার ধরণের কর্মধারার মধ্যে বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থাটি বাদ পড়েছে, দুটিতে আছে শিক্ষা ও বৃত্তি প্রোগ্রাম, :টিতে রয়েছে শুধুই শিক্ষা প্রোগ্রাম। স্কুলগুলির মধ্যে তিনটিই আবাসিক নয়, একটি শুধুই আবাসিক, আর একটিতে আবাসিক এবং দিবা ছাত্রও আছে। ছাত্রদের বেতন ১০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। দুটি প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, বাকিগুলি সম্পূর্ণই প্রাইভেট। সহজেই মন্তব্য করা চলে যে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাহতদের শিক্ষাপ্রয়াস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ব্যাহতদের শিক্ষা সমস্যা ও সমাধান

সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার যে ভারতে মানসিক ব্যাহত কতজন আছেন, তার কোন হিসেব নেই। যতটুকু হিসেব আছে, সেই তুলনায়ও স্কুলের সংখ্যা অতিশয় নগন্য। নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অসংগঠিত। সহপাঠ্য-ক্রমিক কাজও অপ্রতুল। গবেষণার সুযোগ সীমাবদ্ধ। শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা নামে মাত্র। সরকারী দায়িত্ব এবং অর্থ সাহায্য অতি নগন্য। সুতরাং বিদ্যালয়ের অর্থ ও প্রশাসন ব্যবস্থা অতি দীন।

এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে তথ্য বণ্টন, এবং জনমত গঠন করা ; ব্যাধি নির্ণয়ের ব্যবস্থা উন্নত করা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা ; মানসিক ব্যাহতাবস্থার উপযুক্ত সংজ্ঞা এবং মানবতাপূর্ণ আইন প্রণয়ন দরকার ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রী এবং গুণগত মান সম্পর্কে নির্দেশ প্রয়োজন ; আরও বহুসংখ্যক বিদ্যালয় দরকার ; গবেষণা এবং শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার বহুল প্রসার প্রয়োজন ; শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাহতদের জন্য আরও কর্মসংস্থান দরকার ; সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন ; আরও প্রচুর অর্থসংস্থান চাই ; নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট সংযোগ প্রয়োজন ; মেয়েদের জন্য আরও স্কুল দরকার ; বিশেষজ্ঞের যোগান চাই। পুনর্বাসন প্রোগ্রাম, সংরক্ষিত কর্মশালা এবং অন্যান্য ভাবে চাকুরির সুযোগ বাড়ানো দরকার ; মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র ভাষা এবং মাধ্যম করা উচিত ; প্রতিটি রাজ্যেই এই কার্যক্রম প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ শিক্ষা ও পুনর্বাসনে ব্যাহতদের অধিকার আছে, এই

কথাটিই স্বীকার করে নিতে হবে। তা ছাড়া শিশু স্বাস্থ্য প্রোগ্রামের ব্যাপক প্রসার দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা হলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া সম্ভব। সুতরাং diagnosis programme, এবং শিশু ক্লিনিকের প্রসার করা দরকার; হাসপাতালের বহির্বিভাগেও চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরণের ব্যাহতদের মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নয়। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিকলাঙ্গদের জন্য ভ্রমণ সাহায্য এবং বিশেষ কর্মসংস্থান সংগঠন আছে। এই ব্যবস্থা দুটি মানসিক ব্যাহতদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হওয়া উচিত)। বিভিন্ন স্তরের ব্যাহতদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়া ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের সমাজকর্মী শিক্ষণ প্রকল্পে ব্যাহতদের জন্য সেবামূলক কাজের যোগ্য শিক্ষণের ব্যবস্থা দরকার। সমস্যার বিরাটত্ব এবং সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতার জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না নয়, তবে অন্ততঃ সাধারণ স্কুলে বহু সংখ্যক বিশেষ ক্লাশ খুলবার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে দরকার। বর্তমানের স্কুলগুলি প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষার সুযোগ ছড়ানো প্রয়োজন। সর্বোপরি বলা দরকার যে ব্যাহতদের শিক্ষার ৯০ ভাগ ব্যয়ই সরকারের বহন করা উচিত। এই শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে বহু কর্তৃত্বের অবসান করে শুধু শিক্ষা বিভাগ কিম্বা শুধু স্বাস্থ্যবিভাগের উপর দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

দৈহিক ব্যাহতদের শিক্ষা

(ক) বিকলাঙ্গ শিশু

এতক্ষণ আমরা মনের দিক থেকে ব্যাহতদের কথা আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করবো দেহের দিক থেকে বিকলাঙ্গদের শিক্ষার কথা। এবার আমাদের আলোচনা হবে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, কারণ আগেকার আলোচনার প্রথমাংশ এবং শেষাংশ মূলতঃ বর্তমান আলোচনায়ও প্রযোজ্য।

দৈহিক বিকলাঙ্গতার প্রকারভেদ ও কারণ

আমাদের প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে এমন অনেক শিশু (১) যার উপরের ঠোঁটটি কাটা। Hare lip হওয়ার ফলে এদের কথায় থাকে অপরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে এদের পক্ষে হয় অসুবিধা। (২) অনেক

শিশুর হাতের কিম্বা পায়ের আঙুলগুলি থাকে জোড়া লাগানো, কিম্বা আঙুলের থাকে সংখ্যাধিক্য অথবা সংখ্যাল্পতা। অনেক সময় হাতের কিম্বা পায়ের পাতা আদৌ গঠিতই হয় না। (৩) অনেক সময় বাঁকা পা কিম্বা বাঁকা হাত নিয়ে শিশু জন্মলাভ করে, অথবা একটি হাত অথবা পায়ের তুলনায় অপরটি হয় ছোট। এর ফলে শিশুটি খুঁড়িয়ে চলে। (৪) অনেক সময় শৈশবে রিকেটের ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কখনো স্নায়বিক ব্যাধির ফলে বিশেষ কোন অঙ্গের কর্মক্ষমতা হারিয়ে যায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গের ক্রমবৃদ্ধি হয় না। (৫) পলিও রোগাক্রান্ত হয়ে কত শিশুর যে হাত পা কিম্বা নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। সর্বোপরি আধুনিক শিল্পজীবনে দুর্ঘটনার অভিশাপ আছে প্রতিনিয়ত। দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি ঘটেছে, এমন শিশুও অসংখ্য।

প্রতিষেধক ও প্রতিবিধান ব্যবস্থা

এইসব ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য ভগবানকে দায়ি করা এবং ভগবানের দয়ার দিকে তাকিয়ে থাকবার দিন ফুরিয়েছে। বিজ্ঞান আজ মানুষকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। প্রকৃতির দেওয়া খর্বতাকে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে জয় করতে সে বদ্ধপরিকর।

সন্তান ধারণের সময় মায়েরা যদি বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি পালন করেন, নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা করান, জরায়ুতে ভ্রূণের সুস্থ অবস্থান নিশ্চিত করেন এবং উপযুক্ত যত্নের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ করে, তবে হয়তো অনেক ধরণের বিকলাঙ্গতা থেকে শিশুরা উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু বাবা মায়ের প্রত্যক্ষ ত্রুটি ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বিকলাঙ্গতা সম্ভব। দেহগঠনের উপাদানে ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে, metabolism-এর ত্রুটি হলে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঠিকমত রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত হলে, কিম্বা বিশেষ কোন স্নায়বিক জটিলতা থেকেও সম্পূর্ণ সুস্থ পিতামাতার বিকলাঙ্গ শিশু হতে পারে।

তবুও মাতৃগর্ভে থাকবার সময় মা ও শিশুর যত্ন, অতি উত্তেজক ওষুধ খাওয়া থেকে মায়ের বিরতি, কোন কোন ধরণের পরিশ্রম কিম্বা অঙ্গ সঞ্চালন থেকে মায়ের নিবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে শিশুর বিকলাঙ্গতা প্রতিরোধ করতে পারে।

জন্মের পরে হাম, বসন্ত মেনিনজাইটিস্ প্রভৃতি অসুখেও অনেক সময় অঙ্গহানি ঘটে। আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ অন্ততঃ এটুকু উন্নত

হয়েছে যে এসব ক্ষেত্রেও প্রতিষেধক গ্রহণ করা সম্ভব। আর অসুখ হলে উপযুক্ত চিকিৎসায়ও অনেক বিপদ এড়ানো যায়। সর্বোপরি পলিও প্রতিষেধকও এখন মানুষের হাতে এসেছে। প্রতিটি শিশুর জন্মের পরেই এইসব প্রতিষেধক গ্রহণ করা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো প্রতিবিধান। বিকলাঙ্গতা যদি প্রতিরোধ করা নাও যায়, তবে জন্মসূত্রের অনেক বিকলাঙ্গতা নিরসন করার ব্যবস্থাও আজ মানুষের হাতে এসেছে। প্ল্যাস্টিক সার্জারির কল্যাণে কাটা ঠোঁট জোড়া লাগানো, জোড়া আঙুল পৃথক করা, বাড়তি আঙুল সরিয়ে দেওয়া, কিম্বা শরীরের অন্যান্য অংশের মাংস দিয়ে নূতন আঙুল সৃষ্টি করা—এতো আজ চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিত্যকার ব্যাপার। সুতরাং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এমন কি সার্জারির সাহায্যে দুটি পায়ের অসমতা দূর করে খোঁড়াকেও স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা সম্ভব।

Orthopaedic চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। স্নায়বিক চিকিৎসা এবং অপারেশন যেমন সম্ভব, তেমনি **নানা ধরণের কৃত্রিম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা চলে।**

বিশেষ ধরণের জুতো পরিয়ে, কিম্বা দস্তানা পরিয়ে পা ও হাতের বক্রতা দূর করা যায়; স্নায়ুর অপারেশন এবং বিশেষ ধরণের ব্যাণ্ডেজ বেধে রাখলেও নানা ধরণের শারীরিক বিকলাঙ্গতা দূর করা সম্ভব। আজকাল Physiotherapy-র গুণে অবশ অঙ্গও আংশিক সচল হতে পারে। তা ছাড়া, যাদের বিকলাঙ্গতা স্থায়ি হয়ে গিয়েছে তারাও কৃত্রিম হাত পা কিম্বা ক্রাচ ব্যবহার করে চলচ্ছক্তি লাভ করতে পারেন; নিজেদের প্যাডেল করা গাড়ীতে রাস্তাঘাটে চলাফেরাও করতে পারেন।

দৈহিক বিকলাঙ্গদের শিক্ষা

দৈহিক বিকলাঙ্গতা যদি এমন পর্যায়ের না হয় যে শিশু একেবারেই চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কিম্বা দৈহিক অসুবিধার সঙ্গে যদি মানসিক বাধাগ্রস্ততাও না থাকে, তবে **স্বল্প বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়া-শোনার ব্যবস্থাই প্রয়োজন।** সাধারণতঃ দৈহিক বিকলাঙ্গ শিশুরা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট থাকে না। সুতরাং তাদের জন্য বিশেষ কোন পাঠ্যক্রম কিম্বা পাঠ

পদ্ধতিরও প্রয়োজন হয় না। তবে বিদ্যালয়ের যাতায়াত প্রভৃতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়, অনেক সময় "সহায়কের" সাহায্য নিতে হয়। তা ছাড়া কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিম্বা ক্রাচের ব্যবহার চলতে পারে। তবে এইসব শিশুর ক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকবে একটু ভিন্নধর্মী। মাঠের খেলাধূলোর বদলে সাহিত্য, আলোচনা, চিত্রাঙ্কণ এবং ইনডোর খেলার প্রতি এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি সমপাঠীদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব এবং শিক্ষকদের সহানুভূতি থাকলে বিকলাঙ্গ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যও থাকে ভাল।

কিন্তু যেসব শিশুর বিকলাঙ্গতা খুবই গভীর কিম্বা দৃষ্টিকটু, যাদের চলচ্ছক্তি পর্যন্ত নেই, যাদের কোন কোন অঙ্গ একেবারেই নেই, কিম্বা নিম্নাঙ্গ যাদের অসার হয়ে গেছে, তাদের জন্য **বিশেষ ধরণের স্কুল, সম্ভব হলে আবাসিক স্কুল স্থাপন করাই শ্রেয়।** এইসব স্কুলে একদিকে থাকবে মেডিকেল সার্ভিস বিশেষতঃ Physiotherapy, অপরদিকে থাকবে Educational Therapy, এবং Occupational (Vocational) Therapy

এইসব শিশুর জন্যও সাধারণ ভাবে বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বয়সের হেরফের হয় অনেক, কারণ অনেক শিশুরই লেখাপড়া আরম্ভ হয় দেরিতে, এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার ফলে লেখাপড়ার গতিও থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প। তা ছাড়া বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন সমস্যা থাকবার ফলেই পড়ানোর ব্যবস্থাটি হওয়া উচিত মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তা ছাড়া একটি অঙ্গের দুর্বলতা অন্যান্য অঙ্গ দিয়ে দূর করবার জন্যে বিশেষ ধরণের অনুশীলনও প্রয়োজন।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে **হীনমন্যতার ফলে বিকলাঙ্গ শিশুরা আবেগপ্রবণ এবং স্পর্শকাতর হওয়াই স্বাভাবিক।** সুতরাং সহৃদয়তা নিয়ে তাদের সমস্যাগুলি অনুধাবন করাই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এইসব শিশুর লেখাপড়া যেহেতু স্বাভাবিক শিশুদের মতই, সেইহেতু শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন নেই বলেই মনে করা হয়। অবশ্য অঙ্কনের শিক্ষক, সেলাইয়ের শিক্ষিকা, গানের শিক্ষিকা প্রভৃতির বিশেষ ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের কৃষ্টিমূলক কাজ, ভ্রমণ, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং Sheltered Workshop সম্বন্ধে আগেকার আলোচনা এখানেও প্রযোজ্য।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান

ভারতে দৈহিক দিক থেকে বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা আজও নিরূপিত হয়নি। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ভারতে বিকলাঙ্গ জনসংখ্যা হলো ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে স্কুল বয়সের ছেলেমেয়ে আছে ৪ লক্ষ। কিন্তু সমগ্র ভারতে বর্তমানে বিকলাঙ্গদের স্কুল সংখ্যা হলো মাত্র ২৫টি। সমস্ত স্কুল মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা ১০০০। এর মধ্যে একটি অংশ মাত্র আবাসিক ছাত্রছাত্রী। স্কুলগুলির মধ্যে ১২।১৩টিই বম্বে এবং চারপাশের অঞ্চলে। স্বভাবতঃই বোঝা যায় যে সবগুলি রাজ্যে বিকলাঙ্গের শিক্ষাপ্রয়াস যথোপযুক্ত ভাবে করা হয়নি। বিকলাঙ্গদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা উন্নত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে Fellowship of the Physically handicapped. পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি এদিকে দৃষ্টি পড়েছে। বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই রাজ্যে। তার মধ্যে কলকাতার উপকণ্ঠে বনহুগলীতে প্রতিষ্ঠিত কুমার প্রথম নাথ শিশু হাসপাতাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সারা রাজ্যে ৫টি Vocational Centre আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ মেডিসিন থেকে বিনামূল্যে অর্থোপেডিক চিকিৎসা এবং কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য একটি ছোট কারখানাও স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য নিয়ে অর্থোপেডিক গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাছাড়া Vocational Rehabilitation Administration Project গঠিত হয়েছে। এটি ভারতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, অন্যটি মাদ্রাজে।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষাক্ষেত্রটিও আজ বহু সমস্যা জর্জরিত। চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বল্পতা, স্কুলের সংখ্যাল্পতা, গবেষণার সীমিত প্রসার, কৃত্রিম অঙ্গ সরবরাহের অপ্রতুলতা, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক সচেতনতার অভাব, সরকারী দায়িত্বের অভাব (অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বেসরকারী—এবং সামান্য সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে মাত্র), অর্থের অভাব প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর সমস্যার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি। আরও সামাজিক সচেতনতা এবং মানবতাবোধ, আরও গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ, আরও সরকারী দায়িত্ব আর অর্থ-সংস্থানের পন্থায় এই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং প্রয়োজন।

(খ) মূক ও বধিরদের শিক্ষা

দেখতে সুশ্রী, গায়ে পায়ে বলিষ্ঠ শিশু, অথচ বাকশক্তিহীন, এরকম উদাহরণ

চোখে পড়ে না, এমন নয়। সুস্থ পিতামাতার সন্তানও মূক হতে পারে, আবার মূক পিতা মাতার সন্তানও স্বাভাবিক হতে পারে। সুতরাং বংশধারার মধ্যেই বধিরতা কিম্বা মূকত্বের অভিশাপ বয়ে চলবেই, এমন নয়। তবে দেহ গঠনের কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ঠ্য পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান পেতে পারে একথাও সত্য। সুতরাং মোটামুটি বলা চলে যে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই দেহগঠনের প্রক্রিয়ায়, বিশেষতঃ স্নায়ু ও পেশীর প্রক্রিয়ায় বিশেষ ত্রুটির ফলেই মূকত্ব সৃষ্টি হয়।

শিশু যে বাকশক্তিহীন একথাটি জন্মের সময়েই তো বোঝা যায় না, কারণ বোবা শিশুর কান্নায়ও শব্দ থাকে। গলা দিয়ে স্বর বেরোয়। কিন্তু কণ্ঠনিঃসৃত স্বরকে ভাষায় রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা তার থাকে না। কথা বলবার জন্য যে স্নায়ু ও পেশীর যে ধরণের কার্যকারিতা দরকার হয়, সেই ধরণের কর্মক্ষমতার অভাবেই এমনটি ঘটে। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার কথা বলা স্বাভাবিকভাবে উচিত, তখন কথা বলবার অক্ষমতা প্রকাশ পেলেই আত্মীয়জনের হৃদকম্প উপস্থিত হয়। অবশ্য অনেক শিশু এমনিতেই একটু দেরিতে কথা বলে। সুতরাং শিশুটি সত্যিই বোবা কিনা, একথা জানবার জন্য সময় গুণতেই হবে।

বাকশক্তির ত্রুটি বলতে সম্পূর্ণ মূকত্বই বোঝায় না; এক্ষেত্রেও দুর্বলতার স্তরভেদ আছে। তোতলামিও বাকশক্তির অন্যতম নিদর্শন। তোতলামিও হয় দু'রকমের। অনেক ক্ষেত্রে কথা সম্পূর্ণ আটকে যায়। একে ইংরাজীতে বলে stammering আবার অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। একে বলা হয় Stuttering. তোতলামি অনেক সময় বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই সেরে যায়, কিম্বা কমে যায়। তাছাড়া নির্দিষ্ট অনুশীলনের সাহায্যে কণ্ঠনালীর স্নায়ু ও পেশীর জড়তা কাটাতে পারলে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকভাবে কথা বলার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

বাকশক্তির দ্বিতীয় ধরণের ত্রুটি হলো কথার আড়ষ্টতা এবং অস্পষ্টতা। এ ক্ষেত্রে সচেতন অনুশীলনে অনেক সময় উন্নতি হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় সারা জীবনেও এই ত্রুটি সারে না। কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হলেও উপরোক্ত দুই ধরণের ত্রুটিতে সামাজিক ও কর্মজীবন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েনা। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বোবা হলে জীবনের নানা সমস্যাই সৃষ্টি হয়।

ভাষা হলো ভাবের বাহন, এবং সামাজিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম। তাই বাকশক্তিহীন শিশুর আত্মপরিপূর্ণতা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, ভাবজগতে আসে সংকীর্ণতা, সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়, সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মূকত্বের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থাও তেমন নেই, প্রতিবিধান ব্যবস্থাও খুব সামান্যই আছে। নির্দিষ্ট অনুশীলনের সাহায্যে কিছু হয়তো উন্নতি করা সম্ভব হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থাকে স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বাকশক্তির সঙ্গে শ্রুতিশক্তি খুবই ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যে বধিরতা সৃষ্টি হয়, আমরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, কারণ এটি স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু বিভিন্ন রোগের ফলেও স্বাভাবিক শিশুর শ্রুতি-শক্তি নষ্ট হতে পারে, দুর্ঘটনাতেও হতে পারে তেমনি অবস্থা। অনেক রোগের বিরুদ্ধেই প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করা বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব। দুর্ঘটনার ফলে শ্রুতিশক্তি ব্যাহত হলে চিকিৎসার সাহায্যে কিঞ্চিৎ উন্নতি, অন্ততঃ আরও অবনতির হাত থেকে রক্ষা করাও সম্ভব। তা ছাড়া শ্রুতিশক্তি হীনতার মধ্যেও আছে স্তরভেদ। শব্দের উচ্চ অথবা নীচ গ্রাম, শব্দের গভীরতা ও ব্যাপ্তি, শব্দের উৎস ও প্রকৃতি এবং সর্বোপরি শব্দ তরঙ্গের (sound wave) দৈর্ঘের উপরও শোনবার ক্ষমতা নির্ভর করে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অনুশীলনের সাহায্যে উন্নতি করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আজকাল অনেক শ্রুতিযন্ত্রও (hearing aid) আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হলো সম্পূর্ণ বধিরতার ক্ষেত্রে। কথা না শুনলে কথা শেখা যায় না। সুতরাং শ্রুতিশক্তির ত্রুটির ফলে বাকশক্তিতেও ত্রুটি আসে। এর ফলে ভাব প্রকাশ, শিক্ষা গ্রহণ এবং সামাজিক সামঞ্জস্য ব্যাহত হয়। তা ছাড়া কণ্ঠনালীর পেশী ও স্নায়ুর সঙ্গে কাণের স্নায়ু ও পটাহের (membrane) ঘনিষ্ট সংযোগ আছে, এবং উভয়ের সঙ্গে সংযোগ আছে মস্তিষ্কের। তাই মুকত্ব এবং বধিরতা একসঙ্গেই চলে।

বাকশক্তির সাধারণ দুর্বলতা, কিম্বা শ্রুতিশক্তির সাধারণ খর্বতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, একথা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং এই শ্রেণীর শিশুদের পক্ষে সাধারণ স্কুলে পড়া অসম্ভব নয় ; বরং তাদের সাধারণ স্কুলে অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই

শ্রেয়, কারণ পারস্পরিক মেলামেশার ফলে ত্রুটিপূর্ণ শিশুর উন্নতিই হয়। অবশ্য সাধারণ স্কুলে এদের সম্পর্কে বিশেষ নজর, চিকিৎসা, পুষ্টি এবং প্রয়োজন বোধে বিশেষ শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করা শ্রেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মূক ও বধির শিশু সাধারণ স্কুলে শিক্ষালাভ করতে পারে না। প্রথমতঃ দুইটি ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতার ফলে জ্ঞানের দুইটি দরজাই থাকে অকেজো হয়ে। যে বুদ্ধি নিয়ে শিশু জন্মলাভ করে, তারও পুরোপুরি অনুশীলন হয় না। তাই প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিও বিকশিত এবং প্রসারিত হয় না। সুতরাং তত্ত্বগত শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও কমে যায়। তাই তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পড়াশুনার প্রশ্নই ওঠে না। সর্বোপরি সাধারণ স্কুলে সকলের সঙ্গে সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করাও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজেদের অক্ষমতা সম্বন্ধে এরা সচেতন বলে, মনের ভাব প্রকাশে এরা অক্ষম বলে এরা স্বভাবতঃই স্পর্শকাতর, অনেক ক্ষেত্রেই বদরাগী এবং মানসিক জটিলতাগ্রস্থ। অথচ এদের দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সচল ও কর্মক্ষম। সুতরাং বিশেষ স্কুলে শিক্ষা ও শিক্ষণের ব্যবস্থা হলে এরা আত্মনির্ভর এবং উৎপাদনী দক্ষতা সম্পন্ন সামাজিক মানুষ ও সুস্থ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই এদের জন্য বিশেষ স্কুল এবং বিশেষ শিক্ষণ প্রয়োজন।

মূখ-বধির বিদ্যালয়

সাধারণ পুঁথিগত শিক্ষার কোন স্তর পর্যন্ত মূক-বধিরদের পাঠ্যক্রমে থাকবে, এ নিয়ে বিভিন্ন দেশে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং বাস্তব কর্মসূচীতে রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য। আমাদের দেশে উন্নত মানের মূক-বধির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ দশ বৎসরের স্কুল কোর্স প্রচলিত। এখন পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীর স্তরে সাধারণ-বিদ্যা সকলের পক্ষেই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত (অবশ্য কোন কোন স্কুল পাঠ্যক্রমকে অষ্টম শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করবার কথা ভাবছেন)। কিন্তু ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে এখানে স্বীকার করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন স্তরে (উন্নত স্তরেও) শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে। স্কুলের ছাত্রদের বয়সের হেরফের খুবই বেশী। তবে সাধারণতঃ ৪ বছর বয়সেই ছাত্র গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুকরণ এবং কণ্ঠনালী

সঞ্চালনের নির্দিষ্ট অনুশীলনের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী। অপরের ঠোঁট নড়ার ভঙ্গি থেকে ভাষা বুঝবার শিক্ষা দেওয়া হয়। একেই বলে lip reading. তাছাড়া নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গির সাহায্যেও নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের ট্রেনিং দেওয়া হয়। একেই বলে gesture language. বস্তুতঃ lip reading এর সাহায্যে স্বাভাবিক লোকের কথা বুঝতে এবং gesture language এর সাহায্যে নিজেদের মনোভাব বোঝাতে এরা সক্ষম হয়ে উঠে। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে এরা সহজেই পারে। তা ছাড়া আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের অবদানকে মূক বধির শিক্ষার শিক্ষোপকরণ রূপে ব্যবহার করা হয়। গ্রামোফোন ও টেপ রেকর্ড, (অর্ধ বধিদের ক্ষেত্রে), সিনেমা প্রদর্শনী, মর্স কোড (Morse Code), আলোর সিগন্যাল ব্যবস্থার বহুল প্রচলন বর্তমানে আছে। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিই (Direct method) এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত পদ্ধতি।

মূক-বধির বিদ্যালয়ে Speech Training এর স্থান খুবই উপরে। কথা শেখানোর প্রচেষ্টাকেই বলা হয় Speech Therapy. এ জন্য নির্দিষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন। বাকশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্নায়ু ও পেশীর সজীবতা, সঞ্চালন এবং সংহতিই এই ট্রেনিংয়ের মূল কথা। Physiotherapy-র পদ্ধতিতেই এই ট্রেনিং দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কথা বলার কিছু ক্ষমতা জন্মে, অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা আসে না। জড়তা, আড়ষ্টতা ও অস্পষ্টতা সব ক্ষেত্রেই কিছু থাকে।

মূক-বধির শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমস্যা হলো বৃত্তিমূলক এবং সামাজিক পুনর্বাসন (Vocational and Social Rehabilitation)। তাই এদের প্রাকবৃত্তি (Pre-Vocational) শিক্ষণের প্রোগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রমিক স্থান গ্রহণ করে। ছবি আঁকা, মাটির কাজ, মডেলিং, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, ছুতোর ও কর্মকারের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, সেলাই দর্জি ও বুননের কাজ, তাঁত এবং মেসিন চালনার কাজে এরা খুবই পারদর্শিতা অর্জন করে। বস্তুতঃ যাদবপুরের প্রিন্টিং টেকনোলজিতে এদের জন্য তিন বছরের কোর্স চালু হয়েছে। এবং কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চার বছরের বিশেষ কোর্স চালু হয়েছে। শিক্ষার শেষে স্কুল থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়; কর্মবিনিয়োগ সংস্থাও আছে। কিন্তু কর্মসংস্থান ব্যবস্থা কিম্বা সংরক্ষিত কর্মশালার ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুবই দুর্বল।

মূক-বধির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দু'তিন রকমের হতে পারে। দিবা স্কুল কিম্বা আবাসিক স্কুল, কিম্বা মিশ্রিত স্কুলও প্রতিষ্ঠা করা চলে। তেমনি শুধু লেখাপড়া, শুধু বৃত্তিশিক্ষা কিম্বা উভয়ের মিশ্রিত পাঠ্যক্রম নিয়ে স্কুল স্থাপন করা চলে। উপযুক্ত বয়সের পরে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল, অন্ততঃ পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন, কারণ নানাধরণের যৌন সংকট এদের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ট্রেনিং, শুধু উৎপাদন কিম্বা উভয়ের মিশ্রিত উদ্দেশ্যে (training and production centre) শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা চলে। আমাদের দেশে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অবশ্য খুবই নগন্য।

মূক-বধিরদের শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ মূল্য আছে। ছবি আঁকা, মূক অভিনয় করা, ছায়া নাটক, কিম্বা নৃত্যে এদের পারদর্শিতা খুবই সম্ভব। তেমনি নানাধরণের খেলাধূলোয়ও এরা পারদর্শী হতে পারে, কারণ দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিক থেকে এরা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে সম্প্রতি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে তৃতীয় নিখিল ভারত মূক-বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০০ প্রতিযোগী এখানে যোগ দেয় (এদের মধ্যে ৬০ জন ছিল মেয়ে)। এখানে উন্নত মানের ক্রীড়া প্রদর্শনী হয় এবং নির্বাচিত প্রতিযোগীরা এই বছরেই (১৯৬৯) বেলগ্রেড'এ একাদশ আন্তর্জাতিক মূকবধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। বস্তুতঃ মূক-বধিরদের জীবনকে আনন্দ এবং সংস্কৃতি ধর্মী অবসর বিনোদনের সাহায্যে পূর্ণ করে দেওয়া দরকার। এজন্য নানা ধরণের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ ও খেলাধূলো, প্রদর্শনী ও শিক্ষাভ্রমণ প্রভৃতি এদের শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

মূক-বধির শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশে মূক-বধিরদের শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষা পদ্ধতি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ইংলণ্ডে ১৮৯৩ সনেই এদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাশ হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে এদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হয়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কালে সমস্যার গভীরতা আরও প্রকাশ পায়, অথচ একথাও প্রকাশ পায় যে উপযুক্ত শিক্ষণের সাহায্যে উৎপাদনী দক্ষতা সম্পন্ন

নাগরিক হিসেবে এদের পুনর্বাসিত করা সম্ভব। তাই ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে এই সম্পর্কে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স পর্যন্ত এদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। তাছাড়া এদের ক্ষেত্রে বিশেষ কল্যাণ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত কর্মশালার ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। আমেরিকাতেও আছে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা। তা ছাড়া বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য ফাউণ্ডেশনও কাজ করছে, সরকারী সাহায্যও অনেক। তাই সংরক্ষিত কর্মশালা এবং কলোনীও গড়ে উঠেছে অনেক। রাশিয়াতে এদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

আমাদের দেশে মূক-বধির শিক্ষা প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল মানবতা ও দাতব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই চার্চ সংগঠনগুলি প্রারম্ভিক উদ্যোগ নেয়। অবশ্য ক্রমে ক্রমে সামাজিক ও শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে দেখা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তাও দান করা হয় (যদিও পরিমাণে খুবই সামান্য)। ১৮৮৪ সনে বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মূক-বধির শিক্ষা প্রচেষ্টার যাত্রা সুরু হয়। ১৮৯৩ সনে স্থাপিত হয় কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়। চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডও ৫ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য স্কুল গড়ে উঠে।

বর্তমান ভারতে মূক-বধিরদের সংখ্যা ঠিকভাবে নির্ধারিত নেই। তবে নমুনা সমীক্ষার ফল দিয়ে সরকারীভাবে অনুমান করা হয় যে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক মূক-বধির। এদের মধ্যে স্কুল বয়সের শিশুর সংখ্যা কমপক্ষে ৪ লক্ষ। কিন্তু মূক-বধির স্কুল আছে মাত্র ৯২টি এবং এগুলিতে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৪ হাজার, অর্থাৎ স্কুল বয়সের মূক বধির শিশুদের মধ্যে মাত্র ১% শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতি রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে সরকারী বিদ্যালয় আছে। বাকি সবগুলি স্পনসর্ড কিম্বা সাহায্য প্রাপ্ত। এই সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারই বহন করে থাকেন। মেয়েদের জন্য কয়েকটি আলাদা স্কুলও আছে (কিম্বা মেয়ে বিভাগ আছে)। প্রাথমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা এবং প্রাক-বৃত্তি শিক্ষা দেওয়াই স্কুলগুলির প্রধান কার্যক্রম। সারা ভারতে Training cum Production Centre খুবই কম। একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশে। এখানে আছে এক বছরের কোর্স। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

আছে ৬টি। এদের মধ্যে আমেদাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্মৌ এবং কলকাতার শিক্ষণ কেন্দ্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র এবং মাদ্রাজের মূক বধির বিদ্যালয়েও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সবগুলি মিলিয়ে বছরে ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষক শিক্ষণ লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে আছে তিনটি সরকারী স্পনসর্ড স্কুল—বীরভূম, বহরমপুর ও কলকাতায়। আর আছে ৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র আছে একটি।

সমস্যা ও সমাধান

আমাদের আলোচনার মধ্যেই সমস্যার দিকটি ভেসে উঠেছে। সমীক্ষার অভাব, স্কুলের সংখ্যাল্পতা, গবেষণা ও শিক্ষণের সীমিত সুযোগ, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা, উন্নত শিক্ষোপকরণের অভাব, সামাজিক সচেতনতার অভাব, সীমাবদ্ধ সরকারী দায়িত্ব, অর্থের অভাব প্রভৃতিই গুরুতর সমস্যার দিক। আরও সামাজিক সচেতনতা গবেষণা ও শিক্ষণ, আরও স্কুল ও কর্মশালা কিম্বা সাধারণ কর্মসংস্থান, সর্বোপরি সরকারী দায়িত্ব এবং প্রচুর অর্থসংস্থানের পথে এইসব সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব এবং প্রয়োজন।

(গ) অন্ধদের শিক্ষা

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য অন্ধদের শিক্ষার সমস্যা। অন্যান্য ধরণের ব্যাহতদের সম্বন্ধে সমাজ যেমন এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নয়, অন্ধদের সম্পর্কেও তেমনি অবস্থা। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিজ্ঞান বর্তমানে এতটা অগ্রসর হয়েছে যে অন্ধদের শিক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

সাধারণভাবে জীবনীশক্তির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ চল্লিশ বছর বয়সের পরে দৃষ্টিক্ষীণতা এবং পরিণামে দৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়। জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতির কথা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হলো শিক্ষাগ্রহণের বয়সের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তির নানাবিধ ত্রুটি এবং অন্ধত্বের কথা।

দৃষ্টিহীনতার ক্ষেত্রে কয়েক ধরণের রকমভেদ এবং স্তরভেদ আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বর্ণান্ধতা (colour blindness)। চাক্ষুষ অনুভূতি হয় দুই রকমের—(১) বর্ণবৈষম্যহীন অনুভূতি। এক্ষেত্রে কেবল সাদা এবং কালো রংয়ের তারতম্য করবার সামর্থ্য থাকে। (২) বর্ণানুভূতি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রংয়ের মধ্যে তারতম্য নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকে। পূর্ণাঙ্গ বর্ণানুভূতিই স্বাভাবিকত্ব। স্বাভাবিক শিশুরা উজ্জ্বল রংয়ে আকৃষ্ট হয়। রং যত গভীর হয়, আকর্ষণ হয় তত বেশী। এক বছর বয়সের মধ্যেই বিভিন্ন রংয়ের পার্থক্যের অনুভূতি আসতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধে। তবে এক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত; এবং ছেলেরা অপেক্ষাকৃত বেশী বর্ণান্ধ। আংশিক এবং সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা—দুইই সম্ভব। সাদা ও কালো ছাড়া অন্য কোন বর্ণচেতনার অভাবকে বলে পূর্ণবর্ণান্ধতা, এবং বিশেষ বিশেষ রংয়ের সম্পর্কে অনুভূতি হীনতাকে বলে আংশিক বর্ণান্ধতা। বর্ণান্ধতার এই মাত্রা ও প্রকৃতি পরিমাপ করবার সরঞ্জামও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে রংয়ের উৎস, রংয়ের গভীরতা এবং আলোক তরঙ্গের উপর বর্ণানুভূতি আংশিক নির্ভরশীল। অপরদিকে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা (কারণ অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হলো মস্তিষ্কে) এবং চক্ষুতন্ত্র'র (রেটিনা) দুর্বলতাও আংশিক দায়ী।

চোখের পিছনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্ত্রীর বুনটে যে পর্দাটি তৈরী হয় তাকেই বলে রেটিনা। এই পর্দার উপরই পড়ে বাইরের দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব এবং তা থেকেই সংবাদ চলে যায় মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কে অনুভূতি হলেই আমরা দেখি। রেটিনার বিশেষ বিশেষ বিন্দু সর্বাপেক্ষা অনুভূতিপ্রবণ এবং অন্যান্য কোন বিন্দু অনুভূতিহীন। সুতরাং অনুভূতি প্রবণ অঞ্চলে যে ছবি প্রতিফলিত হয়, তাই আমরা সবচেয়ে ভাল দেখি।

এই সূত্রেই আমরা দৃষ্টিহীনতার অন্যান্য প্রশ্নে এসে পড়ি। অনেক সময় অল্পবয়সেই দূরের জিনিস কিম্বা কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। রেটিনার ত্রুটির ফলে যদি সর্বাপেক্ষা অনুভূতি-প্রবণ কেন্দ্রে প্রতিবিম্ব না পড়ে তবেই দেখতে অসুবিধা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে চশমার সাহায্যে আলোক-রশ্মিগুলিকে অনুভূতির অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা হয়, অর্থাৎ আলোর 'ফোকাসটি' রেটিনার ঠিক জায়গায় ফেলা হয়।

উপরে আমরা সাধারণভাবে বর্ণান্ধতা এবং দৃষ্টিক্ষীণতার কয়েকটি দিক

আলোচনা করলাম। এই দুর্বলতাগুলি বাড়ীতে কিম্বা ক্লাশে শিশুর জীবনযাত্রা এবং পড়াশুনাকে ব্যাহত করে। কিন্তু এগুলির কোনটিই প্রকৃত অন্ধতা নয়। তাছাড়া উত্তেজক বস্তুর (stimulus) শক্তি বৃদ্ধি করে, কিম্বা রংয়ের গভীরতা সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে মস্তিষ্ক ও চোখের চিকিৎসা করে এই দুর্বলতা দূর করাও যায়। রাত্রিকালীন অন্ধতাও মূলতঃ এই শ্রেণীর। রেটিনার ত্রুটি এবং শরীরের পুষ্টিহীনতার ফলেই অনেক সময় রাত্রিকালে অন্ধতা (night blindness) সৃষ্টি হয়।

সুখের বিষয় চোখের ব্যাধি, দৃষ্টিক্ষীণতা এবং প্রায়ান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। চোখের অপারেশন; ইনজেকশন, চশমার ব্যবহার, নানাবিধ ওষুধের সাহায্যে চক্ষুতন্ত্রীর সজীবতা সৃষ্টি করা আজ সম্ভব। চক্ষু ব্যাঙ্ক পর্যন্ত আজ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধতার বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান আজও তেমন জয়যুক্ত হয়নি। একথা ঠিক যে বংশধারার মধ্য থেকে অবশ্যম্ভাবী রূপে অন্ধতা সৃষ্টি হয়না। পিতামাতার কাছ থেকেও প্রত্যক্ষ ভাবে অন্ধতা আসেনা; কিন্তু পরোক্ষভাবে আসে। তখনই হয় জন্মান্ধতা। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থার metabolism'এর ত্রুটির ফলে চক্ষুতন্ত্রী সুগঠিত না হতে পারে, ভ্রূণে আঘাত লাগলে তন্ত্রীগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, সিফিলিসের বীজবাহী মায়ের রক্তদুষ্টতা শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে, কিম্বা সিফিলিস প্রভৃতির বীজ চক্ষে প্রবেশ করে গর্ভস্থ ভ্রূণকে কিম্বা জন্মের পরে আপাতঃসুস্থ শিশুকে অন্ধ করে দিতে পারে।

জন্মলাভের পরেও নানাবিধ কারণে অন্ধতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া, উচ্চ তাপ (Sun blindness) এবং বসন্ত, হাম, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের ফলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া শরীরের অপুষ্টি, বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং 'এ' ভিটামিনের অভাবে ক্যারাটাইটিস রোগ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে রেটিনার কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়। অধিকাংশ দরিদ্রের অন্ধতা এইভাবেই সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দুর্ঘটনার ফলে যে কোন সময় যে কোন লোকেরই অন্ধতা আসতে পারে।

অন্ধতার কারণ সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে বাবা মায়ের বিচক্ষণতা, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন, উপযুক্ত প্রতিষেধক, যথাসময়ে

প্রতিবিধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে বহু ক্ষেত্রেই অন্ধতা নিবারণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই অন্ধতা নিবারণী সমিতিও গঠিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আজও মানুষের হয়নি। সুতরাং সম্পূর্ণ অন্ধ এবং প্রায়ান্ধদের ক্ষেত্রেই শিক্ষা সমস্যাটি সর্বাধিক।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্ধতাকে আমরা ভগবানের অভিশাপ এবং কর্মফল হিসেবেই জ্ঞান করেছি। অন্ধদেরকেও যে উপযুক্ত শিক্ষা এবং শিক্ষণ দেওয়া সম্ভব, তারাও যে সমাজের কাছে অপাংক্তেয় নয়, তারাও যে উৎপাদনী দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, এই চেতনা আমাদের ছিলনা। তাই অন্ধদেরকে সমাজের বোঝা ও পরগাছা হিসেবেই আমরা মনে করেছি। যাদের পিতামাতা সঙ্গতিপন্ন তারা কোনক্রমে ভদ্র জীবন যাপন করেছে। যারা দরিদ্র তারা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। আজও আমরা ভিক্ষুকদের মধ্যে অন্ধই দেখি সর্বাধিক। আমরা খবর রাখিনা এইভাবে কত মনুষ্যশক্তির অপচয় হচ্ছে। আমরা করুণা দেখাই, কিন্তু দায়িত্ব বোধ করিনা। তাই বলা হয় "আমরাও অন্ধদের সম্পর্কে অন্ধ" (Most of us are blind about the blind)।

অন্ধদের শিক্ষাক্রম

অন্ধদের শিক্ষা ও শিক্ষণের দায়িত্ব সমাজের। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তারা যে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধাও অবশ্য আছে। প্রধানতম ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে তারা বঞ্চিত। তাছাড়া বিশেষ স্কুল, বিশেষ সরঞ্জাম, বিশেষ উপকরণ ছাড়া অন্ধদের শিক্ষা সম্ভব হয়না। কিন্তু অন্যদিকে তাদের শ্রুতিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি হয় খুবই তীক্ষ্ণ। Kinaesthetic Sensation' ও তাদের খুবই প্রবল। তাই তারা না দেখেও রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে। সর্বোপরি অনেকেরই থাকে বুদ্ধিদীপ্তি। সুতরাং স্বাভাবিক শিশুর সমতালে শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, এবং সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও তারা কৃতিত্ব দেখায়। অবশ্য সাধারণভাবে বলা যায় যে অনেকেরই লেখাপড়া সুরু হয় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। বুদ্ধিও সকলের তীক্ষ্ণ থাকেনা। তাই অধিকাংশের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ উপযোগিতাসম্পন্ন

প্রাথমিক শিক্ষা কিম্বা সামান্য মাধ্যমিক শিক্ষা, কার্যকরী জ্ঞান এবং হাতে কলমে উৎপাদনী দক্ষতা অর্জন করাই বড় কথা।

অন্ধদের শিক্ষায় সাধারণ পাঠ্যক্রম স্বাভাবিক শিশুদের পাঠ্যক্রমেরই মত। অবশ্য একই বিষয় পড়ানোর জন্য এক্ষেত্রে সময় দেওয়া হয় অনেক বেশী। প্রতিভাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বাভাবিক পাঠ্যক্রমই গ্রহণ করা হয়। Writer'-এর সাহায্যে তারা সাধারণ পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হয়।

অন্ধদের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে শ্রবণ শক্তি এবং স্পর্শশক্তির বিশেষ সদ্ব্যবহার করা হয়। এমনকি হাঁটা চলা শেখানোও হয় স্পর্শশক্তির সাহায্যে। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে আবশ্যিকরূপে এবং শিক্ষার্থীরা প্রায়শই এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় braille টাইপ। ইদানীং অন্যান্য শিক্ষোপকরণও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অন্ধ বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বৃত্তি শিক্ষার জন্য হাতের কাজ। এটি বস্তুতঃপক্ষে আবশ্যিক। উৎপাদনী দক্ষতাকে পুঁজি করে বৃত্তি জীবনে স্বাবলম্বী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই শিক্ষণের লক্ষ্য। এজন্য বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, বই বাঁধাইয়ের কাজ, ধোলাইয়ের কাজ, সহজ যন্ত্রচালনার কাজ প্রভৃতিকে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য গ্রহণ করা হয়।

অন্ধদের ক্ষেত্রেও সহপাঠ্যক্রমিক কাজের বিশেষ মূল্য আছে। আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, গল্প বলা ও রচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর, Word Making. মানসিক গনিত, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ফলপ্রসূ সহপাঠ্যক্রমিক প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব। অবশ্য অন্ধদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন। আবেগ প্রবণ এবং স্পর্শকাতর ছাত্রছাত্রীর জন্য সহানুভূতিপ্রবণ দরদী শিক্ষকের প্রয়োজন। অন্ধদের জন্য দিবা স্কুল এবং আবাসিক স্কুল দুইই প্রতিষ্ঠা করা চলে। তেমনি শুধু শিক্ষা, শুধু বৃত্তি কিম্বা উভয়ের সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম রচনা করা চলে। অবশ্য শিক্ষার শেষে সংরক্ষিত কর্মশালা, উপনিবেশ কিম্বা অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা একান্তই দরকার।

অন্ধদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে অন্ধদের শিক্ষা সম্পর্কিত সমাজ চেতনা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। ইংলণ্ডে ১৮৯৩ সনেই এই সম্পর্কে আইন করা

হয়। বর্তমানে সেখানে অন্ধদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রক সদা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। আমেরিকায় সরকারী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী উদ্যোগ অনেক ব্যাপক। তা ছাড়া সরকারী বিদ্যালয়ও আছে অনেক। রাশিয়াতে সম্পূর্ণ দায়িত্বই রাষ্ট্রের।

আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পন করা হয় মানবিকতা এবং সেবাধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই মিশনারীরাই অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৩ সনে তাঁরা স্থাপন করেন অমৃতসহরে একটি অন্ধ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ই ১৮৯০ সনে দেরাদুনের রায়পুরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান এটি সরকারী এবং ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। সমসাময়িক কালেই দক্ষিণ ভারতে ২।১টি স্কুল গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টাও সংগঠিত হয়। ১৮৯৯ সনে স্থাপিত হয় কলকাতায় বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়। আমেরিকান খৃষ্টান মিশন বোম্বাইয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ্যানা মিলার্ড-এর প্রচেষ্টায় ১৯০০ সনে স্থাপিত হয় দাদার'এর অন্ধ স্কুল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রচেষ্টা প্রসারিত হতে থাকে। সরকারী সাহায্যও একটু একটু করে পাওয়া যায়। ১৮৮৩ থেকে ১৯৪৭ সন (স্বাধীনতা) পর্যন্ত স্থাপিত হয় ৩৪টি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পরে ১৯৬০ সনে স্কুলের সংখ্যা হয় ৬০টি। এই সময় থেকে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

ভারতে অন্ধদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয়নি। তবে নমুনা সমীক্ষা থেকে অনুমান করা হয় যে এই সংখ্যাটি হবে কমপক্ষে ৪০ লক্ষ। (লণ্ডনের Commonwealth Society for the Blind ও এই তথ্য সমর্থন করেছেন)। এই তথ্য গ্রহণ করলে স্কুল বয়সের অন্ধ শিশু ভারতে আছে অন্ততঃ ৮ লক্ষ। কিন্তু বর্তমানে অন্ধদের স্কুল ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান আছে মোট ১২৫টি। এখানে শিক্ষা লাভ করতে পারে মোট ৫ হাজার শিক্ষার্থী। অর্থাৎ শতকরা এক ভাগের সামান্য বেশী শিশু শিক্ষার সুযোগ পায়। অধিকাংশ স্কুলেই পাঠ্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের। ঐসঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা এবং প্রায় আবশ্যিকভাবেই সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্কুলগুলি অধিকাংশই বেসরকারী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। অবশ্য রাজ্য সরকারগুলি যৎসামান্য অর্থসাহায্য দেন। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র আছে মাত্র তিনটি। এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের

ঔদার্যে পরিচালিত। কিন্তু বছরে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষক ট্রেনিং পেতে পারেন। অন্ধ্র এবং মাদ্রাজের অন্ধ বিদ্যালয়েও প্রয়োজন বোধে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বল্প কয়েকটি সংরক্ষিত কর্মশালাও তৈরী হয়েছে। ১৯৫০'এর পরে কয়েকটি বয়স্ক কেন্দ্রও তৈরী হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেরাদুনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে National Centre for the Blind. এই প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে আছে Braille Press এবং ছাপা ও ব্রেইল যন্ত্রের অংশ উৎপাদন ব্যবস্থা, সংরক্ষিত কর্মশালা প্রভৃতি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Central Institute for Audio Visual aid, (Auditional aid লাগে অন্ধদের ক্ষেত্রে, Visual aid লাগে মূক-বধিরদের)। ১৯৫২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে National Association for the Blind. কোন কোন সরকারী কিম্বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরির ক্ষেত্রে অন্ধদের বিশেষ সুযোগও দেওয়া হয়, এবং এজন্য Employment Bureau'ও তৈরী হয়েছে। কিন্তু এইসব কিছুই প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

পশ্চিমবঙ্গে অন্ধ বিদ্যালয় আছে ৪।৫টি। এর মধ্যে বেহালা ও নরেন্দ্রপুরের প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা আছে। সিউড়ীর স্কুল এবং কলকাতার Light House for the Blind প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরকারী স্পনসর্ড পর্যায়ের।

সমস্যা ও সমাধান

উপরের আলোচনার মধ্যেই আমরা সমস্যার ইঙ্গিত করে এসেছি। সমীক্ষার অভাব, স্কুলের সংখ্যাল্পতা, গবেষণা ও শিক্ষণের সীমিত সুযোগ, ব্রেইল যন্ত্র ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণের উচ্চমূল্য এবং সীমাবদ্ধ সরবরাহ, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক সচেতনতার অভাব, সীমাবদ্ধ সরকারী দায়িত্ব এবং অর্থের অভাব প্রভৃতিই গুরুতর সমস্যার দিক। আরও সামাজিক চেতনা, গবেষণা ও শিক্ষণ, শিক্ষোপকরণের অঢেল সরবরাহ, আরও অনেক স্কুল এবং কর্মশালা প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং প্রচুর অর্থসংস্থানের পথে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

ব্যাহতদের অপরাধ প্রবণতার সমস্যা

শিশুদের অপসঙ্গতি সম্বন্ধে আমরা আগে যে আলোচনা করেছি (দ্বিতীয় পর্বের ৬৯ এবং ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা দেখ) সেটি ব্যাহতদের শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তবে ব্যাহতদের ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির সমস্যা আরও গভীর। শারীরিক বিকলাঙ্গতার ফলে এরা প্রায়ই হীনমন্যতা এবং কুণো স্বভাবের দোষে দুষ্ট হয়। লজ্জা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব এদের ক্ষেত্রে বড় বেশী। তাছাড়া এদের আবেগ জীবনও অনেক সময় অব্যবস্থিত থাকে! অতি ক্রোধ, অতি হিংসা, অতি ভয় প্রভৃতি দেখা যায় প্রায়ই। সুতরাং আবেগ জীবনে এদের অপসঙ্গতি দূর করবার জন্য শিক্ষকের সাহচর্য এবং মানবিক সহৃদয়তা প্রয়োজন।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যৌন চেতনাও এদের মধ্যে জাগে। অন্যান্য স্বাভাবিক লোকের মত বিয়ে করে সংসার যাপনের আকাঙ্খাও এদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিম্বা দোষাবহ নয়। কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে এরা অতি সচেতন বলেই সুস্থ দাম্পত্য জীবনের আশা অনেকেই করতে পারে না। তাই অসঙ্গত উপায়ে যৌন কামনা চরিতার্থতাও এদের পক্ষে সম্ভব। সুতরাং বিশেষ যত্নে এদের যৌনআবেগকে অবদমিত এবং কাম্য পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কে সাবধানতা দরকার। আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ এবং আত্মঅবমাননায় জর্জরিত হয়ে, সমাজের কাছে বঞ্চিত হয়ে, সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এই স্পৃহা চরিতার্থতা করবার জন্যই অপরাধের পন্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মানসিক ব্যাহতরা বিচারবুদ্ধিতে অক্ষম। অপরের নির্দেশে তারা চলতে অভ্যস্ত। সচেতন অপরাধী এদেরকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিজে সুফলটুকু ভোগ করতে পারে। এই ভাবেই অপরাধ প্রবণতা ব্যাহতদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। সুতরাং সুস্থ সামাজিক জীবন এবং সুনির্দেশনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

সার্বিক পরিস্থিতি

বিভিন্ন ধরণের ব্যাহতদের কথা আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু সমস্তগুলি তথ্য সংযুক্ত করে সকল ধরণের ব্যাহতদের শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বভারতীয় চিত্র অঙ্কন খুবই বেদনাদায়ক হবে। ব্যাহতদের সংখ্যা সম্বন্ধে বেসরকারী ও সরকারী তথ্যে গরমিল আছে। (বেসরকারী হিসেবে ব্যাহতদের সংখ্যা অনেক বেশী)। সরকারীভাবে কোঠারি কমিশন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তারপরে National Institute of Education থেকে অন্ধ ও

মূকবধির বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। উপরোক্ত দুইটি সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ীই নিম্নানুরূপ পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

জনসংখ্যার ২—৩% হিসেবে ভারতে মানসিক ব্যাহতদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। (টাটা সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের মতে স্কুল শিশুদের ১'৪ ভাগই মানসিকভাবে ব্যাহত)। কিন্তু মানসিক ব্যাহতদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবরকমের মিলিয়ে ৫১টি; ছাত্রসংখ্যা ১৮৬০, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে দু'টি।

৫—১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ শ্রবণশক্তি আছে ১২৫৮০০০০ জনের। তাছাড়া ১৫ লক্ষাধিক লোক রয়েছে মূক ও বধির। এদের মধ্যে স্কুল বয়সের শিশু ৩ লক্ষ। কিন্তু মূক বধিরদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ৯২টি এবং বয়স্ক কেন্দ্র ৮টি। স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ৩টি এবং মাঝে মাঝে চালু হয় আর তিনটি। বৎসরে শিক্ষণ পেতে পারেন ৫০—৬০ জন। বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে ৩৮% শিক্ষণ প্রাপ্ত।

ভারতে অন্ধের সংখ্যা ৪০ লক্ষের উপর। এদের মধ্যে স্কুল বয়সের শিশু আছে ৪ লক্ষের মত। এদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ১১৫ টি এবং অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান আও ২০টি। এখানে ৫ হাজার শিশুর স্থান সংকুলান সম্ভব; অর্থাৎ ১% শিশুর ব্যাহত শিশুর। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র আছে ৩টি। ৫৫% শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত।

দৈহিক ব্যাহতদের সংখ্যা আনুমানিক ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে স্কুল বয়সের শিশু আছে ৪ লক্ষ। কিন্তু ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০০ হাজার শিশু মাত্র শিক্ষা পেতে পারে।

কেন্দ্রীয় ভাবে অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। বাঙ্গালোরের All India Institute of Speech, National Centre for the Blind; Central Film Laboratory, National Institute of Audio Visual aid; প্রভৃতি এই ধরনের প্রতিষ্ঠান।

শিশু সংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যাল্পতা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অত্যন্ত ভাবে ব্যাহত এবং মানসিক বিশৃঙ্খলা সম্পন্ন শিশুদের জন্য কোন শিক্ষারই বন্দোবস্ত নেই। সর্বমোট সাফল্য অতি নগণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের

যাত্রাই সুরু হয়নি। তাছাড়া বর্তমানের প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রধানত শহরেই স্থাপিত। শিক্ষকদের বেতনক্রমও অনুন্নত এবং বহু ধরণের।

পশ্চিম বঙ্গে মানসিক ব্যাহতদের জন্য বিভিন্ন ধরণের মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬টি। এগুলির সব কয়টিতেই মাইনে নেওয়া হয়। দৈহিক ব্যাহতদের স্কুল আছে মাত্র ২।৩টি। অন্ধদের স্কুল আছে ৪।৫টি। ব্যাহতদের জন্য বৃত্তিকেন্দ্র আছে ৫টি।

বস্তুত ব্যাহতদের শিক্ষায় আমাদের দুর্দশার উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ

তথ্যাদি উপস্থিত করে আমাদের পশ্চাৎপদতার কথা আলোচনার পরেও কমিশন বলেছেন যে অর্থের অভাব এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রয়াসেও সীমাবদ্ধতা থাকবে। কমিশন নিম্নানুরূপ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা বলছেন—(ক) ১৯৮৬ সনের মধ্যে অন্ধ, বধির এবং বিকলাঙ্গদের ১৫%এবং মানসিক ব্যাহতদের ৫% শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে হবে। দুইটি লক্ষ্য পূর্ণ হলে ব্যাহতশিশুদের সার্বিক সংখ্যার ১০% শিক্ষার সুযোগ পাবে।

(খ) প্রতি জিলায় বিভিন্ন ধরণের ব্যাহতদের জন্য অন্ততঃ একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ভারতে মোট জিলার সংখ্যা ৩২০টি। বর্তমানে এর মধ্যে ২৫০টি জিলাতেই কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

(গ) শিক্ষা কার্যক্রম হতে পারে দুই ধরনের—(১) সাধারণ স্কুলের মধ্যে, অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে। এবং (২) বিশেষ স্কুলে। অর্থ সমস্যা এবং সামাজিক মেলামেশার কথা মনে রেখে সাধারণ স্কুলেই ব্যাহতদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঘ) ক্ষীণদৃষ্টি, বাকশক্তিতে আড়ষ্ট, মস্তিকে আঘাত প্রাপ্ত এবং প্রক্ষোভে অপসঙ্গতি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সুরু করতে হবে।

(ঙ) সকল ধরনের ব্যাহতদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার করতে হবে। একজন শিক্ষক প্রতি ১০ জন ছাত্রের হিসেবে শুধুমাত্র অন্ধ, বধির ও মানসিক ব্যাহতদের জন্যই লাগবে ১৬৫০০ শিক্ষক।

(চ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রক; সমাজ কল্যাণ বোর্ড এবং বেসরকারী উদ্যমের মধ্যে সংহতি এবং যোগাযোগ আনতে হবে।

(ছ) গবেষণার প্রসার করতে হবে এবং শিক্ষোপকরণ তৈরী করতে হবে। এজন্য N.C.E.R.T'এর একটি বিশেষ কমিটি দরকার।

কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খুব আশান্বিত হওয়ার কারণ নেই। পরিকল্পনা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী পরিষ্কার বলেছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় সকল ধরণের ব্যাহতদের শিক্ষার জন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলে ঘোষণা করা সম্ভব নয়। এজন্য ব্যাহতদেরকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন বেসরকারী উদ্যমই দায়িত্ব পালন করে চলবে।

রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব

কিন্তু এই কথা সর্বাংশে গ্রহণ করা যায়না। বস্তুতঃ বর্তমানে এই ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব অতি অল্প। অন্ধদের স্কুলগুলির ব্যয়ের ৩৩% এবং বধিরদের স্কুলে ৬২% ব্যয় সংকুলান হয় সরকারী সাহায্য থেকে। বাকিটা সব সংকুলান হয় দান, চাঁদা এবং ছাত্রবেতন থেকে। কিন্তু আমরা গোড়াতেই বলেছি যে আজ রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্বকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। জনকল্যাণের দৃষ্টিতে, সমসুযোগের দৃষ্টিতে, গনতন্ত্রের দৃষ্টিতে, নাগরিক শিক্ষার দৃষ্টিতে, উৎপাদনী জনশক্তি তৈরীর দৃষ্টিতে—যে কোন দিক থেকেই দেখা হোক, এই দায়িত্বটি সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্রের। এই বিরাট দায়িত্ব রাষ্ট্র ছাড়া অপরের গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। (বেসরকারী সহযোগিতা থাকতে পারে মাত্র)। তাছাড়া ব্যাহতদেরকে দয়ার উপর বাঁচতে বাধ্য করাও যায়না। শিক্ষায় ও কর্মে তাদের অধিকার আছে। এই কথা স্বীকার করে রাষ্ট্রকেই পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব নিতে হবে।